মুসনাদে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)

অনুবাদ

মুহাম্মদ সিরাজুল হক

মুসনাদে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)
মুহাম্মদ সিরাজুল হক অনূদিত

ইফাবা প্রকাশনা : ২০৪২
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬১
ISBN : 984-06-0653-X

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯১

দ্বিতীয় (ইফাবা প্রথম) সংস্করণ
এপ্রিল ২০০২
বৈশাখ ১৪০৯
মুহররম ১৪২৩

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

কম্পিউটার কম্পোজ
নাজমুন কম্পিউটার্স
১১২ পূর্ব গোড়ান, ঢাকা-১২১৯

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহম্মদ মুনসুরউদ্‌দৌলাহ্ পাহ্‌লোয়ান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ অংকনে : জসিম উদ্দিন

মূল্য : ২২৮,০০ (দুইশত আটাশ) টাকা

MUSNADE IMAM AZAM ABU HANIFA (R) (Compilation of Hadiths) : translated by Muhammad Sirajul Hoque into Bangla and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
April 2002

Price : Tk 228.00 US Dollar : 8.00

মহাপরিচালকের কথা

ইসলামী শরীয়তের অন্যতম দু'টি উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্। মহানবী (সা)-এর হাদীসসমূহ থেকেই সুন্নাহ্ বা তাঁর অনুসৃত আদর্শ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। মহানবী (সা)-এর বাণী, তাঁর কাজ ও তাঁর অনুমোদন বা মৌন সম্মতিই হাদীস। তাঁর এইসব অভিব্যক্তিকে হাদীস সংকলনগুলোতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছয়টি বিশুদ্ধ সংকলন "সিহাহ্ সিত্তাহ্" নামে খ্যাত। কিন্তু এর বাইরেও অনেক বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন রয়েছে। এর মধ্যে ইমাম মালিক (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর 'মুয়াত্তা', ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর 'মুসনাদ' এবং হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর 'মুসনাদ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম আবূ হানীফা (র) পবিত্র মক্কা, মদীনা, ইয়ামান, বসরা ও কূফা ইত্যাদি নগরী সফর করে বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেঈ থেকে হাদীস্ সংগ্রহ করে তাঁর মুসনাদে সন্নিবেশিত করেন। তাঁর সংকলিত হাদীসগুলো প্রামাণ্য ও সিদ্ধান্তমূলক। এ ছাড়াও তিনি যে অত্যন্ত উঁচুমানের একজন হাদীসবেত্তা ছিলেন এবং ফিকহ্শাস্ত্রে দেওয়া তাঁর সিদ্ধান্তগুলো হাদীসের ভিত্তিতে গভীর বিশ্লেষণমূলক ছিল, তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ হচ্ছে এই হাদীস সংকলন।

এই গ্রন্থের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এতে ঈমান, ইলম, পবিত্রতা, সালাত, যাকাত, সওম, হজ্ব, বিবাহ-তালাক, জেহাদ, ক্রয়-বিক্রয়, আদব, অপরাধ, দণ্ড, ফিতনা এবং নবী ও সাহাবীগণের মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে হাদীসগুলো এমনভাবে চয়ন করা হয়েছে যাতে এ সকল বিষয়ে সঠিক দিক-নির্দেশনা লাভ করা যায়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমান। আবার মুসলমানদের ৯৯% ভাগ লোকই হচ্ছে হানাফী মাযহাবের অনুসারী। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোতে হানাফী মাযহাবের আলোকেই ফিকহ্শাস্ত্র পড়ানো হয়। অথচ হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক জগতশ্রেষ্ঠ ইমাম — ইমামে আযম আবূ হানীফা (র)-এর সংকলিত এই বিশ্ববিখ্যাত হাদীস সংকলনটির পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ না হওয়ায়, ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষক নির্বিশেষে সকল বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট তা অগোচরেই থেকে যায়।

বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করে একটি বহুল প্রতীক্ষিত জরুরী খেদমত আনজাম দিয়েছেন। আশা করি বইটি জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে।

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইমাম আবূ হানীফা নু'মান বিন সাবিত হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক এবং 'ইমাম আযম' অভিধায় বিভূষিত, যা ইমামদের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। ফিকহ্ শাস্ত্রের পথিকৃৎ হিসেবে তিনি পরিচিত হলেও ইল্‌মে কালাম বা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস — আকীদার ওপর সর্বপ্রথম একটি গ্রন্থ "আল-ফিকহুল আকবার" প্রণয়ন করে তিনি এ ক্ষেত্রেও পথ-প্রদর্শকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি যেমন ফিকহ্ শাস্ত্রের সূচনা ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ও মূল্যবান অবদান রেখেছে, তেমনি হাদীসশাস্ত্রে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি প্রমাণের জন্য তাঁর সংকলিত 'মুসনাদ' গ্রন্থটিই যথেষ্ট। তিনি নিজে জগদ্বিখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন বলে হাদীসের গ্রহণ-বর্জনের ব্যাকরণ উত্তীর্ণ এক পরিশুদ্ধ ও সুবিন্যস্ত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন উপহার দিতে পেরেছেন।

এই হাদীস গ্রন্থটি ধর্মতাত্ত্বিক, গবেষক নির্বিশেষে হাদীসের সকল শিক্ষার্থী, বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য অতীব প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও অনুবাদের অভাবে এই মূল্যবান ও উঁচুমানের গ্রন্থটি বাংলাভাষীদের অগোচরেই থেকে যায়। তবে গ্রন্থটি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণা ইত্যাদি প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশে পাদটীকা ও ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাকের এ গ্রন্থটির স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন। এই সংযোজনসহ মূল গ্রন্থটি বাংলা অনুবাদে এগিয়ে এসেছেন বিশিষ্ট আলেম ও অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক। গ্রন্থটি হাদীস চর্চাকারী ও গবেষকদের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। তারপরও পাঠকদের কাছে কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এই মহান ইমামের মেধা ও শ্রমসাধ্য হাদীস সংকলনটি অধ্যয়ন করে জ্ঞানের গভীরতা ও আমলে নিষ্ঠালাভের তাওফিক দিন। আমীন।।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের আরয

ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস হলো আল্লাহ্ পাকের বাণী পবিত্র কুরআন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাদীস। হাদীসকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর এবং ব্যাখ্যাও বলা হয়ে থাকে। কেননা শরীয়তের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং সাহাবায়ে কিরামের যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াবের সমাহার হলো এই হাদীস। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা তা আঁকড়িয়ে ধর এবং তা অনুসরণ করে চল, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহ্র কিতাব —কুরআন, অপরটি হলো আমার সুন্নাত ও আদর্শ।"

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং পবিত্র কুরআনের হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় মানবজাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদতলে জীবন উৎসর্গকারী একদল সাহাবায়ে কিরাম পার্থিব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে তাঁর পবিত্র বাণী তথা হাদীস সংগ্রহ করার মহতী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই আত্মত্যাগের ফলেই তাঁদের পরে হাদীস বর্ণনাকারীদের একটি ক্রমধারা অব্যাহত রয়েছে এবং তাঁদের মাধ্যমেই বর্তমান যুগ পর্যন্ত পবিত্র হাদীসের অমিয় বাণী থেকে মানবজাতি সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে আসছে।

হাদীসের গ্রন্থসমূহের মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ ছাড়াও অনেক হাদীস গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে 'মুসনাদে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)' শীর্ষক হাদীস গ্রন্থখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেউ কেউ মনে করেন, হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) শুধু ফিকহশাস্ত্রেই অভিজ্ঞ ও অনন্য সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হাদীস চর্চাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অপরিসীম। তাই দেখা যায়, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি বিরাট অবদান রেখেছেন। তৎকালীন ইলম চর্চার কেন্দ্রভূমি মক্কা মুয়াজ্জামা, মদীনা মুনাওয়ারা, ইয়েমেন, বসরা ও কূফার প্রখ্যাত তাবেঈ ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম থেকে তিনি হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি তাঁর মুসনাদে পবিত্র হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। ঈমান, পবিত্রতা, সালাম, সাওম, যাকাত, হজ্জ, বিবাহ, তালাকসহ ইসলামী শরীয়তের প্রায় সকল বিষয় সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র) হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। এ ছাড়া প্রতিটি হাদীস শেষে বর্ণিত বিষয়বস্তুর উপর প্রখ্যাত আলিম আল্লামা দোস্ত মুহাম্মদ শাকের বিস্তারিত আলোচনা করে মাসয়ালাগুলো সন্নিবেশ করেছেন। ফলে এ মূল্যবান গ্রন্থখানা প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে ঘরে রাখা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে। তাই প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাদীস থেকে ফয়েয ও বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে শত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও 'মুসনাদে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)'

শীর্ষক গ্রন্থখানা অনুবাদ করার মত মহৎ ও কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করি। পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১২ হিজরী উদযাপন উপলক্ষে মেসার্স নূর লাইব্রেরী চট্টগ্রাম থেকে এর কিছু অনূদিত অংশ প্রকাশ করে। বর্তমানে এ মূল্যবান হাদীস গ্রন্থখানা সম্পূর্ণ অনুবাদের পর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের এ দীনি খেদমত কবূল করুন।

মহান আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো শুকরিয়া জানাচ্ছি, তিনি এ অধমকে তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীন রাহ্মাতুললিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী মাতৃভাষা বাংলায় অনুবাদ করার তৌফিক দিয়েছেন। যেহেতু মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়, তাই সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের নিকট অনুরোধ, যদি কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। গ্রন্থখানা পাঠ করে যদি কেউ হাদীস অনুযায়ী বাস্তব জীবনে আমল করার চেষ্টা করেন, তাহলে শ্রম সার্থক মনে করব।

পরিশেষে এ গ্রন্থখানার উসীলায় পরকালে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফাআত নসীব করার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে আকুল ফরিয়াদ জানাচ্ছি।

১ যিলহজ্জ, ১৪২২ হিজরী
২ ফাল্গুন, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ
১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ

মুহাম্মদ সিরাজুল হক
খিলগাঁও, ঢাকা

সূচিপত্র

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৯

ঈমান অধ্যায়

সমস্ত আমলে বিশুদ্ধতা নিয়্যতের উপর নির্ভর করে ৩৯
ঈমান, ইসলাম, তাকদীর এবং শাফাআত ৪১
তাওহীদ ও রিসালাত ৪৬
মুশরিক লোকদের সন্তানদের ব্যাপারে কোনরূপ ফয়সালা না দিয়ে বিরত থাকা ৫০
ইসলামের মূল ভিত্তি হলো তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদান করা ৫১
কবীরা গুনাহকারীকে কাফির বলা যাবে না ৫২
মুমিন অনন্তকালের জন্য জাহান্নামী হবে না ৫৬
তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব ৬৪
আমলের ব্যাপারে প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান ৬৫
কাদরিয়া দলের প্রতি তিরস্কার ৬৭
শাফাআতের বর্ণনা ৬৯

ইলম অধ্যায়

বিদ্যা অর্জন ফরয হওয়ার বর্ণনা ৮৫
ফিকহ্-এর জ্ঞান অর্জনের ফযীলত ৮৬
যিকিরকারীদের ফযীলত ৮৮
ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মিথ্যারোপের শাস্তি ৯০

তাহারাত অধ্যায়

স্থির ও জমা পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ ৯৫
বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা উযূ করার বর্ণনা ৯৭
দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার বর্ণনা ৯৮
দুধপান করে উযূ না করা সম্পর্কে ১০০
গোশ্‌ত খাওয়ার পর উযূ না করা সম্পর্কে ১০০
মিসওয়াক ব্যবহারের নির্দেশ ১০১
উযূর মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিন-তিনবার ধৌত করা সম্পর্কে ১০২

উযূতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক-একবার ধৌত করা	১০৮
উযূর উদ্বৃত্ত পানি লজ্জাস্থানে ছিঁটিয়ে দেওয়া	১০৯
মোযার উপর মাসেহ করা	১১০
মাসেহ্ করার সময় নির্ধারিত করা	১১৮
অপবিত্র অবস্থায় দ্বিতীয়বার সহবাস করা	১২১
অপবিত্র ব্যক্তি উযূ না করা পর্যন্ত নিদ্রা যাবে না	১২২
মুমিন অপবিত্র হয় না	১২৩
নিদ্রায় মহিলারাও সেরূপ দেখে, যেরূপ পুরুষ দেখে থাকে	১২৫
গোসলখানা সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান	১২৬
কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে ফেলা	১২৬
চামড়া পাকা করার দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়	১২৯

নামায অধ্যায়

নামায অধ্যায়	১৩১
নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর	১৩৩
এক কাপড়ে নামায আদায় করা জায়েয	১৩৪
ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায পড়া	১৩৫
ইসফারের (পূবাকাশ পরিষ্কার হওয়ার) পর নামায আদায় করার ফযীলত	১৩৬
আসরের নামায কাযা হওয়া সম্পর্কে হুঁশিয়ারী	১৩৯
আযান ও ইকামতের বর্ণনা	১৪৩
যে আল্লাহ্র জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে	১৪৯
মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা করা নিষেধ	১৫০
নামায শুরু করার বর্ণনা	১৫১
নামাযে উচ্চস্বরে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়বে না	১৬৮
ইমামের কিরাআতই মুকতাদীর কিরাআত	১৭১
তাতবীক রহিত হওয়ার বর্ণনা	১৮২
ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলে	১৮৩
সিজদার অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা	১৮৪
ফজর নামাযে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করা সম্পর্কে	১৮৮
তাশাহহুদে বসার পদ্ধতি	১৯২
তাশাহহুদের বর্ণনা	১৯৩
ইমামের সংক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করা	১৯৭
চাটাইয়ের উপর নামায পড়ার বর্ণনা	১৯৮
অসুস্থ ও রোগীর নামায	১৯৯
জারজ সন্তান, ক্রীতদাস ও গ্রাম্য লোকের নামাযে ইমাম হওয়া	২০৪
দু'জনের জামাআত	২০৫

কাতার মিলানোর ফযীলতের বর্ণনা	২০৫
যে ব্যক্তি ফজর ও ইশার জামাআতে অংশগ্রহণ করে	২০৬
ইশার নামায শুরু হওয়ার সময় খাবার এলে কি করতে হবে	২০৮
যদি কেউ একা নামায আদায় করে, অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে এবং এ সময়ে নামাযের জামাআত শুরু হলে, তখন কি করতে হবে	২০৯
জুমুআর দিন গোসল করা	২১১
খুতবার বর্ণনা	২১৩
জুমুআর নামাযে কি সূরা পড়তে হবে	২১৫
জুমুআর রাত এবং ঐ রাতে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত	২১৬
মহিলাদের কোন কল্যাণকর কাজে এবং সমস্ত মুসলমানদের দু'আয় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে গমনের অনুমতি	২১৭
ঈদের নামাযের পূর্বে এবং পরে (নফল) নামায আদায় না করা প্রসঙ্গে	২১৯
সফরে (ভ্রমণে) নামায কসর করা	২২০
সওয়ারী বা বাহনের উপর নামায	২২৫
বিতরের বর্ণনা	২২৬
সাহু সিজদার (ভুলের সিজদা) বিবরণ	২৩৪
সিজদায়ে তিলাওয়াতের বর্ণনা	২৩৫
নামাযে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ	২৩৬
নামাযে ভুল প্রকাশ করার জন্য পুরুষের তাসবীহ্ এবং মহিলাদের হাতে তালি দেওয়া	২৩৭
নামায কিসের দ্বারা ভঙ্গ হয় এবং কিসের দ্বারা ভঙ্গ হয় না	২৩৮
সূর্যগ্রহণের নামায	২৩৯
ইসতিখারার নামাযের বর্ণনা	২৪৩
চাশ্‌তের নামায	২৪৪
ইতিকাফের বর্ণনা	২৪৬
তাহাজ্জুদ নামাযের বর্ণনা	২৪৬
ফজরের সুন্নাত	২৪৮
যে ব্যক্তি মসজিদে ইশার পর চার রাকাআত নামায আদায় করে	২৫০
জোহরের নামাযের পর দু'রাকাআত সুন্নাত আদায়ের বর্ণনা	২৫২
ঘরের মধ্যে নামায আদায় করার বিবরণ	২৫২
কা'বা ঘরে দু'রাকাআত সুন্নাত পড়া সম্পর্কে	২৫৩
জানাযার বর্ণনা	২৫৫
কবরে প্রশ্ন ও উত্তর	২৬২
কবর যিয়ারত এবং কবরবাসীদের প্রতি সালাম দেয়ার বর্ণনা	২৬৬

যাকাত অধ্যায়

রিকাযের বিধান ২৬৯
প্রত্যেক সৎকাজ সদকা ২৭০
সদকার মাল অন্যের জন্য হাদিয়া হতে পারে ২৭১

রোযা অধ্যায়

রোযার ফযীলত ২৭২
শিংগা লাগানোর কারণে রোযা ভংগের বিধান রহিত ২৭৬
অপবিত্র অবস্থায় রোযা পালনকারীর ভোর হওয়া ২৭৭
রোযা অবস্থায় চুমো দেওয়া ২৭৮
সফর বা ভ্রমণে রোযা না রাখার অনুমতি ২৮০
চুপ থাকার রোযা এবং ক্রমাগত রোযা রাখা নিষেধ ২৮১
আইয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখা নিষেধ ২৮২
ই'তিকাফ করা এবং মান্নত পূর্ণ করা ২৮৪

হজ্জ অধ্যায়

হজ্জে জলদি করা ২৮৫
হজ্জ আদায়কারীর মাগফিরাত ২৮৫
জোরে লাব্বাইক বলা এবং কুরবানীর নাম হজ্জ ২৮৬
ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান ২৮৭
মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন্ ধরনের পোশাক পরিধান করবে ২৮৮
মুহ্‌রিম ব্যক্তির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার ২৯০
তামাত্তুর বর্ণনা ২৯০
মুহরিমের জন্য শিকারের গোশত খাওয়া ২৯৪
ইহ্‌রামরত ব্যক্তির জন্য কোন্ জীব হত্যা করা জায়েয ২৯৬
মুহরিমের বিবাহ করা ২৯৭
ইহ্‌রামরত ব্যক্তির শিংগা লাগানো ৩০১
রুকন এবং হাজরে আসওয়াদকে চুমো দেওয়া ৩০১
আরাফাতে দু'নামায একত্রে আদায় করা ৩০৪
কংকর নিক্ষেপ করা ৩০৬
কুরবানীর জন্তুর উপর সওয়ার হওয়া ৩০৮
তামাত্তু এবং কিরান ৩০৯
রমযানে উমরার ফযীলত ৩১৭
নবী (সা)-এর রওযা শরীফের যিয়ারতের বর্ণনা ৩১৮

বিবাহ অধ্যায়

বিবাহের খুতবা ৩১৯
বিবাহের নির্দেশ ৩২০
কুমারী মেয়েদের বিবাহের ব্যাপারে উৎসাহ দান ৩২১
বৃদ্ধা, বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তা সন্তানের মাকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা ৩২৩
বন্ধ্যা মহিলাদেরকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা ৩২৪
মহিলাদের অশুভ হওয়া ৩২৫
কুমারী ও প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের বিবাহে তাদের অনুমতি গ্রহণ করা ৩২৭
কুমারী মেয়ের সন্তুষ্টি এবং প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার অনুমতি গ্রহণ ৩২৯
সম্মতি ব্যতীত মহিলাদের বিবাহ বৈধ নয় ৩৩০
কোন মহিলাকে তার ফুফু বা খালার সাথে এক সাথে বিবাহ করা নিষেধ ৩৩৪
মুতআ বিবাহ হারাম ৩৩৫
আযলের বর্ণনা ৩৩৯
যেদিক থেকে ইচ্ছা নারীদের সাথে সহবাস করা জায়েয ৩৪০
মহিলাদের মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম ৩৪১
বংশ (সন্তান) বিছানায় অবস্থানকারীর জন্য ৩৪৪

গর্ভাশয় পরিচ্ছন্ন ও শূন্য করা সম্পর্কে

গর্ভাশয় পরিচ্ছন্ন ও শূন্য করা ৩৪৬

দুধপান করানোর বিধান

দুধপান এবং বংশ সম্পর্কের কারণে হুরমত সাব্যস্ত হওয়া একই পর্যায়ের ৩৪৭

তালাকের বর্ণনা

কৌতুকার্থে তালাক উচ্চারণ করা ৩৪৯
ইদ্দতের বর্ণনা ৩৪৯
ঋতু অবস্থায় তালাক প্রদান ৩৫১
তালাককে খেলার বস্তু বানানো হারাম ৩৫২
পাগলের তালাক কার্যকর হবে না ৩৫৩
শুধু ক্ষমতা প্রদান করার কারণে নারীর তালাক কার্যকর হবে না ৩৫৩
বিবাহিত দাসীর আযাদীলাভের পর সাথে থাকা বা না থাকার ব্যাপারে অধিকার রয়েছে ৩৫৪
দাসীর তালাকের বর্ণনা ৩৫৫
তিন তালাক প্রদত্ত নারীর জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ ৩৫৮
মৃত স্বামীর স্ত্রীর ইদ্দত ৩৬০
সূরা বাকারায় উল্লিখিত মৃত্যুর ইদ্দতের সময় রহিত ৩৬১
যে নারীর স্বামী মৃত্যু বরণ করেছে কিন্তু তার মাহর নির্ধারণ করা হয়নি
এবং তার সাথে সহবাসও করা হয়নি ৩৬৩

কথার মাধ্যমে ঈলা ৩৬৪
খুলার বর্ণনা ৩৬৬

খোরপোষের বিবরণ

খোরপোষের বিবরণ ৩৬৭

মুদাব্বার করার বর্ণনা

মুদাব্বার-এর বিক্রয়ের বর্ণনা ৩৬৯
ওয়ালার বর্ণনা ৩৭০
ওয়ালা বিক্রি বা হেবা করা নিষিদ্ধ ৩৭১

শপথ করার বর্ণনা

মিথ্যা শপথ করা নিষিদ্ধ
পাপের কাজে মান্নত করা এবং এতে যে কাফফারা ওয়াজিব হয় তা পূর্ণ না করার বর্ণনা ৩৭২
অর্থহীন কসমের বর্ণনা ৩৭৪
কসমের মধ্যে ব্যতিক্রম বা প্রভেদ করা হলে কসম বাতিল হয়ে যাবে ৩৭৬
৩৭৮

হুদূদ অধ্যায়

মদ, জুয়া এবং এরূপ অন্যান্য হারাম বস্তুর বর্ণনা ৩৭৯
মদ্যপান এবং চুরির শাস্তির বর্ণনা ৩৮০
যে পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কর্তন করা যায় ৩৮৩
শাস্তি দূরীভূত করার বর্ণনা ৩৮৬
বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা ৩৮৬
যিম্মী হত্যার কারণে মুসলমান থেকে কিসাস নেয়া হবে ৩৯৪

জিহাদের বর্ণনা

মুজাহিদদের স্ত্রীদের সাথে জিহাদ থেকে বিরত থাকা
লোকদের খিয়ানত করা হারাম ৩৯৫
সেনাবাহিনী প্রেরণের সময় যে ওসীয়ত করা হয়, এর বর্ণনা ৩৯৬
নাক-কান কর্তন করা নিষিদ্ধ ৩৯৮
এক-পঞ্চমাংশ বণ্টন করার পূর্বে বিক্রি করা নিষিদ্ধ ৩৯৯

ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

সন্দেহজনক বস্তু থেকে বেঁচে থাকা ৪০১
মদ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপর লা'নত ৪০২
সুদখোরের উপর লা'নত ৪০৩
ঋণের সুদ ৪০৪
ছয় বস্তুর মধ্যে অতিরিক্ত গ্রহণ করা সুদ ৪০৪
একটির পরিবর্তে দু'টি গোলাম ক্রয় করা ৪০৭

প্রতারণার সাথে বিক্রির নিষেধাজ্ঞা ৪০৯
মুযাবানা ও মুহাকালা পদ্ধতিতে বিক্রি নিষিদ্ধ ৪০৯
ফল লাল অথবা হলুদ হওয়ার পূর্বে ক্রয় করা নিষিদ্ধ ৪১০
ক্রেতার পক্ষ থেকে শর্ত আরোপের বর্ণনা ৪১১
দরের উপর দর করা নিষিদ্ধ ৪১২
শিকারী কুকুরের মূল্য আদায় করার অনুমতি ৪১৪
দরিদ্রকে সুযোগ দেয়া ৪১৮
ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা নিষিদ্ধ ৪১৯
বন্ধকের বিবরণ ৪২০
শুফআর বর্ণনা ৪২১
বর্গাচাষের বর্ণনা ৪২৬

ফযীলত ও সম্মানের বর্ণনা

নবী করীম (সা)-এর ফযীলত ও সম্মান ৪২৮
হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর ফযীলত ৪৩৫
হযরত আম্মার (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর ফযীলত ৪৩৫
হযরত উসমান (রা)-এর ফযীলত ৪৩৭
হযরত আলী (রা)-এর ফযীলত ৪৩৮
হযরত হামযা (রা)-এর ফযীলত ৪৩৯
হযরত যুবায়র (রা)-এর ফযীলত ৪৪০
হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর ফযীলত ৪৪১
হযরত খুযায়মা (রা)-এর গুণাবলী ও মর্যাদা ৪৪৬
হযরত খাদীজা (রা)-এর ফযীলত ৪৪৮
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর ফযীলত ৪৪৯
হযরত শাবী (রা)-এর ফযীলত ৪৫৬
হযরত ইবরাহীম, আলকামা এবং আবদুল্লাহ (রা)-এর ফযীলত ৪৫৬
হযরত আবূ হানীফা (র)-এর ফযীলত ৪৫৭
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উম্মতের ফযীলত ৪৫৭
পানাহারের দ্রব্যাদি, কুরবানী, শিকার এবং যবেহ সম্পর্কে বর্ণনা ৪৬১
প্রত্যেক থাবা ও নখ দ্বারা আক্রমণকারী পশু খাওয়া হারাম ৪৬২
গৃহপালিত গাধা খাওয়া থেকে নিষেধাজ্ঞা ৪৬২
যমীনের কীট-পতঙ্গ খাওয়া নিষিদ্ধ ৪৬৩
গুইসাপ খাওয়ার বিধান ৪৬৪
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা শিকার করা ৪৬৭
টিড্ডি বা ফড়িং খাওয়ার ব্যাপারে অধিকার দেয়া হয়েছে ৪৬৮

পশুকে নিশানা বানিয়ে এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ ৪৭০
পাথর দ্বারা যবেহ্ করা জায়েয ৪৭০
যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত ৪৭১
সিরকার ফযীলত ৪৭৪
ঠেস দিয়ে আহার করার নিষেধাজ্ঞা ৪৭৬
স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করা নিষিদ্ধ ৪৭৬
নবীয পান করা ৪৮১
শারাবের (মদের) মূল্য ভক্ষণ করা হারাম ৪৮৫

পোশাক ও সৌন্দর্যের বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর টুপীর বর্ণনা ৪৮৭
কাপড় ঝুলানোর বিবরণ ৪৮৭
রেশম ও রেশমী বস্ত্র পরিধানে নিষেধাজ্ঞা ৪৮৮
ছবির বর্ণনা ৪৮৯
মেহেদী দ্বারা চুল খেযাব করা ৪৮৯
কাতান (নীল) দ্বারা খেযাব লাগানো ৪৯০
দাড়ির চতুষ্পার্শ্ব ও কিনারা (ছেঁটে) ঠিক করা ৪৯০
চিকিৎসা, পীড়ার বরকত, দম ও দু'আর বর্ণনা ৪৯১

আদব অধ্যায়

আদব বর্ণনা ৫০০
বিনয় ও সচ্চরিত্র ৫০৩
জ্যোতির্বিজ্ঞানে দৃষ্টি দেয়া নিষিদ্ধ ৫০৭
কাল বা সময়কে গালি দেয়া নিষেধ ৫১৭
কারো বিপদে আনন্দ প্রকাশ করা নিষেধ ৫১৮
আত্মাকে নরমকারী কথাবার্তা ৫১৯

অপরাধ অধ্যায়

অপরাধের বর্ণনা ৫২২
আহকামের বর্ণনা ৫২৫

ফিতনার বিবরণ

ফিতনার বিবরণ ৫৩৮

পবিত্র কুরআনের তাফসীর

পবিত্র কুরআনের তাফসীর ৫৪১

অসীয়ত ও ফারাইযের বর্ণনা

অসীয়ত ও ফারাইযের বর্ণনা ৫৫৬

কিয়ামত ও জান্নাতের গুণাবলী অধ্যায়

কিয়ামত ও জান্নাতের গুণাবলী অধ্যায় ৫৬০

মুসনাদে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ তালিকা

নাম নু'মান, উপ-নাম আবূ হানীফা, উপাধি ইমাম আযম।

নু'মান ইবনে সাবিত ইবনে যয়ূতী ইবনে মাহ্। বংশ তালিকা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আযম আজমী বংশের ছিলেন। তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে খতীব বাগদাদী ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর পৌত্র ইসমাঈল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে নু'মান ইবনে সাবিত ইবনে নু'মান ইবনে মারযুবান। আমরা পারস্য বংশোদ্ভূত এবং কখনো কারো দাসে পরিগণিত হইনি। আমার দাদা ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সাবিত শৈশবকালে হযরত আলী (রা)-এর খেদমতে হাযির হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের বংশের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য দু'আ করেছিলেন। আমরা আশা করি তাঁর ঐ দু'আ নিষ্ফল হয়নি।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর পৌত্র ইসমাঈল তাঁর দাদার নাম নু'মান এবং তাঁর পিতার নাম মারযুবান বলে উল্লেখ করেছেন। সাধারণত এঁরা দু'জন যয়ূতী এবং মাহ্ বলে প্রসিদ্ধ। সম্ভবত যয়ূতী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর নাম যয়ূতী থেকে নু'মানে পরিবর্তন করা হয়। ইসমাঈল বংশ তালিকা বর্ণনা করতে গিয়ে যয়ূতীর ইসলামী নাম উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত যয়ূতীর পিতার নাম অন্য কিছু এবং মাহ্ ও মারযুবান উপাধি। কেননা ইসমাঈলের বর্ণনায় আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, তাঁর বংশ পারস্যের একটি সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতনামা বংশ ছিল। ফার্সী ভাষায় নগর প্রধান ও নেতাকে মারযুবান বলা হয়। তাই কিয়াসও এটাই বলে যে, মাহ্ ও মারযুবান নাম নয়; বরং উপাধি। অবশেষে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মাহ্ ও মারযুবান (ماه ومرزبان) সমার্থবোধক শব্দ। প্রকৃতপক্ষে মাহ শব্দের অর্থ হলো বুযর্গ, সর্দার বা নেতা।

ইমাম আযমের দাদা গোলাম ছিলেন না

কিছু কিছু অবাঞ্ছিত লোক এটা প্রচার করে থাকে যে, তিনি গোলাম ছিলেন। অথচ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ। কেননা ইমাম সাহেব পৃথিবীতে এরূপ খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন যে, তাঁর জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে মানুষ সম্যক জ্ঞাত রয়েছে।

কোন কোন ঐতিহাসিক ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দাদা যয়ূতীর ইসলামী নাম নু'মান এ সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি কাবুল থেকে গ্রেফতার হন এবং বনী তাইমুল্লাহ গোত্রের এক মহিলা তাঁকে ক্রয় করেন। কিছুদিন এভাবে থাকার পর ঐ মহিলা তাঁকে আযাদ করে দেন। তাই তাঁর

বংশকে বনী তাইমুল্লাহ বলা হয়। প্রথমত এটি একটি ঐতিহাসিক ভুল এবং এটাই কোন কোন ঐতিহাসিক ইমাম আযমের সম্পর্কে প্রচার করছে। যদি ঘটনা সত্য হয়, তবুও তা দূষণীয় নয়। যদি আমরা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, তাঁদের মধ্যে অনেক ফকীহ ও মুফাস্‌সিরই গোলাম ছিলেন। তাঁদের নাম উচ্চারণ করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। তাঁদের ওসীলায় দু'আ কবূল হয়। তাঁদের বরকতে আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম হাসান বসরী, ইবনে সিরীন, তাঊস, আতা ইবনে ইয়াসার, নাফে', ইকরামা, মাকহুল (র) খ্যাতনামা আলিম ও ফকীহ ছিলেন। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা যদি গোলাম হয়েও থাকেন, তা হলে এতে দোষের কি আছে ?

অধিকন্তু হযরত ইউসুফ (আ.)-ও কয়েক বছর দাসত্বের জীবন অতিবাহিত করেন। হযরত ইউনুস (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ اذ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, গোলাম হওয়াটা কোন দূষণীয় ব্যাপার নয়। অতঃপর আরো একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে. ইমাম আযমের দাদা গোলাম হিসেবে কিভাবে খ্যাত হলেন ? এর জওয়াব এই যে, আরবে নিয়ম হলো, যখন কেউ কারো সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে অথবা কাউকে নিরাপত্তা দান করে, তখন তাকে গোলাম বা مَولى হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে এবং هذا مَولاَى বাক্য ব্যবহার করে থাকে। খুব সম্ভব ইমাম সাহেবের দাদা আরবের কোন গোত্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং এই সম্পর্কের কারণে তিনি গোলাম বা مَولى হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ঐতিহাসিকগণ কোন গবেষণা ছাড়াই এটা গ্রহণ করেন। ইসমাঈল তাঁর বর্ণনায় বিশেষভাবে এটা বর্ণনা করেন যে, আমরা গোলাম নই এবং কখনো গোলাম ছিলাম না। ইসমাঈলের বর্ণনা কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য। কেননা তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কাযী জমিরীর মতে যয়ূতী বনী তাইমুল্লাহ্‌র সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। যয়ূতী সম্পর্কে এটা জানা যায়নি যে, তিনি কোন্ শহরের অধিবাসী ছিলেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন শহরের নাম উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে কোন একটিও অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা যায় না। তবে নিশ্চিতভাবে এটা গ্রহণ করা যায় যে, তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের কোন এক শহরের বাসিন্দা ছিলেন। ঐ যুগে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রভাব পড়ে। ফলে বিরাট বিরাট গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। সম্ভবত যয়ূতী ঐ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের দরুন তাঁর গোত্রের সমস্ত লোক তাঁর বিরোধী হয়ে উঠে। যার ফলে তিনি পারস্য ত্যাগ করে আরবে হিজরত করেন।

এ সময় হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকাল ছিল। যখন যয়ূতী হিজরত করেন, তখন কূফা ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। যয়ূতী কূফায় বাস করতে থাকেন এবং কখনো কখনো আমীরুল মু'মিনীনের খেদমতে হাযির হয়ে ঈমান ও ইখলাসের তালীম হাসিল করতেন। একবার পার্সীদের ঈদের দিন তিনি আমীরুল মুমিনীনের খেদমতে মহব্বতের নিদর্শনস্বরূপ ফালুদা প্রেরণ করেন। তখন হযরত আলী (রা) বললেন ঃ আমাদের এখানে প্রত্যহ ঈদ হয়ে থাকে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সম্মানিত পিতা সাবিত কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। যয়ূতী শিশুকে হযরত আলী (রা) -এর খিদমতে হাযির করেন। তিনি সস্নেহে শিশুর কল্যাণের জন্য দু'আ করেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই দু'আ কবূল করেন। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত এইগোত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সম্মানিত পিতা এমন কোন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, তাই ঐতিহাসিকগণ তাঁর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেন নি। তবে এতটুকু জানা যায় যে, জীবিকার জন্য তিনি ব্যবসা করতেন। যখন সাবিতের বয়স প্রায় চল্লিশ, তখন হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের রাজত্বকাল ছিল। এই যুগে এরূপ কয়েকজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি জীবিত ছিলেন যাঁরা দু'জাহানের সর্দার আঁ হযরত (সা)-এর পবিত্র সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যৌবনকালে জীবিত ছিলেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) ৯৩ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। হযরত সাহল ইবনে সা'আদ (রা) ৯১ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। হযরত আবূত-তুফায়ল আমির ইবনে ওয়াসিলা (রা) ১০০ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) এই বুযর্গদের কারো থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেননি। কারণ তখন তিনি ইমাম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেননি; বরং শুধু একজন ব্যবসায়ীর পুত্রই ছিলেন।

যৌবনকাল ও শিক্ষা

ইমাম আবূ হানীফা (র) যেহেতু একটি ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তাই পৈত্রিক ব্যবসার প্রতি তাঁর সমস্ত ঝোঁক ছিল। তবে গোত্রীয় খ্যাতি ও মর্যাদার কারণে লেখাপড়া সম্পূর্ণ ত্যাগ করেননি। ঐ যুগের চাহিদা অনুযায়ী তিনি কিছু কিছু বিদ্যা অর্জন করেন। তবে যে কাজের জন্য আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেন, এর চিহ্ন তাঁর উজ্জ্বল চেহারায় ফুটে উঠত। শি'বলী নু'মানী (র) ইলমে দীন হাসিলের জন্য ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর প্রচেষ্টা সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

একদিন ইমাম আবূ হানীফা (র) কূফার প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা শা'বী (র)-এর বাড়ির নিকট দিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন। তখন শা'বী (র) তাঁকে একজন ছাত্র (طَالِبُ الْعِلْمِ) মনে করে কাছে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ ? তিনি একজন সওদাগরের নাম বললেন। ইমাম শা'বী (র) বললেন, আমি জানতে চেয়েছিলাম, তুমি কার কাছে শিক্ষা গ্রহণ কর ? ইমাম আবূ হানীফা (র) জওয়াব দিলেন, কারো কাছে নয়। ইমাম শা'বী (র) বললেন, আমি তোমার মধ্যে ইল্‌ম হাসিলের যোগ্যতা লক্ষ্য করছি। তুমি আলিমদের সাহচর্য গ্রহণ কর। এই উপদেশ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অন্তরে রেখাপাত করল। তাই তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ইলম হাসিলের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এই সময় সেখানে ইলমে আদব, ইলমে নসব, আইয়ামুল আরব, ফিকহ্, হাদীস এবং ইলমুল কালাম শিক্ষার প্রচলন ছিল।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে খতীব বোগদাদী ইমাম সাহেব থেকে এক রিওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ আমি যখন বিদ্যা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা শুরু করি, তখন প্রচলিত বিষয়গুলোর মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করব এটা নিয়ে আমার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। অতঃপর ইলমে কালাম (তর্কশাস্ত্র) শিখবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তবে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশংকাও আমার মনে উদয় হয়। বেশ কিছুদিন সাধনার পর এই বিষয়ে আমার ব্যুৎপত্তি সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে মানুষের নাস্তিকতা বা ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগের ভয়ে তা

১. সীরাতুন নুমানী, আল্লামা শিবলী নুমানী পৃ. ২৯।

প্রকাশ করতে সক্ষম হইনি। মক্তবে বসে পাঠদান ব্যতীত আদব ও কিরাআতে কোন ফায়দা খুঁজে পেলাম না। কাব্য ও কবিতার মধ্যে মিথ্যা প্রশংসা ও গালাগালি ব্যতীত অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হয়নি। ইলমে হাদীসের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকের সাথেও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে সর্বদা মনে একটি চিন্তা উদয় হতো যে, লোকজন যেন সন্দেহ ও অসত্যের চিহ্ন বা আশংকা করে না বসে। অবশেষে ইহকাল ও পরকালের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য করে ইলমে ফিকহ শিক্ষালাভের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

এই বর্ণনার উপর আল্লামা শিবলী নু'মানী সমালোচনা করে বলেন, এ রিওয়ায়েত সম্পূর্ণ ভুল। সমস্ত নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়েত এর বিরোধী। ইমাম সাহেবের দিকে এমন কটুক্তি করা হয়েছে যা সাধারণ মানুষের প্রতিও করা হয় না। যদি উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এটাও মানতে হবে যে, ইলমে হাদীস ও ইলমে কালামের দিকে ইমাম আবূ হানীফা (র) দৃষ্টিপাত করেন নি। অথচ এই সমস্ত বিষয়ে তিনি যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সম্ভবত বিদ্যাশিক্ষার শেষ পর্যায়ে তিনি ভেবেছিলেন যে, কোন একটি বিষয়ে বিশেষভাবে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে। যেহেতু ফিকহর সাথে সাধারণ মানুষের গভীর সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করেন, তাই এটাকেই তিনি অগ্রাধিকার প্রদান করেন যা বর্তমানে চরম উন্নতি লাভ করে।

হাম্মাদের খেদমতে

হাম্মাদ তৎকালীন কূফার একজন খ্যাতনামা আলিম ও উস্তাদ ছিলেন। ইনি আঁ হযরত (সা)-এর প্রিয় খাদেম বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং অনেক প্রখ্যাত তাবিঈর সাহচর্য লাভ করে ধন্য হয়েছেন। ঐ সময় কূফায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। ঐ যুগে বিশেষজ্ঞ আয়িম্মা হিসেবে খ্যাত মআর্‌রা ও শু'বা তাঁর মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে ফিকহ্‌র যে ক্রমধারা চলে আসছে, এর দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। তিনি অত্যন্ত সম্পদশালী ছিলেন। জীবন-জীবিকার জন্য তাঁর কোন চিন্তা করতে হয়নি। তাই তিনি ধীরস্থিরভাবে ফিকহ্‌শাস্ত্রের গবেষণায় মগ্ন থাকেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) এ সমস্ত কারণে ফিকহ্‌শাস্ত্র অধ্যয়নের চিন্তা করেন এবং হাম্মাদকে উস্তাদ হিসেবে নির্বাচিত করেন। এ সময় শিক্ষা পদ্ধতি ছিল এই যে, উস্তাদ কোন একটি বিশেষ মাসয়ালার উপর বক্তৃতা প্রদান করতেন। ছাত্রগণ তা মুখস্ত করে ফেলতেন। আবার কখনো তা লিখে রাখতেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রথম দিন বামদিকের সারিতে বসেন। কেননা নতুন ছাত্রদের জন্য এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু কয়েক দিন পর যখন হাম্মাদের এই অভিজ্ঞতা হলো যে, ক্লাসের সমস্ত ছাত্রের মধ্যে হিফয্ ও মেধাশক্তির দিক দিয়ে কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই, তখন তিনি নির্দেশ দান করেন যে, আবূ হানীফা (র) সবার আগে বসবেন।

স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা (র) বর্ণনা করেন যে, আমি দু'বছর উস্তাদ হাম্মাদের নিকট শিক্ষালাভ করি। অতঃপর নিজেই শিক্ষাদানে ব্রতী হওয়ার চিন্তা করি। কিন্তু উস্তাদের প্রতি আদব এ কাজে বাধা সৃষ্টি করে। ঘটনাক্রমে এই সময় বসরায় বসবাসকারী হাম্মাদের একজন আত্মীয় ইনতিকাল করেন এবং হাম্মাদ ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর আত্মীয় ছিল না। সুতরাং উস্তাদ হাম্মাদ আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তিনি বসরা গমণ করেন। ছাত্রবৃন্দ ও উলামায়ে কিরাম আমার প্রতি তাঁদের

আগ্রহ প্রকাশ করলেন। উস্তাদের অনুপস্থিতিতে আমার নিকট এমন কতিপয় জটিল মাসয়ালা উপস্থিত হয় যেগুলো সম্পর্কে উস্তাদের কাছ থেকে কোন রিওয়ায়েত শ্রবণ করিনি। তাই ইজতিহাদের দ্বারা জওয়াব দিয়ে সতর্কতামূলকভাবে তা লিপিবদ্ধ করে রাখি। দু'মাস পর তিনি বসরা থেকে ফিরে আসার পর আমি তা উস্তাদের নিকট পেশ করি। এতে মোট ষাটটি মাসয়ালা ছিল। এর মধ্যে ২০টিতে ভুল ধরা পড়লো। বাকীগুলো সঠিক হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। আমি মনে মনে অঙ্গীকার করলাম যে, হাম্মাদ (র) যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন তাঁর কাছ থেকে তালীম হাসিল করার সুযোগ পরিত্যাগ করব না। ইমাম হাম্মাদ (র) ১২০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) যদিও অন্যান্য ফকীহদের কাছ থেকে ফিকহ্‌র ইলম হাসিল করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ে ইমাম হাম্মাদ (র) প্রথম ও শেষ পর্যন্ত তাঁর উস্তাদ ছিলেন।

ইমাম আযম ও ইলমে হাদীস

ইমাম হাম্মাদ (র)-এর জীবদ্দশায় আবূ হানীফা (র) ইলমে হাদীস শিক্ষালাভের প্রচেষ্টা শুরু করেন। কেননা ইলমে হাদীসের উপর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ব্যতীত ইলমে দীন অর্জন করা মোটেই সম্ভব নয়। এই সময় ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে পূর্ণোদ্যমে হাদীসের শিক্ষাদানের কাজ অব্যাহত ছিল। প্রায় জায়গায় মুসনাদ ও রিওয়ায়েত (مسند و روايت) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় কমপক্ষে দশ হাজার সাহাবা (রা) ছিলেন যাঁরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এর ফলে সনদ ও রিওয়ায়েতের এক বিরাট ক্রমধারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। লোকজন যেখানেই কোন সাহাবার নাম শুনতো, সেখানেই তারা হুযূর (সা)-এর পবিত্র বাণী শুনার জন্য অথবা শরীয়তের কোন মাসয়ালার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য চতুর্দিক থেকে আগমন করত। এমনিভাবে সাহাবায়ে কিরামের শাগরিদ হিসেবে খ্যাত তাবিঈদের অনেকগুলো দল সমস্ত ইসলামী দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যে সমস্ত শহরে সাহাবা (রা) অথবা তাবিঈদের সমাগম অধিক ছিল, সেটাই দারুল ইলম উপাধিতে ভূষিত হতো। এগুলোর মধ্যে মক্কা মুআজ্জামা, মদীনা মুনাওয়ারা, ইয়ামান, বসরা এবং কূফা বিশেষভাবে খ্যাত ছিল। কেননা ইসলামী শিক্ষা ও তাহযীব-তমুদ্দুনের দিক দিয়ে এই শহরগুলোর সমপর্যায়ে অন্য কোন শহর ছিল না।

কূফা

কূফার জন্য এটা গৌরবের বিষয় যে, এ শহরেই হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বাসস্থান ও জন্মস্থান ছিল। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার এটা একটা উল্লেখযোগ্য শহর ছিল। এ শহরের ভিত্তি স্থাপন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মত হলো, হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) ঐ সময় পারস্য সাম্রাজ্য জয় করে মাদায়েনে বসবাস করছিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে পত্র লিখে বলেন যে, মুসলমানদের জন্য এমন একটি শহর প্রতিষ্ঠা করুন যা তাদের জন্য দারুল হিজরত ও বাসস্থান হতে পারে। হযরত সাআদ (রা) কূফার ভূমিকে এ ব্যাপারে পসন্দ ও নির্বাচন করেন। ১৭ হিজরীতে এ শহরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। প্রথমত সাধারণ দালান-কোঠা নির্মাণ করা হয়। এ সময় চতুর্দিক হতে লোকজন আগমন করে এখানে বসবাস করতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যে এ শহর একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র ও ইসলামী তাহযীব-তমুদ্দুনের কেন্দ্রভূমি হিসেবে

পরিণত হয়। অগ্রগতির এই ক্রমধারা প্রত্যক্ষ করে হযরত উমর (রা) এই শহরকে رمح الله, جمجمة العرب এবং كنز الايمان খেতাবে ভূষিত করেন। পরে এই শহরের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) এ শহরকে দারুল খিলাফা বা খিলাফতের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) এখানে আগমণের ফলে সর্বত্র قال الرسول এবং قال الله অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের চর্চা হতে লাগল। এমনকি কূফার প্রতিটি ঘর হাদীস শিক্ষাদানের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হল।

বসরা

হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশে বসরা আবাদ হয়েছিল। এ শহরও কূফার মত ইলমে হাদীস ও অন্যান্য ইলমের কেন্দ্রভূমি ছিল।

তাযকিরাতুল হুফ্ফায ঃ নামক গ্রন্থে আল্লামা যাহবী কতিপয় খ্যাতনামা হাফিযে হাদীসের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে মসরুক ইবনে আজদা, উবায়দা ইবনে উমর, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, আবূ আবদুর রহমান সালমা, শুরাইহ ইবনে জায়েশ, রাবী ইবনে খায়সাম, আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা, আবূ আবদুর রহমান, সালমা, শুরাইহ ইবনে হারিস, শুরাইহ ইবনে হানী, আবূ ওয়াকিল, শাকীক ইবনে সালমা, কায়েস ইবনে হাযিম, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, হাসান বসরী, শু'বা ইবনে হাজ্জাজ, কাতাদা ইবনে দা'আমা (র) প্রমুখ এ দু'টি শহরের বাসিন্দা ছিলেন। আয়িম্মায়ে হাদীস সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা কূফার প্রশংসা করে বলেছেন, হজ্জের জন্য মক্কা, যিয়ারতের জন্য মদীনা এবং হালাল-হারাম অর্থাৎ ফিকহ্‌র জন্য কূফা।

ইমাম আবূ হানীফা (রা) ফিকহ্ শিক্ষালাভের জন্য ইমাম হাম্মাদ (র)-এর পাঠদানকে যথেষ্ট মনে করতেন। কিন্তু হাদীস শিক্ষালাভের জন্য এটা সম্ভব ছিল না। এখানে শুধু প্রতিভা ও ইজতিহাদের দ্বারা কাজ চলে না; বরং বুদ্ধিমত্তার সাথে রিওয়ায়েতের জ্ঞানও অত্যন্ত জরুরী। এ সময় হাদীসসমূহ অত্যন্ত এলোমেলো ও অবিন্যস্ত ছিল। এমনকি প্রখ্যাত উস্তাদবৃন্দ দু'চার শ'র বেশি হাদীস মুখস্থ রাখতেন না। প্রয়োজনের তুলনায় এ সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। এছাড়া রিওয়ায়েত পদ্ধতির ও ক্রমধারায় এরূপ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল যে, একটি হাদীস যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন পদ্ধতিতে অবগত না হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এর মূল উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে অনুধাবন করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম হাম্মাদের ছাত্র হিসেবে সঙ্গলাভের ফলে এ সমস্ত প্রয়োজনীয়তা খুব ভালভাবে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই কঠোর পরিশ্রম ও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে হাদীসের তালিম হাসিল করার প্রতি মনোবিবেশ করেন। কূফায় এমন কোন মুহাদ্দিস বাকী ছিলেন না, যাঁর ছাত্র হয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র) হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেননি। অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাঁর উস্তাদের সংখ্যা ৯৯ বলে উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন তাবিঈ।[১]

আমরা এখানে ঐ মুহাদ্দিসীন কিরামের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করব, যার ফলে এটা ধারণা করা যাবে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) ইলমে হাদীসের উপর কত উচ্চ পর্যায়ের আলিম ছিলেন।

১. সীরায়ে তাবেঈন।

ইমাম শা'বী (র)

ইমাম শা'বী (র) সর্বপ্রথম ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে ইলমে দীন হাসিলের জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি পাঁচশত সাহাবাকে দেখেছেন। তৎকালে ইরাক, আরব ও সিরিয়ার মধ্যে যে চার ব্যক্তিকে সর্বাধিক জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ উস্তাদ বলে গণ্য করা হতো, ইমাম শা'বী (র) এঁদের মধ্যে একজন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, বিখ্যাত আলিম হলেন চারজন; মদীনায় ইবনে মুসাইয়্যেব, বসরায় হাসান বসরী, সিরিয়ায় ইমাম মাকহুল এবং কূফায় ইমাম শা'বী (র)। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) একবার তাঁকে হাদীসের মাগাযী অধ্যায় পড়াতে দেখে বলেন, আল্লাহর শপথ ! এই ব্যক্তি উক্ত বিষয়টি আমার চেয়ে ভাল জানেন। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। খলীফা এবং সুলতানগণ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ইলমে হাদীসের এ বরেণ্য আলিম ১০৪ অথবা ১০৬ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

সালামা ইবন কুহাইল (র)

সালামা ইবন কুহাইল (র) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও তাবিঈ ছিলেন। হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা আবুত তুফায়েলসহ অন্যান্য সাহাবী (রা) থেকে তিনি হাদীসসমূহে রিওয়ায়েত করেছেন। ইবনে সাদ তাঁকে কাসীরুল হাদীস (كثير الحديث) বলেছেন।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, সালামা ইবনে কুহাইল আরকানের মধ্যে এক রুকন (স্তম্ভ)। ইবনে মাহদী বলেছেন, কূফার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহীহ রিওয়ায়েত বর্ণনাকারী হলেন ৪ জন। মানসূর, সালামা, আমর ইবনে মুররাহ্ এবং আবুল হুসাইন।

আবূ ইসহাক সাবঈ (র)

আবূ ইসহাক সাবঈ (র) প্রথম সারির তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), ইবনে যুবায়র (রা), হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা), হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা)-সহ অনেক সাহাবা থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। আল্লামা নববী "তাহ্যীবুল আসমা" নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। আজলী (র) বলেছেন, '৩৮ জন সাহাবা থেকে তিনি সরাসরি হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন।' ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনে মদিনী (র) বলেছেন, 'আমি আবূ ইসহাকের হাদীসের উস্তাদের নাম গণনা করে প্রায় ৩৬০ জনের মত পেয়েছি।' হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র) তাহযীব নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এর বর্ণনা করেছেন।

হযরত সিমাক ইবনে হারব (র)

হযরত সিমাক ইবনে হারব (র) অত্যন্ত উঁচুমানের মুহাদ্দিস ছিলেন এবং হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফার উস্তাদ ছিলেন। ইমাম সুফিয়ান সওরী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, সিমাক কখনো হাদীসের মধ্যে ভুল করেননি। তিনি নিজেই বলেছেন যে, 'আমি ৮০ জন সাহাবার সাথে সাক্ষাত করেছি।'

হযরত মাহারিয ইবনে দিসার

ইনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এবং হযরত জাবির (রা)-সহ অন্যান্য সাহাবাদের

ফিকহ্ শিক্ষা গ্রহণ করতেন। একদিন তিনি বললেন, তুমি প্রত্যহ অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে থাক। এগুলোর মধ্যে তোমার কিছু স্মরণ আছে কি ? তিনি বললেন, প্রতিটি অক্ষর স্মরণ আছে। সুতরাং তাঁর নিকট থেকে যা শুনেছেন, তা দিন ও তারিখসহ বর্ণনা শুরু করেন। তিনি হতবাক হয়ে বললেন, আল্লাহ তোমার মত লোকও দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন ! এজন্য লোকে তাকে (احفظ الناس) বা সর্বাধিক স্মরণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) তাঁর সর্বাধিক সমপর্যায়ের হতে পারেন, কিন্তু তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন না। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র) তাহযীব নামক গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যার দ্বারা ইমাম কাতাদাহ (র)-এর মর্যাদা সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

হযরত শু'বা (র)

হযরত শু'বা (র) একজন মর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিস ছিলেন। দু'হাজার হাদীস তিনি মুখস্থ করেছিলেন। হযরত সুফিয়ান সওরী (র) তাঁকে হাদীসশাস্ত্রের আমীরুল মুমিনীন মনে করতেন। ইরাকে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেছেন, হযরত শু'বা না হলে ইরাকে হাদীসের চর্চা হতো না। ১৬০ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। হযরত শু'বা (র) এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল। অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁর যথেষ্ট প্রশংসা করতেন। একবার কথোপকথনের সময় তিনি বলেন, সূর্য যে উজ্জ্বল এটা আমি যেভাবে জানি, ঠিক তেমনি বিশ্বাসের সাথে এটাও বলতে পারি যে, ইলম এবং আবূ হানীফা মিলিত অবস্থায় আছে। ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইয়াহিয়া ইবনে মুঈনের নিকট কেউ জিজ্ঞাসা করল, আপনি ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করেন ? তিনি বললেন, এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইমাম হযরত শু'বা (র) তাঁকে হাদীস রিওয়ায়েতের অনুমতি দিয়েছেন। বসরার অন্যান্য যে সকল শায়খ থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র) হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন, এঁদের মধ্যে আবদুল করীম ইবনে উমাইয়া এবং আসিম ইবনে সুলায়মান (র) উল্লেখযোগ্য।

পবিত্র মক্কা ও মদীনা গমন

উপরে বর্ণিত খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও আয়িম্মার কাছ থেকে যদিও ইমাম আবূ হানীফা (র) ইল্‌মে হাদীস শিক্ষালাভ করেন কিন্তু তবুও পূর্ণাঙ্গভাবে সনদ হাসিলের জন্য ইলমের মূল কেন্দ্রভূমি পবিত্র মক্কা ও মদীনা গমন করা জরুরী মনে করেন। তিনি কখন পবিত্র ভূমির দিকে সফর শুরু করেন; এর সঠিক কোন তারিখ জানা যায়নি। তবুও অনুমান করা হয় যে, যখন তিনি পবিত্র মক্কা ও মদীনা সফর করেন, তখন তাঁর ইলম হাসিলের প্রাথমিক অবস্থা ছিল। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, ইমাম ওয়াকি স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, হজ্জের মৌসুমে যিনি আমার মাথা মুন্ডন করে দিয়েছেন, সেই ক্ষৌরকারের নিকট আমি কয়েকটি কথায় জব্দ হয়ে গিয়েছি। আমি পারিশ্রমিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, মানাসিক আদায় করা যায় না। আমি চুপ হয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি বললেন, হজ্জের সময় চুপ থাকা ঠিক নয়, তাকবীর বলতে থাকুন। ক্ষৌরকার্য শেষ করে বাসায় রওয়ানা হলাম। তখন তিনি বললেন, প্রথমে দু'রাকআত নামায আদায় করুন, এরপর কোথাও গমন করুন। আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা

থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। ইমাম সুফিয়ান সওরী বলেছেন, 'আমি এমন কোন যাহিদকে দেখিনি যাকে হযরত মাহারিযের উপর অগ্রাধিকার দিব।' আল্লামা যাহাবী বলেছেন, 'হযরত মাহারিয হুজ্জাতের যোগ্য'। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন, আবূ যুরাআ, দারে কুতনী, আবূ হাতিম, ইয়াকূব, ইবনে সুফিয়ান এবং নাসাঈ তাঁকে সিকাহ (ثقه) বা নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি কূফায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন এবং ১১৬ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। হযরত আওন ইবন আবদুল্লাহ, ইবন উয়ায়না, ইবন মাসঊদ (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইনি নির্ভরযোগ্য ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন।

হযরত হিশাম ইবনে উরওয়াহ (র)

ইনি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রখ্যাত তাবিঈ ছিলেন। অনেক সাহাবা থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইমাম মালিক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) সহ প্রখ্যাত আয়িম্মার ছাত্র ছিলেন। আবূ জা'ফর মনসূরের যুগে তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। খলীফা মনসূর তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। একবার তিনি তাঁকে ১ লক্ষ দিরহাম প্রদান করেন এবং খলীফা মনসূর নিজেই তাঁর জানাযার নামায পড়ান। ইবনে সাআদ তাঁকে সিকাহ (ثقه) এবং কাসীরুল হাদীস (كثير الحديث) বলেছেন। আবূ হাতিম তাঁকে ইমামুল হাদীস বলেছেন।

হযরত সুলায়মান ইবনে মিহরান (র)

হযরত সুলায়মান ইবনে মিহরান (র) ওরফে আমাস কূফার একজন খ্যাতনামা ইমাম ছিলেন। সাহাবাদের মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা) থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। সুফিয়ান সওরী এবং শা'বী তাঁর ছাত্র ছিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বসরার মাদ্রাসা থেকেও হাদীসের ইলম হাসিল করেছেন। ইমাম হাসান বসরী, শা'বী ও কাতাদাহ (র) ঐ মাদ্রাসায় শিক্ষক ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইমাম হাসান বসরী (র) ১১১ হিজরী পর্যন্ত জীবিত থাকা সত্ত্বেও ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছেন বলে প্রমাণ নেই। তবে কাতাদাহ (র) থেকে শিক্ষালাভ করেছেন বলে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম শা'বী (র) থেকে হাদীস রিওয়ায়েতের অনুমতি লাভ করেছেন।

হযরত কাতাদাহ (র)

হযরত কাতাদাহ (র) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও খ্যাতনামা তাবিঈ ছিলেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), আবদুল্লাহ ইবনে সারাখস (রা) এবং হযরত আবুত তুফায়েল (রা)-সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। হযরত আনাস (রা)-এর দু'জন ছাত্র খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন হযরত কাতাদাহ (র)। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি হাদীস হুবহু বর্ণনা করতেন। বাক্য ও অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য হতো না। তাঁর মুখস্ত শক্তি সম্পর্কে একটি আশ্চর্য ঘটনা বর্ণিত আছে। আমর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, তিনি মদীনায় হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (র)-এর নিকট হাদীস ও

করলাম, এ সমস্ত মাসয়ালা আপনি কোথায় শিক্ষা করেছেন ? তিনি বললেন, আতা ইবনে আবি রিবাহ (র)-এর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছি। এ ঘটনার দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এটা প্রথম যুগ ছিল। যে সময় ইমাম আবূ হানীফা (র) পবিত্র মক্কায় গমন করেন, তখন সেখানে ব্যাপকভাবে শিক্ষা-দীক্ষার কাজ অব্যাহত ছিল। অনেক সাহাবার খেদমতে থেকে বরকত হাসিল করেছেন, এ ধরনের হাদীস বিশেষজ্ঞ উস্তাদদের পৃথক পৃথক মাদ্রাসা ছিল। এঁদের মধ্যে হযরত আতা ইবনে আবি রিবাহর তালীমের মজলিস সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি খ্যাতনামা তাবিঈ ছিলেন এবং অধিকাংশ সাহাবার খেদমতে অবস্থান করেছেন। তাঁদের কল্যাণ ও সঙ্গলাভের দ্বারা তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা), হযরত আকীল (রা), হযরত রাফে' (রা), হযরত আবূ দারদা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা), হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা), হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-সহ আরো অনেক সাহাবা (রা) থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন যে, আমি এমন দু'জন বুযর্গের সাথে সাক্ষাত করেছি যাঁরা হুযূর (সা)-এর সাক্ষাত ও সোহবতলাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) একজন। যাঁর ইলম ও মর্যাদা সম্পর্কে সাহাবাদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। তিনি অধিকাংশ সময় বলতেন, আতা ইবনে আবী রিবাহ থাকা সত্ত্বেও লোকজন ফতওয়ার জন্য কেন আমার নিকট আগমণ করে ? হজ্জের সময় বাদশাহর পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হতো যে, হযরত আতা ব্যতীত অন্য কারও ফতওয়া দেওয়ার যোগ্যতা নেই। ইমাম আওযাঈ, ইমাম যুহরী এবং আমর ইবনে দীনারের মত প্রখ্যাত আয়িম্মায়ে হাদীস তাঁরই নিকট শিক্ষালাভ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ইলম হাসিলের জন্য আতা ইবনে আবী রিবাহর খেদমতে হাযির হলেন। তিনি সতর্কতামূলকভাবে আকীদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন আবূ হানীফা (র) বললেন, আমি পূর্ববর্তীগণকে মন্দ বলি না, গুনাহগারকে কাফির বলি না, তকদীরের ভালমন্দের উপর বিশ্বাস করি। হযরত আতা (র) তখন দরসে হাদীসে বসার জন্য তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে লাগল, ফলে তাঁর প্রতি উস্তাদের সুদৃষ্টিও বৃদ্ধি পেতে লাগল। এমনকি অন্যদেরকে সরিয়ে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে নিকটে বসাতেন।

হযরত আতা ইবনে আবী রিবাহ (র) ১১৫ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এ সময়ে যখনই ইমাম আবূ হানীফা (র) পবিত্র মক্কায় গমন করতেন, তখনই তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে তালীম হাসিল করতেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) পবিত্র মক্কায় হযরত আতা (র) ব্যতীত যে সমস্ত মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত ইকরামা (র)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর গোলাম ও শাগরিদ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাঁর প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। ফলে তিনি নিজের জীবদ্দশায় তাঁকে ইজতিহাদ ও ফতওয়া প্রদানের যোগ্য করে তুলেছিলেন। এ ছাড়া হযরত

ইকরামা (র) ও অন্যান্য সাহাবার মধ্যে হযরত আলী (রা), হযরত জাবির (রা), হযরত আবূ কাতাদা (রা) সহ অনেক সাহাবা (রা) থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন এবং ফিকহ্‌র মাসয়ালাসমূহ অবগত হয়েছেন। প্রায় ৭০ জন প্রখ্যাত তাবিঈ হাদীস ও তাফসীরে তাঁর ছাত্র ছিলেন। ইমাম শা'বী (র) বলতেন, বর্তমানে হযরত ইকরামা (র) থেকে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী কেউ নেই। তাবিঈদের নেতা হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো, বর্তমানে আপনার চেয়ে বড় কোন আলিম আছে কি ? তিনি বললেন, হাঁ আছেন, তিনি হযরত ইকরামা (র)।

মদীনা গমন

হাদীসের উৎস ও কেন্দ্রভূমি পবিত্র মদীনা থেকে ইল্‌মে হাদীস শিক্ষালাভের জন্য ১০৩ হিজরী বা এর পূর্বেই ইমাম আবূ হানীফা (র) মদীনা গমন করেন। সাহাবায়ে কিরামের পর তাবিঈগণের সাত ব্যক্তি ইলমে হাদীস, ফিকহ্‌ ও শরীয়তের মাসয়ালা শিক্ষাদানের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁরা অনেক মর্যাদাম্পন্ন সাহাবার কাছ থেকে ইলম হাসিল করেছিলেন। তাঁরা এরূপ সম্মান লাভ করেছিলেন যে, সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রে তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার ক্রমধারা ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি সম্মিলিত ফতওয়া বিভাগ থেকে শরীয়তের সমস্ত মাসয়ালার ফয়সালা করা হতো। অবশ্য মদীনায় ইমাম মালিক (র)-এর মতানুযায়ী ইল্‌ম ফিকহ্‌র প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইমাম আবূ হানীফা (র) যখন মদীনা পৌছেন তখন উপরে বর্ণিত বুযর্গদের মধ্যে মাত্র দু'জন জীবিত ছিলেন। হযরত সুলায়মান ও হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ। হযরত সুলায়মান (র) উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনা (রা)-এর গোলাম ছিলেন এবং সাতজন ফিকহ্‌বিদের মধ্যে ইলম ও মর্যাদার দিক দিয়ে দ্বিতীয় ছিলেন। হযরত সালিম (র) হযরত উমর (রা)-এর পৌত্র ছিলেন এবং স্বীয় বুযর্গ পিতা থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) এ উভয় বুযর্গের খেদমতে হাযির হয়েছেন এবং তাঁদের থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর শিক্ষা জীবন যদিও পবিত্র মদীনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তালীম হাসিলের ক্রমধারা অব্যাহত রাখেন। প্রায়ই তিনি পবিত্র মক্কা ও মদীনায় গমন করে কয়েক মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন। হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বহু প্রখ্যাত আলিম পবিত্র মক্কায় আগমণ করতেন এবং ইলমে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে পরস্পর উপকৃত হতেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) অধিকাংশ সময় তাঁদের সাথে মিলিত হয়ে ভাবের আদান-প্রদান করতেন এবং উপকৃত হতেন। সিরিয়ার ইমামুল মাযহাব হিসেবে আখ্যায়িত ইমাম আওযাঈ (র) ও ইমাম মাকহুল (র)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত লাভ হয় এবং তাঁদের কাছে হাদীসের সনদ হাসিল করেন। এ সময় ইমাম আবূ হানীফার বুদ্ধিমত্তা, প্রতিভা ও ইজতিহাদের প্রচার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁকে কিয়াস বা অনুমাননির্ভর হিসেবে প্রচার করে। এ সময় ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর একজন খ্যাতনামা ছাত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) ইলমে হাদীসে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনের জন্য বৈরুতে ইমাম আওযাঈ (র)-এর নিকট গমন করেন। প্রথম সাক্ষাতে ইমাম আওযাঈ জিজ্ঞাসা করেন, কূফায় আবূ হানীফা (র) নামে কোন ব্যক্তি জন্মলাভ করেছেন কি ? যিনি ধর্মের

মধ্যে নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন করছেন ? তিনি কোন জওয়াব প্রদান না করে বাড়ি ফিরে এলেন। দু'তিন দিন পর একটি পত্র নিয়ে পুনরায় তিনি সেখানে গমন করেন। ইমাম আওযাঈ (র) তাঁর হাত থেকে পত্রটি নিয়ে দেখলেন, শিরোনামে লেখা রয়েছে قَالَ نُعْمَانُ بْنُ ثَابِت (নুমান ইবন সাবিত বলেছেন) দীর্ঘক্ষণ প্রত্যক্ষ করে অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ বুযর্গ এ নু'মান ? জওয়াবে তিনি বললেন, ইনি ইরাকের একজন বাসিন্দা, যার সাহচর্যে আমি অবস্থান করছি। ইমাম আওযাঈ বললেন, 'বড় উচ্চাঙ্গের লোক'। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, 'তিনি হলেন ঐ ইমাম আবূ হানীফা, যাকে আপনি বিদআতী বলে থাকেন।

ইমাম আওযাঈ স্বীয় ভুলের জন্য অনুতাপ করলেন। তিনি হজ্জের মৌসুমে পবিত্র মক্কা গমন করেন। তখন সেখানে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আওযাঈ (র) থেকে হাদীস শিক্ষালাভ করেছেন। সম্ভবত এটা এ সময়েই ছিল।

হযরত ইমাম বাকির (র)-এর খেদমতে

হযরত ইমাম বাকির (র) একজন মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং মুত্তাকী সাহাবা ছিলেন। তাঁর সাথে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সাক্ষাতের ঘটনাটি ঐতিহাসিকগণ এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ একবার ইমাম আবূ হানীফা (র) পবিত্র মদীনায় গমন করে ইমাম বাকির (রা)-এর খেদমতে হাযির হলেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হ্যাঁ, তুমিই কিয়াস করে আমার দাদার হাদীসমূহের বিরোধিতা করে থাক। তিনি তখন অত্যন্ত আদবের সাথে বললেন, اَلْعِيَاذُ بِاللّٰه (আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই) কে বা কোন্ ব্যক্তি হাদীসের বিরোধিতা করতে পারে ? যদি আপনি কিছু সময় ও সুযোগ দান করেন, তা হলে আমি কিছু আরয করি। তখন উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত আলোচনা হয় ঃ

আবূ হানীফা ঃ পুরুষ দুর্বল না মহিলা ?

ইমাম বাকির ঃ মহিলা।

আবূ হানীফা ঃ অংশীদার হিসেবে পুরুষের অংশ বেশি না মহিলার ?

ইমাম বাকির ঃ পুরুষের।

আবূ হানীফা ঃ যদি আমি কিয়াস করতাম তা হলে বলতাম, মহিলাদেরকে বেশি দেওয়া হোক। কেননা বাহ্যিক কিয়াস অনুযায়ী দুর্বলেরই বেশি পাওয়া উচিত। এরপর জিজ্ঞাসা করেন, নামায উত্তম না রোযা ?

ইমাম বাকির ঃ নামায।

আবূ হানীফা ঃ এ দিক বিবেচনা করে ঋতুবতী মহিলাদের উপর রোযার পরিবর্তে নামাযের কাযা ওয়াযিব হওয়া প্রয়োজন ছিল। অথচ আমি রোযার কাযার ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করে থাকি।

এতে ইমাম বাকির (র) এতো সন্তুষ্ট হলেন যে, উঠে এসে তাঁর ললাটে চুমু খেলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর খেদমতে অবস্থান করেন এবং ফিক্হ ও হাদীস সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য ও জ্ঞানলাভ করেন। শী'আ ও সুন্নী সবাই স্বীকার করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ইলমের বিরাট ভান্ডার ইমাম বাকির (র)-এর সাহচর্য লাভের কারণেই হাসিল হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম বাকির (র)-এর সুযোগ্য পুত্র ইমাম জাফর সাদিক (র) এর কাছ থেকেও ইলম হাসিল করেছেন। ইলমে হাদীসে ইমাম আবূ হানীফা (র) একটি উচ্চ আসন লাভ করেছিলেন। কেননা তাঁর উস্তাদ ছিলেন অসংখ্য। আবূ হাফস উমর দাবি করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) কমপক্ষে চার হাজার ব্যক্তি থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। আল্লামা যাহবী (র) তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে তাঁর উস্তাদগণের নাম উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সতর্কতা ও পর্যবেক্ষণ

ইমাম আবূ হানীফা (র) হাদীস রিওয়ায়েতের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন এবং বর্ণনাকারী যত অধিক হবে, এতে ততবেশি পরিবর্তন হবে - এ বিষয়টি সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট অবগত ছিলেন। এ কারণেই তাঁর অধিকাংশ উস্তাদ হলেন তাবিঈগণ, যাঁদের হুযূর (সা)-এর সাথে হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে মাত্র একটি স্তর রয়েছে। অথবা তাঁর উস্তাদ ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাঁরা দীর্ঘদিন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন তাবিঈদের সাহচর্যে ছিলেন এবং ইলম, ফযীলত, সততা, ও আল্লাহভীরুতার আদর্শ হিসেবে যাঁদের গণ্য করা হতো। এই দু'প্রকার ছাড়া অন্যান্য উস্তাদের সংখ্যা খুবই কম। সাধারণ ছাত্রদের তুলনায় তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিও আলাদা ছিল। শুরু থেকেই তাঁর আলোচ'না ও ইজতিহাদের অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। এ ব্যাপারে তিনি উস্তাদের বিরোধিতা করতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

একবার উস্তাদ হাম্মাদের সাথে হযরত আ'মাসকে বিদায় জানানোর জন্য বের হলেন। কিছুক্ষণ চলার পর মাগরিব নামাযের সময় হয়ে এল এবং উযূর জন্য পানি খুঁজতে লাগলেন কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া গেল না। ইমাম হাম্মাদ তায়াম্মুম করার জন্য ফতওয়া দিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিরোধিতা করলেন এবং বললেন, নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত পানির অপেক্ষা করতে হবে। ঘটনাক্রমে কিছু দূর যাওয়ার পর পানি পাওয়া যায় এবং উযূ করে নামায আদায় করেন। এটাই ছিল উস্তাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম বিরোধিতা। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর উস্তাদ ইমাম শা'বী 'নাফরমানীর মধ্যে কাফ্ফারা নেই' –এ বিষয়ের প্রবক্তা ছিলেন। একবার নৌকায় চড়ে ছাত্র-শিক্ষক মিলে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এ মাসয়ালা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। তিনি বলেন, নাফরমানীর মধ্যে অবশ্যই কাফ্ফারা হবে। কেননা আল্লাহ জিহারের (ظهار) মধ্যে কাফ্ফারা নির্ধারণ করেছেন এবং পবিত্র কুরআনের আয়াত এর মধ্যে (ظهار) জিহার (وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا) নাফরমানী হওয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইমাম শা'বী (র)-এর কোন জওয়াব দান করেন নি।

হযরত আতা ইবনে আবি রিবাহ্‌র নিকট কোন এক ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ وَاٰتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। হযরত আতা বলেন, 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত আইউব (আ.)-এর যে সমস্ত সন্তান-সন্ততি মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে জীবিত করে দিয়েছেন এবং তাদের সাথে আরো নতুন সৃষ্টি করেন।' ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তি কারো ঔরস থেকে জন্মগ্রহণ না করে, সে তার সন্তান হবে কি করে ?'

ফিকহ্‌র সম্পাদনা

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর জীবনের সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব ও প্রসিদ্ধ কাজ হলো ইসলামী

ফিকহ্‌র সম্পাদনা করা। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সুশৃঙ্খলভাবে ইসলামী ফিকহ সম্পাদনা করেছেন। ফিকহ্‌র আভিধানিক অর্থ হলো অনুধাবন করা, অবগত হওয়া বা বুঝা। পবিত্র কুরআনেও এ শব্দটি উপরোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। শরীয়তের প্রচলিত অর্থে শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালাকে ফিকহ বলা হয়। আরো উত্তম সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় যে, ফিকহ শরীয়তের আমলের ঐ সমস্ত শাখা -প্রশাখাকে বলা হয়, যে সমস্ত হুকুমের বিধান বিস্তারিত দলীলের দ্বারা হাসিল হয়।

ফিকহ্‌র উৎস

উলামায়ে কিরাম ফিকহর চারটি উৎস বর্ণনা করেছেন ঃ (১) আল্লাহর কিতাব; (২) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নত; (৩) সাহাবা ও আয়িম্মায়ায়ে মুজতাহিদের ইজমা এবং (৪) কিয়াস। ইসলামী শরীয়তে পবিত্র কুরআনের ঐ মর্যাদা রয়েছে, যে মর্যাদা রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে বিধি-বিধানের থাকে। পবিত্র কুরআন হুযূর (সা) এবং তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত উম্মতের জন্য পথ-প্রদর্শক। এতে আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত নির্দেশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। এ কুরআনই শরীয়তের প্রথম ও প্রধান উৎস।

ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো হযরত (সা)-এর প্রতিটি কথা, কাজ এবং তাকরীর (تقرير)। অর্থাৎ হুযূর (সা)-এর সামনে কোন কাজ করা হয়েছে কিন্তু তিনি এতে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অবশ্য সুন্নত ও হাদীস একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় উৎস হলো ইজমা। আঁ হযরত (সা)-এর ইনতিকালের পর শরীয়তের এরূপ মাসয়ালার ব্যাপারে আলোচনা ও পরামর্শের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যা ছিল সংক্ষিপ্ত অথবা হুযূর (সা)-এর একই আমলের ব্যাপারে বিভিন্ন রিওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তখন ঐ সমস্ত বিভিন্ন রিওয়ায়েতের মধ্যে পরামর্শ করে সাহাবায়ে কিরাম একটি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। একেই ইজমা বলা হয়।

ইসলামী শরীয়তের চতুর্থ উৎস হলো কিয়াস। কোন বিষয় সম্পর্কে শরীয়তের যে নির্দেশ রয়েছে, ঐ নির্দেশ একই পর্যায়ের কারণে অন্য একটি বিষয় সম্পর্কে নির্ধারণ করাকে কিয়াস বলে। অর্থাৎ কোন কারণবশত শরীয়তে যদি কোন বস্তু হারাম করা হয় এবং যদি একই কারণ অন্য কোন বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায়, তা হলে কিয়াস অনুসারে ঐ বস্তুকেও হারাম বলে বিবেচনা করা হবে। এর উদাহরণ হলো এই যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন ঃ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً অর্থাৎ ব্যভিচারের নিকটবর্তী হইও না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ। ব্যভিচার একটি অশ্লীল ও লজ্জাজনক কাজ। তাই একে হারাম করা হয়েছে। সুতরাং যে সমস্ত কাজে অশ্লীলতা থাকবে, কিয়াসে তাও হারাম বলে বিবেচনা করা হবে।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের মধ্যবর্তীকাল থেকে ইসলামী ফিকহর সম্পাদনার কাজ শুরু হয়। ঐ সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ইসলামী ফিকহ্‌কে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। হিজরী দ্বিতীয় শতকের তৃতীয় দশক শেষ হওয়ার পর ইসলামী দুনিয়ার সীমানা বহুদূর বিস্তৃত হয়ে পড়ে। যখন ইসলামী শিক্ষা দুনিয়ার অন্যান্য শিক্ষা ও সভ্যতার সাথে মুখোমুখি হয়, তখন বিভিন্ন মাসয়ালা ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ যুগে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে এমন কর্মক্ষমতা

ও দক্ষতা দান করেন যে, তিনি তাঁর সূক্ষ্ম জ্ঞান ও ইজতিহাদের মাধ্যমে এ সমস্ত মাসয়ালার সমাধানে এগিয়ে আসেন। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র) ১২১ হি. থেকে ফিকহ সম্পাদনার কাজে পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

ইসলামী ফিকহ সম্পাদনার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বাস্তব জীবনে আমলের জন্য হুযূর (সা)-এর আনীত শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালাকে সুশৃংখলভাবে বিন্যস্ত করা এবং চূড়ান্তভাবে এমন গ্রহণযোগ্য নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেওয়া, যার ফলে মুসলিম মিল্লাত তা অতি সহজে পূর্ণাঙ্গভাবে আমল করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত যেহেতু কোন যুগ বা এলাকার জন্য নির্ধারিত নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে অব্যাহত ও পালিত হতে থাকবে, তাই তা সম্পাদনা করার অতি প্রয়োজন ছিল এবং সম্পাদনার সময় দু'টি বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিল। প্রথমত সম্পাদনা ব্যক্তিগত মতামত ও ইজতিহাদের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর রচনা ও সম্পাদনার কাজে বিভিন্ন বিষয় ও ইলমের বিশেষজ্ঞ এবং উস্তাদবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। যাঁদের ইলম ও ফযীলত সর্বজন স্বীকৃত এবং তাঁদের যুহদ ও তাকওয়া আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয়ত এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এরূপ স্থান নির্বাচন করতে হবে যা শুধু বিভিন্ন বিষয়ের বিদ্যাপীঠই নয়; বরং প্রাচীন ও নবীন এবং আরবী ও আজমী সভ্যতার মিলনকেন্দ্র হিসেবে খ্যাত। ইমাম আবূ হানীফা (র) এ দু'টি বিষয়ের প্রতি পূর্ণাঙ্গভাবে দৃষ্টি রাখেন এবং এর জন্য কূফাকে নির্বাচন করেন। তা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর যা ছিল আরবী ও আজমী সভ্যতার মিলনকেন্দ্র।

ইমাম আবূ হানীফা (র) মাসয়ালাসমূহের বিন্যাস ও নীতিমালাসমূহের সম্পাদনা শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, বরং চল্লিশজন আলিম ও আয়িম্মার একটি পরিষদ গঠন করেন। এ পরিষদের মধ্যে প্রত্যেক বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম তাহাবী (র) ইমাম মালিক (র)-এর ছাত্র আসাদ ইবনে ফুরাতের একটি বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, 'আবূ হানীফা (র)-এর ফিকহ সম্পাদনা পরিষদের চল্লিশজন সদস্য ছিলেন।' তাঁদের সবাই ফিকহ্র মধ্যে ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দশজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি বিশেষ পরিষদও ছিল। হযরত আবূ ইউসূফ, দাউদ তাঈ, আসাদ ইবনে উমর, ইউসূফ ইবনে খালিদ এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবী যায়দাহ্ এ পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ফিকহ সম্পাদনা পরিষদ সম্পর্কে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ওয়াকি' ইবনে জাররাহ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এ কাজে ইমাম আবূ ইউসূফ, যুফার ও মুহাম্মদ (র)-এর মত কিয়াস ও ইজতিহাদের বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও এতে কিভাবে ত্রুটি থাকতে পারে ? ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া, ইবনে যায়িদাহ, মনস ইবনে গিয়াস, সাওবান এবং মানদিলের মত হাদীসের বিশেষজ্ঞ, কাসিম ইবনে মুঈনের মত আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞ, দাউদ ইবনে নাসির তাঈ এবং ফুযাইল ইবনে আয়াযের মত যুহদ ও তাকওয়ার অধিকারী তাঁর বন্ধু ও পরামর্শদাতা থাকা সত্ত্বেও এ কাজে কিভাবে ত্রুটি হতে পারে ?[১]

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ফিকহ সম্পাদনার পদ্ধতি ছিল এই যে, প্রতিটি মাসয়ালা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কি বিধান রয়েছে তা তিনি প্রথমে খুঁজে বের করতেন। যদি পবিত্র কুরআনে এ

১. জামেউল মাসানিদ, পৃ. ৩৩।

প্রায় বাইশ বছর দিবারাত্র পরিশ্রম করার পর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এ ফিকহ্ সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে "মাজমুআয়ে ফিকহ্" তৈরি হয়ে আলিমদের হাতে পৌঁছে। এ মাজমুআয় তিরাশি হাজার মাসয়ালা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরমধ্যে আটত্রিশ হাজার ইবাদত সম্পর্কে এবং পঁয়তাল্লিশ হাজার পরস্পর লেন-দেন, চুক্তি ও শাস্তি সম্পর্কিত ছিল। এতে মানুষের দৈনন্দিন কাজ-কারবার, জীবন-জীবিকা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি সম্পর্কে মৌলিক ও সামগ্রিক বিধি-বিধান বর্ণিত ছিল। এ মাজমুআ ১১৪ হিজরীর পূর্বেই সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এরপরও এতে সংযোজন হতে থাকে এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কারাবরণের সময়ও এ কর্মধারা অব্যাহত থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যুগেই 'মাজমুআ' সর্বমহলে গৃহীত হয়। এর সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর সমস্ত ছাত্রকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কূফার জামে মসজিদে এক হাজার বিজ্ঞ আলিম একত্রিত হলেন। তাঁদের মধ্যে ফিকহ সম্পাদনা পরিষদের চল্লিশজন সদস্যও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) এ সমস্ত আলিমের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তৃতায় বলেন : "তোমরাই আমার অন্তরের একমাত্র খুশীর মূল। তোমাদের উপস্থিতিতে আমার অন্তরের সমস্ত চিন্তা দূরীভূত হয়ে থাকে। আমি তোমাদের জন্য ইসলামী ফিকহ্র ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছি, এখন তোমরা ইচ্ছানুযায়ী এর উপর বিচরণ করতে পার। আমি এমনি অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছি যে, লোকজন তোমাদের অনুসরণ করবে। আমি তোমাদের জন্য আমার গর্দান ঝুঁকিয়ে দিয়েছি। এখন সময় হয়েছে, তোমরা সবাই ইলমের হিফাজতের জন্য আমার সাহায্য কর। তোমাদের মধ্যে চল্লিশজন এরূপ রয়েছে, যারা অতি সুন্দরভাবে কাযীর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম এবং ঐ ইলমের অঙ্গীকার দিচ্ছি যা তোমাদেরকে দান করা হয়েছে– তোমরা কখনো এ ইলমকে অসম্মান করো না। এ ইল্মকে বিকৃত করার হাত থেকে রক্ষা কর। যদি তোমাদের কাউকে কাযীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তখন এমন দুর্বলতাকে কখনো প্রশ্রয় দিও না– যা মানুষের দৃষ্টিতে গোপন থাকে। কাযীর পদ ঐ পর্যন্ত সঠিক থাকে, যখন পর্যন্ত কাযীর জাহির ও বাতিন (ভিতর ও বাহির) এক হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ পদ গ্রহণ করবে, সে যেন তার ও জনগণের মধ্যে কোন প্রকার বাধা প্রতিষ্ঠা না করে। যে কোন প্রার্থী যেন তোমাদের নিকট প্রবেশ করতে পারে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে আদায় করবে। মুসলমানদের নেতা যদি আল্লাহ্র সৃষ্টির সাথে অন্যায় আচরণ করে, তা হলে সে যেন বার বার অনুসন্ধান করে, বিচার-বিশ্লেষণ করে বিরত থাকার চেষ্টা করে।"[১]

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এ বক্তৃতার ফলে সমবেত ফিকহবিদদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হল। এরপর খলীফা মনসূর ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে বাগদাদে ডেকে পাঠালেন এবং কাযীর পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সম্পাদিত এ ফিকহ্র নাম 'ফিকহ্ হানাফী' হিসেবে সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় সুখ্যাতি লাভ করে।

ইনতিকাল

১৪৬ হিজরী খলীফা মনসূর ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে গ্রেফতার করেন। কিন্তু গ্রেফতার করা সত্ত্বেও তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে বিপজ্জনক মনে করতেন। বাগদাদ রাজধানী হওয়ার কারণে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। বিদ্যা শিক্ষার্থীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে

১. মুজামুল মুসান্নিফীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫।

মাসায়ালা সম্পর্কে কোন বিধান পেতেন, তবে তা লিপিবদ্ধ করতেন। যদি না পেতেন, তা হলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নত তথা হাদীসে এ মাসায়ালা খোঁজ করতেন। এর মধ্যে এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হতো যে, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বশেষ আমল ও মতামত কি ছিল। ইমাম আবূ হানীফা (র) তখন সর্বশেষ আমল ও মতামত গ্রহণ করতেন। যদি হিজাযী ও ইরাকী সাহাবাদের মরফূ' হাদীসসমূহের মধ্যে মতপার্থক্য হতো, তা হলে ফিকহ্ সম্পর্কে অভিজ্ঞ বর্ণনাকারীর রিওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। যদি হাদীসের দ্বারা কোন সমাধান না পাওয়া যেত তখন ফতওয়া প্রদানকারী সাহাবা, তাবিঈ ও ফকীহদের ফয়সালা এবং বাণী খোঁজ করতেন এবং যে বিষয়ে ফকীহ সাহাবাদের ইজমাতে একমত পাওয়া যেত, তা গ্রহণ করতেন। যদি এর মধ্যে কোন সমাধান না পেতেন তা হলে চতুর্থবারে কিয়াস ও ইস্তিহসানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন এবং এর আলোকে মাসয়ালা সমাধান করতেন। কোন মাসয়ালা সম্পর্কে গবেষণা করার সময় এটাও লক্ষ্য রাখতেন যে, এ মাসয়ালা সম্পর্কে বিধানসমূহ শরীয়তী না শরীয়তবিহীন। এ ব্যাপারে মাসয়ালা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অতি জরুরী। এখানে যদি সামগ্রিক নীতিমালা এবং ঘটনার অংশবিশেষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তা হলে তিনি পবিত্র কুরআন-হাদীসের বিধানকে অগ্রাধিকার প্রদান করতেন এবং খন্ডিত ঘটনার ব্যাখ্যা করতেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ফিকহ্ সম্পাদনার দিকে দৃষ্টিপাত করার পূর্বে ফিকহবিদ ও মুহাদ্দিসগণ কোন মাসয়ালা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এ মাসয়ালার উপর কোন বিধান বা নির্দেশ প্রদানের ব্যাপারে চিন্তা ও গবেষণা করা অন্যায় মনে করতেন। কিন্তু আবূ হানীফা (র) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি এ প্রথা বা পদ্ধতির বিরোধিতা করেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, ভবিষ্যতে যে সমস্ত বিষয়ে বা কাজে লোকজনের জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, জ্ঞানীদের এ সমস্ত বিষয়েও চিন্তা ও গবেষণা করা উচিত যে, মানুষ কোন সময় এ সমস্ত বিষয়ে জড়িত হয়ে পড়তে পারে। শরীয়ত এ ব্যাপারে কি কি বিধান নির্ধারণ করেছে, তা পূর্ব থেকে চিন্তা ও গবেষণা করা উচিত।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কায়স ইবনে রাবী অতি সংক্ষিপ্তভাবে এর নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে ইংগিত করেছেন এবং এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) এ মাসায়ালাসমূহ খুব ভালভাবে চিন্তা করতেন– যা এখনো ব্যবহারিক জীবনে পাওয়া যায়নি। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র) ফিকহর এ সমস্ত মাসয়ালা নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা শুরু করেন। তাঁর সম্পাদনার পদ্ধতি ছিল এরূপ যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর চারপাশে পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপবেশন করতেন। তিনি এক-একটি মাসয়ালাকে প্রশ্নের আকারে পেশ করতেন এবং সদস্যদের মতামত সম্পর্কে অবগত হতেন এবং তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। যদি সদস্যগণ একটি মাসয়ালার ব্যাপারে একমত হতেন, তা হলে তা সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করা হতো। যদি কোন মাসয়ালা সম্পর্কে মতানৈক্য হতো, তাহলে এর সর্বদিক নিয়ে আলোচনা হতো। কোন কোন সময় এ আলোচনা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত চলত। সবার আলোচনা শোনার পর ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁর মতামত পেশ করতেন। তাঁর মতামত এত যুক্তিপূর্ণ হতো যে, সবাই তা গ্রহণ করতেন। আবার কখনো পরিষদের কোন কোন সদস্য ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতের সাথে বিরোধিতা করতেন তখন এ বিরোধিতাও সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করা হতো। যখন কোন জটিল মাসয়ালা দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে ফয়সালা হতো তখন সদস্যবৃন্দ আনন্দিত হয়ে আল্লাহু আকবর তাকবীর উচ্চারণ করতেন।

আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উত্তম চরিত্র এবং সুন্দর আকৃতি দান করেছিলেন। তিনি মধ্যম আকৃতি ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। কথাবার্তা খুবই মিষ্টি এবং আওয়ায খুব উচ্চ ও স্পষ্ট ছিল। যে কোন কঠিন বিষয়কে তিনি অলংকারপূর্ণ ভাষায় অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম ছিলেন।

সন্তান-সন্ততি

কোন ঐতিহাসিক ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু বর্ণনা করেননি। তবে সাধারণভাবে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা হলো এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ইনতিকালের সময় হাম্মাদ ব্যতীত তাঁর অন্য কোন সন্তান ছিলেন না। হাম্মাদ অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আলিম ছিলেন। শৈশবকালে অত্যন্ত যত্নের সাথে তাঁর উস্তাদকে পাঁচ শ' দিরহাম উপহার হিসেবে দান করেন। অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা (র) নিজেই তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদান করেন। ইল্‌ম ও ফযীলত এবং তাকওয়ার দিক দিয়ে তিনি পিতার ন্যায় ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফার ইনতিকালের সময় তাঁর ঘরে লোকদের অনেক মাল ও আসবাব-পত্র আমানত ছিল। তিনি শহরের কাযীর নিকট এ সমস্ত পৌঁছে দিয়ে বললেন, আমানতকারীদের নিকট যেন এগুলো পৌঁছে দেওয়া হয়। কাযী বললেন, অধিক হিফাযতের জন্য এগুলো আপনার নিকট আপাতত রেখে দিন। হাম্মাদ বললেন, তাহলে এগুলো আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে নিন যাতে আমার পিতা যিম্মামুক্ত হতে পারেন। মোটকথা সমস্ত মাল ও আসবাব-পত্র কাযীর নিকট সোপর্দ করে তিনি আত্মগোপন করেন। যখন এ সমস্ত মালামাল অন্য কারো যিম্মায় অর্পণ করা হয়, তখন তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। সারা জীবন তিনি কারো অধীনে চাকুরী করেননি এবং বাদশাহর দরবারের সাথে কোন সম্পর্ক রাখেননি।

১৭৬ হিজরীর যিলকদ মাসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি চার পুত্র রেখে যান। তাঁদের নাম হলো উমর, ইসমাঈল, আবূ হাইয়ান এবং উসমান (র)। এঁদের মধ্যে ইসমাঈল অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাই বাদশাহ্ মামুনুর রশীদ তাঁকে কাযীর (বিচারকের) পদে নিযুক্ত করেন। তিনি অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা ও ইনসাফের সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। ফলে যখন তিনি বসরা ত্যাগ করে চলে আসেন, তখন শহরের সমস্ত লোক তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য বের হয়ে আসে এবং সবাই তাঁর জন্য দু'আ করতে থাকে।

রচনাবলী

ইমাম আবূ হানীফা (র) যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. **ফিকহ আকবর ঃ** (فقه اكبر) এটা আকাইদ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। এতে আকাইদে নাসাফীর মত মাসয়ালা ও অধ্যায়সমূহ সাজানো হয়েছে এবং আকাইদে নাসাফীর মত শরাহ (شرح) বা ব্যাখ্যা লিখা হয়েছে। এ কিতাবের কয়েকজন শরাহ লিখকের নাম এখানে বর্ণনা করা হলো ঃ

বাগদাদ আগমণ করত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খ্যাতি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌছেছিল। গ্রেফতারের মাধ্যমে তাঁর প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা হ্রাসের পরিবর্তে তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। খলীফা মনসূরের পক্ষ থেকে গ্রেফতার করা সত্ত্বেও কোন আমীর তাঁর প্রতি আদব ও তা'জীমের বিরোধী কোন কাজ করেননি। জেলখানায় তাঁর শিক্ষাদানের ক্রমধারা অব্যাহত থাকে। হানাফী ফিকহ্র প্রসিদ্ধ ইমাম মুহাম্মদ (র) জেলখানায় শিক্ষালাভ করেন। এই সমস্ত কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র) জেলখানায় থাকা সত্ত্বেও খলীফা মনসূরের আশংকা ও শত্রুতা অব্যাহত থাকে। যার ফলে তার চূড়ান্ত ষড়যন্ত্র কার্যকর করেন এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে গোপনে বিষপান করান। যখন তিনি বিষক্রিয়া অনুভব করেন, তখন সাথে সাথে সিজদা করেন এবং এ অবস্থায় ইনতিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ইনতিকালের খবর খুব দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র বাগদাদে এক বিষাদের ছায়া নেমে আসে। বাগদাদের কাযী হাসান ইবনে আম্মারা তাঁকে গোসল দান করেন। গোসল দেওয়ার সময় তিনি বলতে থাকেন, "আল্লাহর শপথ! আল্লাহর শপথ! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকহবিদ, শ্রেষ্ঠ আবিদ, শ্রেষ্ঠ যাহিদ ছিলে। তোমার মধ্যে সমস্ত সৌন্দর্য বিদ্যমান ছিল। তুমি তোমার সঙ্গীদেরকে তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌছার ব্যাপারে নিরাশ করে দিয়েছ।" গোসল শেষ হওয়ার পর এত অধিক মানুষের সমাগম হয় যে, জানাযার প্রথম জামাআতে প্রায় ৫০ হাজার লোক অংশগ্রহণ করে। এরপরও লোকজন আসতে থাকে। ফলে ছয়বার জানাযার নামায পড়াতে হয়। অবশেষে আসরের নামাযের সময় দাফন করা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) ওসীয়ত করেছিলেন যে, তাঁকে যেন খিযরান নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়। কেননা তাঁর মতে এই স্থানটি গযবমুক্ত ছিল। এই ওসীয়ত অনুযায়ী খিযরানের পূর্ব পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়। ঐতিহাসিক খতীব বাগদাদী লিখেছেন যে, দাফনের পরেও বিশ দিন পর্যন্ত লোকজন তাঁর জানাযার নামায পড়তে থাকে। সবার নিকট তিনি যে সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, তা কি কেউ কখনো লাভ করতে সক্ষম হয়েছে?

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর চরিত্র

ঐতিহাসিকগণ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর চরিত্র মাধুর্য বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করেছেন। তবে প্রকৃত দিক দিয়ে ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর বর্ণনা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। একবার খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম আবূ হানীফার চরিত্র বর্ণনা করার জন্য ইমাম আবূ ইউসূফকে অনুরোধ করেন। তখন তিনি তাঁর সম্মানিত উস্তাদ সম্পর্কে বলেন, "আমি যতটুকু জানি তিনি অত্যন্ত আল্লাহভীরু ছিলেন। নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকতেন। অধিকাংশ সময় চুপ থেকে চিন্তা করতেন। যদি কেউ কোন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করত এবং যদি তিনি তা জানতেন তাহলে এর উত্তর দিতেন, নতুবা চুপ থাকতেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কারো নিকট কোন প্রয়োজনীয়তার কথা বলতেন না। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকতেন। দুনিয়ার জাঁকজমক ও ইযযত-সম্মানকে তুচ্ছ মনে করতেন। গীবত থেকে মুক্ত থাকতেন। কারো আলোচনা হলে তার উত্তম দিকগুলো বর্ণনা করতেন। সম্পদের মত ইলম বিতরণ করতেও খুব আগ্রহী ছিলেন।" খলীফা হারুনুর রশীদ এ সমস্ত শুনে বললেন, নেককার ও উত্তম লোকদের চরিত্র এরূপই হয়ে থাকে।

ক. মুহীউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে বাহাউদ্দিন । (মৃ. ৯৩৫ হি.)
খ. মাওলা ইলইয়াস ইবনে ইবরাহীম সিনুবী।
গ. মাওলা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ মু'তাসারী।
ঘ. হাকীম ইসহাক।
ঙ. শায়খ আকমাল উদ্দিন।
চ. মোল্লা আলী কারী। তাঁর রচিত শরাহ খুবই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

২. আল-আলিমু ওয়াল মুতাআল্লিমু ঃ প্রশ্নোত্তর সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।

৩. মুসনাদ ঃ এ যাবত পৃথিবীতে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সংকলিত মুসনাদের কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এ সমস্ত সংস্করণের প্রকাশক ছিলেন আবুল মুয়াইয়েদ মুহাম্মদ ইবনে মাহমূদ আল-খাওয়ারযিমী (মৃ. ৬৬৫ হি.)। তিনি তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন, "সিরিয়ায় আমি কিছু কিছু জাহিল লোককে বলতে শুনেছি যে, হাদীসে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কোন জ্ঞান ছিল না। তাই হাদীসের উপর তাঁর কোন গ্রন্থ নেই। এর ফলে হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে আমি ঐ সমস্ত মুসনাদ একত্র করেছি যা উলামায়ে কিরাম ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বর্ণিত হাদীস থেকে সংকলন করেছেন।" নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো ঃ

১. মুসনাদে হাফিয আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ ইয়াকূব আল-হারেসী আল-বুখারী।
২. মুসনাদে ইমাম আবুল কাসিম তালহা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আশ্-শাহেদ।
৩. মুসনাদে হাফিয আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে মুজাফ্ফর ইবনে মূসা ইবনে ঈসা।
৪. মুসনাদে হাফিয আবু নাঈম ইসফাহানী সাহেবে হুলিয়া।
৫. মুসনাদে শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী মুহাম্মদ আল-আনসারী।
৬. মুসনাদে ইমাম আবূ বকর আহমদ আবদুল্লাহ ইবনে আদী আল-জুরজানী।
৭. মুসনাদে ইমাম হাফিয উমর ইবনে হাসান উশনানী।
৮. মুসনাদে ইমাম আবূ ইউসূফ কাযী।
৯. মুসনাদে আবূ বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালিদ আল-কালাঈ।
১০. মুসনাদে ইমাম মুহাম্মদ।
১১. মুসনাদে ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবূ হানীফা।
১২. মুসনাদে ইমাম আবুল কাসিম আবদুল্লাহ ইবনে আবিল আওয়াম আল-আদী।
১৩. মুসনাদে হাফিয হাসনাঈন ইবনে খসরু বলখী।
১৪. মুসনাদে আল্লামা হাফসাকী। মোল্লা আলী কারী এই মুসনাদের শরাহ করেছেন। এই মুসনাদ আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আবিদ সিন্ধী সংকলন করেছেন। এর উর্দূ অনুবাদ বর্তমানে আমাদের হাতে রয়েছে।
১৫. মুসনাদে মাওয়ারদী।
১৬. মুসনাদে ইবনে আবদুল বাযযাযী।

এই মুসনাদসমূহের মধ্যে কোন কোন মুসনাদের খুব উত্তম শরাহ লেখা হয়েছে। হাজী খলীফা কাশফুয-যুনূন নামক গ্রন্থে তা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَابُ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

সমস্ত আমলের বিশুদ্ধতা নিয়্যতের উপর নির্ভর করে

١- اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيَمِى عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّيْثِى عَنْ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِه فَهِجْرَتُه اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلَه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه اِلى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُه اِلى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ *

হাদীস নং-১

অনুবাদ ঃ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ সমস্ত আমলে বিশুদ্ধতা নিয়্যতের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়্যত অনুযায়ী ফলাফল লাভ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই হবে (সে সওয়াব ও নেকীর অধিকারী হবে)। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়ার পার্থিব বস্তু লাভ অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, হিজরতের মাধ্যমে সে তাই পাবে যা সে নিয়্যত করেছে।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসে এই শিক্ষাদান করা হয়েছে যে, প্রতিটি কাজে নিয়্যত ও ইখ্লাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশুদ্ধ নিয়্যত ছাড়া যে কোন কাজই নিষ্ফল বলে গণ্য হবে। তাই ইমাম শাফিঈ (র) বলেছেন, 'দীনের প্রতিটি কাজে এ হাদীসের বিরাট ভূমিকা রয়েছে এবং নিয়্যতের গুরুত্বের কারণেই এ হাদীস ইসলামের মূল ও ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।' কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেছেন, 'এ হাদীস ইলমের অর্ধেক। কেননা প্রতিটি দীনী কাজ যত বরকতপূর্ণই হোক না কেন, নিয়্যতের ত্রুটির কারণে এর দ্বারা কোন সাওয়াব ও নেকীর আশা করা যায় না। এমনিভাবে দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যতীত যদি কেউ প্রসিদ্ধিলাভের জন্য শিক্ষাদানের কাজ করে, তা হলে এর দ্বারা কোন সাওয়াব লাভ হবে না।'

এই হাদীসের বর্ণনায় اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -এর দ্বারা একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তা হলো এই যে, প্রতিটি আমলের জন্য নিয়্যত অত্যন্ত জরুরী। এরপর لِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوٰى এই বাক্যের দ্বারা বিষয়টি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য নয়; বরং তার নিয়্যত অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে। তাই দেখা যায়, উম্মে কায়েস নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে মুহাজিরে উম্মে কায়েস নামক এক ব্যক্তি হিজরত করা সত্ত্বেও নিয়্যতের ত্রুটির কারণে তা দীনী ও নেকীর কাজ হিসেবে বিবেচিত ও গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিয়্যতের গুরুত্বের কারণে মুহাদ্দিসগণ তাঁদের সংকলিত হাদীস গ্রন্থ প্রায়ই এ হাদীস দ্বারা শুরু করে থাকেন। অবশ্য এর দ্বারা হাদীস শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও উদ্দেশ্য রয়েছে, যাতে তারা এই অমূল্য ও মর্যাদাসম্পন্ন ইল্‌ম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই অর্জন করে, দুনিয়ালাভের জন্য নয়।

كِتَابُ الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ وَالْقَدْرِ وَالشَّفَاعَةِ

ঈমান, ইসলাম, তাকদীর এবং শাফাআত

بَابُ شَرَائِعِ الْاِسْلَامِ وَذَمِّ الْقَدْرِيَّةِ

অধ্যায় ঃ ইসলামী শরীয়ত ও কাদরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি তিরস্কার

٢- اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ بَيْنَا مَعَ صَاحِبٍ لِىْ بِمَدِيْنَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَبْصَرْنَا بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ(رض) فَقُلْتُ لِصَاحِبِىْ هَلْ لَكَ اَنْ نَأْتِيَهُ فَنَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدْرِ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ دَعْنِىْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا الَّذِىْ اَسْأَلُهُ فَاِنِّىْ اَعْرِفُ بِهِ مِنْكَ قَالَ فَانْتَهَيْنَا، اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّا نَتَقَلَّبُ فِىْ هٰذِهِ الْاَرْضِ فَرُبَّمَا قَدِمْنَا الْبَلْدَةَ بِهَا قَوْمٌ يَّقُوْلُوْنَ لَاقَدْرَ فَبِمَا نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ اَبْلِغْهُمْ مِنِّى اِنِّى مِنْهُمْ بَرِىْءٌ وَلَوْ اَنِّى وَجَدْتُّ اَعْوَانًا لَجَاهَدْتُّهُمْ ثُمَّ اَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا *

قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ رَهْطٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ اِذْ اَقْبَلَ شَابٌّ جَمِيْلٌ اَبْيَضُ حَسَنُ اللِمَّةِ طَيِّبُ الرِّيْحِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيْضٌ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَدْنَا مَعَهُ فَقَالَ اَدْنُوْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَدْنُ فَدَنَا دَنْوَةً اَوْ دَنَوْتَيْنِ ثُمَّ قَامَ مُوَقِّرًا لَهُ ثُمَّ قَالَ اَدْنُوْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَدْنُ فَدَنَا حَتّٰى اَلْصَقَ رُكْبَتَه بِرُكْبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِهٖ وَلِقَائِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ

خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا مِنْ تَصْدِيْقِهٖ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِهٖ صَدَقْتَ كَاَنَّهٗ يَعْلَمُ ، قَالَ فَاَخْبِرْنِى عَنْ شَرَائِعِ الْاِسْلَامِ مَاهِىَ قَالَ اِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَحِجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَالْاِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لِقَوْلِهٖ صَدَقْتَ ، قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ مَاهُوَ قَالَ الْاِحْسَانُ اَنْ تَعْمَلَ لِلّٰهِ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ قَالَ فَاِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَنَا مُحْسِنٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ *

قَالَ فَاَخْبِرْنِى عَنِ السَّاعَةِ مَتٰى هِىَ قَالَ مَاالْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ لَهَا شَرَائِطُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ. قَالَ صَدَقْتَ *

ثُمَّ انْصَرَفَ وَنَحْنُ نَرَاهُ – قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ بِالرَّجُلِ فَقُمْنَا فِى اَثَرِهٖ فَمَا نَدْرِىْ اَيْنَ تَوَجَّهَ وَلاَ رَأَيْنَا شَيْئًا فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هٰذَا جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمَ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ وَاللّٰهِ مَا اَتَانِىْ بِصُوْرَةٍ اِلاَّ وَاَنَا اَعْرِفُهٗ فِيْهَا اِلاَّ هٰذِهِ الصُّوْرَةَ *

হাদীস নং-২

অনুবাদ ঃ হযরত ইয়াহহিয়া ইবন ইয়ামার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন আমার সঙ্গীর সাথে পবিত্র মদীনায় উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) দৃষ্টিগোচর হলেন। আমি সাথীকে বললাম, তুমি কি মনে কর আমরা তাঁর নিকট গিয়ে তাকদীরের মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করব? সাথী বলল, হ্যাঁ। তখন আমি বললাম, আচ্ছা, আমাকেই প্রশ্ন করতে দাও। কেননা আমি তাঁকে তোমার চেয়ে অধিক জানি। হযরত ইয়াহিয়া (র) বলেন, অতঃপর আমি হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, হে আবূ আবদুর রহমান (হযরত আবদুল্লাহ্‌র উপনাম)! আমরা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করতে থাকি এবং কখনো এমন শহর অতিক্রম করে থাকি যার বাসিন্দাগণ বলে যে, তাকদীর বলতে কিছুই নেই। এ ধরনের

লোকদেরকে আমি কি জওয়াব দেব ? হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন যে, আমি তাদের উপর অসন্তুষ্ট। যদি আমি সাহায্যকারী পাই, তাহলে তাদের সাথে জিহাদ করব।

অতঃপর তিনি এই হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আমরা কতিপয় সাহাবী একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ শুভ্র বস্ত্র পরিহিত একজন সুদর্শন ব্যক্তি সেখানে আগমণ করেন, যার মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত ঝুলন্ত এবং দেহ থেকে সুগন্ধি ছড়াচ্ছিল। নিকট এসে বললেন, আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আস্সালামু আলাইকুম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সালামের জবাব দিলেন, আমরাও তাঁর অনুকরণ করলাম। অতঃপর আগন্তুক কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, আস। তখন আগন্তুক দু-এক পা অগ্রসর হলেন। এরপর দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আদবের সাথে আগন্তুক আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি কি নিকটে আসতে পরি ? তিনি বললেন, আস। তখন তিনি আঁ হযরত (সা)-এর হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে বসে পড়লেন এবং বললেন, আপনি আমাকে ঈমানের হাকীকত সম্পর্কে বলুন। হুযূর (সা) বললেন, ঈমান হল এই যে, তুমি আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, কিতাবসমূহের উপর, রাসূলগণের উপর, কিয়ামতের দিনের উপর এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়,– এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, তার এ কথায় আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কেননা প্রশ্নও করেন আবার হুযূর (সা)-এর জওয়াবের সত্যতা প্রমাণও করেন ! এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি পূর্ব থেকেই এ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ইসলামের আহ্কাম কি, আমাকে বলুন। আঁ হযরত (সা) বললেন, ইসলামের আহ্কাম হল নামায পড়া, যাকাত আদায় করা, সক্ষম ব্যক্তির জন্য বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করা, রমযানের রোযা রাখা, পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা। আগন্তুক ব্যক্তি পুনরায় বললেন, আপনি সত্য বলেছেন, তাঁর এ কথায় আমরা পুনরায় হতবাক হয়ে গেলাম। অতঃপর ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, ইহ্সান কি এ সম্পর্কে আমাকে একটু বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ইহ্সান হল এই যে, তুমি প্রত্যেকটি আমল এভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহ্ তাআলাকে দর্শন করছ। যদি সত্যিকারভাবে দেখতে না পাও, তবে কমপক্ষে এটা ধারণা করবে যে, আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন। তখন আগন্তুক বললেন, যদি আমি এসব পালন করি, তাহলে কি আমি মুহ্সিন (নেককার) হতে পারব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। এবারও ঐ ব্যক্তি বললেন, "আপনি সত্য বলেছেন।"

অতঃপর আগন্তুক বললেন, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে, এ সম্পর্কে আপনি আমাকে একটু বলুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে এ ব্যাপারে অধিক কিছু অবগত নন। তবে এর কিছু প্রমাণ বা চিহ্ন রয়েছে। এরপর তিনি বলেন, নিশ্চয়ই একমাত্র আল্লাহ্ জানেন কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে, বৃষ্টি কখন বর্ষিত হবে, মায়ের গর্ভে কি সন্তান রয়েছে এবং মানুষ কোথায় মৃত্যুবরণ করবে (এগুলো মানুষ কিছুই জানে না)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন ও খবর রাখেন। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।

فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِيْمَانُ فَقَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْتُ لِقَوْلِهٖ صَدَقْتَ كَاَنَّهٗ يَدْرِى ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا شَرَائِعُ الْاِسْلَامِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لِقَوْلِهٖ صَدَقْتَ كَاَنَّهٗ يَدْرِى ثُمَّ قَالَ فَمَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْمَلَ لِلّٰهِ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَمَتٰى قِيَامُ السَّاعَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ فَقَفٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ بِالرَّجُلِ فَطَلَبْنَا فَلَمْ نَرَلَهٗ اَثَرًا فَاَخْبَرْنَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذٰلِكَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ *

হাদীস নং-৩

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার হযরত জিবরাঈল (আ) শুভ্র বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় একজন যুবকের আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আগমণ করেন এবং বলেন, আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তিনি জওয়াবে বলেন, ওয়া আলাইকাস্ সালাম। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি কি আপনার নিকট আসতে পারি ? তিনি বললেন, আসুন। এরপর ঐ ব্যক্তি বললেন, ঈমান কি আমাকে বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ঈমান হলো আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। আগন্তুক বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আমরা তাঁর এই কথায় আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কেননা এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তিনি পূর্ব থেকেই অবগত আছেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, শরীয়তের আহ্কাম কি আমাকে একটু বলুন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ইসলামের আহ্কাম হল নামায পড়া, যাকাত দান করা, পবিত্র রমযানের রোযা রাখা, পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা। আগন্তুক বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমরা তার কথায় আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কেননা এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এর উত্তর পূর্ব হতেই অবগত আছেন। এরপর আগন্তুক প্রশ্ন করলেন, ইহ্সান কি এ সম্পর্কে আমাকে একটু বলুন। হুযূর (সা) বলেন, তুমি এভাবে আমল

অতঃপর আগন্তুক ব্যক্তি চলে যেতে লাগলেন এবং আমরাও তা দেখছিলাম। নবী করীম (সা) বললেন, ঐ লোকটিকে একটু ডেকে আন। আমরা তাঁর পেছনে দৌড়াতে লাগলাম। কিন্তু আমরা তাকে খুঁজে পেলাম না এবং কোন্‌দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তা বুঝতে পারলাম না। আমরা এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। হুযূর (সা) বললেন, ইনি ছিলেন জিবরাঈল (আ)। তোমাদেরকে তোমাদের দীনের আহকাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন। আল্লাহ্‌র শপথ! আজকের এই ঘটনা ব্যতীত যখনই তিনি যে কোন আকৃতি নিয়ে আমার নিকট আগমণ করেছেন, আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি।

ব্যাখ্যা ঃ ঈমান ও ইসলামের অভিধানিক অর্থের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু শরীয়তের প্রচলিত দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমান ও ইসলামের অর্থ প্রায় একই। একই অর্থ কখনো ইসলামের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে, কখনো ঈমান-এর দ্বারা। কেননা দু'টি শব্দই পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঈমান ব্যতীত ইসলাম বিশুদ্ধ হয় না এবং ইসলাম ব্যতীত ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না। তবে কোন কোন সময় শরীয়তে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। যেমন গোপন বিশ্বাসকে ঈমান ও বাহ্যিক আমলকে ইসলাম বলা হয়ে থাকে। এ হাদীসে ঈমান ও ইসলাম পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا *

বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম। বল, ঈমান আন নি, বরং তোমরা বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। (৪৯ ঃ ১৪)

এই হাদীসটি ইসলামের ভিত্তি ও সারমর্ম। তাই এ হাদীসের নাম উম্মুল আহাদীস, উম্মুস-সুন্নাহ্ অথবা উম্মুল-জাওয়ামি' বলা হয়ে থাকে। কোন কোন উলামায়ে কিরাম এর সামগ্রিকতা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি ঃ (১) ফিকহ্, যা বাহ্যিক আমলসমূহকে বলা হয়; (২) কালাম, যা গোপন বিষয় ও বিশ্বাসকে বলা হয় এবং (৩) তাসাউফ, যা ইখলাস ও ইহ্সানের নামে আখ্যায়িত করা হয়।

আঁ হযরত (সা) ইহ্সানের দু'টি স্তর বর্ণনা করেছেন। একটি হল উঁচু স্তর, 'যাতে ইবাদতকারীর আল্লাহ্‌র সাথে এরূপ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যেন তিনি আল্লাহ্‌কে দেখছেন। এটাকেই মুশাহাদা বলা হয়। দ্বিতীয় হল, নীচু স্তর যাতে ইবাদতকারীর এ ধারণা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্ যেন তাকে দেখছেন। এটাকে মুরাকাবা বলা হয়।

٣- اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ جِبْرَئِيْلُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صُوْرَةِ شَابٍّ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيَاضٌ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْنُوْ فَقَالَ اُدْنُه

করবে যেন তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখছ, যদি দেখার সৌভাগ্য না হয়, তাহলে এ ধারণা করবে যে, আল্লাহ্ তোমাকে প্রত্যক্ষ করছেন।

অতঃপর ঐ ব্যক্তি বললেন, তা হলে বলুন, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে ? তখন আঁ হযরত (সা.) বললেন, যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে এ ব্যাপারে অধিক জানেন না। এরপর আগন্তুক চলে যান। তখন হুযূর (সা) সমবেত সাহাবাদেরকে বললেন, ঐ লোকটিকে ডেকে আন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা তাঁর খোঁজে বের হলাম কিন্তু কোথাও তাঁকে পেলাম না। আমরা এ সংবাদ আঁ হযরত (সা)-এর নিকট জানালাম। তখন তিনি বললেন, ইনি হলেন জিবরাঈল (আ), তোমাদেরকে দীনী আহ্কাম শিক্ষা দানের জন্য আগমণ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস বাক্য ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পূর্বে বর্ণিত হাদীসের মতই। তবে ইসলামী আহ্কামের বর্ণনায় হজ্জের উল্লেখ নেই। সম্ভবত এ রিওয়ায়েত বা বর্ণনা হজ্জ ফরয হওয়ার পূর্বের হতে পারে। হাদীসে জিবরাঈল হিসেবে কথিত এ হাদীস কম ও বেশি একই বাক্য দ্বারা সিহাহ্ সিত্তার কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এ দু'টো হাদীসের মধ্যে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ নেই। হাদীসে ইবন মাজার বর্ণনায় এর উল্লেখ রয়েছে এবং পঞ্চমতঃ হজ্জের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু' হাদীসের মধ্যে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসলের কথা বর্ধিত হয়েছে। এ পার্থক্য হয়ত বাক্য অথবা একাধিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে হয়েছে। অথবা বর্ণনাকারী সাহাবাগণ কোথাও কোথাও তাঁদের বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত করেছেন।

এ হাদীসে ইহ্সানের হাকীকত ব্যাখ্যা করেছেন এবং রিয়া ও নাম প্রচারের প্রবণতার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। কেননা এগুলো দীনের আমলসমূহকে ধ্বংস করে দেয়। ইহসান মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র ভয়, মনের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা এবং আল্লাহ্র মহত্বের সঠিক ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করে থাকে। যদি সত্যিকার অর্থে মানুষ নেককার হয়, তা হলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ তার অন্তরে স্থান পেতে পারে না। গায়রুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত অন্যসব) থেকে তার অন্তর এমনি পরিষ্কার ও নিষ্কলংক হয়ে থাকে যেন ঝিনুকের মধ্যে স্বচ্ছ ও দাগবিহীন মুক্তা পাওয়া যায়। তাই ইবাদতের সাথে ইখলাস যুক্ত করে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ -তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদত করতে। (৯৮ ঃ ৫)

بَابُ التَّوْحِيْدِ وَالرِّسَالَةِ

তাওহীদ ও রিসালাত

٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ رِجَالاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُوْهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ كَانَتْ لَهُ رَاعِيَةٌ تَتَعَاهَدُ

غَنَمَهُ وَاَنَّه اَمَرَهَا تَتَعَاهَدُ شَاةً فَتَعَاهَدَتْهَا حَتّٰى سَمُنَتِ الشَّاةُ وَاشْتَغَلَتِ الرَّاعِيَةُ بِبَعْضِ الْغَنَمِ فَجَاءَ الذِّئْبُ فَاخْتَلَسَ الشَّاةَ وَقَتَلَهَا فَجَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ وَفَقَدَ الشَّاةَ فَاَخْبَرَتْهُ الرَّاعِيَةُ بِاَمْرِهَا فَلَطَمَهَا ثُمَّ نَدِمَ عَلٰى ذٰلِكَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ وَقَالَ ضَرَبْتَ وَجْهَ مُؤْمِنَةٍ فَقَالَ سَوْدَاءُ لَاعِلْمَ لَهَا فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَهَا اَيْنَ اللّٰهُ فَقَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ فَمَنْ اَنَا قَالَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَاَعْتِقْهَا فَاَعْتَقَهَا *

হাদীস নং-৪

অনুবাদ ঃ হযরত আতা (রা) কয়েকজন সাহাবা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-এর একজন দাসী ছিল। সে তাঁর বকরী চরাত এবং সেবা করত। তিনি তাকে আরো একটি বকরী লালন-পালনের জন্য প্রদান করেন। ধীরে ধীরে এটা খুব মোটা তাজা হয়ে উঠল। একদিন মেয়েটি অন্যান্য বকরীগুলো দেখছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে ঐ বকরীটি নিয়ে মেরে ফেলল। যখন আবদুল্লাহ্ (রা) আগমণ করেন, তখন তিনি বকরীটি আর দেখতে পাননি। অতঃপর মেয়েটি তার নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। তিনি এতে ক্রোধান্বিত হয়ে মেয়েটিকে থাপ্পড় মারলেন। এরপর তিনি নিজেই অনুতপ্ত হলেন এবং হুযূর (সা)-এর নিকট এসে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। আঁ হযরত (সা) বিষয়টিকে খুবই গুরুতর অপরাধ মনে করে বললেন ঃ তুমি একটি নিরপরাধ মেয়েকে মেরেছ। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, সে একটি ক্রীতদাসী, ঈমানের সাথে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? হুযূর (সা) মেয়েটিকে ডেকে আনালেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ্ কোথায় ? মেয়েটি উত্তরে বলল, আকাশে। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে ? মেয়েটি বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন তিনি বললেন ঃ মেয়েটি মুমিনা বা বিশ্বাসী, তুমি তাকে আযাদ করে দাও। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) তাকে আযাদ করে দেন।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের পরস্পরের মধ্যে কয়েকটি হক বা অধিকার রয়েছে। এগুলো সঠিকভাবে আদায় বা প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। যেমন একটি হল সাধারণ; এটাকে আমরা মানবতা বলে আখ্যায়িত করে থাকি। অপরটি হল বিশেষ অধিকার। যেমন দীন সম্পর্কিত অধিকার। এ হাদীসে দু'টি অধিকার আদায়ের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি মহব্বত ও আনুগত্যও প্রকাশ করেছে। সুতরাং মানুষের হক আদায় করতে পারেননি বলে এবং একটি নিরপরাধ মেয়েকে শাস্তি দিয়েছেন বলে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) অনুতপ্ত হলেন। এছাড়া কাজটি

সাহাবায়ে কিরামের উন্নত চরিত্র ও মর্যাদা বিরোধী ছিল। কেননা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মধ্যে পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (ক্রোধ হজম করা এবং মানুষের অপরাধ ক্ষমা করা)-এর উপর পূর্ণাঙ্গ আমল বিদ্যমান ছিল। অতঃপর হুযূর (সা) যেহেতু ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুতর মনে করেছেন, তাই ঈমানী সম্পর্কের কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) মেয়েটিকে আযাদ করে দেন। এ প্রসঙ্গে আঁ হযরত (সা) ইরশাদ করেন ঃ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِيْهِ . —পূর্ণাঙ্গ মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رض) قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِاَصْحَابِهِ انْهَضُوا بِنَا نَعُوْدُ جَارَنَا الْيَهُوْدِيَّ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي الْمَوْتِ فَسَاَلَهُ ثُمَّ قَالَ اِشْهَدْ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ فَنَظَرَ اِلٰى اَبِيْهِ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ اَبُوْهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْهَدْ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ فَنَظَرَ اِلٰى اَبِيْهِ فَقَالَ اَبُوْهُ اِشْهَدْلَهُ فَقَالَ الْفَتٰى اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْقَذَنِيْ نَسَمَةً مِّنَ النَّارِ *

وَفِي رِوَايَةٍ اَنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِاَصْحَابِهِ انْهَضُوْا بِنَا نَعُوْدُ جَارَنَا الْيَهُوْدِيَّ قَالَ فَوَجَدَهُ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ اِلٰى اَبِيْهِ قَالَ فَاَعَادَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَصَفَ الْحَدِيْثَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ اِلٰى اٰخِرِهِ عَلٰى هٰذِهِ الْهَيْأَةِ اِلٰى قَوْلِهِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْقَذَنِيْ نَسَمَةً مِّنَ النَّارِ *

হাদীস নং- ৫

অনুবাদ ঃ হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণনা করেন যে, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি সাহাবাদেরকে বললেন ঃ চল আমরা আমাদের প্রতিবেশী অসুস্থ ইয়াহূদী লোকটির সেবা করে আসি। বর্ণনাকারী বলেন, আঁ হযরত (সা) তার নিকট পৌঁছার পর তাকে মুমূর্ষূ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তাকে তার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর বললেন ঃ তুমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। তখন লোকটি তার পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করল, কিন্তু তার পিতা কিছুই বলল না। হুযূর (সা) পুনরায় বললেন ঃ তুমি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। তখনও লোকটি তার পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করল। এ অবস্থায় তার পিতা তাকে উক্ত বিষয়ে সাক্ষ্য বা স্বীকারোক্তির জন্য নির্দেশ দান করল। তখন ইয়াহূদী যুবকটি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা), আল্লাহ্র রাসূল। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্র শুকরিয়া এই যে, তিনি আমার দ্বারা একজন মানুষকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে একই ঘটনা এভাবে বর্ণিত আছে যে, একদিন হুযূর (সা) স্বীয় সাহাবা (রা)-দেরকে বললেন ঃ চল আমরা আমাদের একজন রুগ্ন ইয়াহূদী প্রতিবেশীকে সেবা করে আসি। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি ঐ লোকটির নিকট গমন করেন তখন তাকে মুমূর্ষূ অবস্থায় দেখতে পেলেন। আঁ হযরত (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি কি স্বীকার কর যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই ? সে বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই ? এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল? তখন লোকটি তার পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করল। বর্ণনাকারী বলেন, হুযূর (সা) একই বাক্য তিনবার পুনরুল্লেখ করেন। অবশেষে লোকটি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের শোকর যে, আমার দ্বারা তিনি একজন লোককে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করলেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহূদী-খ্রীস্টান ও অগ্নি উপাসক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার জন্য যাওয়াতে কোন দোষ নেই। বিশেষ করে যদি তাবলীগে দীনের উদ্দেশ্য থাকে, যেমন আঁ হযরত (সা) এর আদর্শ পেশ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র) স্বীয় 'আসার' নামক গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে, রুগ্ন অবস্থায় কাফিরদের শুশ্রূষা করাতে কোন দোষ নেই।

এ হাদীসে বিস্তারিতভাবে প্রতিবেশীর হক ও অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে ইসলামী আইনের মধ্যে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। বাযযায, আবূ নাঈম এবং তিবরানী নামক গ্রন্থসমূহে এক মরফূ হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রতিবেশী তিন প্রকার।

প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি যার সাথে শুধু প্রতিবেশীর সম্পর্কে রয়েছে। যেমন একজন মুশরিক, এর সাথে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতেও কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং অধিকারের দিক দিয়ে এটা হল নিম্নস্তরের প্রতিবেশী।

দ্বিতীয়তঃ যার মধ্যে দুটি হক বা অধিকার রয়েছে। যেমন ঐ ব্যক্তি যিনি মুসলমান এবং প্রতিবেশী। ইসলামের হক এবং প্রতিবেশীর হক। এটা হল মধ্যম স্তরের প্রতিবেশী।

তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যিনি মুসলমান, আত্মীয় এবং প্রতিবেশী। এটা হল উঁচু স্তরের প্রতিবেশী। কেননা তিনি একাধারে তিনটি হকের অধিকারী।

হাদীসের দ্বারা আরো একটি বিষয় প্রতীয়মান হল যে, শিশু যখন এতটুকু বয়ঃপ্রাপ্ত হয় যে, কুফরীর হাকীকত বা মূল উৎস উপলব্ধি করতে সক্ষম হওয়ার পর কুফরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে শাস্তির যোগ্য হবে। এছাড়া হাদীসের দ্বারা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল যে, অন্য ধর্মের লোকদেরকে মুসলমানগণ দীনের দাওয়াত দিতে থাকবেন।

بَابُ التَّوَقُّفِ فِى ذَرَارِىْ الْمُشْرِكِيْنَ

মুশরিক লোকদের সন্তানদের ব্যাপারে কোনরূপ ফয়সালা না দিয়ে বিরত থাকা

٦- اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ هُرْمُزِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُّوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ وَيُنَصِّرَانِهٖ - قِيْلَ فَمَنْ مَاتَ صَغِيْرًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ - قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ *

হাদীস নং- ৬

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ প্রত্যেকটি জন্মগ্রহণকারী শিশু স্বীয় ফিতরত বা প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী অথবা খ্রীস্টান বানিয়ে ফেলে। হুযূর (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! যে শিশু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার কি অবস্থা হবে ? তখন হুযূর (সা) বললেন, আল্লাহ্ ভাল জানেন যে, সে ভবিষ্যতে কি কাজ করত।

ব্যাখ্যা ঃ ফিত্রতের দ্বারা প্রাকৃতিক স্বভাব বা সহজাত স্বভাব ও যোগ্যতাকে বুঝায়, যা নিয়ে প্রতিটি শিশু মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এর মধ্যে ভাল-মন্দ উভয়ের যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। যদি সে কুফর ও শিরকের সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র থাকে এবং কুফরীর কর্মক্ষেত্র বা আশ-পাশ থেকে দূরে থাকে, তাহলে এর মধ্যে ঈমান কবূলের পূর্ণ যোগ্যতা তৈরি হয়ে থাকে এবং ঐ শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর নিজেই সিরাতে মুসতাকীম তথা সরল-সঠিক পথে চলতে পারে। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ তার পিতামাতা ইয়াহূদী-খ্রীস্টান বা অগ্নি উপাসক হয়ে থাকে, তাহলে

তাদের প্রভাবে ঐ সন্তান সরল ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গুমরাহীর পথ গ্রহণ করে থাকে। হাদীসে এ ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হাদীসের দ্বিতীয় অংশে একটি বিতর্কিত মাসআলার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো এই যে, কাফিরদের শিশু সন্তান শরীয়তের দৃষ্টিতে কি কাফির না মুমিন, জান্নাতী না জাহান্নামী। কেউ কেউ বলেন, এদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ইমাম বায়হাকী এ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র)-এর সাথে একমত পোষণ করে এটা আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ইমাম মালিক (র) থেকে এ বিষয়ে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর কতিপয় শাগরিদ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, মুসলমানদের শিশু সন্তান জান্নাতী এবং মুশরিকদের শিশু সন্তানদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কাযী আয়ায বলেছেন, ইমাম আহমদ (র)-এর মতে মুশরিকদের শিশু সন্তান জাহান্নামী হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থেকেছেন। কেননা কোনদিকেই চূড়ান্ত ফয়সালা দেওয়া সম্ভব নয়। বস্তুতঃ বর্ণিত হাদীসে এ ধারণার দিকেই ইঙ্গিত করে হুযূর (সা) বলেছেন, আমরা জানি না যে, ভবিষ্যতে এ সন্তান কি করবে। নেককাজ করে জান্নাতী হবে, না অন্যায় কাজ করে জাহান্নামী হবে। সুতরাং এখানেই নিশ্চুপ থাকই শ্রেয়।

بَابُ اَصْلِ الْاِسْلَامِ الشَّهَادَةُ

ইসলামের মূল ভিত্তি হলো তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদান করা

٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى *

হাদীস নং- ৭

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি ঐ সময় পর্যন্ত কাফির-মুশরিকদের সাথে জিহাদ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' না বলবে। যখন তারা কালিমায়ে তাওহীদ বলবে, তখন তাদের জীবন ও ধন-সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। শরীয়তের ব্যাপারে বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অতঃপর তাদের হিসাবের বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেওয়া হলো।

ব্যাখ্যা ঃ হুযূর (সা)-এর বাণী حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর একটি মর্ম হল এই যে, কাফির কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যখন ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ করবে, তখন

তাদের জীবন ও ধন-সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় মর্ম হল এই যে, ইসলাম গ্রহণ না করে ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করা, যেমন জিযিয়া প্রদানের নীতি গ্রহণ করা, সন্ধি করার সুযোগ গ্রহণ করা, ইসলামী রাষ্ট্রের বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার করা। এ অবস্থায়ও জীবন এবং ধন-সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে। এ ছাড়া - الاَّ حَقِّهَا এর দ্বারা দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইসলামী আহ্কাম বা বিধান প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের জীবন ও সম্পদ উভয় থেকেই বদলা গ্রহণ করা যাবে। যেমন কাউকে হত্যা করা হলে কিসাস (হত্যার পরিবর্তে হত্যা), জিনার শাস্তি হিসাবে রজম (পাথর মেরে হত্যা), সম্পদ হরণের পরিবর্তে সম্পদ আদায় করা হবে। হাদীসের শেষদিকে বলা হয়েছে- وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰه অন্তরের গোপন চিন্তাধারা অনুসন্ধানের দায়িত্ব আমাদেরকে দেয়া হয়নি। অর্থাৎ যদি মুখে কালিমা পাঠ করে কিন্তু অন্তরে মুনাফিকী, রিয়াকারী, আল্লাহ্র একত্বে অবিশ্বাস ইত্যাদি গোপন রাখে, তাহলে এর অনুসন্ধান করার অধিকার আমাদের নেই। এদের হিসাব গ্রহণ ও শাস্তি প্রদানের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র। এ দায়িত্ব থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং এ হাদীসের আলোকে যদি কোন যিন্দীক ও মুনাফিক তওবা করে এবং তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কালিমা পাঠ করে, তাহলে তা' গ্রহণ করা হবে ; অন্তরে কি রয়েছে তা অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নেই।

بَابُ عَدَمِ كُفْرِ اَهْلِ الْكَبَائِرْ

কবীরা গুনাহকারীকে কাফির বলা যাবে না

٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ (رض) قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) مَاكُنْتُمْ تَعُدُّوْنَ الذُّنُوْبَ شِرْكًا قَالَ لاَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ فِى هٰذِهِ الْاُمَّةِ ذَنْبٌ تَبْلُغُ الْكُفْرَ قَالَ لاَ اِلاَّ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى *

হাদীস নং- ৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ যুবায়ের (র) বলেন, আমি হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি গুনাহ্ কবীরাকে শিরক বলে গণ্য করেন না ? তিনি বললেন, না। হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন,আমি আঁ হযরত (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ উম্মতের মধ্যে এমন কোন গুনাহ্ আছে কি যা কুফরী পর্যন্ত পৌছে থাকে ? হুযূর (সা) বললেন ঃ একমাত্র আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক বা অংশীদার করা ব্যতীত অন্য কোন গুনাহ্ (এরূপ) নেই।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস একটি বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য আনয়ন করা হয়েছে। তা হলো এই যে, গুনাহ্ কবীরা, যেমন রক্তপাত করা, চুরি করা, মদ্যপান করা ইত্যাদি কুফরীর মধ্যে গণ্য হবে না। এরদ্বারা মূলতঃ খারিজীদের মতবাদকে খন্ডন করা হয়েছে। কেননা তাদের মতবাদ হলো এই যে, গুনাহ্ কবীরায় লিপ্ত হওয়ার কারণে মুমিন কাফিরে পরিণত হয়ে যায়।

এ মাসয়ালাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি দল বিভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত করেছে। খারিজীদের মতবাদ হলো এই যে, গুনাহে কবীরায় লিপ্ত ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়ে যায়। দলীল হিসেবে তারা এ হাদীস পেশ করে বলেন, হুযূর (সা) বলেছেন ঃ

لَايَزْنِى الزَّانِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ -

"জিনাকারী জিনারত অবস্থায় এবং চোর চুরি করা অবস্থায় মুমিন থাকে না।" কিন্তু এ অবস্থায়ও তাদের ঈমান থাকার ব্যাপারে হাদীসে যে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে, তা তারা গোপন রেখেছেন। যেমন অপর একটি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ঈমান গ্রহণের পর কোন গুনাহ মুমিনের ঈমানকে ক্ষতি করতে পারে না; বরং তারা বিনাবাধায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা দলীল হিসেবে এ হাদীস পেশ করে বলেন, আঁ হযরত (সা) বলেছেন ঃ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ। "যে ব্যক্তি তাওহীদের এই কালিমা পাঠ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" এ দল নাফরমানদের আযাব ও শাস্তি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, তা তারা গোপন রেখেছে। আর মু'তাযিলাগণ কুফর ও ঈমানের মধ্যে একটি স্তর মেনে থাকে। তাদের মত হল, কাফির কালিমা পাঠের দ্বারা কুফরী থেকে এবং মুমিন গুনাহ্ কবীরা দ্বারা ঈমান থেকে বিচ্যুত হতে পারে না; বরং গুনাহ্ কবীরার কারণে একজন মুমিনকে শুধু ফাসিক বলা যেতে পারে।[১]

উল্লেখিত হাদীস ঐ লোকদের ভুল ধারণাকে দূরীভূত করেছে যারা হুযূর (সা)-এর হাদীস ঃ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ (যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করে সে কাফির হয়ে যায়)–এর প্রেক্ষিতে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাফির মনে করে থাকে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করে। যদিও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ উপরোক্ত বিষয়কেই প্রকাশ করেছে কিন্তু এখানে হাদীসের মূল অর্থ এ নয় যে, নামায পরিত্যাগকারী ঈমানের গন্ডীর সীমানা থেকে বহির্ভূত হয়ে প্রকৃত কুফরীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়; বরং এখানে কুফরীর অর্থ হলো এই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করার ফলে ঐ ব্যক্তি কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। অধিকন্তু এখানে হাদীসের এ ব্যাখ্যাও করা যায় যে, মূল ঈমান কালিমায়ে শাহাদাতের উপর নির্ভরশীল এবং আঁ হযরত (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের ঈমানের প্রতি দাওয়াত ও হিদায়াত এ কালিমার উপর নির্ভর করে থাকে। তাই হুযূর (সা) বলেছেন ঃ

---

১. প্রকৃতপক্ষে এটি মুতাযিলাদের অভিমত নয়। বরং তাদের অভিমত হলো, মুমিন ব্যক্তি গুনাহে কবীরার কারণে ঈমানের সীমানা থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু কুফরীর সীমানায় দাখিল হয় না। মূলতঃ তারা منزلة بين المنزلتين -এর পক্ষে রায় দিয়ে থাকে। –শরহে আকাইদে নাসাফী

مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ অথবা مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ -

"যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" অথবা

"যে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রাসূল, আল্লাহ তার জন্য (জাহান্নামের) আগুনকে হারাম করেছেন।"

এরূপ অন্যান্য সহীহ হাদীসের মধ্যে দোযখ হারাম হওয়া অথবা বেহেশতে প্রবেশ করা শুধু কালিমায়ে শাহাদাতের উপর নির্ভরশীল বলা হয়েছে।

সুনানে আবূ দাউদে হযরত আনাস (রা) থেকে একটি মরফূ' হাদীস উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, ঈমানের ভিত্তি হলো তিনটি বস্তুর উপর।

٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ اَبِى الْمَخَارِقِ عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى ابْنِ عُمَرَ (رض) فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَاأَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَرَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَكْسِرُوْنَ اَغْلاَقَنَا وَيَنْقُبُوْنَ بُيُوْتَنَا وَيُغِيْرُوْنَ عَلٰى اَمْتِعَتِنَا اَكَفَرُوْا قَالَ لاَ قَالَ اَرَأَيْتَ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَتَاوَّلُوْنَ عَلَيْنَا وَيَسْفِكُوْنَ دِمَاءَنَا اَكَفَرُوا قَالَ لاَ حَتّٰى يَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلٰى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ يُحَرِّكُهَا وَيَقُوْلُ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ فَرَفَعُوْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

হাদীস নং- ৯

অনুবাদ ঃ হযরত তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! অনুগ্রহ করে বলুন, যারা আমাদের তালা ভাঙ্গে, আমাদের ঘরে সিঁদ কাটে এবং আমাদের মাল ও আসবাব-পত্র লুণ্ঠন করে, তারা কি কাফির হয়ে গিয়েছে ? তিনি বললেন, না। অতঃপর আমি পুনরায় বললাম, যারা বাহানা বা অপপ্রচার করে আমাদের রক্ত প্রবাহিত করে, তারা কি কাফির হবে? তিনি বললেন, না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাফির বলে গণ্য হবে না। হযরত তাউস (র) বলেন, আমি হযরত ইবনে উমর (রা) -কে তাঁর অঙ্গুরী নাড়তে দেখলাম এবং তাঁকে বলতে শুনলাম, এটাই হুযূর (সা)-এর সুন্নত। বর্ণনাকারীদের একটি দল হুযূর (সা) থেকে এ হাদীসটি মরফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসকে পূর্ববর্তী হাদীসের ব্যাখ্যা হিসেবে ধরে নেয়া যায়। পূর্ববর্তী হাদীসে বলা হয়েছে, কবীরা গুনাহ্ দ্বারা একজন মুমিন কাফিরে পরিণত হয় না। এ হাদীসে কবীরা গুনাহ্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন চুরি করা, সিঁদ কাটা, লুণ্ঠন করা এবং রক্তপাত ইত্যাদি গুনাহ্র কারণেও একজন মুমিন কাফিরে পরিণত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করে।

উপরোক্ত বিষয়ে সিহাহ্ সিত্তার অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, গুনাহ্ কবীরার কারণে একজন মুমিন কাফিরে পরিণত হয়ে যায় না এবং সে চিরকালের জন্য দোযখেও থাকবে না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আঁ হযরত (সা) বলেছেন, বান্দার উপর আল্লাহ্র হক হলো এই যে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে আযাব থেকে মুক্তি দিবেন যে তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করেনি এবং আল্লাহ্র উপর বান্দার হক হলো এই যে, তিনি এমন ব্যক্তিকে আযাব থেকে মুক্তি দিবেন যে তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার না করে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত মু'আয (রা) থেকে আরও একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এটা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল এবং অন্তরে এটা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহলে আল্লাহ্ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। মুসলিম শরীফে হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আঁ হযরত (সা) বলেছেন, এ বিশ্বাসের উপর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এরূপ অনেক সহীহ্ হাদীস রয়েছে সেগুলোর মূল বক্তব্য হলো এই যে, শুধু তাওহীদ ও রিসালতের উপর বিশ্বাসে চিরস্থায়ী দোযখ থেকে মুক্তি এবং বেহেশ্ত ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং এ আলোচনার পর গুনাহ্ কবীরার কারণে একজন মুমিনকে কিভাবে কাফির বলে আখ্যায়িত করা যায় ?

এবার ঐ সমস্ত হাদীস নিয়ে আলোচনা করা হবে যেগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গুনাহে কবীরা দ্বারা মুমিনের ঈমান দূরীভূত হয়ে কাফিরে পরিণত হয়ে যায়। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

لَا يَزْنِى الزَّانِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ . . . الخ সুতরাং উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা হলো এই যে, এ হাদীসে বাহ্যিক অর্থ বুঝান উদ্দেশ্য নয়, বরং এগুলো কঠোর শাস্তি ও হুঁশিয়ারীর জন্য বলা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল এই যে, এ কঠিন শাস্তির কথা শুনে যাতে একজন মুমিনের অন্তর কেঁপে উঠে এবং কখনো এ গুনাহের দিকে অগ্রসর না হয়। কেননা মানুষ যতই অন্যায় আচরণ ও বদ আমল করুক না কেন, সে কখনো ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া বা ধর্ম ত্যাগ করা পসন্দ করে না। অবশ্য ধর্মের আড়ালে সে সবকিছুই করে থাকে। এ কারণেই একজন বদ আমলকারী মুসলমান স্বীয় ধর্মের হিফাযতের জন্য এরূপ আত্মত্যাগ করে থাকে যা প্রত্যক্ষ করে হতবাক হতে হয়।

অথবা, হাদীসে এখানে ঈমানের দ্বারা মূল ঈমান বুঝান উদ্দেশ্য নয়; বরং কামিল ঈমান বা

পূর্ণাঙ্গ ঈমান বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ এ সমস্ত গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে কামিল মুমিন থাকে না। কেননা এতে সে সাজা ও নিন্দার উপযুক্ত হয়ে যায়। মূলত ঈমানে কামিল হলো এই যে, মুমিন গুনাহ্ থেকে এমনি পবিত্র থাকবে যাতে সে নিন্দা বা শাস্তির উপযুক্ত না হয়।

بَابُ عَدَمُ خُلُوْدِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى النَّارِ

মুমিন অনন্তকালের জন্য জাহান্নামী হবে না

١٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبِيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ (رض) صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا اَنَا رَدِيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ - قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّى سَاعَةً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ - قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّى سَاعَةً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ مَنْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ - قَالَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِى الدَّرْدَاءِ - قَالَ فَكَانِّى اُنْظُرُ اِلٰى اِصْبَعِ اَبِى الدَّرْدَاءِ السَّبَّابَةَ يُوْمِى اِلٰى اُرْنُبَتِهِ *

হাদীস নং- ১০

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন হাবীবাহ্ (র) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী হযরত আবুদ দারদা (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি একবার হুযূর (সা)-এর সাথে একই সাওয়ারীর উপর উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আবুদ দারদা (রা) ! যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল, তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, আমি বললাম, যদি সে ব্যভিচার করে, যদি সে চুরি করে ? হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, এরপর হুযূর (সা) কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ চলার পর পুনরায় বললেন ঃ যে ব্যক্তি এ

সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল, তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, আমি বললাম, যদি সে ব্যভিচার করে, যদি সে চুরি করে ? হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, এরপর হুযূর (সা) কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ চলার পর পুনরায় বললেন ঃ যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল, তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, আমি বললাম, যদি সে ব্যভিচার করে, যদি সে চুরি করে ? হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, এবার আঁ হযরত (সা) বলেন ঃ যদিও সে ব্যভিচার করে, চুরি করে। আবুদ দারদার নাক মাটি মিশ্রিত হোক। আবুদ দারদা (রা)-এর ছাত্র হযরত আবদুল্লাহ বলেন, আমার ঐ দৃশ্যটা এমনি মনে পড়ে যেন, আমি এখনো দেখছি যে, হযরত আবুদ দারদা (রা) তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা স্বীয় নাকের বাঁশীর দিকে ইঙ্গিত করছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের দ্বারা খারিজী ও মু'তাযিলা দলের বাতিল ধারণা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ভিত্তিহীন ও বাতিল বলে প্রমাণিত হয়। তিবরানী এ হাদীস হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন। আহমদ ও ইবনে হাব্বান তাঁর থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। আহমদ, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আবূ যর (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ হযরত আবূ যর (রা) থেকে এবং তিনি হুযূর (সা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মোটকথা এ হাদীস অর্থের দিক থেকে মুতাওয়াতির হাদীসের অন্তর্ভুক্ত এবং বিভিন্নভাবে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

নবী করীম (সা)-এর এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ হলো এই যে, শুধু তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য দানকারী যদি গুনাহ্ থেকে পবিত্র থাকে, তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। যদি সে গুনাহ্গার হয়, তবে শাস্তি ভোগের পর অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বস্তুত তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য দানকারী কবীরা গুনাহ করলেও চিরকালের জন্য জাহান্নামবাসী হবে না। অতঃপর গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য দানকারী সবার জন্য এ হাদীসে হুযূর (সা) প্রথমবারে জান্নাতে প্রবেশের বিষয়টি ওয়াজিব বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কেননা এখানে তাওহীদ ও রিসালতের দ্বারা এমন শাহাদাত ও ইকরারের কথা বলা হয়েছে, যা অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌছে সমস্ত দেহ ও দৈহিক আমলের উপর এর প্রভাব পড়ে এবং অন্তরে আল্লাহ্ভীতি এমনিভাবে স্থায়ী হয়ে যায় যে, নাফরমানী ও পাপ করার সাহস অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং কালেমায়ে শাহাদতের প্রভাবে যখন কোন গুনাহ্ প্রকাশ না হবে তখন প্রথমবারে জান্নাতে প্রবেশ তার জন্য ওয়াজিব হবে, শাস্তি ভোগ করার আশংকা বাকী থাকবে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নামায সম্পর্কে আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ঐ নামায যা অন্তরে বিপ্লব সৃষ্টি করে, ঐ নামায যা মনের চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করে দেয়, ঐ নামায যা মুখমন্ডলকে শুধু কিবলার দিকে না ফিরিয়ে অন্তরকে আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে দেয়, ঐ নামায যা قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ (নামায আমার চোখের প্রশান্তি)-এর বাস্তবায়ন করে, ঐ নামায যা اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ (এভাবে আল্লাহ্র ইবাদত কর যেন তুমি

আল্লাহ্‌কে দেখতে পাচ্ছ)-এর ধারণা অন্তরে ফুটে উঠে। এমনি ধরনের নামাযই মানুষকে অন্যায়, অশ্লীল ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে। তাই বলা হয়ে থাকে, আমল ঈমানকে সঠিক পথে ও শক্তিশালী রাখার ব্যাপারে খুবই দায়িত্ব বহন করে।

١١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى الْمُسْلِمِ الْخَوْلَانِى قَالَ لَمَا نَزَلَ مُعَاذٌ (رضـ) حِمْصَ اَتَاهُ رَجُلٌ شَابٌ فَقَالَ مَا تَرَى فِىْ رَجُلٍ وَصَلَ الرَّحِمَ وَبَرَّ وَصَادَقَ الْحَدِيْثَ وَاَدَّى الْاَمَانَةَ وَعَفَّ بَطْنَه وَفَرْجَه وَعَمِلَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ غَيْرَ اَنَّهُ شَكَّ فِى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ قَالَ اِنَّهَا تُحْبِطُ مَاكَانَ مَعَهَا مِنَ الْاَعْمَالِ ـ قَالَ فَمَا تَرَى فِىْ رَجُلٍ رَكِبَ الْمَعَاصِى وَسَفَكَ الدِّمَاءَ وَاسْتَحَلَّ الْفُرُوْجَ وَالْاَمْوَالَ غَيْرَ اَنَّهُ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهٗ مُخْلِصًا قَالَ مُعَاذٌ اَرْجُوْ وَاَخَافُ عَلَيْهِ قَالَ الْفَتٰى وَاللّٰهُ اِنْ كَانَتْ هِىَ الَّتِى اَحْبَطَتْ مَامَعَهَا مِنْ عَمَلٍ مَاتَضُرُّ هٰذِهِ مَاعَمِلَ مَا اَزْعَمُ اَنَّ رَجُلًا اَفْقَهَ بِالسُّنَّةِ مِنْ هٰذَا *

হাদীস নং- ১১

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ মুসলিম খাওলানী বলেন, যখন হযরত মু'আয (রা) হিম্‌স নগরে আগমণ করেন তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট হাযির হয়ে আরয করল, এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা যিনি আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায় করেন, মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল, সত্যবাদী, আমানতদার, পেট ও লজ্জাস্থানের হিফাজতকারী এবং যতটুকু সম্ভব নেককাজ করেন, কিন্তু আল্লাহ্ ও রাসূল সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। হযরত মু'আয (রা) বলেন, তাওহীদ ও রিসালত সম্পর্কে সন্দেহ তার সমস্ত নেক আমল জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিবে।

অতঃপর ঐ লোকটি হযরত মু'আয (রা)-কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, ঐরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা যে বিভিন্ন প্রকার গুনাহ্‌র কাজ কাজ করে, অন্যায়ভাবে রক্তপাত করে, ব্যভিচার করে, লুণ্ঠিত মালকে হালাল মনে করে, কিন্তু তাওহীদ ও রিসালতকে ইখলাসের সাথে বিশ্বাস করে। হযরত মু'আয (রা) এর উত্তরে বলেন, আমি এর মুক্তির জন্য আশাবাদী এবং তার শাস্তির ব্যাপারেও ভয় করছি। তখন ঐ যুবক লোকটি বলল, যদি তার সন্দেহ তার নেক আমলসমূহকে ধ্বংস করে দেয়, তাহলে তার বদ বা খারাপ আমল তার খাঁটি অন্তরের শাহাদত বা সাক্ষ্য প্রদানকে বিনষ্ট করতে পারবে না। এ কথা বলে যুবকটি চলে গেল। হযরত মু'আয (রা) বলেন, আমার ধারণামতে এ লোকটির চেয়ে সুন্নত সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী অন্য কেউ নেই।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের মাধ্যমে পূর্ববর্তী বিষয়সহ দু'টি মাসয়ালার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমত তাওহীদ ও রিসালতকে গ্রহণ না করে নেক আমলের মাধ্যমে নেকী ও সওয়াবের অধিকারী হবে কিনা ?

দ্বিতীয়ত হল এই যে, তাওহীদ ও রিসালতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের পর খারাপ আমল ঈমানী আকীদার উপর কোন প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কিনা ? এ হাদীসে দু'টি বিষয়ের উপর আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমত ঈমান ব্যতীত কাফিরদের নেক আমলসমূহ ভিত্তিহীন ও নিষ্ফল হবে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ حَبِطَ اَعْمَالُهُمْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ (তাদের আমল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও নেই।) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (তাদের আমল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে, অতঃপর কিয়ামতের দিন তাদের আমল পরিমাপ করা হবে না)। এ হাদীসে উপরোক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়, দান-সদকা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী ইত্যাদির মত নেক আমল ঈমান না থাকার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ঈমান হল মূল, আমল হল শাখা। সুতরাং মূল ব্যতীত শাখার কোন মূল্য নেই। দ্বিতীয়ত মন্দ বা খারাপ আমল ঈমানকে বিনষ্ট বা নিষ্ফল করতে পারে না। কেননা কালিমায়ে শাহাদতের প্রাথমিক ক্রিয়া হল এই যে, একজন মুমিন এর দ্বারা চিরকাল জাহান্নামবাসী হওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে। কোন গুনাহ্ এর ক্রিয়াকে বিনষ্ট করতে পারে না। এটাই হকপন্থীদের আকীদা ও বিশ্বাস। এরদ্বারা মুরজিয়াদের মতামত প্রমাণিত হয় না। কেউ কেউ হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে মুরজিয়াদের সাথে সম্পৃক্ত করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে চায় এবং হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর গুনিয়াতুত তালিবীন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। উক্ত কিতাবে এরূপ কোন উদ্ধৃতি নেই এবং ইমাম আযম (র)-ও এরূপ মন্দ আকীদা ও বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

١٢ - حَمَّادٌ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى مَالِكِ الْاَشْجَعِى عَنْ رِبْعِى بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ يُدْرَسُ الْاِسْلاَمُ كَمَا يُدْرَسُ وَشِىُ الثَّوْبِ وَلاَ يَبْقَى اِلاَّ شَيْخٌ كَبِيْرٌ اَوْ عَجُوْزٌ فَانِيَةٌ يَقُوْلُوْنَ قَدْ كَانَ قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَهُمْ لاَ يَقُوْلُوْنَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ فَقَالَ صِلَةُ بْنُ زَيْدٍ فَمَا يُغْنِى عَنْهُمْ يَاعَبْدَ اللّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ وَهُمْ لاَيَصُوْمُوْنَ وَلاَ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَحُجُّوْنَ وَلاَ يَتَصَدَّقُوْنَ قَالَ يَنْجُوْنَ بِهَا مِنَ النَّارِ *

হাদীস নং- ১২

অনুবাদ ঃ হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইসলাম এভাবে মিটে যাবে

যেভাবে কাপড়ের নকশা মিটে যায়। একজন অতিশয় বৃদ্ধ বাকী থাকবেন। তিনি বলবেন, অতীতকালে এক জাতি ছিল যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলত, কিন্তু সে নিজে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে না। উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে সিলাহ্ ইবনে যায়দ বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বললে তার কি লাভ হবে? তারা নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, হজ্জ আদায় করে না, যাকাত প্রদান করে না। হযরত হুযায়ফা (রা) বললেন, সে তার ঈমানের দ্বারা দোযখের আগুন থেকে মুক্তিলাভ করবে।

ব্যাখ্যা ঃ আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযী হযরত আনাস (রা)-এর মাধ্যমে আঁ হযরত (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামত ঐ সময় সংঘটিত হবে যখন একটি লোকও আল্লাহ্ উচ্চারণকারী থাকবে না। এছাড়া আহমদ ও মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় আছে, সবচেয়ে অভদ্র ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের যুগে কিয়ামত সংঘটিত হবে। হাকিম আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামত ঐ সময় সংঘটিত হবে যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফে হজ্জ আদায় করার মত কোন লোক বাকী থাকবে না।

পূর্ববর্তী হাদীসেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাওহীদ ও রিসালতের প্রতি ঈমানের কারণে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামবাসী হওয়া থেকে মুক্তিলাভ করা যাবে; কিন্তু বদ আমলের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। অথবা হুযূর (সা)-এর শাফাআতের কারণে আল্লাহ মার্জনা করে দিবেন।

١٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالْمِسْعَرُ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ كُنْتُ اَرى رَأَىَ الْخَوَارِجِ فَسَأَلْتُ بَعضَ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَنِى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ اَقُوْلُ فَاَنْقَذَنِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ *

হাদীস নং- ১৩

অনুবাদ ঃ ইয়াযীদ (র) বর্ণনা করেন যে, প্রথমে আমি খারিজীদের মতামত পোষণ করতাম (অর্থাৎ কবীরা গুনাহকারী কাফির হয় যাবে এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামে অবস্থান করবে)। তাই আমি এ বিষয়ে আঁ হযরত (সা)-এর কতিপয় সাহাবা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তাঁরা বললেন, আমি যে মতামত পোষণ করছি, হুযূর (সা)-এর ফরমান এর বিপরীত। অতঃপর আল্লাহ্ আমাকে এ মন্দ আকীদা ও বিশ্বাস থেকে রক্ষা করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, খারিজীদের আকীদা বাতিল ও ভিত্তিহীন।

١٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَلْقَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ فَسَأَلَه عَلْقَمَةُ فَقَالَ لَه يَاَابَا مُحَمَّدٍ اِنَّ بِبِلَادِنَا قَوْمًا لَايُثْبِتُوْنَ لِاَنْفُسِهِمُ الاِيْمَانَ وَيَكْرَهُوْنَ اَنْ يَّقُوْلُوا اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ بَلْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَقَالَ وَمَا لَهُمْ لَايَقُوْلُوْنَ ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّا اِذَا اَثْبَتْنَا لِاَنْفُسِنَا الْاِيْمَانَ جَعَلْنَا لِاَنْفُسِنَا الْجَنَّةَ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ هٰذَا مِنْ خِدَعِ الشَّيْطَانِ وَحَبَائِلِهِ وَحِيَلِهِ الْجَأَهُمْ اِلٰى اَنْ دَفَعُوْا اَعْظَمَ مِنَّةَ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ وَهُوَ الْاِسْلَامُ وَخَالَفُوْا سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ يُثْبِتُوْنَ الْاِيْمَانَ لِاَنْفُسِهِمْ وَيَذْكُرُوْنَ ذٰلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ وَلَا يَقُوْلُوْنَ اِنَّا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَوْ عَذَّبَ اَهْلَ سَمٰوَاتِهِ وَاَهْلَ اَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ اَهْلٌ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ فَقَالَ لَه عَلْقَمَةُ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَوْ عَذَّبَ الْمَلٰئِكَةَ الَّذِيْنَ لَمْ يَعْصُوْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَّهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ هٰذَا عِنْدَنَا عَظِيْمٌ فَكَيْفَ نَعْرِفُ هٰذَا فَقَالَ لَه يَا ابْنَ اَخِيْ مِنْ هٰهُنَا ضَلَّ اَهْلُ الْقَدَرِ فَاِيَّاكَ اَنْ تَقُوْلَ بِقَوْلِهِمْ فَاِنَّهُمْ اَعْدَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰى الرَّادُوْنَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَلَيْسَ بِقَوْلِ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰكُمْ اَجْمَعِيْنَ - فَقَالَ لَه عَلْقَمَةُ اِشْرَحْ يَااَبَا مُحَمَّدٍ شَرْحًا يُذْهِبُ عَنْ قُلُوْبِنَا هٰذِهِ الشُّبْهَةَ فَقَالَ اَلَيْسَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى دَلَّ الْمَلٰئِكَةَ عَلٰى تِلْكَ الطَّاعَةِ وَاَلْهَمَهُمْ اِيَّاهَا وَعَزَّمَهُمْ عَلَيْهَا وَجَبَرَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ وَهٰذِهِ نِعَمُ اَنْعَمَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهَا عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَوْ طَالَبَهُمْ بِشُكْرِ هٰذِهِ النِّعَمِ مَا قَدَرُوْا عَلٰى ذٰلِكَ وَقَصَرُوا وَكَانَ لَهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِتَقْصِيْرِ الشُّكْرِ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ *

হাদীস নং- ১৪

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হানীফা (র) বলেন, আমরা হযরত আলকামা (র) ও হযরত ইবনে আবী রাবাহ্ (র)-সহ একত্রে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন হযরত আলকামা (র) হযরত আতা (র)-কে

জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ মুহাম্মদ ! আমাদের শহরে (কূফা ও ইরাক) এরূপ লোক বাস করে যারা তাদের ঈমানের ব্যাপারে দৃঢ়তা পোষণ করে না এবং "নিশ্চয়ই আমরা মুমিন" দৃঢ়তার সাথে এটা বলাও পসন্দ করে না। বরং তারা এটা বলে যে, 'ইনশা আল্লাহ্ আমরা মুমিন।' হযরত আতা (র) বলেন, তাদের কি হল যে, তারা এরূপ বলে না যে, নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান ? হযরত আলকামা (রা) উত্তরে বলেন, আমরা যখন নিজেদেরকে ঈমানদার বলে বিশ্বাস করি, তাহলে আমরা যেন নিজেদেরকে জান্নাতী বলে দাবি করছি। কেননা আল্লাহ প্রত্যেক বিশ্বাসী ও মুমিন নর-নারীর জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন (ওয়াদা ভঙ্গ করা আল্লাহ্র জন্য নিন্দনীয়)। কারণ তিনি সকল প্রকার নিন্দা ও দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত। হযরত আতা (র) বলেন, এটা তো শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা। শয়তান তাদেরকে আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ ইহ্সান অর্থাৎ ইসলামের ইহ্সানকে না মানা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নত মান্য না করার জন্য বাধ্য করেছে। আমি হুযূর (সা)-এর সাহাবাদেরকে দেখছি তাঁরা নিজেদের মধ্যে ঈমানের দাবি প্রমাণ করেছেন এবং আঁ হযরত (সা)-এর নিকট তা বর্ণনা করতেন। হযরত আতা (র) বলেন, তাঁরা বলতেন, আমরা মুমিন, কিন্তু এটা বলতেন না যে, আমরা জান্নাতী। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যদি আকাশ ও যমীনে বসবাসকারী সবাইকে শাস্তি প্রদান করেন, তাহলেও তাঁকে যালিম বা অত্যাচারী বলা যাবে না। তখন হযরত আলকামা (র) হযরত আতা (র)-কে বললেন, হে আবূ মুহাম্মদ ! যদি আল্লাহ্ ঐ ফিরিশতাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন যারা এক মুহূর্তের জন্য নাফরমানী করে না, তাহলে কি আল্লাহ্কে যালিম বলা যাবে না ? হযরত আতা (র) বলেন, তখন আলকামা (র) বলেন, এটাতো আমাদের জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাপার। আমরা এটা কিভাবে উপলব্ধি করব! তখন হযরত আতা (র) বলেন, মু'তাযিলীগণ ভ্রান্তপথে রয়েছে। সুতরাং তাদের মত ধারণা ও উক্তি থেকে মুক্ত ও বিরত থাক। কেননা তারা হল আল্লাহ্র শত্রু এবং আল্লাহ্র বাণীকে তারা মিথ্যা প্রমাণিত করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ কি তাঁর নবীকে বলেননি যে, "হে নবী ! আপনি বলুন,আল্লাহ্র নিকট সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তাহলে সবাইকে হিদায়তের পথ প্রদর্শন করতেন।" তখন হযরত আলকামা (র) বলেন, হে আবূ মুহাম্মদ ! এ বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন যাতে আমাদের অন্তর থেকে এ ধরনের সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায় এবং তা পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। এরপর হযরত আতা (র) বলেন, আল্লাহ্ কি ফিরিশতাদেরকে তাঁর আনুগত্যের প্রতি পথ প্রদর্শন করেননি এবং তাদের অন্তরে স্বীয় মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থায়ী করে দেননি? হযরত আলকামা (র) বলেন, নিশ্চয়ই। হযরত আতা (র) বলেন, এটা আল্লাহ্র ঐ নিয়ামত যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন। হযরত আলকামা (র) বলেন, জি হ্যাঁ, এটা সত্য। হযরত আতা (র) বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে এ সমস্ত নিয়ামতের শুকরিয়া কামনা করতেন, তাহলে তারা এর শুকরিয়া আদায় করতে সক্ষম হতো না; বরং এটা তাদের জন্য অসম্ভব হতো। ফলে শুকরিয়া আদায়ের অক্ষমতার কারণে যদি আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতেন, তাহলে এরজন্য আল্লাহ্কে যালিম বলে বিবেচনা করা কখনো সঠিক হতো না।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হলো এই যে, اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْشَاءَ اللّٰهُ বলা সঠিক কিনা, দ্বিতীয়ত হলো 'কদর' বা

তাকদীরের মাসয়ালা। প্রথম বিষয়ে সঠিক মাযহাব হলো এই যে, এরূপ বলার কোন প্রয়োজন নেই এবং এরূপ বলা জায়েয নয়। প্রথম দলীল হলো এই যে, নবী করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে কোন প্রমাণ নেই এবং তাঁরা স্বীয় ঈমানের সাথে কখনো ইন্‌শা আল্লাহ্ শব্দ যুক্ত করেননি। অতঃপর পবিত্র কুরআনে যেখানে মুমিনদের প্রশংসা করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে ঃ أُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا অথবা কাফিরদের তিরস্কার বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ أُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا মূলত এ সময় যিনি মু'মিন, আল্লাহ্ তাঁকে মুমিন বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং যে কাফির, তাকে কাফির বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেহেতু বর্তমানে তিনি মুমিন বলে আখ্যায়িত, তাই তাঁর উপর ঈমানের হুকুমসমূহ আবর্তিত হবে এবং সাথে সাথে এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হবে। সুতরাং যখন হুকুমসমূহ বাস্তবায়িত হবে এবং এর প্রভাব ও ফলাফল প্রকাশ পাবে, তখন ঈমানের প্রকৃত অস্তিত্ব কেন নিশ্চিতভাবে মান্য করা হবে না ?

দ্বিতীয় যুক্তি হলো এই যে, ঈমানের মধ্যে সন্দেহের কারণে যদি 'ইন্‌শা আল্লাহ্' শব্দ বলা হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট কুফরী হবে। যদি আদব ও শেষ পরিণতির দিকে লক্ষ্য করে অথবা বিনয়ের কারণে অথবা আত্মপ্রশংসা থেকে মুক্ত থাকার জন্য এ বাক্য উচ্চারণ করে, তবুও এটা সঠিক হবে না। কেননা এ শব্দ মূলত সন্দেহ প্রকাশ করে থাকে এবং খাঁটি মু'মিনের জন্য স্বীয় ঈমানের মধ্যে সন্দেহ পোষণ করা জায়েয নয়।

যে দল 'ইনশা আল্লাহ্' বলা জায়েয মনে করেন, তাঁরা এ দলীল পেশ করে থাকেন যা হযরত আলকামা (র)-এর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো এই যে, ঈমানের উপর দৃঢ়তা প্রকাশ করা নিজকে জান্নাতী বলে নির্ধারণ করারই নামান্তর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। যেহেতু আল্লাহ্র জন্য ওয়াদা ভঙ্গের অভিযোগ আরোপ করা কুফরী, তাই নিজকে মুমিন বলা 'নিজকে জান্নাতী বলারই সমার্থক'। অথচ পৃথিবীতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং আশারায়ে মুবাশ্‌শারা ব্যতীত শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজকে জান্নাতী বলার অধিকার কারো নেই।

উপরোক্ত বিষয়ে কখনো এ দলীলও পেশ করা হয়ে থাকে যে, এখনও ঈমানের উপর এজন্য স্থায়ী নয়; কেননা এটা তার জানা নেই যে, সর্বশেষ পরিণতি কি হবে। অথচ সর্বশেষ পরিণতির উপরই সবকিছু নির্ভর করে। এর সুস্পষ্ট জওয়াব হলো এই যে, যদি এই সময় দৃঢ় ঈমান না থাকে, তা হলে ঈমানের আহ্কাম কিভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হলো ? প্রথম দলীলের জওয়াব হাদীসে হযরত আতা (র) নিজেই বর্ণনা করেছেন ঃ هُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ "তারা এটা বলে যে, আমরা হলাম মু'মিন" কিন্তু এটা বলেনি যে, اِنَّا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ "আমরা হলাম জান্নাতী।" প্রকাশ থাকে যে, এটা ঐ সময় বলতে পারে যখন সর্বশেষ পরিণতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও জ্ঞান থাকে। কিন্তু সর্বশেষ পরিণতি ভাল হলেও জান্নাত লাভ করা আমলের উপর নির্ভর করে না; বরং এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্র রহমতের উপর নির্ভর করে। তাই হযরত আতা (র) বলেছেন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা কোন নিষ্পাপ বান্দাকে অথবা ফিরিশতাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন, তবুও এটা তাঁর জন্য যুলুম হবে না। কেননা প্রত্যেক বান্দার উপর আল্লাহ্র এত অসংখ্য করুণা ও দয়া রয়েছে, যেগুলোর শুকরিয়া আদায় করা কখনো সম্ভব নয়। ফিরিশতাগণ যদিও নিষ্পাপ ও পবিত্র

এবং তাঁদের পবিত্রতা দেখে তাঁদেরকে শাস্তি প্রদান করা যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে যুলুম মনে হয় ; কিন্তু এরপরও আল্লাহ্‌র অসংখ্য নিয়ামত, করুণা ও দয়া তাঁদের উপর বিদ্যমান। এ পবিত্রতা তাঁরই করুণায়, তিনিই আনুগত্যের তাওফীক ও ক্ষমতা দিয়েছেন। যদি এখন আল্লাহ্ এ সমস্ত নিয়ামতের শুকরিয়া কামনা করেন, তা হলে ফিরিশতাগণ কিভাবে বা কতটুকু শুকরিয়া আদায়ের ক্ষমতা রাখেন ? সুতরাং এ অপরাধে তিনি তাঁদেরকে পাকড়াও করতে পারেন। যেহেতু তিনি সৃষ্টিকর্তা ও মালিক, তাই তিনি এ ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

بَابُ وُجُوْبِ الْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ

তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব

١٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ سُرَاقَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَدِّثْنَا عَنْ دِيْنِنَا كَاَنَّا وُلِدْنَا لَه اَنَعْمَلُ بِشَئٍ قَدْ جَرَتْ بِه الْمَقَادِيْرُ وَجَفَّتْ بِه الْاَقْلَامُ اَمْ فِى شَئٍ نَسْتَقْبِلُ فِيْهِ الْعَمَلَ - قَالَ بَلْ فِى شَئٍ قَدْ جَرَتْ بِه الْمَقَادِيْرُ وَجَفَّتْ بِه الْاَقْلَامُ قَالَ فَفِيْمَ الْعَمَلُ قَالَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَه - فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى *

হাদীস নং- ১৫

অনুবাদ ঃ হযরত সুরাকা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমাদেরকে দীনের মূল তত্ত্ব এবং আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন। আমরা কি সে কাজ করছি যা আমাদের তাকদীরে লেখা হয়েছে এবং যা লিখে কলম শুকিয়ে গিয়েছে, নাকি এ বিষয়ের উপর আমল করতে থাকি এবং পরে তা লিপিবদ্ধ হবে ? আঁ হযরত (সা) বলেন ঃ বরং তোমাদের কাজ ও আমল ঐ সমস্ত বিষয়, যা তাকদীরে লেখা হয়েছে এবং কলম লিখে শুকিয়ে গেছে, তারই অন্তর্ভুক্ত। হযরত সুরাকা (রা) বলেন, তাহলে এরপর আমল কিসের জন্য ? হুযূর (সা) বলেন ঃ (না) আমল কর। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঐ কাজ করা সহজ হবে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন)" অতঃপর যে দান করে, তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করে, তাহলে তার জন্য আমি সুগম করে দিব সহজ পথ। যে কৃপণতা করে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে, আর যা উত্তম তা অস্বীকার করে, তাহলে তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পথ।"

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস প্রায়ই একই বাক্যের মাধ্যমে আহমদ, মুসলিম, ইবনে হাব্বান, তিবরানী এবং ইবনে মারদুবীয়া হযরত সুরাকা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসে হুযূর (সা)-এর মূল বক্তব্য হলো এই যে, পৃথিবীতে আমাদের সমস্ত আমল তাকদীরের লিখনী অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু তাকদীরের অর্থ এ নয় যে, মানুষ অক্ষম হয়ে কোন আমল না করে বাধ্যতামূলকভাবে বসে থাকবে। যদি এরূপ হয়, তবে সবকিছুই বেকার হয়ে যাবে। কিন্তু ঘটনা এরূপ নয়। তাকদীরের যা কিছু লিখন রয়েছে, তা ভবিষ্যতের জন্য শুধু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবেই গণ্য হবে। মানুষের কর্মক্ষমতার উপর এর কোন প্রভাব নেই। মানুষের কর্মক্ষমতা যথারীতি বহাল থাকবে। এ কর্মক্ষমতার কারণেই মানুষ মুক্তি বা শাস্তি পাবে। অবশ্য যে কোন কাজ আল্লাহ্‌র কুদরতী শক্তির উপরই নির্ভরশীল। অর্থাৎ মানুষ অর্জনকারী এবং আল্লাহ্ সৃষ্টিকারী।

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْعَمَلِ

আমলের ব্যাপারে প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান

١٦ - حَمَّادُ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ سَعْدٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَفْسٍ اِلاَّ وَقَدْ كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَدْخَلَهَا وَمَخْرَجَهَا وَمَا هِىَ لاَقِيَةٌ قِيْلَ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ بِمَا خُلِقَ لَهُ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ قَالَ الْاَنْصَارِىُّ اَلْاٰنَ حَقَّ الْعَمَلُ *

হাদীস নং- ১৬

অনুবাদ ঃ হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, এমন কোন মানুষ নেই যার শুরু ও শেষ পরিণতি এবং ইহকাল ও পরকালে সে যা কিছুর সম্মুখীন হবে, তা আল্লাহ্ তা'আলা লিপিবদ্ধ করে দেননি। একজন আনসারী আরয করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে আমল কিসের জন্য প্রয়োজন ? আঁ হযরত (সা) বললেন, আমল কর। কেননা যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ করা সহজ করে দেয়া হয়। সুতরাং যিনি জান্নাতবাসী হবেন, তার জন্য জান্নাতবাসীদের আমল সহজ হবে এবং যে জাহান্নামী হবে, তার জন্য জাহান্নামীদের আমল সহজ হবে। তখন আনসারী বললেন, হ্যাঁ, এখন আমল করার কারণ অবগত হলাম।

ব্যাখ্যা ঃ তাকদীরের এ মাসয়ালার মাধ্যমে খুবই সূক্ষ্মভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি খুবই দুর্বল যা উক্ত হাদীসকে কেন্দ্র করে আমল পরিত্যাগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকে। আমল ত্যাগ করার মূল সূত্র হলো এই যে, সওয়াবের আশায় আমল করা হয়। যদি সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই পাওয়া যাবে। যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তাকদীর যেহেতু ভুল হতে পারে না, তাই কোন শক্তিই সওয়াব হাসিলের কারণ হতে পারে না। এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, বাহ্যত বিষয়টি এরূপই। কিন্তু আমল ত্যাগ করার কোন অর্থ নেই। তাই আমল অব্যাহত রাখার জন্যই আমল করার ক্ষমতাকে ইচ্ছাশক্তির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখন যা করা হবে, তা তাকদীর অনুযায়ী করা হবে। জান্নাতীদের নেককাজ করা সহজ হবে এবং স্বীয় নেক আমলের দ্বারা সহজেই জান্নাতের অধিকারী হতে পারবে। জাহান্নামীদের জন্য বদ ও খারাপ আমল করা সহজ হবে এবং স্বীয় আমলের কারণেই জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হবে। তাকদীরের কারণে আমল কেন বন্ধ হবে এবং আমলের দ্বারা তাকদীর কেন অশুদ্ধ বা ত্রুটিপূর্ণ বা ভুল হবে ? অন্যান্য আমলের ব্যাপারে তো এরূপ করা হয় না। এখানে একটু চিন্তার বিষয় রয়েছে। তা হলো এই যে, তাকদীরের লিখন অনুযায়ী যতটুকু রিযিক ভাগ্যে আছে, তা অবশ্যই পাওয়া যাবে। যদি তা না পাওয়া যায়, তাহলে শত চেষ্টা করলেও ফল হবে না। কিন্তু এরপরও আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রিযিকের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে থাকি। চেষ্টা ও পরিশ্রম ত্যাগ করে বসে থাকি না। অথবা কোন প্রকার অসুস্থতা বা বিপদে পতিত হলে সবাই এ কথা অবগত আছে যে, মৃত্যুর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে সমস্ত চিকিৎসা ও চেষ্টা নিষ্ফল হবে। আর যদি আয়ু থাকে, তাহলে কোন শক্তিই তাকে মারতে পারবে না। কিন্তু এরপরও মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা ও চেষ্টার ত্রুটি থাকে না। অথচ দীনী আমলের ব্যাপারে স্বীয় মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাধারার সাহায্যে আমল থেকে বিরত ও বিমুখ হয়ে থাকে।

١٧ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَفْسٍ اِلاَّ وَقَدْ كَتَبَ اللّٰهُ مَدْخَلَهَا وَمَخْرَجَهَا وَمَا هِىَ لاَقِيَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَفِيْمَ الْعَمَلُ اِذًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَمَّا اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْا بِعَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْا بِعَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا اَهْلُ - فَقَالَ الْاَنْصَارِى اَلْاٰنَ حَقَّ الْعَمَلُ -

وَفِى رِوَايَةٍ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ يُسَّرُ لِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ اَهْلِهَا - فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ اَلْاٰنَ حَقَّ الْعَمَلُ *

হাদীস নং- ১৭

অনুবাদ ঃ হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক মানুষের প্রারম্ভিক অবস্থা ও পরিণতি এবং যা কিছু সে পাবে, এ সমস্ত কিছু আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তখন একজন আনসারী আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহলে আমলের কি প্রয়োজন ? আঁ হযরত (সা) বললেন ঃ আমল করতে থাক। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঐ কাজ সহজ হবে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাপীদের জন্য পাপকাজ করা এবং নেককারদের জন্য নেককাজ করা সহজ হবে। তখন আনসারী বলেন, এবার আমল করার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হলাম।

অন্য এক রিওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) বলেছেন ঃ আমল করতে থাক। কেননা যে জান্নাতবাসী হবে, তার জন্য জান্নাতের কাজ করা সহজ হবে এবং যে জাহান্নামী হবে, তার জাহান্নামের কাজ করা সহজ হবে। তখন আনসারী বলেন, এবার আমল করার মূল কারণ স্পষ্ট হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী হাদীসের ব্যাখ্যার অনুরূপ। তাই পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা দেখা যেতে পারে।

بَابُ ذَمِّ الْقَدَرِيَّةِ

কাদরিয়া দলের প্রতি তিরস্কার

١٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِئُ قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ لَاقَدَرَ ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ اِلَى الزَّنْدَقَةِ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ وَاِنْ مَرِضُوْا فَلَا تَعُوْدُوْهُمْ وَاِنْ مَاتُوْا فَلَا تُشَيِّعُوْا هُمْ فَاِنَّهُمْ شِيْعَةُ الدَّجَّالِ وَمَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُلْحِقَهُمْ بِهِمْ فِى النَّارِ *

হাদীস নং- ১৮

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ভবিষ্যতে এমন একটি জাতি আগমণ করবে যারা বলবে, তাকদীর বলতে কিছুই নেই। অতঃপর তারা যিন্দীক হয়ে যাবে। যদি তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও, তাহলে তাদেরকে সালাম প্রদান করবে না। যদি তারা অসুস্থ হয়, তবে তাদের শুশ্রূষা করার জন্য যাবে না। যদি তারা মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না। কেননা তারা দাজ্জালের সঙ্গী হবে এবং এ

উম্মতের মজূসী হবে। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে দাজ্জাল ও মজূসীদের সাথে জাহান্নামে একত্র করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে কাদরিয়া দলকে বয়কট এবং তাদের সাথে সকল প্রকার কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের সাথে ঐ সম্পর্ক রাখা যাবে না যা মুসলমানদের সাথে রাখা যায়। তাদেরকে এ উম্মতের মজূসী এজন্য বলা হয়েছে যে, মজূসীরা দু'খোদা মেনে থাকে। এক ঃ ইয়াজদাঁ, যে মঙ্গলের খোদা, দুই ঃ আহ্রামান, যে অমঙ্গলের খোদা। কাদরিয়া দল এদের চেয়ে জঘন্যতম। তারা প্রত্যেক মানুষকে তাদের কর্মসমূহের সৃষ্টিকর্তা বলে মেনে থাকে এবং এটা স্পষ্ট শিরক। সুতরাং এদের হাশর তাদের সাথে হবে। পবিত্র কুরআনের আয়াত কাদরিয়াদের এ ভ্রান্ত ধারণাকে বাতিল বলে ঘোষণা দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ "আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের আমলকেও সৃষ্টি করেছেন।"

١٩ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِئُ قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ لاَقَدْرَ ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ اِلَى الزَّنْدَقَةِ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَلاَ تُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ وَاِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُوْدُوْهُمْ وَاِنْ مَاتُوْا فَلاَ تَشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ فَاِنَّهُمْ شِيْعَةُ الدَّجَّالِ وَمَجُوْسَ هٰذِهِ الاُمَّةِ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اِنْ يُلْحِقَهُمْ بِهِمْ فِى النَّارِ *

হাদীস নং- ১৯

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। হুযূর (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের সামনে এমন এক জাতির আগমণ ঘটবে যারা বলবে, কদর বলতে কিছুই নেই। অতঃপর তারা যিন্দীক হয়ে যাবে। যখন তোমাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে, তাদেরকে সালাম দিবে না। যদি তারা রোগগ্রস্ত হয়, তাহলে তাদের সেবার জন্য যাবে না। তারা মৃত্যুবরণ করলে তাদের জানাযায় উপস্থিত হবে না। কেননা তারা দাজ্জালের সাথী হবে এবং এ উম্মতের মজূস। আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে জাহান্নামে এদের সাথে একত্র করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ কাদরিয়াদেরকে সালাম না দেওয়ার অর্থ হলো এই যে, এরদ্বারা সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করা বুঝা যাবে। যাতে এ ধরনের জঘন্যতম চিন্তাধারা পোষণ করার অন্য কেউ যেন সাহস না পায় এবং বয়কটের কারণে যাতে তারা স্বীয় বদ আকীদা ও বিশ্বাস হতে তওবা করে।

٢٠ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْقَدْرِيَّةَ وَقَالَ مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلِىْ اِلاَّ حَذَّرَ اُمَّتَهُ مِنْهُمْ وَلَعَنَهُمْ *

হাদীস নং- ২০

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আঁ হযরত (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাদরিয়াদের উপর লা'নত বর্ষণ করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন ঃ আমার পূর্বে এমন কোন নবী আবির্ভূত হননি যিনি স্বীয় উম্মতকে এ কাদরিয়া দল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেননি এবং লা'নত প্রেরণ করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ কাদরিয়া দল ইসলামের মধ্যে অত্যধিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। তাই তাদের তিরস্কারে হাদীসের কিতাবে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢١ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ الْقَدْرِيَّةَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ رَسُوْلٍ اِلاَّ لَعَنَهُمْ وَنَهٰى اُمَّتَهُ عَنِ الْكَلاَمِ مَعَهُمْ *

হাদীস নং- ২১

অনুবাদ ঃ হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাদরিয়াদের লা'নত করেছেন এবং অতীতে এমন কোন নবী-রাসূল আগমণ করেননি যাঁরা তাদের উপর লা'নত করেননি এবং স্বীয় উম্মতকে তাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। পূর্ববর্তী হাদীসের সাথে এর ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

٢٢ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقَدْرِيَّةُ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَهُمْ شِيْعَةُ الدَّجَّالِ *

হাদীস নং- ২২

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কাদরিয়া দল (যারা তাকদীরকে মানে না) এ উম্মতের মজূস এবং তারা দাজ্জালের সাথী।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য পূর্ববর্তী হাদীসের ব্যাখ্যাই যথেষ্ট।

بَابُ الشَّفَاعَةِ

শাফাআতের বর্ণনা

٢٣ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

(رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يُخْرِجُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ مَنْ اَهْلِ الْاِيْمَانِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَزِيْدُ فَقُلْتُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا قَالَ جَابِرٌ اِقْرَأْ مَا قَبْلَهَا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اِنَّمَا هِيَ فِى الْكُفَّارِ *

وَفِى رِوَايَةٍ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْاِيْمَانِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَزِيْدُ قُلْتُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا فَقَالَ جَابِرٌ اِقْرَأْ مَاقَبْلَهَا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ذٰلِكَ الْكُفَّارُ *

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يُعَذِّبُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْاِيْمَانِ بِذُنُوْبِهِمْ ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ فَاَيْنَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ اِلٰى اٰخِرِهٖ *

১ হাদীস নং- ২৩

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা গুনাহ্গার মুমিনদেরকে মুহাম্মদ (সা)-এর শাফা'আতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদান করবেন। হযরত জাবির (রা)-এর ছাত্র ইয়াযিদ ইবনে সুহাইব (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا "জাহান্নামীদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে না।" হযরত জাবির (রা) বলেন, একটু পূর্ব থেকেই পাঠ কর– اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا এখানে কাফিরদের সম্পর্কে জাহান্নাম থেকে বের না হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত আছে, মুমিনদের থেকে একদলকে মুহাম্মদ (সা)-এর শাফা'আতে জাহান্নাম হতে বের করা হবে। ইয়াযিদ বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না। হযরত জাবির (রা) বলেন, একটু পূর্ব থেকে অর্থাৎ – اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا থেকে পাঠ কর। এখানে কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে ইয়াযিদ থেকে এভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি হযরত জাবিরের নিকট শাফাআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বলেন, মুমিনদের থেকে একটি দলকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করবেন। অতঃপর হযরত

মুহাম্মদ (সা)-এর শাফা'আতের কারণে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে বা মুক্তি দেওয়া হবে। ইয়াযিদ বলেন, এরপর আমি বললাম, তাহলে আল্লাহ্‌র এ বাণীর অর্থ কি হবে? এই বলে তিনি হাদীসের শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ অধ্যায়ে শাফা'আতের বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদীসে সাথে সাথে তাকদীরের উপর ইমান আনয়নের আবশ্যকতা এবং কাদরিয়া দলের প্রতি নিন্দাবাদ করা হয়েছে। সুস্পষ্ট বাক্যের দ্বারা শাফা'আতের অস্তিত্ব ও হাকীকতকে গ্রহণ করার ব্যাপারে দলীল পেশ করা হয়েছে। এরদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) কাদরিয়া দলের বিরোধী এবং শাফা'আতের জোর সমর্থক ছিলেন। তাঁর এ সমস্ত বর্ণনা প্রত্যক্ষ করার পর যদি কেউ তাঁর প্রতি মু'তাযিলা হওয়ার অপবাদ উত্থাপন করে, তাহলে এটা বেইনসাফী ও যুলুম হবে।

শাফাআতের মাসয়ালা সম্পর্কে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাআত এবং মু'তাযিলার মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। মু'তাযিলা দল বলে, ছোট গুনাহ্ তাওবা অথবা তাওবা ব্যতীত মাফ হয়ে যায়। কবীরা গুনাহ্ তাওবা ব্যতীত মাফ হয় না। শাফা'আত শুধু সওয়াবের স্তর বৃদ্ধির জন্য, গুনাহে কবীরা মাফের জন্য নয়। আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের মতে শাফাআতের দ্বারা কবীরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। মু'তাযিলা দল তাদের ভ্রান্ত ও বাতিল ধারণার স্বপক্ষে এ যুক্তি পেশ করে থাকে যে, এরদ্বারা পাপীকে পাপ কাজে সাহসী এবং অন্যায় কাজে প্রেরণা দেওয়া হয়ে থাকে। অধিকন্তু এরদ্বারা শাস্তি থেকে মুক্তিলাভের একটি সুযোগ মিলে যায়।

এর জওয়াব হলো এই যে, গুনাহে কবীরা মাফ হয়ে যাওয়া শাফা'আতের দ্বারা বা শাফাআত ব্যতীত জায়েয আছে, কিন্তু ওয়াজিব নয়। তবে এর উপর পাপীদের ভরসা করার কোন অবকাশ বা সুযোগ নেই। বা মুতাযিলাগণ দ্বিতীয় দলীল হিসেবে এটা পেশ করে যে, যদি ব্যভিচার বা অন্যায়ের শাস্তি প্রদান করা না হয়, তাহলে এক প্রকার ওয়াদা ভঙ্গ এবং ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনার মধ্যে গণ্য হবে। যেমন ঃ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَبِه বা مَنْ اَسَاءَ বা جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا বা فَعَلَيْهَا অর্থাৎ অন্যায় ও অপকর্মের প্রতিদান শাস্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু শাফা'আতের দ্বারা মাফ করে অন্যায়কারী ও পাপীকে শাস্তি প্রদান করা না হলে এটা উপরোক্ত আয়াতের ভুল বর্ণনা করা হবে এবং এটা হবে সম্পূর্ণ নীতি বিরোধী। এর জওয়াব হলো এই যে, উত্তম কাজে ওয়াদা ভঙ্গ করা নিন্দনীয়, কিন্তু অন্যায়ের জন্য ক্ষমা করা বা শাস্তি থেকে ক্ষমা প্রদান করায় ওয়াদা ভঙ্গ করা হয় না; বরং এটা মূলত একজন হকদারের তার হক বা অধিকার আদায় থেকে বিরত থাকা। যেমন ঃ একজন ঋণদাতা যদি তার প্রদত্ত ঋণ মাফ করে দেয়, তাহলে এতে নিন্দনীয় কিছুই নেই; বরং এটা একটি উত্তম কাজ বলে বিবেচিত হবে।

মুতাযিলাগণ তাদের মতামতের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পেশ করে ঃ

لاَ تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ বা مَالِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلاَ شَفِيْعٍ يُّطَاعُ বা فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ বা مَامِنْ شَفِيْعٍ اِلاَّ مِنْ بَعْدِ اِذْنِه *

এর জওয়াব হলো এই যে, এ সমস্ত আয়াত কাফিরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং কাফিরদের জন্যই এ আয়াতসমূহ নির্ধারিত। এখানে গুনাহ্গার মুমিনদের সম্পর্কে আলোচনা চলছে। শাফা'আত ব্যতীতও মুমিনদের গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়টি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং শাফা'আত দ্বারা কেন মাফ হবে না ? পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ অথবা وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ এখানে গুনাহে সগীরা ও কবীরা উভয়কে সংযুক্ত করেছে। এরপর প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহে যেহেতু শাফা'আতের প্রমাণ রয়েছে, তাই এতে অন্য কোন চিন্তার অবকাশ নেই। পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের সন্দেহ হয়েছে যে, অনুমতি ব্যতীত কারো শাফা'আতের অধিকার নেই। কিন্তু উক্ত আয়াতে এর স্পষ্ট জওয়াব রয়েছে এবং হুযূর (সা)-কে শাফা'আতের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

٢٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْرِجُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَوْمًا مِنَ الْمُوَحِّدِيْنَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا امْتَحَشُوْا وَصَارُوْا فَحْمًا فَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى الْجَنَّةَ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِمَّا تُسَمِّيْهِمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ فَيُذْهِبُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ ذٰلِكَ *

হাদীস নং- ২৪

অনুবাদ ঃ হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ মুমিনদের একটি দলকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন যখন তারা জ্বলে কয়লা হয়ে যাবে এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করবে যাতে তাদের জাহান্নামীর পরিবর্তে জান্নাতী বলে ডাকা হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে এ নাম মিটিয়ে দিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী একটি দল হযরত ইমাম আযম (র)-এর উপর মুরজিয়া হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছে। এ হাদীসের দ্বারা তা দূরীভূত করা হয়েছে। কেননা মুরজিয়াদের মত হলো এই যে, ঈমানের পর মুমিনদেরকে কোন গুনাহ্ই ক্ষতি বা অনিষ্ট করতে পারে না। বিনা-বাধায় তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ হাদীস তাদের এ ভ্রান্ত মতবাদ খন্ডন করে প্রমাণ করেছে যে, গুনাহ্গার মুমিন জাহান্নামে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশ ও মেহেরবানীতে হুযূর (সা) শাফা'আত করবেন এবং অনেক গুনাহ্গার উম্মত এরদ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে। এ হাদীস বর্ণনার পর কেউ ইমাম সাহেবকে মুরজিয়া বলে আখ্যায়িত করার সুযোগ পাবে না।

٢٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِه تَعَالٰى عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا قَالَ الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ الشَّفَاعَةُ يُعَذِّبُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْاِيْمَانِ بِذُنُوْبِهِمْ ثُمَّ يَخْرُجُ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُؤْتٰى بِهِمْ نَهَرًا يُقَالُ لَهُ الْحَيَوَانُ فَيَغْتَسِلُوْنَ فِيْهِ ثُمَّ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيُسَمُّوْنَ فِى الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ ثُمَّ يَطْلُبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فَيُذْهِبُ عَنْهُمْ ذٰلِكَ الْاِسْمَ *

وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ يُخْرِجُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَوْمًا مِنْ اَهْلِ النَّارِ مِنْ اَهْلِ الْاِيْمَانِ وَالْقِبْلَةِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذٰلِكَ هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ فَيُؤْتٰى بِهِمْ نَهَرًا يُقَالُ لَهُ الْحَيَوَانُ فَيُلْقَوْنَ فِيْهِ فَيَنْبُتُوْنَ بِهِ كَمَا يَنْبُتُ الثَّعَارِيْرُ ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ وَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيُسَمُّوْنَ فِيْهَا الْجَهَنَّمِيِّيْنَ ثُمَّ يَطْلُبُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يُّذْهِبَ عَنْهُمْ ذٰلِكَ الْاِسْمَ فَيَذْهَبُ عَنْهُمْ .

وَزَادَ فِى اٰخِرِه وَعُتَقَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰى *

وَرَوٰى اَبُوْ حَنِيْفَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِى رُوْبَةَ شَدَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ *

হাদীস নং- ২৫

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ (রা)আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী ঃ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا (তোমার প্রতিপালক তোমাকে মাকামে মাহমূদে পৌছাবেন) সম্পর্কে আঁ হযরত (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'মাকামে মাহমূদ'- এর অর্থ হলো শাফা'আত। আল্লাহ মুমিনদের একটি দলকে তাদের পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করবেন। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শাফা'আতের কারণে তাদেরকে দোযখ থেকে বের করা হবে। এরপর তাদেরকে হায়াওয়ান নামক নহরে নিয়ে গোসল করানো হবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু জান্নাতে তাদের নাম জাহান্নামী বলে পরিচিত হবে। তাই তারা এই ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে। তখন আল্লাহ্ তাদের এ নাম মিটিয়ে দিবেন।

অন্য এক রিওয়াতে এভাবে বর্ণিত আছে যে, ঈমানদার ও কিবলা বিশ্বাসী জাহান্নামে প্রবেশকারী একটি দলকে আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শাফা'আতে জাহান্নাম থেকে বের করে মুক্তি প্রদান করবেন এবং এটাই হলো মাকামে মাহমূদ। অতঃপর তাদেরকে হায়াওয়ান নামক নহরে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তারা টাটকা শশার মত তাজা ও সতেজ হয়ে উঠবে। অতঃপর সেখান থেকে বের করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। কিন্তু জান্নাতে তাদের নাম জাহান্নামী হিসেবে পরিচিত হয়ে যাবে। ফলে তারা আল্লাহ্‌র নিকট এ নাম মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ফরিয়াদ করবে। তখন আল্লাহ্ তাদের এ নাম মিটিয়ে দিবেন।

এ বর্ণনার শেষে عُتَقَاءُ اللّٰهُ অর্থাৎ "আল্লাহ্ কর্তৃক আযাদকৃত" সংযুক্ত করা হয়েছে (এ নামে ডাকা হবে)।

আবূ হানীফা (রা) এ হাদীস আবী রাওবা শাদ্দাদ ইবন আবদুর রহমান থেকে এবং তিনি হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শাফা'আতের অধ্যায়ে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা মুতাওয়াতিরের স্তর পর্যন্ত পৌছেছে। এ পর্যায়ে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে ইমাম মুসলিম (রা) এক দীর্ঘ হাদীস গ্রহণ করেছেন। বাযযায হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে 'মরফূ' হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। আল্লামা তিবরানী আওসাত নামক গ্রন্থে হযরত মুগীরা (রা) থেকে মরফূ' হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। উক্ত গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) থেকে সামান্য পরিবর্তনসহ একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র) 'কানযে মাদফুন' নামক গ্রন্থে নবী করীম (সা)-এর শাফা'আত আট প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথম হলো শাফা'আতে ওযমা যা আম্বিয়া ও রাসূলগণের মধ্যে একমাত্র আঁ হযরত (সা)-এর (সৌভাগ্য) হবে এবং দ্বিতীয় প্রকার শাফা'আত যা এই উম্মতের হিসাব দ্রুত গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করা হবে। ইবনে আবিদ-দুনিয়া একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন ঃ يَارَبِّ عَجِّلْ حِسَابَهُمْ হুযূর (সা) বলবেন ঃ হে রাব্বুল আলামীন ! তাদের হিসাব দ্রুত গ্রহণ করুন। তখন তাদেরকে ডাকা হবে। তৃতীয় শাফা'আত ঐ সমস্ত লোকের জন্য করা হবে যাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দান করা হয়েছে। অতঃপর এ শাফা'আতের কারণে তারা মুক্তিলাভ করবে। ইবনে আবিদ-দুনিয়া এ সম্পর্কে এক মরফূ' হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হযরত (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের একটি দলকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। তখন তারা বলবে, হে মুহাম্মদ (সা) ! আপনি আমাদের জন্য শাফা'আত করুন। তখন আমি ফিরিশতাদেরকে বলব, তাদেরকে একটু থামাও। অতঃপর আমি আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হওয়ার জন্য দরখাস্ত পেশ করব। তখন আমাকে সিজদাবনত হওয়া এবং শাফা'আতের জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে। এরপর আমাকে বলা হবে, যাও, তোমার উম্মতদেরকে নিয়ে যাও। চতুর্থ শাফা'আত যা আঁ হযরত (সা) তাঁর চাচা হযরত আবূ তালিবের জন্য করবেন। ফলে তাঁর আযাব হ্রাস পাবে। পঞ্চম শাফা'আত আঁ হযরত (সা) এমন কয়েকটি জাতির জন্য করবেন যারা হিসাব ব্যতীত জান্নাত লাভ করবেন। কাযী আয়ায (রা) এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ষষ্ঠ শাফা'আত হুযূর (সা) মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য

করবেন। সপ্তম শাফা'আত আঁ হযরত (সা) জান্নাতবাসীদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য করবেন। ফলে তারা স্বীয় আমলের চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করবে। মু'তাযিলারা এ শাফা'আতকে বিশ্বাস করে থাকে। অষ্টম শাফা'আত যা হুযূর (সা) গুনাহে কবীরাকারী জাহান্নামবাসীদের জন্য করবেন। ফলে এই শাফা'আতের কারণে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং মুক্তি প্রদান করা হবে। ইমাম গাযালী (র) ইহ্ইয়াউল উলূম গ্রন্থে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

٢٦ – حَمَّادٍ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِىِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا قَالَ يُخْرِجُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَوْمًا مِنَ النَّارِ مِنْ اَهْلِ الايْمَانِ وَالْقِبْلَةِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذٰلِكَ هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ فَيُؤْتٰى بِهِمْ نَهَرًا يُقَالُ لَهُ الْحَيَوَانُ فَيُلْقَوْنَ فِيْهِ فَيَنْبُتُوْنَ بِهِ كَمَا يَنْبُتُ الثَّعَارِيْرُ ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيُسَمَّوْنَ فِيْهَا الْجَهَنَّمِيِّيْنَ ثُمَّ يَطْلُبُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يُّذْهِبَ عَنْهُمْ ذٰلِكَ الاِسْمَ فَيُذْهِبُ عَنْهُمْ *

হাদীস নং- ২৬

অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শাফা'আতের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা একদল ঈমানদার ও কিবলায় বিশ্বাসী লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবেন এবং এটাই হলো মাকামে মাহমূদ। এরপর তাদেরকে হায়াওয়ান নামক একটি নহরে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা টাটকা শশার মত তাজা ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। অতঃপর এখান থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু সেখানে তারা জাহান্নামী হিসেবে পরিচিত হবে। তাই তারা এ নাম মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ নামকে মিটিয়ে দিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস ইমাম মুহাম্মদ (র) 'কিতাবুল আসার' নামক স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম এবং মুহাদ্দিস ইবনে মাজাহ একই বিষয়বস্তুর হাদীস স্ব-স্ব হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ত্রুটিপূর্ণ আকীদা যদি মানুষকে কুফরী পর্যন্ত না পৌছায়, তাহলে তারা পরকালে মূল ঈমান ও বিশ্বাসের কারণে অবশেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে। তাদের ফাসিকী যতই বৃদ্ধি হোক না কেন। তাই রাফিজী, খারিজী ও মুতাযিলীদের সম্পর্কে এ ফয়সালা দেওয়া যায় যে, যদি তাদের আকীদা কুফরীর সীমা

পর্যন্ত পৌঁছে না থাকে, তাহলে তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে না। অবশেষে জাহান্নাম থেকে তারাও মুক্তি পাবে।

٢٧ – حَمَّادٌ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْاِيْمَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ النَّارَ بِذُنُوْبِهِمْ فَيَقُوْلُ لَهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ مَا اَغْنٰى عَنْكُمْ اِيْمَانُكُمْ وَنَحْنُ وَاَنْتُمْ فِى دَارٍ وَاحِدَةٍ نُعَذَّبُ فَيَغْضَبُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُمْ فَيَأْمُرُ اَنْ لاَّ يَبْقٰى فِى النَّارِ اَحَدٌ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَيَخْرُجُوْنَ وَقَدْ اِحْتَرَقُوْا حَتّٰى صَارُوْا كَالْحُمَمَةِ السَّوْدَاءِ اِلاَّ وُجُوْهُهُمْ فَاِنَّهُ لاَيَزْرَقُ اَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَسْوَدُّ وُجُوْهُهُمْ فَيُؤْتٰى بِهِمْ نَهْرًا عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُوْنَ فِيْهِ فَيَذْهَبُ كُلُّ فِتْنَةٍ وَاَذًى ثُمَّ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ لَهُمُ الْمَلَكُ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَلِدِيْنَ فَيُسَمُّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ ثُمَّ يَدْعُوْنَ فَيَذْهَبُ عَنْهُمْ ذٰلِكَ الْاِسْمُ فَلاَ يَدْعُوْنَ بِهِ اَبَدًا ـ فَاِذَا خَرَجُوْا قَالَ الْكُفَّارُ يَالَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِيْنَ فَذَالِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَزَّوَجَلَّ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ *

হাদীস নং- ২৭

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মুমিনদের একটি দল তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন মুশরিকগণ তাদেরকে বলবে, তোমাদের ঈমান তোমাদের কোন উপকারে আসেনি, তাই তোমরা ও আমরা একত্রেই শাস্তি ভোগ করছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধে আবেগ ও জোশের সৃষ্টি হবে এবং তিনি নির্দেশ প্রদান করবেন যাতে একজন তাওহীদে বিশ্বাসী লোকও জাহান্নামে না থাকে। অতঃপর তাদেরকে এ অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে, তাদের মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত দেহ জ্বলে কাল কয়লা হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের চোখ নীল এবং মুখমন্ডল কাল হবে না। এরপর তাদেরকে জান্নাতের দরজায় অবস্থিত একটি নহরের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে এবং তারা সেখানে গোসল করবে। ফলে সাথে সাথে তাদের মানসিক দুশ্চিন্তা ও দৈহিক ব্যথা-যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে। তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে এবং জান্নাতের দারোগা তাদেরকে বলবে, তোমরা পবিত্র হয়ে গিয়েছ। সুতরাং তোমরা চিরকালের জন্য জান্নাতে অবস্থান কর। কিন্তু জান্নাতে তারা জাহান্নামী হিসেবে আখ্যায়িত হবে। হুযূর (সা) বলেন ঃ

অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র দরবারে এ নাম মিটিয়ে দেওয়ার জন্য দু'আ করবে। তখন তাদের এ নামকে মিটিয়ে দেওয়া হবে। এরপর কখনো তাদেরকে এ নামে ডাকা হবে না।

যখন এদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে তখন কাফিরগণ বলবে, হায়! যদি আমরা মুসলমান হতাম! আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী ঃ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ (কাফিরগণ বলবে, যদি আমরা মুসলমান হতাম!) এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের তাফসীরে ইবনুল মুবারক, ইবনে জারীর এবং ইমাম বায়হাকী (র) হযরত আনাস (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামে গুনাহ্‌গার মুসলমান ও মুশরিকদেরকে একত্র করবেন। তখন মুশরিকগণ বলবে, তোমরা যার ইবাদত করেছিলে, তিনি তোমাদের কোন উপকারে আসেননি। এ কথা শুনে আল্লাহ্ ক্রোধান্বিত হবেন এবং স্বীয় রহমতের দ্বারা ঐ সমস্ত গুনাহ্‌গারকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। ইমাম হাম্মাদ ও সাঈদ ইবন মানসূর স্বীয় 'সুনান' নামক গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা শাফা'আত ও রহমতের কারণে গুনাহ্‌গার মুসলমানদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে থাকবেন। অবশেষে এটাও বলবেন যে, যে কোন মুসলমান হোক না কেন, সে যেন জান্নাতে প্রবেশ করে। আল্লাহ্‌র এ বাণী ঃ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ -তে ঐ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লামা তিবরানী 'আওসাত' নামক গ্রন্থে সহীহ সনদসহ হযরত জাবির (রা) থেকে মরফূ' হাদীস রিওয়ায়েত করে বলেন, আঁ হযরত (সা) বলেছেন ঃ যতদিন আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন আমার উম্মতের মধ্য থেকে অনেক লোককে জাহান্নামে শাস্তি প্রদান করবেন। অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে কাফিরদের এ উক্তিও বর্ণিত হয়েছে। এরপর মুসলমানদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। অতঃপর আঁ হযরত (সা) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ আল্লামা তিবরানী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে, তিনি হযরত (সা) থেকে একই রিওয়ায়েত করেছেন। এতে আম্বিয়া, ফিরিশতা এবং মুমিনদের শাফা'আতের কথা উল্লেখ রয়েছে।

٢٨ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ يَبْقِى اَحَدٌ مِنَ الْمُوَحِّدِيْنَ فِى النَّارِ قَالَ نَعَمْ رُجُلٌ فِى قَعْرِ جَهَنَّمَ يُنَادِى بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ حَتّٰى يَسْمَعُ صَوْتَهُ جِبْرِئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَتَعَجَّبُ مِنْ ذٰلِكَ الصَّوْتِ فَقَالَ الْعَجَبُ الْعَجَبُ ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ حَتّٰى يَصِيْرُ بَيْنَ يَدَى عَرْشِ الرَّحْمٰنِ سَاجِدًا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِرْفَعْ رَأْسَكَ يَا جِبْرِيْلُ فَيَرْفَعُ

رَأسَهُ فَيَقُوْلُ مَا رَأَيْتَ مِنَ الْعَجَائِبِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا رَاهُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ سَمِعْتُ صَوتًا مِنْ قَعْرِ جَهَنَّمَ يُنَادِى بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ فَتَعَجَّبْتُ مِنْ ذٰلِكَ الصَّوْتِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَاجِبْرِئِيْلُ اذْهَبْ اِلٰى مَالِكٍ قُلْ لَهٗ اَخْرِجِ الْعَبْدَ الَّذِى يُنَادِى بِالحَنَّانِ الْمَنَّانِ فَيَذْهَبُ جِبْرِئِيْلُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ اِلٰى بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ جَهَنَّمَ فَيَضْرِبُه فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ مَالِكٌ فَيَقُوْلُ جِبْرِئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ اَخْرِجِ الْعَبْدَ الَّذِى يُنَادِى بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ فَيَدْخُلُ فَيَطْلُبُهُ فَلَا يُوْجَدُ وَاَنَّ مَالِكًا اَعْرَفُ بِاَهْلِ النَّارِ مِنَ الْاُمِّ بِاَوْلَادِهَا فَيَخْرُجُ فَيَقُوْلُ لِجِبْرِيْلَ اِنَّ جَهَنَّمَ زَفَرَتْ زَفْرَةً لَااَعْرِفُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْحَدِيْدِ وَلَاالْحَدِيْدَ مِنَ الرِّجَالِ فَيَرْجِعْ جِبْرِئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى يَصِيْرُ بَيْنَ يَدَى عَرْشِ الرَّحْمٰنِ سَاجِدًا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِرْفَعْ رَأسَكَ يَا جِبْرِئِيْلُ لِمَ لَمْ تَجِئْ بِعَبْدِى فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اِنَّ مَالِكًا يَقُوْلُ اِنَّ جَهَنَّمَ قَدْ زَفَرَتْ زَفْرَةً لَا اَعْرِفُ الْحَجَرَ مِنَ الْحَدِيْدِ وَلَا الْحَدِيْدَ مِنَ الرِّجَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قُلْ لِمَالِكٍ اِنَّ عَبْدِىْ فِىْ قَعْرِ كَذَا وَكَذَا فِى سِتْرِ كَذَا وَكَذَا - وَفِى رِوَايَةٍ كَذَا وَكَذَا فَيَدْخُلُ جِبْرِئِيْلُ فَيُخْبِرُه بِذٰلِكَ فَيَدْخُلُ مَالِكٌ فَيَجِدُه مَطْرُوْحًا مَنْكُوْسًا مَشْدُوْدًا نَاصِيَتُه اِلٰى قَدَمَيْهِ وَيَدَاه اِلٰى عُنُقِه وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَيَاتُ وَالْعَقَارِبُ ثُمَّ يَجِذْبِه جَذْبَةً اُخْرٰى حَتّٰى تَنْقَطِعَ مِنْهُ السَّلَاسِلُ وَالْاَغْلَالُ - ثُمَّ يُخْرِجُه مِنَ النَّارِ فَيُصَيِّرُه فِى مَاءِ الْحَيَاةِ وَيَدْفَعُه اِلٰى جِبْرِئِيْلَ فَيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِه وَيَمُدُّوْه مَدًا فَمَا مَرَّبِه جِبْرِئِيْلُ عَلٰى مَلَأٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ اِلَّا وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ اُفْ لِهٰذَا الْعَبْدِ حَتّٰى يَصِيْرَ بَيْنَ يَدَى عَرْشِ الرَّحْمٰنِ سَاجِدًا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِرْفَعْ رَأسَكَ

يَا جِبْرِئِيْلُ وَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَبْدِى اَلَمْ اَخْلُقْكَ بِخَلْقٍ حَسَنٍ اَلَمْ اُرْسِلْ اِلَيْكَ رَسُوْلاً اَلَمْ يَقْرَأ عَلَيْكَ كِتَابِىْ اَلَمْ يَأْمُرْكَ وَيَنْهَكَ حَتّٰى يُقِرَّ الْعَبْدُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَلِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ يَا رَبِّ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ حَتّٰى بَقِيْتُ فِى النَّارِ كَذَا وَكَذَا خَرِيْفًا لَمْ اَقْطَعْ رَجَائِى مِنْكَ يَا رَبِّ دَعَوْتُكَ بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ وَاَخْرَجْتَنِى بِفَضْلِكَ فَارْحَمْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِشْهَدُوا يَا مَلَائِكَتِى بِاَنِّى رَحْمَةٌ *

হাদীস নং- ২৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হুযূর (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! তাওহীদে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি কি জাহান্নামে বাকী থাকবে (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার পর)? আঁ হযরত (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ, এক ব্যক্তি বাকী থাকবে। জাহান্নামের অতল গহ্বরে একটি লোক 'ইয়া হান্নান, ইয়া মান্নান' বলে চিৎকার করতে থাকবে। এমন কি অবশেষে হযরত জিবরাঈল (আ.) তার আওয়াজ শুনে হতবাক হয়ে বলবেন, আশ্চর্য ! আশ্চর্য!! অতঃপর তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না এবং আরশের সামনে গিয়ে সিজদাবনত হয়ে পড়বেন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে জিবরাঈল ! মাথা উঠাও। তিনি মাথা উঠাবেন। আল্লাহ বলবেন, তুমি আশ্চর্যের কি প্রত্যক্ষ করলে ? অথচ আল্লাহ খুব ভালভাবে অবগত আছেন যা কিছু হযরত জিবরাঈল (আ.) দেখেছেন। তিনি বলবেন, হে প্রভু ! আমি জাহান্নামের অতল গহ্বর থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কে যেন চিৎকার দিয়ে বলছে, 'ইয়া হান্নান, ইয়া মান্নান'। এই আওয়াজ শুনে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে জিবরাঈল ! তুমি জাহান্নামের দারোগার নিকট যাও এবং তাকে বল, যেন ঐ লোকটিকে বের করে দেয়, যে 'ইয়া হান্নান, ইয়া মান্নান' বলে চিৎকার করছে। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) জাহান্নামের কোন একটি দরওয়াজার নিকট গিয়ে খট্খট্ আওয়াজ দিবেন। তখন জাহান্নামের দারোগা তাঁর নিকট আগমণ করবেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে বলবেন, আল্লাহ্র নির্দেশ হয়েছে, ঐ বান্দা যে 'ইয়া হান্নান, ইয়া মান্নান' বলে চিৎকার করছে, তাকে বের করে দাও। তখন দারোগা ভিতরে প্রবেশ করবেন এবং তাকে খুঁজতে থাকবেন, কিন্তু তাকে পাবেন না। অথচ মা তার সন্তানকে ততটুকু চিনতে পারে না যতটুকু দারোগা জাহান্নামবাসীদেরকে চিনতে পারবেন। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বাইরে এসে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নিকট বলবেন, জাহান্নাম এ মুহূর্তে এমন এক নিশ্বাস গ্রহণ করেছে যে, পাথর এবং লোহা, লোহা এবং মানুষের মধ্যে আমি পার্থক্য করতে পারছি না। হযরত জিবরাঈল (আ.) ফিরে গিয়ে পুনরায় আরশের সামনে সিজদাবনত হবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন,

হে জিবরাঈল ! মাথা উঠাও। তুমি কি আমার বান্দাকে নিয়ে আসনি ? তিনি বলবেন, হে আমার প্রতিপালক ! জাহান্নামের দারোগা বলল যে, "জাহান্নাম এরূপ একটি নিশ্বাস গ্রহণ করেছে যার ফলে আমি পাথর ও লোহা এবং লোহা ও মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারিনি।" তখন আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামের দারোগার নিকট গিয়ে বল, আমার বান্দা অমুক গর্তের এরূপ গোপন কোটরে অবস্থান করছে। হযরত জিবরাঈল গিয়ে দারোগাকে এ সংবাদ দিলে দারোগা ভিতরে প্রবেশ করে তাকে পায়ের সাথে কপাল, গলার সাথে হাত বাঁধা এবং সাপ-বিচ্ছু দ্বারা আক্রান্ত অবস্থায় দেখতে পাবেন। তখন দারোগা এমন জোরে হেঁচকা টান মারবেন যার ফলে সাপ-বিচ্ছু তার উপর থেকে পড়ে যাবে। দ্বিতীয়বার হেঁচকা টান মারবেন যার ফলে হাত-পা ও গলার সমস্ত বাঁধন ও বেড়ী খুলে যাবে। অতঃপর তাকে আগুন থেকে বের করে হায়াওয়ান নামক নহরে নিক্ষেপ করা হবে। সেখান থেকে বের করার পর হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নিকট তাকে সোপর্দ করা হবে। তিনি তাকে কপালে ধরে নিয়ে যেতে থাকবেন এবং ফিরিশতাদের যে জামাআতের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবেন, তারাই বলবেন, এ বান্দার জন্য আফসোস ! অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আরশের সামনে গিয়ে সিজদাবনত হয়ে পড়বেন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে জিবরাঈল ! মাথা উঠাও। তিনি মাথা উঠাবেন। আল্লাহ বলবেন, হে আমার বান্দা ! আমি কি তোমাকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করিনি ? আমি কি তোমাদের নিকট পয়গাম্বর প্রেরণ করিনি ? তিনি কি তোমাকে আমার কিতাব তিলাওয়াত করে শোনান নি ? সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে বাধা প্রদান করেন নি ? ঐ ব্যক্তি তখন সবকিছুই স্বীকার করবে। আল্লাহ্ বলবেন, তাহলে তুমি এভাবে চিৎকার করছ কেন ? তখন সে বলবে, হে প্রভু ! আমি আমার জীবনের উপর যুলুম করেছি। যার শাস্তি হিসেবে আমি দীর্ঘদিন জাহান্নামে পড়ে আছি। কিন্তু আমি তোমার করুণা ও দয়ার আশা পরিত্যাগ করিনি। তাই তোমাকে ইয়া হান্নান, ইয়া মান্নান বলে ডাকছি। তুমি তোমার করুণা দ্বারা আমাকে জাহান্নাম থেকে বের করে এনেছ। সুতরাং আজ তুমি আমার উপর তোমার রহমতের বারিধারা বর্ষণ কর। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে বলবেন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি এ বান্দার উপর রহমত ও অনুগ্রহ করলাম।

ব্যাখ্যা ঃ মু'তাযিলাদের মাযহাবমতে কবীরা গুনাহ থেকে তওবাকারী ও গুনাহে সগীরাকারী উভয়ে জাহান্নামে যাবে এবং কাফির ও কবীরা গুনাহকারী চিরদিনের জন্য জাহান্নামে যাবে, কখনো সেখান থেকে বের হওয়ার উপায় থাকবে না। উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা তাদের মতবাদকে খন্ডন ও বাতিল করা হয়েছে। আঁ হযরত (সা), অন্যান্য আম্বিয়া কিরাম (আ.), আওলিয়া, শহীদগণ, উলামা এবং মুকাররাবীনের শাফা'আতের দ্বারা তাওহীদে বিশ্বাসী গুনাহগার মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। এমনিভাবে যদি কোন হকদার তার দাবি তুলে নেয়, তবে ঐ ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। এরদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ বলবেন, হে ফিরিশতাগণ ! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তার (গুনাহগার বান্দার) উপর রহমত ও দয়া করলাম।

রহমত কেন হবে না? আল্লাহ বলেছেন ঃ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ (আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুর উপর বিদ্যমান রয়েছে)। হতে পারে, তাঁর করুণা ও দয়ার কারণে পাপীদের সাজা হ্রাস পাবে। অথবা শাস্তি পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ স্বীয় ইনসাফের কারণে তাদেরকে বের করবেন।

বর্ণিত আছে, হযরত হাসান বসরী (র)-এর মাহফিলে উল্লেখ করা হয় যে, হান্নাদ নামক এক ব্যক্তি এক হাজার বছর শাস্তি ভোগ করার পর 'ইয়া হান্নান, ইয়া মান্নান' বলে চিৎকার করতে থাকবে এবং তাকে জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ বের করা হবে। এ সময় হাসান বসরী (র) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হায় ! আমি যদি হান্নাদ হতাম ! লোকজন আশ্চর্য হয়ে বলল, এটা কি ধরনের আশা ? তিনি বললেন, এতে আশ্চর্য বা আফসোসের কি আছে ? তার জন্য কি এমন একটি দিন হবে না যে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং সে অনন্তকালের জন্য সেখানে থাকবে না। হযরত ইমাম গাযালী (র) 'মিনহাজুল আবেদীন' নামক গ্রন্থে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা সুয়ূতী (র) 'কানযুল মাদফুন' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর হত্যাকারিণী 'যবা' অথবা 'আযমীল' নামক মহিলা সর্বপ্রথম জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে এর পূর্বে সত্তরজন নবীকে হত্যা করেছে। বাইবেলে তার নাম 'সলোমী' তাওরাতে 'মাকতালাতুল আম্বিয়া' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে জাহান্নামের একটি উঁচু স্থান থেকে এমন জোরে চিৎকার করতে থাকবে যে, তার আওয়াজ জাহান্নামের অপর কিনারা থেকে শোনা যাবে।

٢٩ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُوْرِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ الْبَلْخِى وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيْسٰى وَيَزِيْدَ الطُّوْسِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اُمَيَّةَ نِ الْحَذَاءِ الْهَدِى عَنْ نُوْحِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يَزِيْدَ الرُّقَاشِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَنْ تَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ وَاَهْلِ الْعَظَائِمِ وَاَهْلِ الدِّمَاءِ *

হাদীস নং- ২৯

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা) ! কিয়ামতের দিন আপনি কোন কোন লোকদের জন্য শাফা'আত করবেন। আঁ হযরত (সা) বললেন ঃ আহলে কাবায়ের, আহলে আযায়েম এবং যারা অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটিয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ আহলে কাবায়ের দ্বারা ঐ সমস্ত লোককে বুঝান হয়েছে যারা গুনাহ কবীরা করেছে। জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে হোক, অথবা কিছু দিন শাস্তি ভোগ করার পর হোক তাদের জন্য শাফা'আত কবূল করা হবে।

আযায়েম (عَظَائِمْ) শব্দের কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। হয়ত এটা কাবায়ের শব্দের ব্যাখ্যা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এরদ্বারা কোন অতিরিক্ত অথবা ভিন্ন প্রকার অর্থ বুঝান হয়নি। অথবা কাবায়েরের অর্থ হুকূকুল্লাহ বা আল্লাহর হক এবং আযায়েমের অর্থ হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হক। অথবা এখানে تَخْصِيْصُ بَعْدَ التَّعْمِيْمِ অর্থাৎ কোন একটি বিষয়কে বিশেষভাবে

নির্দিষ্ট করার পর সাধারণভাবে বলার নিয়মে কাবায়েরের অর্থ হলো সাধারণ গুনাহে কবীরা এবং আযায়েমের অর্থ হলো ঐ সমস্ত কবীরা গুনাহ যা নিজের মধ্যে অধিক পরিমাণে বিরাজমান। যেমন ঃ নামায ত্যাগ করা, ব্যভিচার করা, লাওয়াতাত করা ইত্যাদি অথবা, تعميم بعد التخصيص। অর্থাৎ কোন একটি বিষয়কে সাধারণ হিসেবে বলার পর বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা। যেমন কাবায়েরের অর্থ হলো গুনাহে কবীরা এবং আযায়েমের অর্থ কোন গুনাহে সগীরা হোক বা কবীরা। কেননা সগীরা গুনাহও আল্লাহ্‌র পবিত্র এবং নেক বান্দাদের নিকট বিরাট গুনাহ বলে মূল্যায়ন হয়ে থাকে, যাঁরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ সামান্য পরিমাণে অমান্য করা মারাত্মক অন্যায় মনে করেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ অথবা আযায়েমের অর্থ যে কোন গুনাহ, তা ছোট হোক বা বড়।

উপরোক্ত হাদীসেও এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, গুনাহে কবীরাকারী মু'মিন ও শাফা'আতের যোগ্য। কেননা কাফিরদের শাফা'আত সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কোথাও উল্লেখ নেই। পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ -এর দ্বারা কাফিরদের জন্য শাফা'আতের দরজা চিরতরে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নিম্নলিখিত হাদীস এ বিষয়ে পেশ করা যায়। যেমন হাদীস ঃ شَفَاعَتِى لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِى (আমার উম্মতের মধ্যে আহলে কাবায়েরের জন্য আমার শাফা'আত প্রযোজ্য হবে) এ হাদীস আহ্‌মাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম মুসতাদরাক নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম হযরত জাবির (রা) থেকে, তিবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এবং খতীব (র) হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বস্তুত এ হাদীসও খারিজী, মু'তাযিলা এবং মুরজিয়াদের চিন্তাধারাকে বাতিল ও অমূলক বলে প্রমাণ করেছে।

٣٠ - حَمَّادٍ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ وَبَيَانِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِى حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرًا بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَاتُضَامُّوْنَ فِى رُؤْيَتِهِ فَانْظُرُوا اَنْ لَا تَغْلَبُوا فِى صَلٰوةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا -

قَالَ حَمَّادُ يَعْنِى الْغَدْوَةَ وَالْعَشِىَّ *

হাদীস নং- ৩০

অনুবাদ ঃ হযরত কায়েস ইবনে আবী হাযেম (রা) বলেন, আমি জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূল করীম (সা) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই তোমরা অচিরে তোমাদের প্রভুকে এমনিভাবে দেখতে পাবে যেমন তোমরা চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে

পাও। ভিড়ের কারণে তাকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় না। সুতরাং খেয়াল রাখবে (শয়তানের কুমন্ত্রণার কারণে) সূর্যোদয়ের পূর্বের নামায (ফজর) এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযসমূহ (যোহর ও আসর) আদায়ের ব্যাপারে কোনরূপ অবহেলা করবে না।

হাম্মাদ বলেন, অর্থাৎ প্রত্যুষ ও সন্ধ্যা।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম মাসয়ালা হল আল্লাহর দীদার সম্পর্কে। কিয়ামতের দিন মুমিনগণ স্বীয় জড় চক্ষু দ্বারা আল্লাহর দীদার (দর্শন) লাভ করবেন। এটা পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইজমায়ে সাহাবা ও তাবেঈন, সালফে সালেহীনের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে আল্লাহর দীদার বরহক। এর অকাট্য প্রমাণ হিসেবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ "আজকের এ দিনে (কিয়ামতের দিন) কিছু লোকের চেহারা সজীব হবে, স্বীয় প্রভুকে দেখতে পাবে।" পবিত্র কুরআন ও নির্ভযোগ্য হাদীসসমূহ দ্বারা যেহেতু বিষয়টি প্রমাণিত, তাই এখানে দীদার বা দর্শন মূল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে সিহাহ্ সিত্তাহ ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) বলেছেন ঃ অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। যেভাবে তোমরা কোন সন্দেহ ছাড়া চাঁদ দেখতে পাও। সুতরাং তোমাদের শক্তি থাকা সত্ত্বে সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামায আদায় থেকে বিরত থাকবে না। অধিকন্তু আল্লাহ্র দীদার সম্পর্কে ইজমায়ে উম্মত বিদ্যমান রয়েছে। তাই আল্লাহ্র দীদার সম্পর্কে অস্বীকার অথবা এতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার কোন অবকাশ নেই।

কেউ কেউ বলছেন, বেহেশতে মহিলাগণ আল্লাহর দীদার লাভ করতে পারবে না। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহর বাণী حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ (তাঁবুর মধ্যে সুলোচনা রমণীগণ অবস্থান করবে)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে রমণীগণ পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। এটা একটা অর্থহীন কথা। কেননা বেহেশতে পর্দার কারণে তাঁবু তৈরি হবে না। অধিকন্তু রমণীগণ পুরুষের মত মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং সমস্ত কাজে অংশীদারভুক্ত। তাই বলা হয়েছে ঃ اِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالُ নিশ্চয়ই মহিলাগণ পুরুষের অনুরূপই।

আবু দাউদ, তিরমিযী হযরত আয়েশা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বাযযায হযরত আনাস (রা) থেকে, তিনি হুযূর (সা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া রমণীদের মধ্যে হযরত ফাতিমা যোহরা (রা), হযরত খাদীজা (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর মত নেক ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব রমণী হওয়ার কারণে এ বিরাট নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকবেন অথচ তাঁদের চেয়ে লাখো গুণ কম মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ এ নিয়ামত লাভ করবেন, তা কিভাবে সম্ভব হতে পারে ? কোন বিবেকসম্পন্ন লোক এটা গ্রহণ করতে পারে না। অতঃপর পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীসে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মুমিন বেহেশতে আল্লাহ্কে দেখতে পাবে। এখানে পুরুষদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। কেউ কেউ বলেছেন ঃ আল্লাহর দীদার ফিরিশতা ও জিন্ন সম্প্রদায় লাভ করতে পারবে না। এ উক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়, বরং এর স্বপক্ষে কোন সঠিক প্রমাণ নেই।

দার্শনিক, খারিজী, মু'তাযিলা এবং আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যে দীদারে ইলাহী

সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। এটা যুক্তিগত ও দার্শনিক সূক্ষ্ম চিন্তার জটিলতায় পরিপূর্ণ। তারা বলে, দীদারের জন্য স্থান, কাল, দিন ও মুখোমুখি হওয়া ইত্যাদির প্রয়োজন এবং এগুলো হলো দেহের গুণাবলী। কিন্তু আল্লাহ এগুলো থেকে পবিত্র। তাহলে দীদার কিভাবে সম্ভব ?

এর জওয়াব হলো এই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন ঃ وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ আল্লাহ্ পাকের এ ঘোষণার পরও এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে কিভাবে? অধিকন্তু দীদারের জন্য এ সমস্ত শর্ত সাধারণভাবে প্রয়োজন নেই। এটা কোন যুক্তিসঙ্গত শর্তও নয় যে, এগুলো ব্যতীত দীদার সম্ভব নয়। আল্লাহ্ কি এ জড় চোখের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করতে অক্ষম (নাউযুবিল্লাহ) হয়ে যাবেন ? যে আল্লাহ্ জিহ্বার মধ্যে কথা বলার শক্তি দান করেছেন, তাঁর দীদারের জন্য চোখের মধ্যে শক্তি দান করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

এ হাদীসের দ্বিতীয় বিষয় হলো, নামাযের দার্শনিক দিক। নামাযের সামগ্রিক সৌন্দর্য হলো এই যে, বিনয় ও নম্রতার সাথে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়া। প্রকৃত নামায হলো এই যে, মুখমন্ডলের দৃষ্টি যদি কিবলার দিকে হয়, তাহলে কালবের দৃষ্টি মহান সত্তা আল্লাহ্র দিকে হতে হবে। বরং নবী করীম (সা)-এর ঘোষণা অনুযায়ী كَاَنَّكَ تَرَاهُ মুখমন্ডলের চোখ আল্লাহর পরম সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অন্তরের পর্যবেক্ষণের সাথে সাথে চোখের পর্যবেক্ষণও হতে হবে। যেমন কোন প্রেমিকার দীদার লাভে চোখ শীতল এবং অন্তর আনন্দিত হয়ে থাকে। এমনিভাবে নামাযে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন যাতে বলা যায় ঃ قرة عينى فى الصلٰوة "নামাযে আমার চোখের প্রশান্তি রয়েছে।" নামাযে জিহ্বা কথোপকথনের স্বাদ গ্রহণ করে, চোখে দীদারের আনন্দ লাভ করে এবং অন্তর ধারণা ও কল্পনা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটাকেই مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ(মুমিনের মিরাজ) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মূলতঃ নামাযে দীদার ও মুলাকাতের সবগুলো দিকই সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নামাযের এ হাকীকতের দৃষ্টিকোণ থেকে হুযূর (সা) বলেছেন ঃ প্রকৃত দীদার যদিও আখিরাতে সৌভাগ্য হবে, কিন্তু এর যোগ্যতা দুনিয়াতে নামাযের প্রতি কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে নিজের মধ্যে সৃষ্টি কর।

অতঃপর তিন ওয়াক্ত নামাযের প্রতি তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেননা এ তিন ওয়াক্ত নামায আদায় অনেকের জন্য কষ্টকর হয়ে থাকে। ভোরবেলা মিষ্টি মধুর নিদ্রা ছেড়ে আরামের বিছানা ত্যাগ করা দীদারে ইলাহীর সত্যিকার আশিক ছাড়া অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়। এমনিভাবে ভোর থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকায় ক্লান্তির কারণে দেহ একটু আরাম চায়। তখন নামায আদায় করা একটু কষ্টকর হয়ে থাকে। আসর নামাযের সময় আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সারা দিনের কাজ শেষে লোকজন সওদা ক্রয়ের জন্য বাজারে গমন করে থাকে। ব্যক্তিগত কাজে বিভিন্নস্থানে গমন করে থাকে। তাই সময়মত লোক মসজিদে উপস্থিত হতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ্র প্রকৃত আশিক বান্দাগণই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে মসজিদে হাযির হতে পারেন। তাই হুযূর (সা) এ তিন ওয়াক্ত নামাযের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে সঠিকভাবে এ সমস্ত নামায আদায় করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। যাতে অন্যান্য নামায আদায় করা ঐ সমস্ত ব্যক্তির জন্য সহজ হয়ে যায়।

كِتَابُ الْعِلْمِ

ইল্‌ম অধ্যায়

بَابُ فَرْضِيَّةِ طَلَبِ الْعِلْمِ

বিদ্যা অর্জন ফরয হওয়ার বর্ণনা

٣١ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَن عَبدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ *

হাদীস নং- ৩১

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর বিদ্যা অর্জন করা ফরয।

ব্যাখ্যা ঃ ইল্‌ম বা বিদ্যার হাজার হাজার শাখা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন কোন ইল্‌ম অর্জন করা ফরয হওয়া না হওয়া অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আবর্তিত হয়ে থাকে। যেমন ঃ আরকানে ইসলামের জ্ঞান ও ফরযসমূহ জানা জ্ঞানসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী, আযাদ ও গোলাম প্রত্যেকের উপর ফরয। এ দায়িত্ব থেকে কেউ কখনো পরিত্রাণ পাবে না। লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ঐ সময় ফরয যখন কেউ ঐ কাজের সাথে জড়িত হয়। যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ উপস্থিত হলে এ সম্পর্কে মাসয়ালা জানা প্রয়োজন। শিল্প-কারখানার সাথে সম্পর্ক থাকলে অথবা চাকুরীর সাথে জড়িত থাকলে ঐ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। কিন্তু ইলমে ফিকহ্ শহর ও গ্রাম সর্বত্র প্রয়োজন হলেও এটা শিক্ষা করা সবার উপর ফরয নয় ; বরং ফরযে কিফায়া। যদি গ্রামের একজন শিক্ষালাভ করে, তা হলে সবার পক্ষ থেকে ফরয আদায় হয়ে যাবে। যদি একজনও শিক্ষালাভ না করে, তা হলে কারো ফরয আদায় হবে না; বরং সবাই এর জন্য দায়ী হবে। যেমন নামায সঠিক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কুরআনের আয়াত মুখস্থ করা সবার জন্য ফরযে আইন; কিন্তু সমস্ত কুরআন শরীফ হিফয করা ফরযে কিফায়া যা সবার জন্য ফরয নয়।

এ হাদীস ইবনে আদী স্বীয় গ্রন্থ কামেলে, বায়হাকী শুয়া'বুল ঈমানে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। খতীব (র) তারিখে বাগদাদে হযরত মুরতাজা ও হুসাইন ইবনে আলী (রা) থেকে, তিবরানী আওসাতে হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসঊদ এবং আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে, সগীর নামক গ্রন্থে হুসাইন ইবন আলী (রা) থেকে, ফওয়ায়েদে ইবনে উমর (রা) থেকে, ইবনে মাজাহ হযরত আনাস (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, সাতজন সাহাবা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। তাই মোল্লা আলী ক্বারী, ইমাম নববী, আল্লামা ইরাকী এবং হাফিয তিরমিযী (রা) বলেছেন ঃ এ হাদীস বিভিন্নভাবে সাহাবায়ে কিরাম (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাই এ হাদীসকে হাদীসে হাসান বলে গণ্য করা যেতে পারে।

٣٢ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ نَاصِحٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ *

হাদীস নং- ৩২

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর বিদ্যা অর্জন করা ফরয।

ব্যাখ্যা ঃ বাক্য ও অর্থের দিক দিয়ে এ হাদীস পূর্বের হাদীসের মত। ইল্‌মের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন দায়লামী স্বীয় মুসনাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে, তিনি হুযূর (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইল্‌ম অর্জন করা আল্লাহ্‌র নিকট নামায, রোযা, হজ্জ এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের চেয়ে অধিক ফযীলতপূর্ণ। এমনি হাদীসে আরো বলা হয়েছে, এক ঘন্টা বিদ্যা অর্জন করা রিয়া ব্যতীত সারা রাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম। একদিন বিদ্যা অর্জন করা তিন দিন রোযা রাখার চেয়ে উত্তম। ইবনে আদী, বায়হাকী এবং ইবনে আবদুল বার হযরত আনাস (রা) থেকে, তিনি হুযূর (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, বিদ্যা অর্জন কর, যদি সুদূর চীনদেশেও যেতে হয়। অর্থাৎ যতদূরে হোক না কেন, বিদ্যা অর্জন কর।[১]

بَابُ فَضِيْلَةِ التَّفَقُّهِ

ফিকহ-এর জ্ঞান অর্জনের ফযীলত

٣٣ – قَالَ اَبُو حَنِيْفَةَ وُلِدْتُ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ وَحَجَجْتُ مَعَ اَبِى سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِيْنَ وَاَنَا ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَرَأَيْتُ حَلْقَةً عَظِيْمَةً فَقُلْتُ لِاَبِىْ حَلْقَةُ مَنْ هٰذِهِ فَقَالَ حَلْقَةُ

১. এ হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

عَبدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِى صَاحِبِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمْتُ فَسَمِعْتُه يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَفَقَّهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ كَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مُهِمَّهُ وَرَزَقَه مِنْ حَيْثُ لَايَحْسَبُ *

হাদীস নং- ৩৩

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ আমি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং ৯৬ হিজরীতে আমার পিতার সাথে আমি হজ্জে গিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৬ বছর। যখন আমি মসজিদে হারামে গমন করি, তখন অনেক লোককে একটি মজলিসে বসা দেখতে পেলাম। আমি আমার পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এই মজলিস কোন্ বুযর্গের খাতিরে আয়োজন করা হয়েছে ? তিনি বললেন, এ মজলিস নবী করীম (সা)-এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিস ইবনে জাযউয-যুবায়দী (রা)-এর জন্য আয়োজন করা হয়েছে। আমি সামনে অগ্রসর হলাম এবং তাঁকে এটা বলতে শুনলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহ্র দীনের জ্ঞান এবং দীনের ইল্ম অর্জন করবে, আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং তাকে এরূপ স্থান থেকে রিযিক দান করবেন যা সে ধারণাও করেনি।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিস (রা)-এর ইনতিকালের তারিখের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। যদি তাঁর ইনতিকাল ৮৫ থেকে ৮৮ হিজরীর মধ্যে হয়ে থাকে, তাহলে ঐ সময় ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বয়স হবে ৫ থেকে ৮ বছর এবং তিনি তাঁর পিতার সাথে ৯৬ হিজরীতে হজ্জ আদায় করেছেন। তাহলে এ হিসাবে ইমাম আবূ হানীফার সাথে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সাক্ষাত প্রমাণিত হয় না। কিন্তু বুরহানুল ইসলাম হুসাইন ইবনে আলী ইবনে হুসাইন গযনবী বলেন, ৯৯ হিজরীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিস (রা)-এর ইনতিকাল হয়। সুতরাং এরদ্বারা সাক্ষাত প্রমাণিত হয়।

আঁ হযরত (সা)-এর ইরশাদ كَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مُهِمَّهُ-এরদ্বারা ইহকাল ও পরকালের যিম্মাদারী বুঝানো হয়েছে এবং رزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ -এরদ্বারা পবিত্র কুরআনের আয়াত (وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلَ لَّهُ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ) -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লামা খতীব স্বীয় তারিখে যিয়াদ ইবনে হারিস আবাদানী থেকে মরফূ' রিওয়ায়েত করেছেন যে, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِرَزْقِه "যে ব্যক্তি ইল্ম শিক্ষা করে, আল্লাহ্ তার রিযিকের যিম্মাদার হয়ে যান।"

٣٤ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ

(رض) قَالَت قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لِيَكُنْ شِعَارُكِ الْعِلْمَ وَالْقُرْاٰنَ *

হাদীস নং- ৩৪

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) [হযরত আয়েশা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে] বলেছেন ঃ হে আয়েশা ! ইল্‌ম ও কুরআনকে নিজের রীতি-নীতি, চাল-চলন ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ কর।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটি সংক্ষিপ্ত হলেও এতে সামগ্রিকভাবে ইল্‌ম ও কুরআনের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইল্‌ম ও কুরআনের সাথে তোমাদের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি কর যাতে ইল্‌ম ও কুরআন অনুযায়ী তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম, চাল-চলন, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন পরিচালিত হয়।

بَابُ فَضِيْلَةِ اَهْلِ الذِّكْرِ

যিকিরকারীদের ফযীলত

٣٥ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الاَقْمَرِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِقَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى فَقَالَ اَنْتُمْ مِنَ الَّذِيْنَ اُمِرْتُ اَنْ اَصْبِرَ نَفْسِى مَعَهُمْ وَمَا جَلَسَ عِدْلَكُمْ مِنَ النَّاسِ فَيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَه *

হাদীস নং- ৩৫

অনুবাদ ঃ হযরত আলী ইবনে আকমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) এক জামাআতের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন এবং ঐ জামাআত আল্লাহর যিকিরে (তিলাওয়াতে কুরআন, তাসবীহ-তাহলীল) মগ্ন ছিল। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা হলে ঐ সমস্ত লোক, যাদের সাথে থাকার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং তোমাদের মত যারা আল্লাহর যিকিরে বসে, ফিরিশতাগণ তাদেরকে স্বীয় পাখার ছায়ায় নিয়ে থাকেন, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটে উপস্থিত ফিরিশতাদের সাথে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এবং আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ এ বাক্য সংযোগ করে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ

তাদের উপর শান্তি নাযিল হয়ে থাকে এবং অন্তরের জল্পনা-কল্পনা যিকরের শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে হ্রাস পেয়ে যায়। আল্লাহর সাথে মহব্বত সৃষ্টি হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে ঐ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ "আল্লাহ্‌র যিকিরের দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়ে থাকে।" অর্থাৎ অন্তরে প্রশান্তি লাভের একমাত্র চিকিৎসা হল আল্লাহর যিকির। যিকিরের বরকতে মানুষ আল্লাহর রহমতের সৌভাগ্য লাভ করে থাকে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَذَكَرَ هُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ "আল্লাহ ফিরিশতাদের সাথে যিকিরকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন।" এই আলোচনা মানুষের উচ্চ মর্যাদার কারণেই করা হবে। আল্লাহর পরিচয় ও আল্লাহ্-ভীতির কারণে তাদের সামনে আনন্দ প্রকাশ করা হবে। মানুষ সৃষ্টির শুরুতে যে রহস্য গোপন ছিল এবং ফিরিশতাগণ যে সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, এ দিন তা প্রকাশ করা হবে এবং মানুষের সৃষ্টির ব্যাপারে ফিরিশতাগণ বিরোধিতা করে যে যুক্তি اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا আল্লাহর নিকট পেশ করেছিল, এখন আল্লাহ্ সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলবেন, হে ফিরিশতাগণ ! এরাই হল সেই মানব জাতি, যাদের মধ্যে তোমরা শুধু ফাসাদ ও রক্তপাতের অভিযোগ প্রত্যক্ষ করেছ। দেখ, তারাই কত অবেগ-অনুভূতি ও আনন্দের সাথে আল্লাহ্‌র যিকিরে মগ্ন রয়েছে এবং আল্লাহর রহমত তাদেরকে স্বীয় বক্ষে আলিঙ্গন করে নিয়েছে।

٣٦ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الْعُلَمَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ اِنِّى لَمْ اَجْعَلْ حِكْمَتِى فِى قُلُوْبِكُمْ اِلاَّ وَاَنَا اُرِيْدُكُمْ الْخَيْرَ اِذْهَبُوْا اِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ مِنْكُمْ *

হাদীস নং- ৩৬

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। আঁ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সমস্ত উলামায়ে কিরামকে এক জায়গায় একত্রিত করে তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন, তোমাদের অন্তরে আমার হিকমত (ইল্‌ম, কিতাব ও সুন্নত) রাখার কারণ হল, তোমাদের শুভ ও মঙ্গল কামনা করা। সুতরাং তোমরা আজ বেহেশতে প্রবেশ কর। যা কিছু হোক না কেন, আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত বিষয়ে আবূ বকর ইবনে আবী আসিম এবং হিলয়ার লেখক আবূ নাঈম আবী মূসা (রা) থেকে মরফূ' হাদীস বর্ণিত আছে। এর মূল বক্তব্য হলো এই যে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন বান্দাদেরকে উঠাবেন। অতঃপর আলিমদেরকে পৃথক করে তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন, হে আলিম সম্প্রদায় ! আমি জেনে বুঝে তোমাদেরকে ইল্‌ম দান করেছি; তোমাদেরকে আযাব দেওয়ার জন্য ইল্‌ম দান করিনি। সুতরাং তোমাদের সবাইকে আমি আজ ক্ষমা করলাম। এমনিভাবে আল্লামা তিবরানী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে হযরত সা'লাবা ইবনে হাকিম

(রা) থেকে মরফূ' হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। এর সারাংশ হলো এই যে, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য বিচারকের আসনে সমাসীন হবেন, তখন আলিমদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়ার জন্যই তোমাদেরকে ইল্‌ম ও হিকমত দান করেছি। ঐ গুনাহ যে পরিমাণ হোক না কেন এবং এতে আমার কোন পরওয়া নেই।

হাদীসে বর্ণিত শব্দ فِى قُلُوْبِكُمْ দ্বারা ঐ হাকীকতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইল্‌ম এমন একটি বিশ্বাসযোগ্য বিষয়, যা অন্তরে স্থান নিয়ে থাকে এবং এটাই তাকওয়া ও আল্লাহ-ভীতির কারণ হয়ে থাকে। ইবনে আবী শায়বা ও হাকিম হাসান (রা) থেকে মুরসাল এবং আল্লামা খতীব তাঁদের থেকে এবং হযরত জাবির (রা) থেকে মরফূ' রিওয়ায়েত করেছেন যে, ইল্‌ম দু'ভাবে বিভক্ত। এক প্রকার হলো ঐ ইল্‌ম যা মুখের উপর জারি থাকে কিন্তু অন্তরে স্থায়ী হয় না। এটা বান্দার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র দলীল হয়ে থাকে। দায়লামী মুসনাদুল ফিরদাউস নামক কিতাবে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ইল্‌ম অর্জনে অগ্রগামী হয়, কিন্তু দুনিয়াতে সংসারের প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত হতে না পারে, তাহলে সে আল্লাহ্‌র সত্তা (রহমত) থেকে দূরে থাকবে।

بَابٌ فِى التَّغْلِيْظِ فِى عَمْدِ الْكَذِبِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপের শাস্তি

٣٧ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا اَوْ قَالَ مَالَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ *

হাদীস নং- ৩৭

অনুবাদ ঃ হযরত কাসিমের পিতামহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা এমন কথা যা আমি বলিনি তা আমার প্রতি আরোপ করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে খোঁজ করে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটি হাদীসে মশহুরের অন্তর্ভুক্ত। ৬০ জনের বেশি সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণিত হওয়ায় অনেকে এই হাদীসকে হাদীসে মুতাওয়াতির হিসেবে গণ্য করে থাকেন। যেমন ঃ ইরশাদুস সারী বুখারী শরীফের হাশিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ وَهُوَ حَدِيْثٌ فِى غَايَةِ الصِّحَّةِ وَنِهَايَةِ الْقُوَّةِ وَقَدْ اُطْلِقَ الْقَوْلُ بِتَوَاتُرِهٖ جَمَاعَةٌ "এই হাদীস বিশুদ্ধতা ও শক্তির দিক দিয়ে খুবই উচ্চ মর্যাদা রাখে। তাই একদল

মুহাদ্দিস এই হাদীসকে মুতাওয়াতির হিসেবে গণ্য করে থাকেন।" আসহাবে সিহাহ্, হাকিম, তিবরানী, দারে কুতনী, খতীব ও অন্যান্য বর্ণনাকারিগণ আশারায়ে মুবাশ্শিরাসহ অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে একই বাক্য দ্বারা বর্ণনা করেছেন। কোন বর্ণনায় রয়েছে ঃ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ আবার কোন বর্ণনায় রয়েছে ঃ مَنْ قَالَ مَالَمْ اَقُلْ এই হাদীস সনদের দিক দিয়ে হাদীসে মুনকাতি'-এর পর্যায়ভুক্ত। কেননা মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর তাঁর পিতার ইনতিকালের সময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। তিনি পিতার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। কিন্তু বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য হন, তা হলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুনকাতি' হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সনদের যে ক্রমধারা রয়েছে, এরদ্বারা হাদীসে মুনকাতি'র অভিযোগ দূরীভূত হয়ে যায়। তা হলো এই যে, ইমাম সাহেব রিওয়ায়েত করেন কাসিম ইবনে আবদুর রহমান থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে আর তিনি তাঁর দাদা আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) থেকে। ইমাম আবূ দাউদ এভাবেই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

নবী করীম (সা)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করার এই কঠোর শাস্তি ও হুঁশিয়ারীর কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, হাদীসের মধ্যে কিছু মিথ্যা বলে দেওয়া বা মিথ্যা কিছু সংযুক্ত করে দেওয়া অগণিত মানুষকে গুমরাহ ও বিভ্রান্ত করা এবং দীনের মৌলিক বিষয় ও ঐক্যের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার নামান্তর। এ গুনাহর পরিমাপ করা সম্ভব নয়। একদিকে হাদীস ও দীন প্রচার এবং প্রসারের জন্য অত্যধিক নেকীর কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে দীনের মধ্যে ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত পদ্ধতি চালু করাকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআনের পর একমাত্র হাদীসই দীন ও শরীয়তের মূল ভিত্তি। যদি হাদীসের মধ্যে ভুল-ত্রুটি যুক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে দীনের মূল ভিত্তি চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। মুসলমানদের এমন একটি অন্ধকার যুগের আগমণ ঘটেছিল যে, অসংখ্য মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তাই মোল্লা আলী ক্বারী (র) 'মাওজুয়াতুল কবীর' নামক গ্রন্থে এরূপ মিথ্যা হাদীসসমূহ একত্রিত করেছেন এবং মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে জনগণকে ধোঁকাদানকারী ঐ সমস্ত লোকের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা মনগড়া হাদীস প্রচারের মাধ্যমে দীনের মূল ভিত্তিকে ধ্বংস করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঐ সমস্ত লোককে উত্তম পুরস্কার দান করুন যাঁরা হাদীসের বর্ণনাকারী ও আসমায়ে রিজাল (اَسْمَائے رِجَال) সম্পর্কে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছেন এবং মিথ্যা, মনগড়া ও মওযূ হাদীসকে পৃথক করে, সঠিক ও সহীহ হাদীসসমূহকে একত্রিত করেছেন এবং সমস্ত হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে দিয়েছেন। ফলে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ আর থাকেনি।

٣٨ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - رَوَاهُ اَبُو حَنِيفَةَ عن اَبِى رُوْبَةَ شَدَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيدٍ *

হাদীস নং- ৩৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। হুযূর (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা খোঁজ করে নেয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) এই হাদীস আবূ রুবা শাদ্দাদ ইবনে আবদুর রহমান থেকে এবং তিনি হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে فليتبوأ শব্দটি اَمر বা নির্দেশবাচক। এর বাহ্যিক অর্থ এখানে সঠিক বলে ধরে নেওয়া দুরূহ ব্যাপার। কেননা জাহান্নাম এমন ভয়ঙ্কর স্থান যা কামনা করা বা সেখানে স্বয়ং ঠিকানা খোঁজ করা তো দূরের কথা, এর ভয়ে মানুষ অস্থির থাকে। এছাড়া এটা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। একমাত্র আল্লাহ্ মানুষকে শাস্তি, পুরস্কার এবং মর্যাদাদানের ক্ষমতা রাখেন।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ এখানে اَمر (আমর) বদ দু'আর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ হুযূর (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাহলে এরূপ ব্যক্তির ঠিকানা যেন জাহান্নাম হয়। আবার কারো মতে এখানে اَمر (আমর) খবরের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ এরূপ ব্যক্তির স্থান জাহান্নামে তৈরি করেছেন। তাই অন্য বর্ণনায় يَلِجُ النَّارَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অন্য রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে بنى له بيت فى النار অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামে একটি ঘর তৈরি করা হবে। তবে হাদীসের এই বাক্যের প্রতি একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, এখানে اَمر (আমর) বদ দু'আ বা খবরের অর্থে নয় ; বরং এর মূল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে নবী করীম (সা)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করার জন্য কঠোর শাস্তি ও হুঁশিয়ারী প্রদান করাই হলো মূল উদ্দেশ্য। তাই এই বাক্যে বিদ্রুপের ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, ভুল করেও এরূপ জাহান্নামের যে কোন একটি স্থান তার ইচ্ছা অনুযায়ী বাছাই করে নিতে হবে। এখানে যদি সরাসরি বলে দেওয়া হতো এরূপ ব্যক্তির স্থান হবে জাহান্নামে, তা হলে এটা ভবিষ্যতে সংঘটিত কোন একটি ঘটনা প্রকাশ করত। ফলে অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে এত কঠোরতা সৃষ্টি হতো না এবং পাপীর জন্য তেমন লজ্জার সৃষ্টি হতো না।

٣٩ – حَمَّادٌ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعُوْفِى عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِى (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ قَالَ عَطِيَّةُ وَاَشْهَدُ اَنِّى لَمْ اَكْذِبَ عَلٰى اَبِى سَعِيْدٍ وَاَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ لَمْ يَكْذِبْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

হাদীস নং- ৩৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি

ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। হযরত আতিয়া বলেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান (কসম খেয়ে) করছি যে, আমি হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করিনি এবং তিনিও হুযূর (সা)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ মিথ্যা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যাপারে এই হাদীস এরূপ গুরুত্বপূর্ণ যে, যার ফলে কোন কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরাম ও আয়িম্মায়ে ইজাম হাদীস বর্ণনা করা থেকে যতটুকু সম্ভব বিরত থাকতেন এবং আঁ হযরত (সা)-এর বাণী বর্ণনা করতে গিয়ে কেঁপে উঠতেন। এমনকি কম হাদীস বর্ণনা করা তাঁদের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কোন এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি দীর্ঘদিন হুযূর (সা)-এর সংস্পর্শে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছেন অথচ আপনি খুব কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) সহ অন্যান্য সাহাবা (রা) কতো অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা) বললেন, যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তখন থেকে হুযূর (সা)-এর সঙ্গ থেকে পৃথক হইনি। কিন্তু আমি আঁ হযরত (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ সুতরাং এই হাদীসে বর্ণিত শাস্তির ভয়ে আল্লাহ-ভীরু লোকদের কোন কিছু বর্ণনা করা অথবা দীন প্রচারে উৎসাহ-উদ্দীপনা হ্রাস পেয়ে থাকে। তবে এতে তাঁদেরকে অভিযুক্ত করা যায় না এবং তাঁদের ইল্মের মধ্যে কোন ত্রুটিও সৃষ্টি হয় না। এ পর্যায়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর দিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর কাছ থেকে কি পরিমাণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং অন্য সাহাবা থেকে কি পরিমাণ। কিন্তু এতে বলা যাবে না যে, তিনি কোন হাদীস শুনেননি অথবা তিনি হুযূর (সা)-এর সংসর্গ লাভ করেননি; বরং তাঁদের অন্তরে আল্লাহ্-ভীতি পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। হাদীস বর্ণনার পূর্বে তাঁরা খুব চিন্তা ও গবেষণা করতেন, তখন আযাবের চিত্র তাঁদের সামনে ফুটে উঠত, ফলে তাঁরা অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। খুব বেশি প্রয়োজন হলে কিছু বর্ণনা করতেন, নতুবা চুপ থাকতেন।

এখন ঐ সাহাবায়ে কিরাম (রা) সম্পর্কে আলোচনা করা যায়, যাঁদের থেকে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) প্রমুখ সাহাবা (রা)। এই বুযর্গদের মধ্যে আল্লাহ্-ভীতি বিরাজমান ছিল। কেননা তাঁদের সামনে ঐ সমস্ত হাদীস বিদ্যমান ছিল যাতে সত্য গোপন করার জন্য কঠোর আযাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তিকে আগুনের লাগাম পরিধান করানো হবে, যারা পৃথিবীতে ইল্মে দীন মানুষ থেকে গোপন করেছে এবং প্রচারের বিনিময় গ্রহণ করেছে। শুধু দৃষ্টিভঙ্গির কারণে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কেউ আল্লাহর ভয়ে তথা জাহান্নামের আযাবের ভয়ে হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থেকেছেন, আবার কেউ জাহান্নামের ভয়ে হাদীস বর্ণনার কাজে এগিয়ে এসেছেন।

আয়িম্মায়ে ইজামের মধ্যে হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) হুযূর (সা)-এর অতি নিকটবর্তী যুগের ছিলেন এবং অনেক সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁদের থেকে ইল্ম হাসিলের সৌভাগ্য লাভ করেছেন কিন্তু তবুও তিনি খুব কম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

কারণ অনেক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মত তাঁর সামনে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা সম্পর্কিত فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ এই হাদীস বিদ্যমান ছিল। নতুবা ইমাম মুহাম্মদ (র) এবং ইমাম আবূ ইউসূফের মত ছাত্র [এবং তাঁদের ছাত্র ছিলেন ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)] থাকা সত্ত্বেও ইমাম সাহেবের ইল্‌ম কম হওয়া সম্পর্কে সমালোচনা করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়।

٤٠ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ *

হাদীস নং- ৪০

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা খোঁজ করে।

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেছেন ঃ এই হুঁশিয়ারী যে কোন মিথ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এটা দীনী ও দুনিয়ার যে কোন কার্যকালাপ হতে পারে। কেউ কেউ শুধু দীনি কার্যকলাপের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ঃ এই হুঁশিয়ারী বিশেষ এক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যখন এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সা)-এর পক্ষ থেকে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে কোন একটি কওমের নিকট গিয়ে বলল যে, আমাকে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা)-এর বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই হাদীস যে কোন মিথ্যাকেই অন্তর্ভুক্ত করে থাকে।

٤١ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - رَوَاهُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ *

হাদীস নং- ৪১

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তৈরি করে বা খোঁজ করে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এই হাদীস ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী আলোচনা অনুগ্রহ করে দেখা যেতে পারে।

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

তাহারাত অধ্যায়

بَابُ فِى النَّهِى اَنْ يَّبُوْلَ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ

স্থির ও জমাকৃত পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ

٤٢ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ *

হাদীস নং- ৪২

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যেন স্থির বা জমাকৃত পানির মধ্যে প্রস্রাব না করে এবং ঐ পানি দ্বারা উযূ না করে।

ব্যাখ্যা ঃ পানির পবিত্রতার শর্ত হিসেবে ফিকহ্বিদগণ পানিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথমতঃ অল্প পানি (مَاءٌ قَلِيْلٌ), দ্বিতীয়ত অধিক পানি (مَاءٌ كَثِيْرٌ)। অল্প পানিতে (مَاءٌ قَلِيْلٌ) ময়লা ও অপবিত্র বস্তু পতিত হলে ঐ পানি অপবিত্র হয়ে যায়। স্থির পানিরও এটাই বিধান। প্রবাহিত ও অধিক পানির বিধান এর থেকে ভিন্ন। এর ব্যাখ্যা বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত মরফূ' হাদীসে পাওয়া যায়। এই হাদীসে হুযূর (সা) বলেছেন ঃ কেউ যেন স্থির পানিতে প্রস্রাব না করে, যে পানি প্রবাহিত নয়। এরপর ঐ পানিতে গোসল করে। এমনিভাবে ঐ পানিও এই বিধানের বাইরে যা প্রবাহিত নয়। কিন্তু অধিকাংশের মতে এটা প্রবাহিত পানির মধ্যে গণ্য। পানির পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে ঐ পানি পবিত্র যা দুই কুল্লা বা এর চেয়ে অধিক। ইমাম মালিক (র)-এর মতে যতক্ষণ পর্যন্ত পানির তিনটি গুণ যথা ঃ রং, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পানির মধ্যে ময়লা ও অপবিত্র বস্তু পতিত হলেও পানি অপবিত্র হবে না। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে স্থির পানি যদি এরূপ দীর্ঘ ও প্রশস্ত পুকুর বা কূপে থাকে যার এক কিনারে নাড়া দিলে অন্য কিনারে স্পন্দন সৃষ্টি না হয়, তবে এই পানি অধিক পানি বলে গণ্য হবে। হানাফী মাযহাবের পরবর্তী আলিমগণের মতে এর পরিমাণ ১০ X ১০ অর্থাৎ একশত বর্গফুট স্থানে ঐ পানি থাকতে হবে।

উপরোক্ত হাদীস এই দু' মাযহাবের বিপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কেননা এতে পানির গুণাবলী বা দু'কুল্লার কোন শর্ত নেই ; বরং এখানে হুযূর (সা) বলেছেন ঃ স্থির পানি প্রস্রাবের দ্বারা অপবিত্র হয়ে যায়। এর দ্বারা উযূ করা জায়েয নয়। অতঃপর দু'কুল্লা বর্ণনাকারী হাদীসের মধ্যে কয়েকটি সন্দেহ রয়েছে। প্রথমতঃ একদল এটাকে দুর্বল (ضَعِيْف) বলেছেন। এদের মধ্যে আলী ইবনে মাদিনী শায়খে নাহারীও রয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ এই হাদীসে দু'কুল্লার (قُلَّتَيْن) প্রমাণ হুযূর (সা) থেকে নেই, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়নি এবং ইজমায়ে সাহাবা (রা)-এর বিরুদ্ধে। কেননা যমযম কূপের মধ্যে হাবশী ব্যক্তি পতিত হওয়ার কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং হযরত ইবনে যুবায়র (রা) সমস্ত কূপ পরিষ্কার করেছেন। অথচ এই হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ কূপ অপবিত্র হয়নি এবং উপরোক্ত সাহাবাদ্বয়ের আমলের উপর কেউ বিরোধিতাও করেননি। আল্লামা তাহাবী (র) বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এই হাদীস সহীহ হলেও এর উপর আমাদের আমল নেই। কেননা قُلَّةٌ শব্দটি মাটির কলস, মশক এবং পাহাড়ের চূড়া এই তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা আমাদের জানা নেই। তাই এই হাদীসের উপর আমল করা কষ্টকর। দ্বিতীয় হাদীসটি খুবই স্পষ্ট। তাই প্রথমটির উপর আমল করা জরুরী নয়।

ইমাম মালিক (রা) দলীল হিসেবে ঐ হাদীস পেশ করেন যেখানে হুযূর (সা) বলেছেন ঃ পানি ঐ পর্যন্ত পবিত্র থাকবে যতক্ষণ পানির মধ্যে ময়লা ও অপবিত্র বস্তু পতিত হওয়া সত্ত্বেও পানির রং, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তন না হয়। এই বর্ণনা অত্যন্ত দুর্বল, দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। বায়হাকী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে। দ্বিতীয় দলীল হলো ঐ হাদীস, যাতে বুযাআ নামক কূপ সম্পর্কে আঁ হযরত (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَايُنَجِّسُهُ شَيْءٌ অর্থাৎ "পানি পবিত্র, তাই কোন বস্তুই তা অপবিত্র করতে পারে না।" এই হাদীস উপরোক্ত কূপের সাথে নির্দিষ্ট এবং এর পানিও প্রবাহিত ছিল। সমাগ্রিকভাবে সমস্ত পানি বা কূপের উপর এ হাদীস কার্যকরী নয়। এর প্রয়োগও এই হাদীস বাতিল করে থাকে এবং এটা হুযূর (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যখন কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হবে, তখন সে যেন স্বীয় হাত তিনবার ধৌত করার পূর্বে বরতনের মধ্যে হাত প্রবেশ না করায়। এখানে হাতে কোন ময়লা বা অপবিত্র বস্তু নেই, কিন্তু অপবিত্র বস্তুর সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং অপবিত্র বস্তু বা ময়লার সন্দেহের কারণে যদি পানি অপবিত্র হয়, তাহলে অপবিত্র বস্তুর কারণে তা কেন অপবিত্র হবে না ? কাজেই বর্ণিত হাদীসের দ্বারা যদি বর্ণিত পানি অপবিত্র হয়, তাহলে অপবিত্র বস্তুর কারণে তা কেন অপবিত্র হবে না ? বর্ণিত হাদীসের দ্বারা যখন পানির শরীয়তের পরিমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি যা প্রবাহিত পানির বিধানের মধ্যে রয়েছে, তাই অক্ষমতার অবস্থায় বিষয়টি বেশির ভাগ ধারণার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে, পানির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এই পরিমাণ হতে হবে যাতে এক কিনারে ময়লা পতিত হলে মনে হয় যেন অন্য কিনারে এর প্রতিক্রিয়া পৌছে না, তাহলে ঐ পানি প্রবাহিত পানির বিধানের মধ্যে গণ্য হবে এবং এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব।

٤٣ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ الصَّوَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ

اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَـالَ نَـهى رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُبَالُ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ اَوْ يَتَوَضَّأُ *

হাদীস নং- ৪৩

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) স্থির বা জমা পানির মধ্যে প্রস্রাব করা অতঃপর ঐ পানি দ্বারা গোসল বা উযূ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা বায়হাকী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেহেতু হাদীসে জমা বা স্থির পানির মধ্যে প্রস্রাব করা নিষেধ করা হয়েছে, তাই মল ত্যাগ করাও নিষিদ্ধ। হুযূর (সা)-এর উক্ত হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হলো এই যে, কোন ময়লা ও অপবিত্র বস্তু যাতে এখানে না ফেলা হয়। কেননা তা হলে ঐ পানি গোসল বা উযূর যোগ্য থাকবে না। এখানে গোসলের দ্বারা অপবিত্রতার গোসলকে বুঝান হয়েছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, তোমাদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা অপবিত্র ও পবিত্র উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা পানি যখন অপবিত্র হয়ে যায়, তখন উভয়ের জন্য এর ব্যবহার অর্থহীন হবে। অপবিত্র ব্যক্তির জন্য পবিত্র পানি প্রয়োজন। পানি যেহেতু স্বয়ং অপবিত্র, তাই এটা কিভাবে অন্যকে পবিত্র করবে ? পবিত্র ব্যক্তি এরদ্বারা নিজেই অপবিত্র হয়ে যাবে। সুতরাং প্রথম অবস্থায় অপবিত্র বস্তু পবিত্র হতে পারবে না। আর দ্বিতীয় অবস্থায় পবিত্র বস্তুও অপবিত্র বস্তু হয়ে যাবে।

بَابُ الْوَضُوْءِ مِنْ سُوْرِ الْهِرَّةِ

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা উযূ করার বর্ণনা

٤٤ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنِ الشَّعْبِى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُـوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّـأَ ذَاتَ يَـوْمٍ فَـجَـاءَتِ الْهِـرَّةُ فَـشَـرِبَتْ مِنَ الْاِنَاءِ فَتَـوَضَّأَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَرَشَّ مَا بَقِىَ *

হাদীস নং- ৪৪

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) একবার উযূ করার ইচ্ছা করেন। এ সময় একটি বিড়াল এসে উযূর পানি থেকে পানি পান করে। তিনি ঐ পানি দ্বারা উযূ করেন এবং অবশিষ্ট পানি জমির মধ্যে ছিটিয়ে দেন।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা তাহাবী ও দারে কুতনী (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বিড়ালের দিকে থালা ঝুঁকিয়ে দিতেন যাতে বিড়াল এর থেকে পানি পান করতে পারে।

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র না অপবিত্র, এটা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আয়িম্মায়ে সালাসা (اَئِمَّه ثَلاَثَه) অর্থাৎ হযরত ইমাম শাফিঈ (র), হযরত ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে মাকরূহ ছাড়াই বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মাকরূহ তানযীহ। তিনজন আয়িম্মার দলীল উপরে বর্ণিত স্পষ্ট হাদীস। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, এই বিড়াল তোমাদের নিকটে ও আশেপাশে যাতায়াত ও গমনাগমন করে থাকে। এর উচ্ছিষ্ট পবিত্র। কেননা এর থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। ইমাম সাহেব (র)-এর মাকরূহ বলার দলীল একই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে হাদীসের বর্ণনামতে হুযূর (সা)-এর উযূ দ্বারা পানির পবিত্রতা প্রমাণিত হয়, কিন্তু হাদীসের শেষভাগে বলা হয়েছে وَرَشَّ مَابَقِىَ অর্থাৎ অবশিষ্ট পানি তিনি জমির উপর ছিটিয়ে দিয়েছেন। যাতে অন্য কেউ তা ব্যবহার করতে না পারে। কেননা ব্যবস্থা না থাকলে বাধ্য হয়ে এ পানি মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহার জায়েয; এটা তা'লীম দেওয়ার জন্যই হুযূর (সা) এই পানি ব্যবহার করেছেন। অন্যরা এই মর্যাদা কিভাবে লাভ করতে পারে ঃ বরং তারা এটা সাধারণ মনে করে ব্যবহার করতে থাকবে। তাই তিনি অবশিষ্ট পানি ফেলে দিয়েছেন। এর দ্বারা হুযূর (সা) উক্ত পানি মাকরূহ হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অন্য এক হাদীসে হুযূর (সা) বলেছেন ঃ এটা অপবিত্র নয় طَوَّافُوْنَ عَلٰى بُيُوْتِكُمْ অর্থাৎ এগুলো (বিড়ালগুলো) তোমাদের বাসস্থানে গমনাগমন করে থাকে।

এই বর্ণনার দ্বারা প্রকৃত বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি যদিও মাকরূহ কিন্তু বাধ্য হয়ে এটা জায়েয রাখা হয়েছে। অন্য এক হাদীসে আছে اَلْهِرَّةُ سَبُعٌ অর্থাৎ বিড়াল এক প্রকার হিংস্র জন্তু। সুতরাং অন্যান্য হিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্ট যেমনি অপবিত্র, তেমনি বিড়ালের উচ্ছিষ্টও অপবিত্র হওয়া উচিত। কিন্তু বিড়াল যেহেতু মানুষের গৃহপালিত পশুর মত। ফলে এর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র বলে গণ্য করা হলে মানুষের জন্য জীবন যাপন কষ্টকর হয়ে পড়বে। তাই আঁ হযরত (সা) طَوَّافُوْنَ عَلٰى بُيُوْتِكُمْ বলে উম্মতকে এ কষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন এবং ইমাম সাহেব (র) স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার দ্বারা এই মত ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র কিন্তু মাকরূহ তানযীহ।

ইসলামে অক্ষমতা ও সংকীর্ণতার সময় এ ধরনের সুযোগ সাধারণভাবে প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন ঘরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি প্রয়োজন। কিন্তু পবিত্র কুরআনে ওজরবশতঃ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ গোলাম ও শিশুদের জন্য তা রহিত করা হয়েছে ; বরং দীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একই উদ্দেশ্যে এ ধরনের সুযোগ দান করা হয়ে থাকে। কেননা দীন সংকীর্ণতার জন্য নয় ; বরং সংকীর্ণতা দূর করে তা সহজ সরল করার জন্য।

بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার বর্ণনা

٤٥ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُوْلُ عَلٰى سُبَاطَةِ قَوْمٍ قَائِمًا *

হাদীস নং- ৪৫

অনুবাদ ঃ হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোন এক কওমের ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে দেখেছি।

ব্যাখ্যা ঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা সম্পর্কে দু'প্রকার হাদীস বর্ণিত আছে। প্রথমতঃ অক্ষমতা ও ওজরের কারণে শরীয়ত এর অনুমতি প্রদান করেছে। দ্বিতীয়তঃ নাজায়েয বলে ঘোষণা। অনুমতি প্রদানের হাদীস হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। এই হাদীস সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে ইমাম আযম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কিছু অতিরিক্ত বাক্যের মাধ্যমে তা মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুমতি প্রদান করা বা নাজায়েয সম্পর্কিত হাদীস হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী, আহমদ ও নাসাঈ এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوْهُ مَاكَانَ يَبُوْلُ اِلاَّ قَاعِدًا "যে তোমাদের নিকট এ কথা বলে যে, নবী (সা) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন, তাকে তোমরা বিশ্বাস কর না। তিনি বসে ছাড়া প্রস্রাব করতেন না।" এ দু'টি হাদীস পরস্পর বিরোধী। সুতরাং দু'হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এইভাবে করা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা) আঁ হযরত (সা)-এর অতি নিকটবর্তী ছিলেন এবং তাঁর যাবতীয় অভ্যাস ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন আর হযরত হুযায়ফা (রা) একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা কোন ওজর বা অক্ষমতার কারণে ঘটে থাকতে পারে। কারণ এটা ছিল ঘরের বাইরের ঘটনা। তাই এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) অবগত ছিলেন না। সুতরাং উভয় হাদীস স্বীয় অবস্থানে সঠিক বলে গণ্য হবে। তবে সর্বদা পালনীয় নীতি পরিত্যাগ করে ওজর বা অক্ষমতার কারণে পালনীয় কোন বিশেষ ঘটনা দীনের স্থায়ী নীতি বা কোন মাসয়ালার ভিত্তি হতে পারে না। অবশ্য এ অক্ষমতা ও ওজর উক্ত বিষয়ে অনুমতি প্রদানের জন্য একটি কারণ হতে পারে। তাই উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা মাকরূহ তাহরীমী বা তানযিহী। কেননা এতে সতর বা লজ্জাস্থান অধিক খুলে যায় এবং দেহে অপবিত্র বস্তু লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু ভদ্রতা, নম্রতা ও মানবতা বিরোধী।

এবার আঁ হযরত (সা) যে জন্য দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন এ সম্পর্কে কয়েকটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ (১) হযরত (সা)-এর পিঠ ও কোমরে সে সময়ে ব্যথা ছিল, তাই তিনি বসতে অক্ষম ছিলেন। (২) স্থানটি উঁচু ছিল, এবং তিনি নীচে ছিলেন। যদি তিনি বসতেন, তাহলে প্রস্রাব তাঁর দিকেই প্রবাহিত হয়ে আসত। যদি তিনি উঁচুতে বসতেন, তা হলে পথ অতিক্রমকারীদের সামনে লজ্জাস্থান খুলে যেত, ফলে তিনি পর্দাহীন হয়ে যেতেন, যা তিনি অপসন্দ করতেন। (৩) মুসতাদরাকে হাকেম নামক গ্রন্থে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আঁ হযরত (সা)-এর হাঁটুতে ব্যথা ছিল, তাই তিনি বসতে অক্ষম ছিলেন। (৪) কোন কোন ফিকহবিদ বলেছেন ঃ এ

ঘটনার দ্বারা এটা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, অক্ষমতা বা ওজরের কারণে এ অবস্থা ক্ষমা ও অনুমোদনযোগ্য।

بَابُ عَدَمِ الْوَضُوْءِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

দুধপান করে উযূ না করা সম্পর্কে

٤٦ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَتَمَضْمَضَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ *

হাদীস নং- ৪৬

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি দুধপান করেছেন এবং কুল্লি করে নামায আদায় করেছেন কিন্তু (নতুনভাবে) উযূ করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে صَلَّى وَلَمْ يَتَبَوَضَّاء বাক্য নেই। তবে এতে اِنَّ لَه دَسَمًا (এতে চিকনাই হয়ে থাকে) এ বাক্য রয়েছে। এর অর্থ হলো যে, যদি উযূ থাকে, তাহলে দুধপান করার কারণে উযূ নষ্ট হবে না।

بَابُ عَدَمِ الْوَضُوْءِ مِنَ اللَّحْمِ

গোশত খাবার পর উযূ না করা সম্পর্কে

٤٧ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ اَكَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَقًا بِلَحْمٍ ثُمَّ صَلَّى *

হাদীস নং- ৪৭

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) বলেন, নবী করীম (সা) শুরুয়াসহ গোশ্‌ত খেয়েছেন, অতঃপর নামায আদায় করেছেন (কিন্তু নতুনভাবে উযূ করেননি)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে মাসায়ালা হলো আগুনে রন্ধনকৃত খাদ্যদ্রব্য আহার করা হলে উযূ নষ্ট হবে কিনা। উযূ নষ্ট না হওয়া সম্পর্কে এ হাদীসটি দলীল। বুখারী শরীফে সাঈদ ইবনে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আগুনে রন্ধনকৃত খাদ্যদ্রব্য খাবার পর উযূ করে থাক ? তিনি বললেন, না। কিন্তু ইমাম আহমদ (রা) স্বীয় মাযহাবের স্বপক্ষে হযরত বারা' ইবনে আযিব (রা) থেকে মরফূ' হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, আঁ হযরত

(সা) বলেছেন ঃ উটের গোশত খাওয়ার পর উযূ কর এবং বকরীর গোশত খাওয়ার পর নতুন উযূর প্রয়োজন নেই। উক্ত হাদীসও এই হাদীসের স্বপক্ষে গ্রহণ করা যায়। আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতে হযরত জাবির (রা)-এর ঐ হাদীস রয়েছে যা আবূ দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ হুযূর (সা)-এর সর্বশেষ আমল এটাই ছিল যে, আগুনের দ্বারা রন্ধনকৃত দ্রব্য খাওয়ার পর উযূ করেননি। অন্যান্যদের মতে উযূ নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আমির ইবনে রাবীআ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। মরফূ' ও মওকূফ হাদীসের মধ্যে কেউ কেউ এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, উযূর নির্দেশ হয়ত মুস্তাহাবের জন্য মানতে হবে অথবা উযূর দ্বারা আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ হাত ধৌত করা, কুল্লি করা– এখানে উযূর প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এতে কারো মতানৈক্য নেই। শুধু ইমাম আহমদ (র)-এর মতে উটের গোশত খাওয়ার পর উযূ নষ্ট হয়ে যায়।

بَابُ الْاَمْرِ بِالسِّوَاكِ

মিসওয়াক ব্যবহারের নির্দেশ

٤٨ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الزَّرَّادِ عَنْ تَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرَ بنِ اَبِى طَالِبٍ (رضـ) اَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اَرَاكُمْ قُلَّحًا اِسْتَاكُوْا فَلَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ –

وَفِى رِوَايَةٍ مَالِىَ اَرَاكُمْ تَدْخُلُوْنَ عَلَىَّ قُلَّحًا اسْتَاكُوا فَلَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى لاَمَرْتُهُمْ اَنْ يَسْتَاكُوا عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ اَوْ عِنْدَ كُلِّ وَضُوْءٍ *

হাদীস নং- ৪৮

অনুবাদ ঃ হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব (রা) বলেন, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কয়েকজন নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হলেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি হয়েছে যে, আমি তোমাদের দাঁত হলুদ দেখছি ? তোমরা মিসওয়াক কর। যদি আমি আমার উম্মতের উপর এটা কঠোর মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক নামাযে মিসওয়াক করার নির্দেশ প্রদান করতাম।

অন্য এক রিওয়ায়েতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, আমি দেখছি, তোমরা আমার নিকট আসছ অথচ তোমাদের দাঁত হলুদ দেখা যাচ্ছে, তোমরা মিসওয়াক কর। যদি আমি আমার উম্মতের উপর এটা কঠোর মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক নামায বা প্রত্যেক উযূর সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ প্রদান করতাম।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ সবাই এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মিসওয়াক করা ওয়াজিব নয়; এ হাদীসের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। মিসওয়াক করা মুস্তাহাবে মুয়াক্কাদা। বিশেষ করে যখন দাঁত হলুদ থাকে, মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয় অথবা নিদ্রা থেকে এইমাত্র জাগ্রত হয়েছে এবং নামায আদায়ের ইচ্ছা করে, তখন উযূ করার সময় মিসওয়াক করতে হবে।

যে সমস্ত রিওয়ায়েতে عِنْدَ كُلِّ وَضُوْءٍ বর্ণিত হয়েছে, সেখানে এর প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক উযূর সময় মিসওয়াক করতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মতামত। এবার যে সমস্ত রিওয়ায়েতে عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ বর্ণিত হয়েছে, এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, প্রতি নামাযের জন্য যে উযূ করা হয়, ঐ উযূর সময় মিসওয়াক করতে হবে। কেননা আঁ হযরত (সা)-এর আদেশের উদ্দেশ্য হলো এই যে, তিনি বলেন, আমার দৃষ্টিতে মিসওয়াকের মধ্যে যথেষ্ট উপকারিতা রয়েছে। কিন্তু মিসওয়াক ওয়াজিব হলে তোমাদের উপর যে কষ্ট হবে, যেমন কখনো তোমাদের নিকট মিসওয়াক থাকবে, আবার কখনো থাকবে না, কখনো তোমরা সফরে থাকবে, কখনো বাড়িতে থাকবে; কখনো সুস্থ থাকবে, আবার কখনো অসুস্থ থাকবে। মোটকথা, সর্বক্ষণ তোমাদের নিকট মিসওয়াক থাকবে না। সুতরাং ওয়াজিব আদায় না করলে এজন্য তোমাদের উপর শাস্তি আসবে। যেহেতু আমি তোমাদের উপর কোন কষ্ট হোক এটা পসন্দ করি না, তাই এর জন্য ওয়াজিব হিসেবে নির্দেশ প্রদান করি না। সুতরাং এখানে হুযূর (সা) উম্মতের সহজ পন্থাকে সামনে রেখে বিষয়টি বিবেচনা করছেন। যদি عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ এর প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে হয়, তাহলে উপরোক্ত জটিলতা দেখা দিবে। এছাড়া যদি এক উযূ দ্বারা চার ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হয়, তাহলে চারবার মিসওয়াক করতে হবে এবং এর ফলে অবশ্যই দাঁত থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে। উযূর মধ্যে পানি রক্ত প্রবাহ বন্ধ করে থাকে। কিন্তু নামাযে এটা সম্ভব নয়। সুতরাং এ অসুবিধাসমূহকে সামনে রেখে عِنْدَ كُلِّ وَضُوْءٍ এর রিওয়ায়েত অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ঐভাবে নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, ইবনে খুযায়মা, হাকেম স্বীয় সহীহ গ্রন্থসমূহে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْوَضُوْءِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا

উযূর মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিন-তিনবার ধৌত করা

٤٩ – حَمَّادٌ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ

عَلِيٍّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ (رضـ) اَنَّه تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلٰثًا وَمَضْمَضَ ثَلٰثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا وَغَسَلَ وَجْهَه ثَلٰثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلٰثًا وَمَسَحَ رَأْسَه وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ هٰذَا وَضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

হাদীস নং- ৪৯

অনুবাদ ঃ আবদে খায়ের (র) হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উযূ করার সময় তিনবার উভয় হাত ধৌত করেন, এরপর তিনবার কুল্লি করেন, তিনবার নাকে পানি দেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, তিনবার (কনুই পর্যন্ত) উভয় হাত ধৌত করেন এবং মাথা মাসেহ্ করেন ও উভয় পা ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এটাই হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উযূ করার পদ্ধতি।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস বিভিন্ন বাক্য দ্বারা আবদে খায়ের, আবূ হাইয়া, যির ইবনে হুবাইশ, আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা, ইবনে আব্বাস, নাযাল ইবনে সাবুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

٥٠ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّه دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلٰثًا وَتَمَضْمَضَ ثَلٰثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا وَغَسَلَ وَجْهَه ثَلٰثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلٰثًا وَمَسَحَ رَأْسَه ثَلٰثًا وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ هٰذَا وَضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّه دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلٰثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا وَغَسَلَ وَجْهَه ثَلٰثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلٰثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِه مَرَّةً وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ هٰذَا وَضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَامِلاً -

وَفِى رِوَايَةٍ اَنَّه دَعَا بِمَاءٍ فَاُتِىَ بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَطَسْتٌ قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ وَنَنْظُرُ اِلَيْهِ فَاَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى الاِنَاءَ وَكَفَاَه عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَه الْيُمْنٰى الاِنَاءِ فَهَلاَ يَدَه وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ فَعَلَ هٰذَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَه ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَخَذَ الْمَاءَ بِيَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَه مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ

قَدَمَيْهِ ثَلثًا ثَلثًا ثُمَّ غَرَفَ بِكَفِّهِ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى طَهُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهٰذَا طَهُوْرُهُ -

وَفِى رِوَايَةٍ اَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلٰثًا وَمَضْمَضَ ثَلٰثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ اَخَذَ مَاءً فِى كَفِّهِ فَصَبَّهُ عَلٰى صِلْعَةٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى طَهُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ تَوَضَّاءَ ثَلثًا ثَلثًا وَقَالَ هٰذَا وَضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَعْقُوْبَ يَعْنِى بِهِ مَنْ رَوَى عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ خَالِدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلثًا عَلٰى اَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى يَافُوْخِهِ ثُمَّ مَرَّ يَدَيْهِ اِلٰى مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ اِلٰى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَجَعَلَ ذٰلِكَ ثَلثَ مَرَّاتٍ وَاِنَّمَا ذٰلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً لِاَنَّهُ لَمْ يُبَائِنْ يَدُهُ وَلَا اَخَذَ الْمَاءَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَهُوَ كَمَنْ جَعَلَ الْمَاءَ فِى كَفِّهِ ثُمَّ صَعَّدَهُ اِلٰى كَوْعِهِ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ بَيَّنَ فِى الْاَحَادِيْثِ الَّتِى رُوِىَ عَنْهُ وَهُمُ الْجَارُوْدُ بْنُ يَزِيْدَ وَخَارِجَةُ بْنِ مُصْعَبٍ وَاَسَدُ بْنُ عُمَرَ اَنَّ الْمَسْحَ كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَبَيَّنَ اَنَّ مَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَا - قَالَ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرَةٌ عَلٰى هٰذَا اللَّفْظِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلثًا مِنْهُمْ عُثْمَانُ وَعَلِىٌّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَغَيْرُهُمْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ - قَالَ الْبَيْهَقِى وَقَدْ رُوِىَ مِنْ اَوْجُهٍ غَرِيْبَةٍ عَنْ عُثْمَانَ تَكْرَارَ الْمَسْحِ اِلَّا اَنَّهُ مَعَ خِلَافِ الْحُفَّاظِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ فَهَلْ كَانَ مَعْنَاهُ اِلَّا عَلٰى مَاذَكَرْنَا فَمَنْ جَعَلَ اَبَا حَنِيْفَةَ غَالِطًا فِى رِوَايَةِ

الْمَسحِ ثَلٰثًا فَقَدْوَهِمَ وَكَانَ هُوَ بِالْغَلَطِ اَوْلٰى وَاَخْلَقُ وَقَدْ غَلَطَ شُعْبَةُ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ غَلَطًا فَاحِشًا عِنْدَ الْجَمِيْعِ وَهُوَ رِوَايَةُ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ مَالِكِ بْنِ بَغْطَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ فَصَحَّفَ الْاِسْمَيْنِ وَفِى اِسْنَادِهٖ فَقَالَ بَدْلَ خَالِدٍ مَالِكٌ وَبَدْلَ عَلْقَمَةَ عُرْفُطَةُ وَلَوْ كَانَ هٰذَا لْغَلَطُ مِنْ اَبِى حَنِيْفَةَ لَنَسَبُوْهُ اِلَى الْجَهَالَةِ وَقِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ وَلَاَخْرَجُوْهُ مِنَ الدِّيْنِ وَهٰذَا مِنْ قِلَّةِ الْوَرَعِ وَاتِّبَاعِ الْهَوٰى *

হাদীস নং- ৫০

অনুবাদ ঃ আবদে খায়ের (র) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, (একবার) হযরত আলী (রা) পানি চাইলেন এবং এরদ্বারা তিনবার হাত ধৌত করেন, তিনবার কুল্লি করেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, তিনবার কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করেন, তিনবার মাথা মাসেহ করেন, এবং তিনবার পা ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এটাই হলো রাসূল করীম (সা)-এর উযূ করার পদ্ধতি।

ব্যাখ্যা ঃ ফাতহুল কাদীর নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা)-এর উযূর পদ্ধতি তেইশজন সাহাবা থেকে হুবহু বর্ণিত আছে। এঁদের মধ্যে হযরত আলী (রা) এবং হযরত উসমান (রা) রয়েছেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ ইবনে আসিম সর্বাধিক স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তাই এ অধ্যায়ে তাঁর বর্ণিত হাদীস মূল দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তিনি হযরত ওয়াহশী (রা)-র সাথে একত্র হয়ে মুসায়লামা (নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার)-কে হত্যা করেন। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম মালিক, ইমাম নাসাঈ (র) তাঁর থেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ঐ আবদুল্লাহ্ নন যিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আবদে রাব্বিহ নামে প্রসিদ্ধ এবং যিনি মুয়াযযিন ছিলেন।

কুল্লি ও নাকে পানি দেওয়া সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম শাফিঈর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেননা বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন বাক্য রয়েছে। কোন হাদীসে ثَلَاثَ غُرَفَات বাক্য রয়েছে অর্থাৎ হুযূর (সা) তিনবার অঞ্জলির মধ্যে পানি নিয়েছেন, কোন হাদীসে রয়েছে غُرَفَات وَاحِدَةً তিনি এক অঞ্জলি পানি নিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ (র) এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলেন যে, প্রত্যেকবার এক অঞ্জলি পানি নিয়েছেন; এরদ্বারা কুল্লিও করেছেন এবং নাকে পানিও দিয়েছেন। মোটকথা, তিনবার তিন অঞ্জলি পানি নিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) ثَلَاثَ غُرَفَات -এর দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যাখ্যা করেন যে, মুখমন্ডল ও নাক পৃথকভাবে পরিষ্কার করেছেন এবং উভয়টির জন্য তিনবার করে পানি নিয়েছেন। সুতরাং মোট ছয় অঞ্জলি পানি নিয়েছেন। ইমাম আযম (র) এই হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা এরদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুখমন্ডল ও নাকের জন্য পৃথকভাবে পানি নিয়েছেন এবং উভয়টির জন্য তিন

অঞ্জলি পানি নেওয়া সম্পর্কে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হযরত উসমান (রা)-এর হাদীসও এর স্বপক্ষে দলীল হিসেবে সাহায্য করে থাকে। এছাড়া আবূ দাউদে বর্ণিত হযরত তালহা ইবনে মুসাররাফ (রা)-এর হাদীস এ বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আঁ হযরত (সা) কুল্লি ও নাকে পানি দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য করতেন। কোন কোন মাযহাবের ইমাম এ হাদীসের বিরোধিতা করেছেন। তবে কিয়াস ইমাম সাহেবের মাযহাবকে জোর সমর্থন করে থাকে। কেননা মুখ ও নাক অন্যান্য অঙ্গের মত পৃথক পৃথক অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে কেন এক অঙ্গ মনে করা হবে ? সুতরাং ধর্মীয় মূলনীতি অনুযায়ী যে রিওয়ায়েত কিয়াসের অনুরূপ, তা দলীল হিসেবে অধিক গ্রহণযোগ্য।

আবদে খায়ের থেকে অপর একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা) পানি নিয়ে তিনবার হাত ধৌত করেন। তিনবার নাকে পানি দেন, তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করেন, তিনবার কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করেন, একবার মাথা মাসেহ করেন এবং তিনবার পা ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এটাই হলো রাসূল করীম (সা)-এর পূর্ণাঙ্গ উযূ (অর্থাৎ এতে ফরয, সুন্নত ও মুস্তাহাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রা) পানি চাইলে তাঁর নিকট পানির একটি কলস ও একটি থালা বা ঘটি আনা হলো। হযরত আবদে খায়ের (র) বলেন, আমি তাঁকে দেখছিলাম যে, তিনি ডান হাতে ঘটি থেকে পানি নিয়ে বাঁ হাতে পানি ঢালেন। অতঃপর তিনবার হাত ধৌত করেন। অতঃপর ডান হাতে পানি নিয়ে কুল্লি করেন এবং তিনবার নাকে পানি দেন। এরপর তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করেন এবং এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মাথা একবার মসেহ করেন। এরপর দু'পা তিনবার করে ধৌত করেন। তারপর এক অঞ্জলী পানি নিয়ে পান করেন। অতঃপর বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উযূ দেখতে ইচ্ছা করে (সে যেন দেখে), এটাই হলো হুযূর (সা)-এর উযূ করার পদ্ধতি।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তিনি পানি চেয়ে নিলেন। অতঃপর দু'হাত তিনবার ধুলেন, তিনবার কুল্লি করলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন, এরপর দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন, এরপর এক অঞ্জলী পানি নিয়ে মাথায় দিলেন এবং বললেন, যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উযূ দেখতে চায়, তবে দেখুক তা এইরূপ।

আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াকূব, হযরত আবূ হানীফা (র) থেকে, তিনি হযরত খালিদ (রা) থেকে, তিনি বলেন যে, নবী (সা) এভাবে তিনবার মাথা মাসেহ করেন যে, স্বীয় হাত কপালের উপর রেখে ধীরে ধীরে তা মাথার পিছনের দিকে নিয়ে যান, এরপর পুনরায় তা কপালের দিকে নিয়ে আসেন। এভাবে তিনবার করে মাসেহ করেন। কেননা এতে হাত মাথা থেকে পৃথক হয়নি এবং তিনবার পানি পরিবর্তন করা হয়নি। এখানে ঐ হাদীসসমূহ লক্ষণীয় যা জারুদ ইবনে যায়দ, খারিজা ইবনে মিসআর এবং আসাদ ইবনে উমর (র) হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ মাসেহ একবার ছিল যা উপরে বর্ণনা করা হল, এটাই সঠিক। হযরত আবূ হানীফা (র) বলেন, সাহাবা (রা)-দের এক বিরাট জামাআত থেকে এটাই বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) তিনবার মাথা মাসেহ করেছেন। এদের মধ্যে হযরত উসমান (রা), হযরত আলী

(রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) ও অন্যান্যগণ ছিলেন। আল্লামা বায়হাকী (র) বলেন, মাথা মাসেহ সম্পর্কিত হাদীস হযরত উসমান (রা) থেকে দুর্বল পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু হাদীসের হাফিযদের রিওয়ায়েতের বিরোধী এবং আহলে ইল্‌ম পন্ডিত ব্যক্তিদের নিকট তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এবার তিনবার মাসেহ করার রিওয়ায়েতে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দিকে ভুলের যে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা মূলত শু'বা (র) বর্ণিত ঐ হাদীসের সনদে সমস্ত মুহাদ্দিসগণের নিকট ভুল রয়েছে। তা হলো এই যে, এই হাদীস মালিক ইবনে বাগতা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আবদে খায়ের থেকে এবং তিনি হযরত আলী (রা) থেকে। কিন্তু বর্ণনার সময় পিতা-পুত্রের নামের মধ্যে ভুলে পরিবর্তন হয়ে গেছে। খালিদের স্থলে মালিক এবং আলকামার স্থানে আরাফাত লিপিবদ্ধ হয়। যদি আবূ হানীফা (র) থেকে এই ভুল প্রকাশ হতো, তাহলে বিরোধিগণ বলতেন, তিনি ইল্‌মে হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ, ইল্‌মে দীনের ব্যাপারে তাঁর প্রতি বিরূপ মন্তব্য করা হতো। কিন্তু এ সমস্ত বিরূপ মন্তব্য তাক্‌ওয়ার স্বল্পতা এবং মনের আবেগের বশবর্তী ও অনুসরণের কারণেই হতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ মাথা মাসেহ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম শাফিঈ (র)-এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম সাহেবের মতে একবার মাসেহ করা সুন্নত, ইমাম শাফিঈ-এর মতে তিনবার মাসেহ করা সুন্নত এবং প্রত্যেকবার নতুন পানি নিতে হবে। ইমাম শাফিঈ (র) এটা গোসলের উপর কিয়াস (অনুমান) করেছেন এবং হাদীস تَوَضَّأَ ثَلَاثًا -কে সামনে রেখেছেন। অর্থাৎ হুযূর (সা) প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনবার করে ধৌত করেছেন।

কেননা উযূ গোসল ও মাসেহ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। ইমাম আযম (র)-এর দলীল হলো ঐ হাদীস যাতে একবার মাসেহ করার নির্দেশ রয়েছে। এটাই মতপার্থক্যের কারণ। তাই দারে কূতনী ইমাম আবূ ইউসূফ-এর সূত্রে ইমাম সাহেব (র)-এর রিওয়ায়েত বর্ণনা করে সর্বপ্রথম এই বিরোধিতা করেন যে, انَّ اَبَا حَنِيْفَةَ خَالَفَ الْحُفَّاظ فِى ذٰلِكَ فَقَالَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَانَّمَا هُوَ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ خِلَافِهِ اِيَّاهُمْ قَالَ انَّ السُّنَّةَ فِى الْوَضُوْءِ مَسْحُ الرَّأْسِ مَرَّةً অর্থাৎ "আবূ হানীফা (র) এখানে হাদীসের হাফিযদের বিরোধিতা করেছেন এবং যারা তিনবার মাসেহ করার কথা বলেছেন, তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, উযূর মধ্যে একবার মাসেহ করা সুন্নত।" অথচ এখানে সন্দেহ করা অর্থহীন। ইমাম সাহেবের রিওয়ায়েতে تثليث শব্দ রয়েছে। কিন্তু শাফিঈ (র)-এর মতানুযায়ী তিনবার নতুন পানি নিয়ে মাসেহ করতে হবে– এটা অর্থ নয়; বরং নতুন পানি না নিয়ে শুধু তিনবার মাথা মাসেহ করতে হবে এবং প্রত্যেকবারেই যখন হাত মাথা থেকে যখন পৃথক করা হয়নি, তখন এটা বাস্তবে একবার মাসেহ করা হবে, তিনবার কিভাবে হতে পারে ? হিদায়া নামক গ্রন্থে মাসেহ করার পদ্ধতি এটাই বর্ণিত হয়েছে। এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, গোসলের কষ্ট থেকে এতে একটু সুযোগ এবং পবিত্রতার মধ্যে একটু অবকাশ দেওয়া হয়েছে। যদি তিনবার নতুন পানি নেওয়া হয়, তাহলে এটাতো গোসলই হয়ে যায়, মাসেহ থাকে না। অবকাশ ও সুযোগ দূরীভূত হয়ে যায়। ফলে মাসেহ করার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে যায়। সুতরাং কিয়াস ও বিবেক অনুযায়ী একবার মাসেহ করাই বিধিসম্মত। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব।

٥١ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حُمْرَانَ (رضـ) مَوْلٰى عُثْمَانَ (رضـ) اَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ *

হাদীস নং- ৫১

অনুবাদ ঃ হযরত উসমান (রা)-এর গোলাম হুমরান (রা) হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উযূর মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনবার করে ধৌত করেছেন এবং বলেছেন ঃ আমি এভাবেই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উযূ করতে দেখেছি।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাব অনুযায়ী এ হাদীস দ্বারা তিনবার মাসেহ করার প্রমাণ গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর রিওয়ায়েতে تثليث শব্দ যখন ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটা মাযহাবের বিরোধী, তখন এর উপর কঠোর সমালোচনা শুরু হয়। কেননা تثليث -এর মাযহাব খুবই দুর্বল এবং সহীহ রিওয়ায়েতে এর প্রমাণ নেই। ফলে বিষয়টি নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। সুতরাং কেউ কেউ এটাকে অস্বীকার করেন। ইমাম তিরমিযী একবার মাসেহ করার পক্ষে মত পোষণ করেছেন। ইমাম ইবনে হাজার (র) ফাতহুল বারী নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ انه لَم يَرو فى طريق من الصالحين ذكر عدد المسح وعليه اكثر العلماء الا الشافعى هو القائل بالتثليث "বুখারী ও মুসলিম শরীফের কোন রিওয়ায়েতে একবারের অধিক মাসেহ করার কোন বর্ণনা নেই। ইমাম শাফিঈ (র) ব্যতীত অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এ মাযহাবের উপর বিশ্বাসী।"

بَابُ الْوَضُوْدِ مَرَّةً مَرَّةً

উযূতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক-একবার করে ধৌত করা

٥٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اِبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً *

হাদীস নং- ৫২

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) একবার করে উযূ করেছেন। অর্থাৎ উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একবার একবার করে ধৌত করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে, হুযূর (সা) উযূর মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একবার একবার ধৌত করেছেন। একবার ধৌত করা ওয়াজিব, দু'বার ধৌত করাও জায়েয। কিন্তু সুন্নত হলো তিনবার ধৌত করা।

٥٣ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِّلْعَوَاقِبِ مِنَ النَّارِ *

হাদীস নং- ৫৩

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জাহান্নামের মধ্যে ওয়ায়েল রয়েছে পায়ের গোড়ালির জন্য।

ব্যাখ্যা ঃ জাহান্নামের একটি গহ্বরের নাম ওয়ায়েল। যারা উযূর সময় পায়ের গোড়ালী শুষ্ক রাখবে, তাদের জন্য জাহান্নামের উক্ত স্থানে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। অধিকন্তু উযূর মধ্যে কোন অঙ্গ শুষ্ক রাখা যাবে না। বিশেষভাবে পায়ের গোড়ালি সম্পর্কে এজন্য শাস্তির কথা বলা হয়েছে যে, দ্রুত ও অসাবধানতার কারণে অধিকাংশ সময় পায়ের গোড়ালী শুষ্ক থেকে যায় এবং এ সামান্য অসাবধানতার কারণে সমস্ত উযূ নষ্ট হয়ে যায়। কোন কোন রিওয়ায়েতে পায়ের পাতাও এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত।

بَابُ نَضْحِ الْفَرَجِ بِفَضْلِ الْوَضُوْءِ

উযূর উদ্বৃত্ত পানি লজ্জাস্থানে ছিঁটিয়ে দেওয়া

٥٤ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيْفٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ اَوِابْنُ الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخَذَ حَفْنَةً مِّنْ مَاءٍ فَنَضَحَهُ فِى مَوَاضِعِ طَهُوْرِهِ *

হাদীস নং- ৫৪

অনুবাদ ঃ হযরত হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম (সা) উযূ করেন এবং এক অঞ্জলি পানি নিয়ে স্বীয় লজ্জাস্থানে ছিঁটিয়ে দেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের উপর শীআ, রাফিজীসহ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত অনেকেই সমালোচনা করেছেন। অজ্ঞতার কারণে হুযূর (সা)-এর পবিত্র জীবনের অনেক বিষয় নিয়ে পথভ্রষ্ট ও ইসলাম বিদ্বেষীগণ সমালোচনা করেছে। আমরা আঁ হযরত (সা)-এর প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস স্থাপন করে বিরোধীদের সমালোচনার জওয়াবে বলতে চাই, হুযূর (সা)-এর এই পবিত্র তালীম এজন্য ছিল যে, মানুষ সাধারণত সন্দেহপ্রবণ। এ সন্দেহের কারণে ইবাদতে ত্রুটি হওয়ার আশংকা থাকে। তাই লজ্জাস্থানে পানি ছিঁটানোর অর্থ হলো এই যে, কারো প্রস্রাবের দ্বারা অপবিত্র হওয়ার সন্দেহ থাকলে এরদ্বারা তা দূর হয়ে যাবে। যদি হুযূর (সা)-এর প্রতি সত্যিকার মহব্বত থাকে, তাহলে কোন প্রকার বিরোধিতা না করে এ হাদীসের উপর আমল করতে হবে। কারণ এ বিধান হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হুযূর (সা)-এর নিকট নিয়ে এসেছেন।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

মোযার উপর মাসেহ করা

٥٥ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ - قَالَتِ ائْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ فَانَّه كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُرَيْحٌ فَاَتَيْتُ عَلِيًّا فَقَالَ لِى اِمْسَحْ *

হাদীস নং- ৫৫

অনুবাদ ঃ হযরত শুরাইহ্ (র) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি মোযার উপর মাসেহ করতে পারব ? [অর্থাৎ হুযূর (সা) থেকে কি এর প্রমাণ আছে যে, আমিও এরূপ করতে পারব ?] হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তুমি হযরত আলী (রা)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। কেননা তিনি নবী (সা)-এর সাথে সফর করতেন। হযরত শুরাইহ্ (র) বলেন, অতঃপর আমি হযরত আলী (রা)-র নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি (মোযার উপর) মাসেহ কর।

ব্যাখ্যা ঃ মোযার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে হাদীস মুতাওয়াতিরের সীমা পর্যন্ত পৌছেছে। কেউ কেউ বলেছেন ঃ এ হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা আশি পর্যন্ত পৌছেছে। এঁদের মধ্যে আশারায়ে মুবাশ্শারাও রয়েছেন। তাই পূর্ববর্তীদের মধ্যে কেউ এর মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি করেননি। অবশ্য ইমাম মালিক (র) থেকে একটি দুর্বল রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুকীমের (বাড়িতে অবস্থানকারী) জন্য মোযার উপর মাসেহ করা জায়েয মনে করেননি। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, মোযার উপর মাসেহ করা আমি তখনও জায়েয মনে করিনি, যতক্ষণ না এ বিষয়ের উপর হাদীস ও আসার আমার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হিদায়ার গ্রন্থকার বলেছেন ঃ মাসেহ সম্পর্কে হাদীস যেহেতু মশহুর, তাই মাসেহ্ অমান্যকারী হলো বিদআতী। আল্লামা কারখী (র) বলেন, আমি এই ব্যাপারে কুফরীর ভয় করে থাকি। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, আল্লাহ্র বাণী ঃ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ এর দ্বারা মোযার উপর মাসেহ জায়েয করে বান্দার উপর এক বিরাট করুণা ও সহজ পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এটাকে সুন্নত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যে ইচ্ছা করে, পা ধৌত করে উযূর সওয়াব লাভ করবে। যে ইচ্ছা করে, মাসেহ করে উপকারিতা লাভ করবে এবং সুন্নতের সওয়াবও লাভ করবে। বরং উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, যদি মানুষ খারিজী ও রাফিজীদের বিরোধিতা করতে ইচ্ছা করে, তাহলে তাদের মুকাবিলার জন্য মাসেহ করলে এতে পা ধৌত করার চেয়ে বেশি সওয়াব লাভ করবে।

٥٦ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَصَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ *

হাদীস নং- ৫৬

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (একবার) উযূ করেন এবং মোযার উপর মাসেহ করেন। অতঃপর এরদ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন।

ব্যাখ্যা ঃ কারো কারো ধারণা হলো এই যে, মোযার উপর মাসেহ করা এটা অপূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা (طَهَارَت نَاقِصَه)। কিন্তু হুযূর (সা)-এর মোযার উপর মাসেহ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার ফলে উপরোক্ত বাতিল ধারণাটি খন্ডন হয়ে যায়।

٥٧ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اِبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَه عُمَرُ مَا رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ هٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْدًا صَنَعْتُ يَاعُمَرُ *

হাদীস নং- ৫৭

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) মক্কা বিজয়ের দিন একই উযূ দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন এবং মোযার উপর মাসেহ করেন (যা পূর্বে কখনো করেননি)। হযরত উমর (রা) আরয করলেন, (হে আল্লাহর রাসূল (সা)!) আজকের পূর্বে তো আপনাকে কখনো এরূপ করতে দেখিনি। তখন নবী (সা) বলেন ঃ হে উমর! আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করেছি।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে হযরত উমর (রা)-এর অবাক হওয়ার মূলত দুটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ এই যে, হুযূর (সা) উযূর মধ্যে পা ধৌত না করে মাসেহ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ একই উযূ দ্বারা তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন। আঁ হযরত (সা) عَمْدًا صَنَعْتُ يَاعُمَرُ এ বাক্যের দ্বারা দু'টি বিষয়কে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মোযার উপর মাসেহ করা শরীয়ত জায়েয রেখেছে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন উযূ করা আমার জন্য ফরয বা ওয়াজিব নয়। আমিও তোমাদের মত একই উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারি। আঁ হযরত (সা) এর দ্বারা হযরত উমর (রা)-এর সামনে বিশেষভাবে মাসেহের গুরুত্ব সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। নতুবা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই মাসেহ জায়েয করা হয়েছে। এর জায়েয হওয়ার সূচনা মক্কা বিজয়ের সাথে

হয়নি। হুযূর (সা) অতীত জীবনে কখনো এরূপ করেননি; বরং মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন উযূ করতেন। সম্ভবতঃ তিনি মুস্তাহাবের উপর আমল করেছেন, ফরয হওয়ার কারণে নয়।

অথবা পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ -এর উপর আমল করার জন্য তিনি নতুন উযূ জরুরী মনে করেছিলেন। কারো কারো মতে এ আয়াত শুধু অপবিত্রতার জন্যই নয়, বরং পবিত্র অপবিত্র সবার জন্য। অর্থাৎ যখন তোমরা নামাযের ইচ্ছা করবে, তখন নতুন উযূ কর। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, হযরত সাআদ (রা) সমস্ত নামায এক উযূদ্বারা আদায় করতেন এবং হযরত আলী (রা) প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন উযূ করতেন। হযরত দারিমী (র) বলেন, হুযূর (সা)-এর উপরোক্ত আমল দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উক্ত আয়াত শুধু অপবিত্রতার জন্য। তিনি দলীল হিসেবে এ হাদীস পেশ করেন لَاوُضُوْءَ اِلَّا مِنْ حَدَثٍ অর্থাৎ অপবিত্রতার জন্যই উযূ। যদি উযূ ভেঙ্গে যায়, তাহলে উযূ কর। নতুবা করো না। অথচ এই ইঙ্গিতের জন্য কোন বিশেষ দলীল নেই। মোটকথা, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উযূ করা আঁ হযরত (সা)-এর জন্যও ফরয ছিল, এ আয়াতের দ্বারা হোক বা অন্য আয়াতের দ্বারা এবং মক্কা বিজয়ের সময় ঐ ফরয রহিত হয়ে যায়। এ রহিত হওয়াকে আঁ হযরত (সা) স্বীয় আমলের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করেছেন। এটাও সাথে সাথে মানতে হবে যে, উম্মতের উপর উযূর নিয়মানুবর্তিতা ছিল না। কেননা বুখারী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করতেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, তখন আপনারা কি করতেন ? তিনি বললেন, উযূ নষ্ট না হলে একই উযূ আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। এমনিভাবে তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা তাদের মতামতকে খন্ডন করা হয়েছে যারা বলেন, সকলের উপর নতুন উযূ করা ফরয এবং মক্কা বিজয়ের পর তা বাতিল হয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারী (র) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, আঁ হযরত (সা)-ই আমলের দ্বারা মাসেহ জায়েয হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং উপরোক্ত আয়াত বাতিল (মানসূখ) না হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। বরং اَرْجُلَكُمْ শব্দে যের ও জবর (ـِ ও ـَ) উভয় কিরাআত নিজ নিজ অর্থে ব্যবহৃত হবে। জবর হলে উভয় পা ধৌত করার উপর এবং যের হলে মোযার উপর মাসেহ করার অর্থে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এ ধারণাও বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। কেননা মাসেহ করার জন্য গোড়ালির সীমা নেই কিন্তু এখানে সীমা রয়েছে।

٥٨ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ اَبِى اُمَيَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ مَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ *

হাদীস নং- ৫৮

অনুবাদ ঃ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল করীম (সা)কে সূরা মায়িদা নাযিল হওয়র পরও মোযার উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

ব্যাখ্যা ঃ ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত ইবরাহীম (র) সূত্রে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত জারীর (র) প্রস্রাব করেন এবং উযূ করার পর মোযার উপর মাসেহ করেন। লোকজন অবাক হয়ে তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, আমি হুযূর (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। লোকজনের অবাক হওয়ার কারণ হল এই যে, যাঁরা মোযার উপর মাসেহ করার স্বপক্ষে নন, তাদের মাসেহ সূরা মায়িদা নাযিল হওয়ার পূর্বে ছিল। এরপর শুধু গোসলকারী থাকে। এই সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য হযরত জারীর (রা) বলেন, আমি আঁ হযরত (সা)-কে সূরা মায়িদা নাযিল হওয়ার পর মোযার উপর মাসেহ করতে দেখেছি। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে, مَا اَسْلَمْتُ اِلاَّ بَعدَ نُزُوْلَ الْمَائدَة অর্থাৎ তিনি বলেছেন, আমি সূরা মায়িদা নাযিল হওয়ার পর মুসলমান হয়েছি।

٥٩ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ رَاَى جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَسَأَلَه عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُه وَاِنَّمَا صَحِبْتُه بَعْدَ مَا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ *

হাদীস নং- ৫৯

অনুবাদ ঃ হাম্মাম ইবনে হারিস (র) হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে দেখেন যে, তিনি উযূ করলেন অতঃপর মোযার উপর মাসেহ করলেন। তখন হযরত হাম্মাম তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হযরত জারীর (রা) বলেন, আমি হুযূর (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছি এবং সূরা মায়িদা নাযিল হওয়ার পর আমার সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। অর্থাৎ তখন আমি মুসলমান হয়েছি।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত জারীর (রা) আঁ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের চল্লিশ দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

٦٠ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضـ) اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضٰى حَاجَتَه ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُوْمِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ

فَرَفَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ضِيْقِ كُمِّهَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَجَعَلْتُ اَصَبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ مِنْ اِدَاوَةٍ مَعِىَ فَتَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ وَلَمْ يَنْزَعْهُمَا ثُمَّ تَقَدَّمَ وَصَلّٰى *

হাদীস নং- ৬০

অনুবাদ ঃ হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) বলেন, আমি একবার রাসূল (সা)-এর সাথে সফরে বের হয়েছিলাম (তাবূকের দিকে)। (পথিমধ্যে) হুযূর (সা) ইস্‌তিন্‌জা করার জন্য একটু দূরে গমন করেন এবং তা শেষ করে ফিরে আসেন। তিনি সংকীর্ণ ও চাপা রূমী জুব্বা পরিধান করেছিলেন। তিনি এটা উপরে উঠাতে চাইলেন কিন্তু হাত থেকে আস্তিন উঠছিল না। তাই তিনি জুব্বা উপরে উঠিয়ে নিলেন। হযরত মুগীরা (রা) বলেন, আমার নিকট যে চামড়ার পাত্র ছিল, আমি এরদ্বারা পানি ঢালছিলাম। হুযূর (সা) নামাযের জন্য উযূ করেন এবং মোযা না খুলে এর উপর মাসেহ করেন। অতঃপর সামনে গিয়ে নামায আদায় করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ ঘটনা বিভিন্ন বাক্যের পার্থক্য সহকারে সিহাহ্ সিত্তাহ নামক ছয়টি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এ সমস্ত রিওয়ায়েত থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা উদ্ভাবিত হয়। তা হলো এই যে, হযরত মুগীরা (রা) বলেন, গাযওয়ায়ে তাবূকে আমি হুযূর (সা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি পথিমধ্যে বাহনটি থামালেন এবং ইস্‌তিন্‌জা করার জন্য একটু দূরে গমন করেন। ফিরে আসার পর আমি তাঁর হাতে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি হাত ধৌত করলেন, অতঃপর মুখমন্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করলেন। এরপর মাথা মাসেহ করেন। অতঃপর মোযার উপর মাসেহ করেন। উযূ শেষ করার পর আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলাম, লোকজন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-কে ইমাম বানিয়ে ফজর নামায আদায় করছে। হযরত আবদুর রহমান (রা) সালাম ফিরালেন। তখন হুযূর (সা) এক রাকআত পূর্ণ করলেন। আঁ হযরত (সা)-কে ছেড়ে নামায আদায় করায় লোকজন ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে অভয় দিয়ে বললেন ঃ তোমরা ঠিকই করেছ।

উপরোক্ত হাদীস ও বর্ণিত ঘটনা থেকে আমরা কয়েকটি মাসয়ালা ও এর সমাধান পেয়ে থাকি। যেমন ঃ আঁ হযরত (সা) যে জুব্বা পরিধান করেছিলেন, এর হাতা চাপা ছিল। সুতরাং এরদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চাপা হাতাওয়ালা জামা পরিধান করা যাবে। বিশেষ করে জিহাদে যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে এই ধরনের জামা পরিধান করা জায়েয আছে। দ্বিতীয়তঃ যদি সওয়াবের আশায় কেউ দ্বিতীয়বার নতুন উযূ করে, তাহলে এটা জায়েয হবে। তৃতীয়তঃ মোযার উপর মাসেহ করার মাসয়ালাটির সমাধান হয়েছে এবং اَمْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ -এর সন্দেহ দূরীভূত হয়েছে। চতুর্থতঃ উক্ত হাদীস দ্বারা এটাও প্রতীয়মান হল যে, যদি সময় সংকীর্ণ হয় তাহলে ইমামের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। এছাড়া এটাও প্রতীয়মান হল যে, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্নের পিছনে নামাযে ইকতিদা করতে পারবে। কেননা আঁ হযরত (সা) স্বীয় উম্মতের একজনের পিছনে নামায আদায় করেছেন। পঞ্চমতঃ এটাও প্রমাণিত

হয় যে, মোযা পরিধানের সময় পা পবিত্র হওয়া শর্ত। কেননা এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুগীরা (রা) মোযা খোলার জন্য সামনে ঝুঁকেন, তখন হুযূর (সা) বলেন, না, খুলতে হবে না। কেননা আমি পা পবিত্র অবস্থায় মোযা পরিধান করেছি।

٦١ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضـ) قَالَ وَضَّأْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُوْمِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَاَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِهَا وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ – وَفِى رِوَايَةٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَاَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ اَسْفَلِ الْجُبَّةِ *

হাদীস নং- ৬১

অনুবাদ ঃ হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উযূ করালাম। এ সময় তিনি চাপা হাতওয়ালা রূমী জুব্বা পরিধান করেছিলেন। তিনি জুব্বার নীচ থেকে হাত বের করেন এবং মোযার উপর মাসেহ করেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তিনি মোযার উপর মাসেহ করেন। এ সময় তিনি চাপা হাতওয়ালা শামী জুব্বা পরিধান করেছিলেন। তিনি জুব্বার নীচ থেকে হাত বের করেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে একই জুব্বার কথা বলা হয়েছে। কোথাও রূমী নামে আবার কোথাও শামী নামে ; কিন্তু ঘটনা একই।

٦٢ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ *

হাদীস নং- ৬২

অনুবাদ ঃ হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে (মোযার উপর) মাসেহ করতে দেখেছি।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস হযরত মুগীরা (রা)-এর বিস্তারিত হাদীসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

٦٣ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ اَبِى الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى غَزْوَةٍ فِى الْعِرَاقِ فَاِذَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ اِذَا قَدِمْتَ عَلٰى اَبِيْكَ

فَسْئَلَه عَنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاَتَيْتُه فَسَأَلْتُه فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ فَمَسَحْنَا -

وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ قَدِمْتُ الْعِرَاقَ لِلْغَزْوِ فَاِذَا سَعَدُ بْنُ مَالِكٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ مَاهٰذَا - قَالَ اِذَا قَدِمْتَ عَلى عُمَرَ (رضـ) فَسْئَلْه - فَقَالَ قَدِمْتُ عَلى عُمَرَ فَسْأَلْتُه - فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ فَمَسَحْنَا -

وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ قَدِمْتُ الْعِرَاقَ لِغَزْوَةٍ جَلُوْلاَ فَرَأَيْتُ سَعَدَ بْنَ اَبِى وَقَّاصٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ - فَقُلْتُ مَا هٰذَا يَا سَعَدُ - فَقَالَ اِذَا لَقِيْتَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاسْأَلْه - قَالَ فَلَقِيْتُ عُمَرَ فَاَخْبَرْتُه بِمَا صَنَعَ - فَقَالَ عُمَرُ صَدَقَ سَعَدٌ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُه فَصَنَعْنَا -

وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ قَدِمْنَا عَلى غَزْوَةِ الْعِرَاقِ فَرَأَيْتُ سَعَدُ بْنُ اَبِى وَقَّاسٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاَنْكَرْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِى اِذَا قَدِمْتَ عَلٰى عُمَرَ (رضـ) فَاسْأَلْه عَنْ ذٰلِكَ - قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ سَأَلْتُه وَذَكَرْتُ لَه مَاصَنَعَ سَعَدٌ - فَقَالَ عَمُكَ اَفْقَهُ مِنْكَ - رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ فَمَسَحْنَا *

হাদীস নং- ৬৩

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি জিহাদের উদ্দেশ্যে ইরাক গমন করি। সেখানে হযরত সাআদ ইবনে মালিক (রা)-কে মোযার উপর মাসেহ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম; হযরত! এটা কি ? তিনি বললেন ঃ হে ইবনে উমর ! যখন তুমি তোমার পিতার নিকট যাবে, তখন এ সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করবে। হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, অতঃপর আমি আমার পিতার নিকট ফিরে আসার পর তাঁর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমি হুযূর (সা)-কে (মোযার উপর) মাসেহ করতে দেখেছি। অতঃপর আমরাও মাসেহ করা শুরু করি।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে যে, কোন এক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে একবার আমি ইরাক গমন করি। সেখানে গিয়ে আমি হযরত সাআদ (রা)-কে মোযার উপর মাসেহ করতে দেখি। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম; এটি আবার কি ? তিনি আমাকে বললেন ঃ হযরত উমরের নিকট যাওয়ার পর তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, অতঃপর আমি বাড়ি ফিরে এসে এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে (মোযার উপর) মাসেহ করতে দেখেছি। তাই আমরাও মাসেহ করতে শুরু করেছি।

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, আমি গাযওয়ায়ে জলুলায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ইরাক পৌছি। সেখানে হযরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা)-কে মোযার উপর মাসেহ করতে দেখি। আমি তাকে বললাম, হে সাআদ, এটা কি ? তিনি আমাকে বললেন ঃ যখন তুমি আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করবে, তখন তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে। অতঃপর ফিরে এসে আমি হযরত উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। হযরত উমর (রা) বললেন ঃ হযরত সাআদ (রা) সত্যবাদী। আমি হুযূর (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। তখন আমরাও এরূপ (মাসেহ) করেছি।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, আমরা জিহাদের জন্য ইরাক গমন করি। তখন সেখানে হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে মোযার উপর মাসেহ করতে দেখি। আমি এটাকে নতুন পদ্ধতি মনে করলাম। তখন হযরত সাআদ (রা) আমাকে বললেন ঃ যখন তুমি হযরত উমর (রা)-এর নিকট যাবে, তখন এ বিষয়ে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করবে। ইবনে উমর (রা) বলেন, যখন আমি হযরত উমর (রা)-এর নিকট পৌছি, তখন আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তোমার চাচা (হযরত সাআদ) তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও ফকীহ্! আমি হুযূর (সা)-কে (মোযার উপর) মাসেহ করতে দেখেছি। তখন আমরাও মাসেহ করেছি।

ব্যাখ্যা ঃ মুহাদ্দিসীনের একটি দল কর্তৃক এই হাদীস বর্ণিত আছে। বুখারী শরীফে মরফূ' হাদীসে এভাবে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা)-এর নিকট মোযার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তখন বললেন ঃ যখন হযরত সাআদ (রা) তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করে, তখন অন্য কারো নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না।

এই মাসয়ালা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর অবগত না হওয়া এই কারণে ছিল যে, এ যাবত উক্ত মাসয়ালা সম্পর্কে প্রথম থেকে কোন খবর তাঁর নিকট পৌছেনি। অথবা তিনি এটা ধারণা করেছিলেন যে, মোযার উপর মাসেহ করা শুধু সফরের জন্যই প্রযোজ্য, স্থায়ী আবাসে নয়। তাই হযরত সাআদ (রা)-কে যখন স্থায়ী আবাসে মাসেহ করতে দেখেন, তখন অবাক হয়ে গেলেন এবং হঠাৎ তা মেনে নিতে পারেননি। তাই অবশেষে স্বীয় পিতার নিকট থেকে এ মাসয়ালা সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হলেন।

٦٤ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّه تَنَازَعَ اَبُوْهُ وَسَعْدُ بْنُ اَبِى وَقَّاصٍ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ سَعْدٌ اَمْسَحُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَا يُعْجِبُنِى قَالَ سَعْدٌ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ (رضـ) فَقَالَ عُمَرُ عَمُّكَ اَفْقَهُ مِنْكَ سُنَّةً *

হাদীস নং- ৬৪

অনুবাদ ঃ হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন, মোযার উপর মাসেহ সম্পর্কে হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) এবং আমার পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। হযরত সাআদ (রা) বলেন, আমি মাসেহ করছি কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি এটা পসন্দ করছি না। হযরত সাআদ (রা) বলেন, আমরা তখন হযরত উমর (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি তাঁর পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ তোমার চাচা [হযরত সাআদ (রা)] সুন্নত সম্পর্কে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা এই হাদীসের জন্য যথেষ্ট।

بَابُ تَوْقِيْتِ الْمَسْحِ

মাসেহ করার সময় নির্ধারিত করা

٦٥ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِى السَّفَرِ وَلَمْ يُوَقِّتْه *

হাদীস নং- ৬৫

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে সফরে মোযার উপর মাসেহ করতে দেখেছি। কিন্তু তিনি এর সময়-সীমা নির্ধারণ করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হাদীসে বর্ণিত لَمْ يُوَقِّتْه শব্দের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, আমার জানামতে হুযূর (সা) মোযার উপর মাসেহ করার সময়-সীমা নির্ধারণ করেননি। কিন্তু তিনি এটা বলেননি যে, এর কোন সময়-সীমা নির্ধারিত নেই। কেননা সহীহ রিওয়ায়েতের মাধ্যমে মুসাফির ও মুকীমের জন্য মাসেহ করার সময়-সীমা প্রমাণিত রয়েছে। সম্ভবত হযরত ইবনে উমর (রা)-এর এ ঘটনা হযরত সাআদ (রা)-এর প্রথমে মাসেহ সম্পর্কে মাসয়ালা অবগত না হওয়ার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত এ রিওয়ায়েতের আলোকেই হযরত

ইমাম মালিক (র) শুধু মুসাফিরের জন্য মাসেহ জায়েয বলেছেন। কিন্তু কোন সময়-সীমা নির্ধারিত করেননি। মোল্লা আলী ক্বারী (র) বলেছেন, সময় নির্ধারণ না করার কারণে এ হাদীস দলীল হতে পারে না। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, হুযূর (সা) মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত নির্ধারণ করেছেন। তবে সময় নির্ধারণ না করা সম্পর্কে আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ শরীফে রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে এগুলো দুর্বল রিওয়ায়েত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

٦٦ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِ عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِى عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه قَالَ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا لَايَنْزَعُ خُفَّيْهِ اِذَا لَبِسَهُمَا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ -

وَفِى رِوَايَةٍ اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةَ اِيَّامٍ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً اِنْ شَاءَ اِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ اَنْ يَلْبَسَهُمَا *

হাদীস নং- ৬৬

অনুবাদ ঃ হযরত খুযায়মা ইবনে সাবিত (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ মোযার উপর মাসেহ মুকীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত সময়-সীমা নির্ধারিত। যদি উযূ অবস্থায় মোযা পরিধান করে থাকে, তবে মোযা খোলার কোন প্রয়োজন নেই।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, মোযার উপর মাসেহকারী মুসাফিরের জন্য তিনদিন এবং মুকীমের জন্য একদিন ও একরাত, যদি সে ইচ্ছা করে। অবশ্য যদি সে মোযা পরিধানের পূর্বে উযূ করে থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের সনদ মুনকাতি', (বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতায় যদি দু'-একজন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যায়, 'তাহলে ঐ হাদীসকে হাদীসে মুনকাতি' বলা হয়)। কেননা ইবরাহীম তাইমী এবং আমর ইবনে মায়মূন মধ্য থেকে বাদ পড়েছেন। ইবরাহীমে নখঈ-র সিমা (শ্রবণ) আবূ আবদুল্লাহ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। বর্ণনাকারীর এই লুপ্ত হওয়া বা বাদ পড়ার কারণে হাদীসটি দুর্বল এবং এর সত্যতার মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। আমাদের কথা হলো, প্রথমতঃ এ হাদীসের উপর সবাই ঐক্যবদ্ধ নয়। তাহ্যীবুত তাহ্যীব গ্রন্থে বলা হয়েছে, আবূ আবদুল্লাহ হাদাবী থেকে ইবরাহীম নখঈ (র) হাদীস শ্রবণ করেছিলেন। যদি শ্রবণকে না মানা হয়, তবুও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যদি বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে ঐ হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে।

ইবরাহীমে নখঈ (র) একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তাকবীর নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীমে নখঈ (র) একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তবে তিনি অধিকাংশ সময় বর্ণনাকারীর নাম লুপ্ত করে থাকেন। অধিকন্তু এ হাদীসকে আবূ দাউদ ও তিরমিযী সহীহ হিসেবে গ্রহণ করছেন। তিরমিযী ইবনে মুঈন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন। ইবনে হিব্বানও এ হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, এ সমস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত বর্ণনাকে না দেখার ভান করে ইমাম নববী শরহে আল-মুহাযযাব নামক গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি দুর্বল (যঈফ) হওয়া সম্পর্কে সবাই একমত। বাস্তব বিরোধী এরূপ দাবি করা ইমাম নববীর জন্য ঠিক হয়নি। অথবা তিনি এর হাকীকত সম্পর্কে অবহিত হতে পারেননি।

মাসেহ করার সময়-সীমা নির্ধারণের মধ্যেও শরীয়তের একটি বিশেষ রহস্য রয়েছে। অধিকাংশ কাজের মধ্যে সময়-সীমা কমপক্ষে একদিন একরাত ধরা হয়ে থাকে। তাই শরীয়ত মুকীমের জন্য এই সময় নির্ধারণ করেছে। অতঃপর মুসফিরের ক্ষেত্রে সফরের সময় কাজ লাঘব করার জন্য তা তিনগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এ ছাড়া মুসাফিরের নিকট কোন কোন সময় পানির ঘাটতি দেখা দেয়। আবার কখনো সময়ের স্বল্পতা দেখা দেয়। শরীয়তে এসব ওযরের কারণে মুসাফিরের উপর অনুগ্রহ ও সফর সহজ করার উদ্দেশ্যে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত সুযোগ দান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, "আমি বেজোড়কে পসন্দ করি।" তাই শরীয়তে দু'-এর সংখ্যাকে পরিহার করা হয়েছে। মোটকথা, শরীয়তের প্রতিটি বিষয়ই হিকমতে পরিপূর্ণ।

٦٧ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِى عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الْاَوْدِى عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدْلِى عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً *

হাদীস নং- ৬৭

অনুবাদ ঃ হযরত খুযায়মা ইবনে সাবিত (রা) বলেন, মোযার উপর মাসেহ করার সময়-সীমা সম্পর্কে নবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন তিনি বলেন ঃ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে মোযা পরিধান করার পর থেকে মাসেহ করার সময়-সীমা আরম্ভ হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে হাদসের পর থেকে। অর্থাৎ যদি কোন মুকীম সকালে মোযা পরিধান করে মাসেহ করে এবং ঐ উযূর সাথে যোহর নামায আদায় করে কিন্তু যোহরের পর উযূ ভেঙ্গে যায়, তাহলে পরবর্তী দিনের সকাল নয়, বরং যোহর নামাযের বাদ পর্যন্ত মাসেহ করার সময় বাকী থাকবে। এ মাযহাবই কিয়াসের নিকটবর্তী। কেননা মোযার কাজ হলো অপবিত্র বস্তুকে পা পর্যন্ত পৌছতে না দেয়া এবং এর-এ প্রতিক্রিয়া যখন উযূ ভেঙ্গে যাবে,

তখন থেকে শুরু হবে। কেননা পূর্বে তা পবিত্র ছিল। এ সময় অপবিত্র বস্তু প্রতিরোধ করার প্রশ্ন আসে না। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, এক ব্যক্তি মোযার উপর মাসেহ করল এবং একদিন একরাত তার উযূ ভাঙ্গেনি। তাহলে সে কি তার মোযা খুলে ফেলবে ? না। সুতরাং মোযা পরিধান করার সময় থেকে নয়; বরং উযূ ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে এ সময়-সীমা থেকে শুরু হয়। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব।

٦٨- اَبُو حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ لِلْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَالْمُقِيْمُ يَوْمًا وَّلَيْلَةً *

হাদীস নং- ৬৮

অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুসাফির তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মোযার উপর মাসেহ করবে এবং মুকীম একদিন একরাত।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসের ব্যাখ্যা এই হাদীসের জন্য যথেষ্ট।

بَابُ فِى الْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ الْعَوْدَ

অপবিত্র অবস্থায় দ্বিতীয়বার সহবাস করা

٦٩ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيْبُ مِنْ اَهْلِهِ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ فَيَنَامُ وَلاَ يُصِيْبُ مَاءً فَاِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ عَادَ وَاغْتَسَلَ *

হাদীস নং- ৬৯

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতের প্রথমভাগে স্বীয় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতেন, কিন্তু পানি স্পর্শ করতেন না। অতঃপর শেষ রাতে যখন জাগ্রত হতেন, পুনরায় সহবাস করতেন এবং গোসল করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) থেকে অন্য একটি সহীহ মরফূ' হাদীসও বর্ণিত রয়েছে। এতে আছে যে, হুযূর (সা) আরাম করার পূর্বে উযূ করতেন। এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, পানি স্পর্শ না করে তিনি আরাম করতেন। কেউ আবূ ইসহাকের দিকে বর্ণনার মধ্যে ভুলের আশংকা করেছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) ও সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। তাকরীব নামক গ্রন্থেও এর ব্যাখ্যা রয়েছে। এছাড়া এই বর্ণনায় তিনি একা নন,হায়সাম,

আবদুল মালিক (র) হযরত আতা (রা) থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে এ রিওয়ায়েত করেছেন। এমনিভাবে ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান স্বীয় সহীহ গ্রন্থে ইবনে উমর (রা) থেকে এ হাদীস মরফূ'ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আমরা কি অপবিত্র অবস্থায় শুতে পারি ? তিনি বলেন, হ্যাঁ,তবে যদি চাও তাহলে উযূও করতে পার। এখানে ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যদি আবূ ইসহাক একাও হন, তবুও যেহেতু তিনি নির্ভরযোগ্য, তাই তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। সুতরাং উভয় রিওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় করা প্রয়োজন। সমন্বয়ের জন্য এভাবে বলা যায় যে, আঁ হযরত (সা) গোসলের জন্য পানি স্পর্শ করতেন না। এতে উযূ করাকে অস্বীকার করা হয়নি। বায়হাকী এই সমন্বয় গ্রহণ করেছেন। অথবা এটাও বলা যায় যে, এই দু'টি ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের হতে পারে। অধিকাংশ সময় উযূ করতেন, আবার কখনো কখনো করতেন না। এটা শুধু জায়েয প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, যাতে হুযূর (সা)-এর অব্যাহত আমলের কারণে তা ওয়াজিব হওয়ার ধারণা সৃষ্টি না হয়। এ সমন্বয় ইমাম নববী (র) বর্ণনা করেছেন।

٧٠- حَمَّادٍ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيْبُ اَهْلَه اَوَّلَ اللَّيْلِ وَلَا يُصِيْبُ مَاءً فَاِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ عَادَ وَاغْتَسَلَ *

হাদীস নং- ৭০

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতের প্রথমভাগে স্বীয় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতেন, কিন্তু পানি স্পর্শ করতেন না। অতঃপর শেষ রাতে যখন জাগ্রত হতেন, পুনরায় সহবাস করতেন এবং গোসল করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসের ব্যাখ্যা দেখা যেতে পারে।

بَابُ لَايَنَامُ الْجُنُبُ حَتّٰى يَتَوَضَّاءَ

অপবিত্র ব্যক্তি উযূ না করা পর্যন্ত নিদ্রা যাবে না

٧١ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَضُوْءَه لِلصَّلٰوةِ *

হাদীস নং- ৭১

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপবিত্র অবস্থায় যখন নিদ্রার ইচ্ছা করতেন, তখন নামাযের উযূর মত উযূ করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম শরীফে হযরত আসওয়াদের সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়েতে কিছু শব্দ অতিরিক্ত রয়েছে। অর্থাৎ আঁ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপবিত্র অবস্থায় যখন পানাহার বা শয়নের ইচ্ছা করতেন, তখন নামাযের উযূর মত উযূ করতেন। বুখারী শরীফে হযরত উরওয়াহ (রা)-এর সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) থেকে এভাবে বর্ণিত আছে যে, আঁ হযরত (সা) অপবিত্র অবস্থায় যখন শোয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি ইসতিনজা করতেন এবং নামাযের উযূর মত উযূ করতেন। এখানে ইসতিনজার কথাটি অতিরিক্ত রয়েছে। ছয়টি সহীহ হাদীসের গ্রন্থে বিভিন্নভাবে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

بَابُ الْمُؤمِنُ لاَيَنْجَسُ

মুমিন অপবিত্র হয় না

٧٢ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَّ يَدَه اِلَيْهِ فَدَفَعَهَا عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ قَالَ اِنِّى جُنُبٌ قَالَ لَه رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرِنَا يَدَيْكَ فَاِنَّ الْمُؤمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ *

وَفِى رِوَايَةٍ الْمُؤْمِنُ لاَيَنْجَسُ *

হাদীস নং- ৭২

অনুবাদ ঃ হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) একবার মুসাফাহা করার উদ্দেশে তাঁর দিকে পবিত্র হাত বাড়িয়ে দেন। তখন হুযায়ফা (রা) স্বীয় হাত টেনে নেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমার কি হয়েছে ? হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি অপবিত্র। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমাকে তোমার হাত দু'টি দেখাও। নিশ্চয়ই মুমিন অপবিত্র নয়।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, মুমিন অপবিত্র হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য সহীহ গ্রন্থ সংকলনকারীগণ এ হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। আবূ দাউদ হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) একবার তাঁর সাথে মুসাফাহা করার জন্য তাঁর দিকে ঝুঁকেন। তখন হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি অপবিত্র। আঁ হযরত (সা) বলেন, মুসলিম অপবিত্র হয় না। এতে 'মুমিন'-এর পরিবর্তে মুসলিম শব্দ উল্লেখ রয়েছে। এরদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতে মুমিন ও মুসলিম একই

অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে অভিধানে দু'টি শব্দের অর্থের মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। এ হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শুক্রক্ষরণের অপবিত্রতা নাজাসাতে হুকমী (نجاسة حكمى) এ অপবিত্রতার কারণে নামায আদায় করা, মসজিদে প্রবেশ করা এবং পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। এটা নাজাসাতে হাকীকীর (نجاسة حقيقى) মত মানুষের দেহ বা চামড়া অপবিত্র করে না। এরদ্বারা মুমিন অপবিত্র হয় কিন্তু তা অন্যের দিকে সংক্রমিত হয় না। তাই এরূপ অপবিত্র ব্যক্তির ঘাম অথবা থুথু অপবিত্র নয়। এমনিভাবে ছোট নাজাসাত, যেমন উযূ ভাঙ্গার কারণে মানুষের দেহ অপবিত্র হয় না। এরূপ ব্যক্তির ঘাম বা থুথু অপবিত্র হয় না এবং অন্যকে অপবিত্র করে না। তাই এরূপ অপবিত্র ব্যক্তির ঘাম অথবা থুথু অপবিত্র নয়। অবশ্য অপবিত্র হওয়ার কারণে নামায থেকে বিরত থাকতে হয়। উক্ত হাদীস থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, কাফির অপবিত্র। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ "মুশরিক মূলত অপবিত্র।"

٧٣ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَّ يَدَاه اِلَيْهِ فَاَمْسَكَهَا عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجِسُ *

হাদীস নং- ৭৩

অনুবাদ ঃ হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (একবার) স্বীয় পবিত্র হাত তাঁর দিতে বাড়িয়ে দেন। তখন হুযায়ফা (রা) স্বীয় হাত টেনে নেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মুমিন অপবিত্র হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ উপরের হাদীসের ব্যাখ্যা দেখা যেতে পারে।

٧٤ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَادِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا نَاوِلِيْنِى الْخُمْرَةَ فَقَالَتْ اِنِّى حَائِضٌ فَقَالَ اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتَ فِىْ يَدِكِ *

হাদীস নং- ৭৪

অনুবাদ ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ চাটাইটি এনে দাও। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ আমি ঋতুবতী। রাসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ 'হায়েয তো তোমার হাতের মধ্যে নেই।'

ব্যাখ্যা ঃ তিরমিযী স্বীয় সনদের ধারাবাহিকতায় কাসিম ইবনে মুহাম্মদের সূত্রে হযরত আয়েশা

(রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আঁ হযরত (সা) আমাকে বলেন ঃ তোমার হায়েয তোমার হাতের মধ্যে নয়। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হায়েয নাজাসাতে হুকমী, হাকীকী নয়। অধিকন্তু হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, অপবিত্র ও ঋতুবতী মহিলার উচ্ছিষ্ট এবং ঘাম পবিত্র। ঋতুবতী মহিলা মসজিদে প্রবেশ না করে কোন বস্তু উঠিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু প্রবেশ করা জায়েয নেই। প্রবেশের এ বিধি-নিষেধের কারণে হযরত আয়েশা (রা) চাটাই উঠাতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন এবং নির্দেশ পালন করতে অক্ষমতা পেশ করেছেন। তিনি ধারণা করেছিলেন, নাজাসাতে হাকীকীর মত হায়েযের নাজাসাত সমস্ত দেহকে অপবিত্র করে দেয়, এতে হাতও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অপবিত্র হাতে কিভাবে চাটাই স্পর্শ করবেন ? আঁ হযরত (সা) বলেন ঃ প্রত্যক্ষ করা যায় এরূপ নাজাসাতের মত হায়েয দেহের মধ্যে অপবিত্রতা বিস্তার করে না।

بَابُ الْمَرْأَةِ تَرى فِى مَنَامِهَا مَايَرى الرَّجُلُ

নিদ্রায় মহিলারাও সেরূপ দেখে, যেরূপ পুরুষ দেখে থাকে

٧٥ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ اُمَّ سُلَيْمٍ (رض) اَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرٰى مَايَرى الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْتَسِلُ *

হাদীস নং- ৭৫

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে সুলাইম (রা) মহিলাদের সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি তারা স্বপ্নে ঐরূপ দেখে যা পুরুষ দেখে থাকে (অর্থাৎ যদি মহিলাদের স্বপ্নদোষ হয় তাহলে এর বিধান কি ?)। নবী (সা) বলেন, 'সে গোসল করবে।'

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী শরীফে যয়নব বিনতে আবি সালমা থেকে বর্ণিত আছে যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, হযরত আবূ তালহা (রা)-এর স্ত্রী উম্মে সুলাইম (রা) হুযূর (সা)-এর নিকট আগমণ করেন এবং আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা) ! সত্য প্রকাশে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না। মহিলাদের উপর কি গোসল ফরয হবে যখন তাদের স্বপ্নদোষ হয় ? আঁ হযরত (সা) বলেন ঃ 'হ্যাঁ, যখন আর্দ্রতা দেখবে।'

এখানে মাসয়ালা হলো যে, আর্দ্রতা দেখার উপর গোসল নির্ভর করে। যদি স্বপ্নদোষ হওয়া স্মরণ হয় কিন্তু আর্দ্রতা অনুভূত না হয়, তবে গোসলও ওয়াজিব নয়। যদি স্বপ্নদোষ স্মরণ না থাকে কিন্তু আর্দ্রতা দেখে, তা হলে গোসল ওয়াজিব হবে। তাই বায়হাকী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর আর্দ্রতা দেখে কিন্তু স্বপ্নদোষ না হয়, তাহলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। যদি স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ হয় কিন্তু

আর্দ্রতা না দেখে, তাহলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না। আবূ দাউদ শরীফে একই সনদে হযরত কাসিম-এর সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন।

بَابُ بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ

গোসলখানা সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান

٧٦ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ هُوَ بَيْتٌ لَايَسْتُرُ وَمَاءُ لَايَطْهُرُ *

হাদীস নং- ৭৬

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ গোসলখানা সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান। যেখানে পর্দাহীনতা রয়েছে এবং যেখানকার পানি অপবিত্র।

ব্যাখ্যা ঃ গোসলখানার অনিষ্টতা সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বায়হাকী হযরত আয়েশা (রা) থেকে এবং ইবনে আদী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়েত করেন যে, গোসলখানা সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান। এতে আওয়ায উঠে, গুপ্তস্থান উন্মুক্ত হয়ে যায়। পূর্বে আরবদেশে ক্ষুদ্র পরিসরের গোসলখানার প্রচলন ছিল। লোকজন উলঙ্গ হয়ে এর থেকে পানি নিয়ে গোসল করত। যদি গোসলখানায় পবিত্র পানির ব্যবস্থা করা যায় এবং গুপ্তস্থান খুলে না যাওয়া অর্থাৎ পর্দার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে গোসলখানা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নয়। সুতরাং আল্লামা তিবরানী কবীরে, হাকেম মুসতাদরাকে এবং বায়হাকী শুআবুল ঈমানে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হাম্মাম নামক গোসলখানার অনিষ্টতা থেকে দূরে থাক। গুপ্তস্থান ঢেকে এতে প্রবেশ কর। তিবরানীর রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এতে গুপ্তস্থান অনাবৃত হয়ে যায়। বায়হাকীতে বলা হয়েছে যে, রুমাল নিয়ে গোসলখানায় প্রবেশ করবে, রুমাল ছাড়া প্রবেশ করবে না। মোটকথা, এ সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করে যদি কেউ গোসলখানা ব্যবহার করে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

بَابُ فَرْكِ الْمَنِى مِنَ الثَّوْبِ

কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে ফেলা

٧٧ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ اَفْرَكُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

হাদীস নং- ৭৭

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে পরিষ্কার করে দিয়েছি।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের ব্যাখ্যা পরবর্তী হাদীসের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হবে।

٧٨ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ اَنَّ رَجُلاً اَضَافَتْهُ عَائِشَةُ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ (رض) فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ مِلْحَفَةً فَالْتَحَفَ بِهَا اللَّيْلُ فَاَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَغَسَلَ الْمِلْحَفَةَ كُلَّهَا فَقَالَتْ مَا اَرَادَ بِغَسْلِ الْمِلْحَفَةِ اِنَّمَا كَانَ يُجْزِيْهِ اَنْ يَّفْرُكَه لَقَدْ كُنْتُ اَفْرُكُه مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّى فِيْهِ *

হাদীস নং- ৭৮

অনুবাদ ঃ হযরত হাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কোন এক ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর বাড়িতে মেহমান হলেন। তার জন্য তিনি একটি লেপ পাঠালেন। রাতে সে এটা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঐ সময় তার স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। সে সম্পূর্ণ লেপটি ধুয়ে দেয়। হযরত আয়েশা (রা) এ বিষয়টি জানার পর বললেন ঃ পূরা লেপটি কেন ধৌত করলে? এটা খুঁটে ফেললেই তো যথেষ্ট হতো। আমি রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে পরিষ্কার করে দিয়েছি অতঃপর এ কাপড়ে তিনি নামায আদায় করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ বীর্য অপবিত্র ও পবিত্র হওয়া সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে বীর্য পবিত্র। ইমাম মালিক (র), ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আহমদ (র) এক বর্ণনায় একে অপবিত্র বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা এবং বিবেক-বুদ্ধি উভয়ের দ্বারা স্বীয় মাযহাবের উপর দলীল পেশ করেছেন। তাঁদের একটি দলীল হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে যে, বীর্য মৃত। এটা পরিষ্কার করে ফেল। বায়হাকী আতা ইবনে আব্বাসের সূত্রে মরফূ হিসেবে এ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। তবে সহীহ হলো, এই হাদীসটি মওকূফ। দ্বিতীয় দলীল ইবনে খুযায়মা, দারে কুতনী এবং বায়হাকী হযরত আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়েত করেছেন ঃ তিনি বলেছেন, আমি হুযূর (সা)-এর কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে ফেলতাম এবং তিনি ঐ কাপড় দিয়ে নামায আদায় করতেন। যুক্তি হিসেবে (عَقلى دَلِيْل) তাঁদের মত হলো এই যে, যেহেতু আম্বিয়া আলাহিমুস সালাম এবং আওলিয়ায়ে কিরাম এই বীর্য থেকে সৃষ্টি

হয়েছেন, তাই বীর্য কিভাবে অপবিত্র হতে পারে ? এরূপ পবিত্র ব্যক্তিদেরকে অপবিত্র বস্তু থেকে সৃষ্টি করা বোধগম্য নয়।

বীর্য থেকে পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মধ্যে সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিক (র) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বীর্য ধৌত করা না হবে, ততক্ষণ কাপড় পবিত্র হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, শুষ্ক বীর্য খুঁটে ফেলে দিলেই কাপড় পবিত্র হয়ে যায় কিন্তু আর্দ্র বা তরল হলে ধৌত করা ব্যতীত কাপড় পবিত্র হবে না। ইমাম মালিক (র) এটা রক্তের বিধানের মত মনে করেন। কেননা রক্ত ধৌত করা ব্যতীত পবিত্র হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র) সহীহ্ আবূ আওয়ানায় হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বীর্য শুষ্ক হলে আমি নবী করীম (সা)-এর কাপড় থেকে তা খুঁটে পরিষ্কার করে দিতাম আর আর্দ্র হলে তা ধুয়ে দিতাম। হযরত আয়েশা (রা)-এর এ কাজের পর নবী করীম (সা)-এর নীরব থাকা এ কথার স্পষ্ট দলীল যে, বীর্য নাপাক। অন্যথায় বিনা কারণে তা ধৌত করার জন্য হুযূর অনুমতি দিলেন কেন ? এর থেকেও বলিষ্ঠ দলীল হল এই যে, মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে বীর্য ধৌত করতেন এবং এরপর সে কাপড় পরিধান করে সালাতের জন্য চলে যেতেন। তখন কাপড়ে আমি ধৌত করার আলামতও দেখতে পেতাম। বীর্য তিনি নিজেই ধৌত করতেন অথবা ধৌত করার নির্দেশ দান করতেন, কিন্তু উভয় অবস্থায় বীর্য অপবিত্র হওয়া প্রমাণিত হয়। এছাড়া দারে কুতনী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সা) বলেছেন ঃ يَا عَمَّارُ انَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْئِ وَالدَّمِ وَالْمَنِى "হে আম্মার (রা) ! কাপড় পাঁচটি বস্তুর কারণে ধৌত করা হয়– মল, মূত্র, বমি, রক্ত এবং বীর্য।" এতে তিনি বীর্যকে পাঁচটি অপবিত্র বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করছেন। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস সহীহ মনে করা হলে তা রহিত (منسوخ) হবে। শুধু খুঁটে ফেলার ফলে কাপড় পবিত্র হওয়া এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয়। যদি কেউ বলে যে, এটা পবিত্রতার কারণে ছিল, অপবিত্রতার কারণে নয়; তা হলে এ দাবির স্বপক্ষে কোন দলীল নেই।

যুক্তিগত দলীল (دليل عقلى) হলো এই যে, বীর্য বের হওয়া বড় ধরনের অপবিত্রতা বলেই পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং গোসল ওয়াজিব হয়েছে। এরপর বীর্যকে পবিত্র বলে মত পোষণকারীদের দলীলের জওয়াব হলো এই যে, যদি আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আওলিয়ার সৃষ্টি বীর্য থেকে হওয়া এর পবিত্রতার দলীল হয়, তাহলে আবূ জাহল ও আবূ লাহাবের মত কাফির-মুশরিকের সৃষ্টিও এই বীর্য থেকেই হয়েছে– এর কি জওয়াব ? অতঃপর অপবিত্র বস্তুর সৃষ্টির মধ্যে কি মন্দ থাকতে পারে ? যেমন রক্ত থেকে দুধ তৈরি হয়ে থাকে। বরং অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্র বস্তু সৃষ্টি করা আল্লাহ্র কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। দ্বিতীয়তঃ যদি এটা পবিত্র হয়, তাহলে বের হওয়ার কারণে পবিত্রতা নষ্ট হয় কেন ? সুতরাং এরদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বীর্য অপবিত্র।

بَابُ اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

চামড়া পাকা করার দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়

٧٩ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ *

হাদীস নং- ৭৯

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে চামড়া পাকা করা হয়, তা পবিত্র হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম শরীফে এই মরফূ' হাদীস হযরতে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। এতে বলা হয়েছে اِذَا دُبِغَ الاَهَابَ فَقَدْ طَهُرَ অর্থাৎ "যখন চামড়া পাকা করা হয়, তখন এটা পবিত্র হয়ে যায়।" তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ ও দারে কুতনী হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। শূকর মূলত অপবিত্র হওয়ার কারণে এবং মানুষ সম্মান ও মর্যাদার কারণে এ বিধানের বহির্ভূত। ইমাম শাফিঈ (রা) কুকুরের চামড়া এ বিধানের বহির্ভূত বলে মতে প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এটা অপবিত্র নয়। কেননা কুকুর শূকরের মত মৌলিকভাবে অপবিত্র নয়। তাই এরদ্বারা উপকারিতা লাভ করা জায়েয এবং এর শিকার করা বস্তু হালাল। অধিকন্তু হাদীসের বাক্যে সাধারণভাবে সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ব্যতিক্রম হওয়ার জন্য বিশেষ কোন কারণ থাকে না। এ হাদীস ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আহমদ (র)-এর বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। কেননা তাঁদের মতে মুর্দার চামড়া থেকে উপকারিতা লাভ করা জায়েয নয়। কেননা তাঁরা নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাকীম (র) হতে আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীস পেশ করে থাকেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হাকীম (র) বলেন, আমাদের নিকট এ মর্মে হুযূর (সা)-এর একটি পত্র আসে যে, মুর্দারের চামড়া কোন কাজে ব্যবহার করো না। কেননা আঁ হযরত (সা) পাকা করাবিহীন চামড়া দ্বারা কোন উপকারিতামূলক কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চামড়া যতক্ষণ পর্যন্ত পাকা না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা পবিত্র হয় না। এর ব্যবহারও নিষিদ্ধ থাকে। এবার দু' হাদীসে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। যদি নিষিদ্ধের হাদীস মান্য করা হয়, তাহলে পরবর্তী হাদীসকে অস্বীকার করা জরুরী হয়ে পড়ে এবং মৃতের চামড়া দ্বারা কোন ফায়দা লাভ করা শীর্ষক উক্তির ব্যাপারে আপত্তি উঠবে।

٨٠ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ لِسَوْدَةَ فَقَالَ مَا

عَلَى اَهْلِهَا لَوْ انْتَفَعُوْا بِاِهَابِهَا فَسَلَخُوا جِلْدَ الشَّاةِ فَجَعَلُوهُ سِقَاءً فِى الْبَيْتِ حَتّٰى صَارَتْ شَنًّا *

হাদীস নং- ৮০

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে হযরত সাওদা (রা)-এর মৃত বকরীর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ এর মালিকদের কি হয়েছে ? যদি তারা এর চামড়া দ্বারা ফায়দা লাভ করত! সুতরাং তারা এই মৃত বকরীর চামড়াটি খুলে নিয়ে যায় এবং এরদ্বারা ঘরে ব্যবহারের জন্য একটি মশক তৈরি করে। এ মশক দীর্ঘ দিন ব্যবহার করার ফলে বহু পুরাতন হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

নামায অধ্যায়

٨١ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) عَنْ اَبِى ذَرٍ (رضـ) اَنَّهُ صَلَّى صَلٰوةً فَخَفَّفَهَا وَاَكْثَرَ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَه رَجُلٌ اَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُصَلِّى هٰذِهِ الصَّلٰوةَ فَقَالَ اَبُو ذَرٍّ اَلَمْ اُتِمَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ قَالَ بَلٰى قَالَ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَجَدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً رَفَعَ بِهَا دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ فَاَحْبَبْتُ اَن تُؤْتى لِى دَرَجَاتٌ اَوْ تَكْتُبَ لِى دَرَجَاتٌ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِى عَمَّنْ حَدَّثَه اَنَّه مَرَّ بِاَبِى ذَرٍّ (رضـ) بِالرَّبْذَةِ وَهُوَ يُصَلِّى صَلٰوةً خَفِيْفَةً يُكْثِرُ فِيْهَا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَلَمَّا سَلَّمَ اَبُو ذَرٍ قَالَ لَه الرَّجُلُ تُصَلِّى هٰذِهِ الصَّلٰوةَ وَقَدْ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُو ذَرٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَجَدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ فَلِذٰلِكَ اُكْثِرُ فِيْهَا السُّجُوْدَ *

হাদীস নং- ৮১

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আবূ যর (রা) নামায আদায় করেন এবং তা সংক্ষিপ্ত করেন (অর্থাৎ কয়েক রাকআত নামায আদায় করেন যার কিয়াম সংক্ষিপ্ত করেন)। কিন্তু অধিক পরিমাণে রুকূ-সিজদা করেন। যখন নামায শেষে ফিরে আসেন তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একজন সাহাবী। কিন্তু এভাবে নামায আদায় করেন ? আবূ যর (রা) বলেন, আমি হুযূর (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য

একটি সিজদা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি দরজা বুলন্দ করবেন (মর্তবা দান করবেন)। সুতরাং আমার এ বিষয়টি পসন্দ হল যে, আমার কয়েকটি দরজা বৃদ্ধি হোক।

ইবরাহীম নখঈ (র) থেকে অপর একটি রিওয়ায়েতে আছে যে, রাবযাহ নামক স্থানে আবূ যর (রা)-এর নিকট দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করছিলেন এবং অধিক পরিমাণে রুকূ-সিজদা করেছেন (অর্থৎ রাকআতসমূহের মধ্যে কম সময় ব্যয় করেছেন কিন্তু তা ছিল অধিক সংখ্যক)। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন লোকটি বলল, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন সাহাবী অথচ এমনভাবে নামায আদায় করেন ? তখন আবূ যর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি দরজা (মর্যাদা) বৃদ্ধি করবেন। তাই আমি নামাযে অধিক সিজদা করছি (অর্থাৎ রাকআতের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে একটি সূক্ষ্ম আলোচনা রয়েছে। তা হলো এই যে, নামাযের কিয়ামের মধ্যে অধিক সময় ব্যয় করে নামায দীর্ঘ করা উত্তম, না রাকআতের সংখ্যা বৃদ্ধি করে রুকূ ও সিজদার সংখ্যা বৃদ্ধি করা অধিক সওয়াবের কাজ ? এই বিষয়টি নিয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ নামাযে দীর্ঘক্ষণ কিয়ামকে উত্তম ও সওয়াবের কারণ মনে করেন। কেউ কেউ উভয়টিতে সমান ফযীলত মনে করেন। সুতরাং এ বিষয়টি নিয়ে তিনটি মতামত দেখা যায়। সহীহ হাদীসসমূহে কিয়াম, রুকূ ও সিজদার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আযম (র) বলেন, যেহেতু হাদীসে উভয়ের ফযীলত সম্পর্কে দলীল রয়েছে, তাই একটির উপর অপরটিকে প্রাধান্য দেওয়ার কোন সংগত কারণ নেই। সুতরাং তিনি এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা প্রদান করেননি। যাঁরা অধিক সিজদায় ফযীলতের পক্ষে মত পোষণকারী, তাঁরা দলীল হিসেবে এ হাদীসটি পেশ করেন। এছাড়া মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটিও দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সা) বলেছেন ঃ "বান্দা ঐ সময় আল্লাহর অতি নিকটবর্তী হয়ে থাকে, যখন সে সিজদা অবস্থায় থাকে। সুতরাং এ সময়ে অধিক দু'আ করবে।" এ হাদীস দ্বারা সিজদার ফযীলত এবং সিজদার মধ্যে অধিক সময় ব্যয় করার সওয়াব প্রমাণিত হয়।

যাঁরা দীর্ঘস্থায়ী কিয়ামকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন, তাঁরা সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। উক্ত হাদীসে হুযূর (সা) বলেছেন ঃ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ طَوْلُ الْقُنُوْتِ "উত্তম হলো ঐ নামায যেখানে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা হয়।"পক্ষান্তরে কিয়াম কিরাআতের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সিজদা তাসবীহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর কিরাআত তাসবীহ্ থেকে উত্তম। এ কারণেই হুযূর (সা) সিজদা থেকে কিয়ামে অধিক সময় ব্যয় করতেন। এছাড়া পরিশ্রম ও কষ্ট অনুযায়ী সওয়াব মিলে থাকে। কিয়ামে দৈহিক যে কষ্ট হয়, সিজদায় তা হয় না। তাই দীর্ঘক্ষণ সিজদার চেয়ে দীর্ঘ কিয়াম উত্তম। হানাফী মাযহাবের তিনজন ইমাম এ মত পোষণ করেন। ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়ায়হ (র) এ মতামতের মধ্যে একটি চমৎকার ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, দিবাভাগের নামাযে রুকূ-সিজদার মধ্যে

আধিক্য এবং রাতের নামাযে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম সংগতিপূর্ণ। ইমাম তিরমিযী (র) বলেছেন ঃ তিনি হয়ত এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বলেছেন যে, হুযূর (সা) দিবাভাগের নামাযের চেয়ে রাতের নামাযের কিয়াম দীর্ঘ করতেন বলে বর্ণিত আছে। মোটকথা, এ ধারণা হুযূর (সা)-এর সুন্নত থেকে গৃহীত হয়েছে।

بَابُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর

٨٢ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ *

হাদীস নং- ৮২

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান হলো সতর (লজ্জাস্থান)।

ব্যাখ্যা ঃ দারে কুতনীর রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ সতর হলো হাঁটুর উপর থেকে নাভীর নীচ পর্যন্ত। ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, নাভীর নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত। অর্থাৎ পুরুষের জন্য সতর হলো নাভীর নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এটা ঢেকে রাখা জরুরী এবং প্রকাশ করা হারাম।

উপরে বর্ণিত হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে সতর সম্পর্কে আয়িম্মায়ে কিরাম একমত যে, নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান হলো সতর এবং নাভী সতরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে হাঁটু সতর হওয়া না হওয়ার মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হাদীসের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। তিনি দারে কুতনী কর্তৃক উকবা ইবনে আলকামার সূত্রে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এতে বলা হয়েছে ঃ الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে مَابَيْنَ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ -এর প্রকৃত অর্থ হলো مَابَيْنَ السُّرَّةُ منتهى الرُّكْبَةِ হবে। অর্থাৎ সতর হলো নাভী থেকে হাঁটুর শেষ পর্যন্ত। এর ফলে সমস্ত হাদীস নিজ নিজ অর্থের উপর সঠিক থাকবে। হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত থাকলে প্রকৃত সতর হবে। নতুবা সতরের সীমা নির্ধারণ করা দুষ্কর হবে।

بَابُ جَوَازِ الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

এক কাপড়ে নামায আদায় করা জায়েয

٨٣ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّهُ اَمَّهُمْ فِى قَمِيْصٍ وَاحِدٍ وَعِنْدَه فَضْلُ ثِيَابٍ يُعَرِّفُنَا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

اَبُوْ قُرَّةَ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ -

قَالَ اَبُو قُرَّةَ فَسَمِعْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ يَذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّه سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ *

হাদীস নং- ৮৩

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এক কাপড়ে নামাযে ইমামতি করেন অথচ তাঁর নিকট অতিরিক্ত কাপড় ছিল। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নতের তালীম দেওয়ার জন্যই তিনি এটা করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এক কাপড়ে কি মানুষ নামায পড়তে পারে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি কাপড় আছে ?

অপর রিওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট এক কাপড়ে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন আঁ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের সবার তো দু'টি কাপড় নেই।

ব্যাখ্যা ঃ ইবনে আবী শায়বা (র) বর্ণনা করেন, হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেছেন, আমি আমার পিতাকে একটি কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি। আমি বললাম,

আব্বাজান! আপনি একটি কাপড় দ্বারা নামায পড়েন অথচ আপনার অনেক কাপড় রয়েছে। তিনি বললেন ঃ হে স্নেহের মেয়ে ! হুযূর (সা) আমার পেছনে সর্বশেষ যে নামায আদায় করেন, তাতে একটি কাপড় তাঁর পরিধানে ছিল।

মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকে বর্ণিত আছে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) এবং হযরত ইবনে মাসঊদ (রা)-এর মধ্যে এক কাপড়ে নামায আদায় করা সম্পর্কে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। হযরত উবাই (রা) বলেন এক কাপড়ে নামায পড়ায় কোন দোষ নেই। কেননা হুযূর (সা) একটি কাপড়ে নামায আদায় করেছেন। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, এটা ঐ সময় প্রযোজ্য ছিল যখন মানুষের নিকট কাপড়ের প্রাচুর্য ছিল না। কিন্তু মানুষ যখন সচ্ছলতা লাভ করে, তখন নামায দু'কাপড়ে পড়তে হবে। হযরত উমর (রা) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত উবাই (রা)-এর মতের উপর ফয়সালা দান করেন। তবে ফযীলতের ব্যাপারে হযরত ইবনে মাসঊদ (রা)-এর উক্তিও সঠিক। কিন্তু এক কাপড়ে নামায জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো মতানৈক্য নেই। যদি উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, তাহলে হযরত উমর (রা)-এর ফয়সালা অনুযায়ী হযরত উবাই (রা)-এর মত সঠিক বলে গণ্য করতে হবে।

٨٤ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لاَبِى الزُّبَيْرِ غَيْرَ الْمَكْتُوْبَةِ – قَالَ الْمَكْتُوْبَةُ وَغَيْرُ الْمَكْتُوْبَةِ *

হাদীস নং- ৮৪

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুতাওয়াশ্বিহ্ (مُتَوَشِّحٌ) অবস্থায় এক কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করেছেন। কিছু লোক আবূ যুবায়রকে জিজ্ঞাসা করল, এটা কি নফল নামায ছিল ? তিনি বললেন ঃ নফল ও ফরয সমস্ত নামাযই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ مُتَوَشِّحٌ শব্দের অর্থ একটি কাপড় সোজা কাঁধের নিম্নাংশ বগল থেকে বের করে দ্বিতীয় কাঁধে রাখা এবং কাঁধের উল্টা দিক থেকে বের করে সোজা কাঁধের উপর রাখা। অন্য এক রিওয়ায়েতে এটাও বলা হয়েছে যে, অতঃপর বুকের উপর এটা বেঁধে নেওয়া।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِى مَوَاقِيْتِهَا

ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায পড়া

٨٥ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ سُئِلَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ ـ قَالَ الصَّلٰوةِ فِى مَوَاقِيْتِهَا *

হাদীস নং- ৮৫

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন্ আমল সর্বোত্তম- এ সম্পর্কে হুযূর (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করা হয়। তখন তিনি বলেন ঃ ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায পড়া (সর্বোত্তম আমল)।

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে মরফূ' হাদীস এভাবে বর্ণিত আছে ঃ اَىُّ الاَعْمَالُ اَحَبُّ اِلَيْه ـ قَالَ الصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا অর্থাৎ কেউ হুযূর (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করে যে, কোন্ আমল আল্লাহ্র নিকট পসন্দনীয় ? তখন তিনি বলেন ঃ সঠিক সময়ে নামায আদায় করা। এরপর জিজ্ঞাসা করা হয়, অতঃপর কোন্ আমল আল্লাহ্র নিকট পসন্দনীয় ? তখন তিনি বলেন ঃ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। এরপর কোন্ আমল এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন হুযূর (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। এই হাদীসে নামাযের ওয়াক্তের প্রতি নিয়মানুবর্তিতার জন্য গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং এতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সর্বোত্তম আমল হলো সঠিক সময়ে নামায আদায় করা।

بَابُ فَضِيْلَةِ الْاِسْفَارِ

ইসফারের (পূবাকাশ পরিষ্কার হওয়ার) পর নামায আদায় করার ফযীলত

٨٦ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْفِرُوا بِالصُّبْحِ فَاِنَّه اَعْظَمُ لِلثَّوَابِ *

হাদীস নং- ৮৬

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ ভোরের (ফজরের) নামায ফর্সা হওয়ার পর আদায় কর। কারণ এতে অধিক সওয়াব রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের বিষয়বস্তু নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এখানে মাসয়ালাটি মূলত ভোরের (ফজরের) নামায সম্পর্কে। তিনজন ইমাম [(ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ (র)] ফজরের নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে গালসের (غَلس) কথা বলেছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইসফার (اسفَار) হল ফজর নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত। এখানে غلس অর্থ ভোরের এমনি একটি মুহূর্ত যখন চতুর্দিকে অন্ধকার

বিরাজ করে। ফলে একজন তার পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে চিনতে পারে না। উপরোক্ত হাদীসের اسفار শব্দটি ইমাম আবূ হানীফা (র) দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সিহাহ সিত্তাহ হাদীস গ্রন্থে একই অর্থে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে ইবনে মাজাহ শরীফে এক মরফূ' রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে ঃ اَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَاِنَّه اَعْظَمُ لِلاَجْرِ "পরিষ্কার হওয়ার পর (ভোরের অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার পর) ফজরের নামায আদায় কর। কেননা এতে অধিক সওয়াব রয়েছে।" আবূ দাউদ শরীফে একই হাদীস বর্ণিত আছে। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে ঃ اَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَاِنَّه اَعْظَمُ لِلاَجْرِ "আলো স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়ার পর ফজরের নামায আদায় কর।কেননা এতে অধিক সওয়াব রয়েছে।" ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, রাফে' ইবনে খাদীজের এ হাদীস হাসান ও সহীহ্ (حسن وصحيح)। সাহাবা ও তাবিঈগণের মধ্যে অনেকেই এ মত পোষণ করেন। সুফিয়ান সওরী (র)-এর মাযহাবও এটা। নাসাঈ, ইবনে হাব্বান এবং তিবরানী প্রায় এই বাক্য (الفاظ) দ্বারা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়া এ হাদীসের সমর্থনে কয়েকটি সহীহ্ হাদীসও রয়েছে। যেমন আঁ হযরত (সা) হযরত বিলাল (রা)-কে বললেন ঃ ফজরের নামায ফর্সা হলে আদায় কর। যাতে আলোর কারণে মানুষ তাদের সিজদার স্থান দেখতে পায়। মুসান্নাফ নামক গ্রন্থে ইবনে আবী শায়বা এবং ইসহাক ও আবূ দাউদ (র) তাঁদের মুসনাদে এ হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। এ বিতর্ক দূর করার জন্য বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর হাদীস পেশ করা যায়। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি হুযূর (সা)-কে দু'টি নামায ব্যতীত প্রত্যেক নামায ওয়াক্ত অনুযায়ী আদায় করতে দেখেছি। প্রথমত, মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন আর দ্বিতীয়ত, মুযদালিফায় ফজরের নামায সাধারণ সময়ের পূর্বে অন্ধকারে (غلس) আদায় করতেন। কেননা মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে ঃ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا بِغَلَسٍ এটা হল এজন্য যে, অবস্থানের সময় অধিক মিলে থাকে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হুযূর (সা)-এর বিশেষ খাদিম ছিলেন। তিনি হুযূর (সা)-এর পারিবারিক, বাহ্যিক, সফর ও বাড়িতে দিবারাত্রি জীবনের অভ্যন্তরীণ খবর সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজর নামায ইসফারে (اسفار অর্থাৎ ফর্সা হলে) পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। সুতরাং এরপর এ বিষয়ে অন্য কারো সাক্ষীর প্রয়োজন আছে কি ? এছাড়া শরহে মা'আনিল আসার নামক গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম নখঈ (র) থেকে সহীহ্ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবাদের মধ্যে অন্য কোন বিষয়ে এরূপ ঐক্য সৃষ্টি হয়নি যেরূপ এ বিষয়ে সৃষ্টি হয়েছিল। উপরে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল পেশ করা হল। কিয়াসও এ মাযহাবের সমর্থন করে থাকে। কেননা যতদূর সম্ভব মুসল্লীদেরকে অধিক সংখ্যক জামাআতে অংশগ্রহণের সুযোগ দান করা উত্তম। জামাআতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এরূপ সংক্ষিপ্ত সময় নির্ধারণ করা ঠিক নয়। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) একবার নামাযে দীর্ঘ কিরআত পাঠ করেন। তখন হুযূর (সা) বলেন ঃ

اَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ হে মুআয ! তুমি কি লোকদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করছ ? সুতরাং এই সমস্ত হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ফজরের নামায ফর্সা (اسفار) হলে পড়তে হবে, অন্ধকারে নয়।

এবার غلس শব্দের যে সমস্ত রিওয়ায়েত রয়েছে, তা বর্ণনা করা প্রয়োজন। যাঁরা ফজর غلس-এর সময় আদায় করার পক্ষে মত পোষণ করেন, তাঁরা সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ –

অর্থাৎ "হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ফজর নামায আদায় করতেন তখন মহিলাগণ (জামাআত শেষে) তাদের চাদরে আবৃত হয়ে বাসায় ফিরে যেতেন। অন্ধকারের (غَلَسْ) কারণে তাদেরকে চেনা যেত না।" 'চেনা যেত না'-এরদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তখন যথেষ্ট অন্ধকার থাকত। কিন্তু বাস্তবে চেনা না যাওয়ার দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত, অন্ধকার হওয়া, দ্বিতীয়ত, চাদরে আবৃত হওয়া। যদি অন্ধকারের কারণেই চেনা না যেত, তাহলে বেশি অন্ধকারের প্রমাণ পাওয়া যেত। চাদরে আবৃত হলে সামান্য অন্ধকারেও চেনা না যাওয়ার কারণ হতে পারে এবং এটা সাধারণ ফর্সায় (اسفار)-ও হতে পারে। কেননা হানাফী মাযহাবমতে ফজর নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত হলো, এমন সময় নামায শুরু করতে হবে যাতে মুসল্লী ষাট থেকে একশ আয়াত নামাযে পড়তে পারে এবং এরপর যদি উযূ ভেঙ্গে যায়, তাহলে উক্ত পরিমাণ আয়াতেরদ্বারা নামায পুনরায় আদায় করতে পারে।

অধিকন্তু এটা ঐ সময়ের ঘটনা যখন ইসলামের শুরুতে মহিলাদের জন্য মসজিদে জামাআতে নামায পড়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু যখন এটা রহিত হয়ে যায় এবং মহিলাদেরকে ঘরে নামায পড়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়, তখন সম্ভবত غَلَس -এর বিষয়টিও বাকী থাকেনি এবং সময়ের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর রিওয়ায়েত সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। এছাড়া হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস হলো আমলের সাথে জড়িত (فعلى) কিন্তু ইসফারের (اسفار) হাদীস বর্ণনাসূচক (قولى)। হানাফী মাযহাবমতে বর্ণনা (قول) -কে আমলের (فعل) উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। এখানে দু'টি হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, غلس -এর অর্থ হলো হাল্কা অন্ধকার থাকা এবং اسفار -এর অর্থ হলো এরূপ ফর্সা হওয়া যাতে কিছু অন্ধকার বিদ্যমান থাকা যা غلس হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। তবে যদি উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তা হলে اسفار -কে প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং ফজর নামায اسفار করে আদায় করা জায়েয হবে।

بَابُ وَعِيْدِ تَفْوِيْتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ

আসর নামায কাযা হওয়া সম্পর্কে হুঁশিয়ারী

٨٧ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكِّرُوا بِصَلٰوةِ الْعَصْرِ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ بُرَيْدَةَ الاَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكِّرُوا بِصَلٰوةِ الْعَصْرِ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ بُرَيْدَةَ الاَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكِّرُوا بِصَلٰوةِ الْعَصْرِ فِى يَوْمٍ غَيْمٍ فَاِنَّ مَنْ فَاتَه صَلٰوةُ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه *

হাদীস নং- ৮৭

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আসর নামায আদায় করার ব্যাপারে জলদি কর।

অন্য এক রিওয়ায়েতে হযরত বুরায়দা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আসর নামায (সময় অনুযায়ী) শীঘ্র আদায় কর।

অন্য এক রিওয়ায়েতে হযরত বুরায়দা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মেঘলা দিনে আসর নামায জলদি আদায় কর। কারণ যার আসর নামায বাদ পড়ে যায় (আদায় না করা অবস্থায়), আর সূর্য অস্ত যায়, তাহলে এরূপ ব্যক্তির আমল ধ্বংস হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে আসর নামাযের প্রতি গুরুত্ব এবং এর সঠিক ও উপযুক্ত সময়ের ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়া এ বিষয়ে কি মতানৈক্য রয়েছে, তা আলোচনা করা হয়েছে। আসর নামায কারো মতে জলদি আদায় করা মুস্তাহাব এবং কারো মতে বিলম্ব করা উত্তম। ইমাম আহমদ (র), ইমাম শাফিঈ (র) এবং ইমাম মালিক (রা)-এর মতে আসর নামায জলদি অর্থাৎ ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে আদায় করা উচিত। ইমাম আবূ হানীফা (র) বিলম্ব করার পক্ষে মত পোষণ করেছেন। উভয় মতামতের স্বপক্ষে মওকূফ ও মরফূ (موقوف و مرفوع) হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) উভয় মতামতের হাদীস একত্র করে জলদি (تعجيل) সম্পর্কিত হাদীস মেঘলা দিনের সাথে এবং বিলম্বের (تأخير) হাদীস মেঘবিহীন পরিষ্কার দিনের সাথে সংযুক্ত করেছেন। تعجيل সম্পর্কে হযরত বুরায়দা আসলামীর হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে তিনি এভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে, মেঘলা দিনে মেঘের কারণে নামায

কাযা হওয়ার আশংকা থাকে। তাই নামায কাযা হয়ে সওয়াব থেকে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য জলদি নামায আদায় করা উত্তম। বিলম্বে নামায আদায়ের ব্যাপারে তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ হুযূর (সা) যোহর নামায তোমাদের থেকে জলদি করে আদায় করতেন। এ হাদীস আসরের নামায বিলম্ব করার প্রতি ইঙ্গিত করে।

تعجيل (জলদি) সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত আছে, তা হলো مبهم (মুবহাম) বা অস্পষ্ট। এরদ্বারা সুস্পষ্টভাবে تعجيل -এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথবা এ সব হলো محتمل (মুহতামাল) যা ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব تأخير -এর ব্যাখ্যা করে থাকে। যেমন হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা) আসর নামায আদায় করতেন। এরপর কোন ব্যক্তি মদীনা শহর থেকে বাইরে যেত এবং সূর্য তখন আকাশে অনেক উপরে থাকত। সত্য হলো এই যে, এরদ্বারা ওয়াক্ত নির্ধারিত হয় না। অথবা রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-এর বর্ণনায়, তিনি বলেছেন, আমরা হুযূর (সা)-এর সাথে আসর নামায আদায় করে পশু যবেহ করে তা বন্টন করতাম এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আমরা গোশত রান্না করে খেতাম। এখানে পশু যবেহ করা এবং বন্টন করার পর রান্না করে খাওয়া কোন চূড়ান্ত বিষয়ের প্রমাণ নয়। কেননা এ ধরনের কাজ খুব দ্রুত শেষ করা যায় আবার ধীরেও করা যায়। অথবা তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সা) এমন সময় আসর নামায আদায় করতেন যখন সূর্যের আলো তাঁর হুজরার (ঘর) উপর পতিত হতো। এখানে উল্লেখ্য যে, স্থান ও কালের পরিবর্তনে ছায়া উঁচু-নীচু হয়ে থাকে। অথবা ঐ সমস্ত হাদীস, যাতে আসর নামায এমন সময় আদায়ের কথা বলা হয়েছে, যখন সূর্যের আলো শুভ্র ও উজ্জ্বল থাকে। এ হাদীসে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী বিলম্বের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা তিনিও تأخير -এরদ্বারা এ অর্থ গ্রহণ করে থাকেন যে, মাকরূহ ওয়াক্তের পূর্বে সূর্যের আলো উজ্জ্বল থাকে, -হলুদ আকার ধারণ না করে, তখন আসর নামায আদায় করতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) মুয়াত্তা নামক হাদীস গ্রন্থে বলেন ঃ আমাদের মতে সূর্যের আলো যখন উজ্জ্বল থাকে, হলুদ আকার ধারণ না করে, আসর নামাযে এরূপ বিলম্ব করা উত্তম। সুতরাং এ বিষয়ে আবূ দাউদ শরীফে আলী ইবনে শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস এর চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছে। অতঃপর এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। হাদীসটি হলো এই ঃ

قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلٰوةَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ تَقِيَّةً *

আমরা যখন মদীনায় হুযূর (সা)-এর খিদমতে আগমণ করি, তখন আসর নামায বিলম্ব করে আদায় করা হতো। তখন সূর্যের আলো উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকত।

এ হাদীস ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাবের পূর্ণ সমর্থন করে।

تعجيل (জলদি) সম্পর্কিত হাদীসসমূহের উদ্দেশ্যে হলো এই যে, যেহেতু আসর নামাযের ওয়াক্ত খুবই সংক্ষিপ্ত এবং এতে কিছু মাকরূহ সময় রয়েছে, তাই নামায যাতে মাকরূহ না হয় এরূপ সূর্যের আলো উজ্জ্বল থাকতেই নামায আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে গাফিল হলে নামায

কাযা হওয়ার আশংকা বিদ্যমান থাকে। শুধু এ আশংকার কারণেই আসর জলদি আদায়ের কথা বলা হয়েছে। নতুবা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতই আসর নামাযের সঠিক ওয়াক্ত।

এছাড়া মুত্তাকীদের জন্য এখানে একটি নেক উদ্দেশ্য হলো এই যে, যদি আসর নামায বিলম্ব করা হয়, তাহলে এর পূর্বে নফল আদায় করে অনেক সওয়াব হাসিলের সুযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু জলদি আদায় করা হলে এ সুযোগ থাকে না। কেননা আসর নামাযের পর কোন নফল নামায জায়েয নেই।

٨٨ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اِبْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُه وَمَالُه *

হাদীস নং- ৮৮

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে,রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যার আসর নামায কাযা হয়ে গেল, যেন তার সন্তান ও ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা ঃ আসর নামাযের ব্যাপারে এ কঠোর শাস্তি ও হুঁশিয়ারীর কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, নিশ্চয়ই আসর নামাযের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অধিকাংশ হাদীসে এ আসর নামাযকে মধ্যবর্তী নামায (صلوة وسطى) বলা হয়েছে।

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো এই যে, এদের উপর থেকে বরকত ও রহমত ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং এদের প্রতিপালন ও বৃদ্ধিপ্রাপ্তি থামিয়ে দেওয়া হয়। কেননা মানুষ যখন আল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ হক আদায়ের ব্যাপারে গাফিল হয়ে যায় এবং অলসতা প্রদর্শন করে, তখন এ কারণে আল্লাহ তার প্রিয় বস্তুসমূহ থেকে বরকত ও রহমত উঠিয়ে নেন।

٨٩ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَلٰوةَ بَعْدَ الْغَدْوَةِ حَتّٰى تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ وَلاَ يُصَامُ هٰذَانِ الْيَوْمَانِ الاَضْحٰى وَالْفِطْرِ وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الاَقْصٰى وَاِلٰى مَسْجِدِى هٰذَا وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ اِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ *

হাদীস নং- ৮৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ফজরের

নামাযের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত কোন নামায নেই এবং আসর নামাযের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে কোন নামায নেই। ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরের দিন কোন রোযা রাখা যাবে না। তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করা যাবে না। মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং আমার এ মসজিদ (মসজিদে নববী)। আর মহিলাগণ মুহরিম ব্যতীত দু'দিনও সফর করবে না।

ব্যাখ্যা ঃ সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থসমূহে প্রায় একই বাক্য দ্বারা এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, বরং এত অধিক সংখ্যক সাহাবা থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হানাফী ফকীহগণ এটিকে মুতাওয়াতির হিসেবে গণ্য করেছেন।

এ হাদীসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মাসয়ালা ফজর নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এবং আসর নামাযের পর সূর্যাস্তের পূর্বে কোন নামায পড়া মাকরূহ। এ হাদীস ঐ লোকদের মতামতকে খন্ডন করেছে, যারা আসর নামাযের পর দু'রাকআত নামায জায়েয বলে মনে করে। অথবা এমন সময় ফজর নামায জায়েয মনে করে যখন সূর্য উদিত হয়। অথবা যারা ফজর নামাযের পর সুন্নতের কাযা জায়েয মনে করে। অথবা জুমুআর দিন মাকরূহ সময়ে নফল নামায জায়েয মনে করে। উক্ত চারটি মতামতকে হাদীসের প্রথম অংশের দ্বারা খন্ডন করা হয়েছে। তবে আসরের পর দু'রাকআত নামায কোন কোন সহীহ রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। এমনকি বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ হাদীস বর্ণিত আছে। বরং এর উপর হুযূর (সা)-এর অনবরত আমলেরও প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এ হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে এ আমল হুযূর (সা)-এর সাথে সম্পৃক্ত বা নির্ধারিত ছিল। উম্মতের জন্য এ বিধান নিষিদ্ধ। এতে জায়েয হওয়ার কোন পথ নেই। যেমন হুযূর (সা) অনবরত রোযা (صوم وصال) রাখতেন। কিন্তু তা উম্মতের জন্য নিষেধ করেছেন। এটা ছিল হুযূর (সা)-এর বিশেষ আমল।

দ্বিতীয় মাসয়ালা হলো, দু'ঈদের দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, نهى صوم الفطر والنحر অর্থাৎ হুযূর (সা) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। ঈদুল আযহার সাথে এগার, বার এবং তেরই যিলহজ্জও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা মুসলিম শরীফে নাবীশা থেকে মরফূ রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله। অর্থাৎ আইয়্যামে তাশরীক (এগার, বার ও তেরই যিলহজ্জ) পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের দিন। সুতরাং রোযা রেখে নিজের উপর পানাহার হারাম করে নেওয়া কিভাবে জায়েয হবে ? মোটকথা, এ দিনসমূহে রোযা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আইম্মায়ে কিরাম একমত; তবে এ সমস্ত দিনে হানাফী মাযহাবমতে শুধু মান্নতের রোযা রাখা জায়েয আছে। কেননা তাঁদের মতে মান্নতের রোযাও একটি ইবাদত। রোযার জন্য দিন নির্দিষ্ট করার ফলে অন্যান্য রোযা হারাম হওয়া রোযার মূল কাজকে বাধা প্রদান করে, দিন নির্ধারণকে নয়। সুতরাং এই পার্থক্যের কারণে মান্নতের রোযা জায়েয ও সঠিক হবে। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী এ দিনসমূহে রোযা রাখার কোন সুযোগ নেই। এ মান্নতের কাযা অন্য কোন দিন আদায় করতে হবে।

এ হাদীসের মধ্যে তৃতীয় মাসয়ালা হলো এই যে, সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে কোন্ কোন্

মসজিদের দিকে সফর করা জায়েয এবং কোন্ কোন্ মসজিদের দিকে জায়েয নয়। কোন কোন মুহাদ্দিস এবং ইমাম বাহ্যিক হাদীসের উপর ভিত্তি করে তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকে সফর করা জায়েয নয় বলে মনে করেন। তাঁরা সফরের উদ্দেশ্যের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য সংযোগ করে অন্যান্য মসজিদকে এ নির্দেশ ও বিধান থেকে পৃথক করেছেন। অর্থাৎ এ নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হলো এই যে, যদি আল্লাহর নৈকট্যলাভের কামনা থাকে, তাহলে এ তিনটি মসজিদের দিকে সফর করতে হবে। কেননা সমস্ত মসজিদের মধ্যে তিনটি মসজিদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তবে কেউ যদি ইলম অন্বেষণ, ব্যবসা এবং কারো হক আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করে, তাহলে অন্যান্য মসজিদের দিকে এরূপ সফর করা জায়েয হবে। সুতরাং মোল্লা আলী ক্বারী (র)-এর উক্তি এ দিকেই ইঙ্গিত করেছে। কোন কোন নিষেধাজ্ঞাকে ফযীলতের তুলনা করে বলা হয় যে, অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এ তিন মসজিদের যিয়ারত অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লামা নববী (র) এ ধারণাকে জমহুর বা অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত বলে উল্লেখ করেছেন।

আবার কেউ কেউ নিষেধাজ্ঞার সীমাকে আরো বৃদ্ধি করে নেককার ব্যক্তি ও আত্মীয়-স্বজনদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য সফর করাকেও শরীয়ত বিরোধী ও খারাপ মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত কাজসমূহ এ নির্দেশের আওতায় পড়ে না। হাদীসে বর্ণিত তিনটি মসজিদের ফযীলতের বর্ণনার দ্বারা অন্যান্য মসজিদকে পৃথক করা হয়েছে। এতে কবর যিয়ারত বিতর্কিত। কেউ কেউ এটাকে মুবাহ বলেছেন। আবার কেউ কেউ নিষিদ্ধ বলেছেন। অবশ্য নেককার আত্মীয়-স্বজন অথবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর মাকরূহ ছাড়াই জায়েয। সুতরাং আল্লামা ইরাকী এ বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন বরং ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণনায় এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

চতুর্থ মাসয়ালা দু'টি অবস্থার উপর বিদ্যমান। প্রথমতঃ মহিলাগণ স্বামী কিংবা অন্যান্য মুহরিম তথা পুত্র, ভাই, মামা, চাচা, ছাড়া সফর করতে পারবে কিনা ? দ্বিতীয়তঃ তাদের সফরের সময়সীমা, কোথাও কোথাও একদিন একরাত বর্ণিত আছে। যদি সফরের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে একদিন এক রাতের কম সময়ের সফরও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মুসলিম শরীফের রিওয়ায়েতে একরাত, আবার অন্যান্য গ্রন্থে একদিন। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে একটি এরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, মহিলাদের একদিনের জন্য মুহরিম ব্যতীত সফর করা নিষেধ। কিন্তু গ্রহণযোগ্য মত হলো এই যে, সবচেয়ে কম সময়ের সফরে মহিলাগণ স্বামী ও মুহরিম ব্যতীত সফর করতে পারবে।

بَابُ الاَذَانِ وَالاِقَامَةِ

আযান ও ইকামতের বর্ণনা

٩٠ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اِبْنِ بُرَيْدَةَ (رض) اَنَّ رَجُلاً مِنَ

الاَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاَه حَزِيْنًا ، وَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا طَعِمَ يَجْمَعُ اِلَيْهِ فَانْطَلَقَ حَزِيْنًا بِمَا رَاَى مِنْ حُزْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكَ طَعَامَه وَمَا كَانَ يَجْتَمِعُ اِلَيْهِ ، وَدَخَلَ مَسْجِدَه يُصَلِّى فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذَا نَعَسَ فَاَتَاه اٰتٍ فِى النَّوْمِ فَقَالَ هَلْ عَلِمْتَ مِمَّا حَزِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ قَالَ فَهُوَ لِهٰذَا التَّاْذِيْنِ فَاْتِهِ فَمُرْه اَنْ يَّاْمُرَ بِلاَلاً اَنْ يُّؤَذِّنَ – فَعَلَّمَه الاَذَانَ – اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ عَلَّمَه الاِقَامَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَقَالَ فِى اٰخِرِه قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَاذَانِ النَّاسِ وَاِقَامَتِهِمْ فَاَقْبَلَ الاَنْصَارِىُّ فَقَعَدَ عَلٰى بَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ اَبُو بَكْرٍ فَقَالَ اِسْتَاْذِنْ لِى وَقَدْ رَاٰى مِثْلَ ذَالِكَ فَاَخْبَرَ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اِسْتَاْذَنَ لِلْاَنْصَارِى فَدَخَلَ فَاَخْبَرَ بِالَّذِى رَاٰى فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرٍ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاَمَرَ بِلاَلاً يُؤْذِنُ بِذٰلِكَ *

وَفِى رِوَايَةٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الاَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاٰه حَزِيْنًا وَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا طَعِمَ يَعْشٰى مَعَه فَانْصَرَفَ لِمَا رَاٰى مِنْ حُزْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ طَعَامَه فَدَخَلَ مَسْجِدَه يُصَلِّى فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذَا نَعَسَ فَاَتَاه اٰتٍ فِى النَّوْمِ فَقَالَ لَهُ اَتَدْرِى مَا اَحْزَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ قَالَ هُوَ النِّدَاءُ فَاْتِهِ فَاْمُرْ بِاَنْ يَّاْمُرَ بِلاَلاً قَالَ الرَّجُلُ فَعَلَّمَه الاَذَانَ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَن لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ عَلَّمَه الاِقَامَةَ كَذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ فِى اٰخِرِه قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ مَرَّتَيْنِ كَاذَانِ النَّاسِ وَاِقَامَتِهِمْ فَانْتَبَهَ الاَنْصَارِىُّ فَاَتى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ بِالبَابِ فَجَاءَ اَبُو بَكرٍ فَقَالَ الاَنْصَارِىُّ اِسْتَأذِنْ لِى فَدَخَلَ اَبُو بَكرٍ فَاَخْبَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذٰلِكَ ثُمَّ دَخَلَ الاَنْصَارِىُّ فَاَخْبَرَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِى رَأى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَخبَرَنَا اَبُو بَكرٍ فَقَالَ مُرَ بِلاَلاً بِمِثْلِ ذٰلِكَ *

হাদীস নং- ৯০

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হলেন এবং তাঁকে চিন্তাযুক্ত দেখতে পেলেন। এ ব্যক্তি (আনসারী) ধনী ও সম্পদশালী ছিলেন। দরিদ্র লোকজন তাঁর বাড়িতে জমা হতো। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চিন্তাযুক্ত দেখে সেখান থেকে চলে গেলেন। পানাহার ত্যাগ করে এবং আত্মীয়-স্বজন ও তাঁর নিকট আগত লোকজন ছেড়ে তিনি মহল্লার মসজিদে দিয়ে নামায পড়া আরম্ভ করেন। এ অবস্থায় তাঁর তন্দ্রা এসে যায় এবং স্বপ্নে দেখেন যে, কোন একজন ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, তুমি কি জান রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেন চিন্তিত হয়েছেন ? তিনি বললেন ঃ না। তখন আগন্তুক বলল, এ আযানের ব্যাপারে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ? তুমি তাঁর কাছে যাও এবং বল, তিনি যেন হযরত বিলাল (রা)-কে আযান দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তি তাঁকে এভাবে আযান শিক্ষা দিলেন اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার) দু'বার করে চারবার। حَىَّ দু'বার। اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ দু'বার। اَشْهَدُ اَن لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ দু'বার। عَلَى الصَّلٰوةِ দু'বার। حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ দু'বার। অতঃপর তাকে একইভাবে ইকামত শিক্ষা দেন এবং আযানের শেষে قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ - قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ সংযোগ করেন। (বর্ণনাকারী বলেন) যেভাবে বর্তমানের লোকজন আযান ও ইকামত দিয়ে থাকে। অতঃপর এ আনসারী (নাম আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আবদে রাব্বিহ) মসজিদ থেকে বের হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরজায় গিয়ে বসেন।

ইতিমধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) সেখানে আগমণ করেন। আনসারী তাঁকে বললেন ঃ আমার জন্য একটু অনুমতি প্রার্থনা করুন। হযরত আবূ বকর (রা)-ও এ স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তা বর্ণনা করেন। অতঃপর আনসারীকে অনুমতি দেওয়া হলো। তখন আনসারী প্রবেশ করলেন এবং স্বপ্নে যা দেখেছিলেন, তা বর্ণনা করলেন। তখন নবী (সা) বলেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা)-ও অনুরূপ স্বপ্নের কথা আমার নিকট বর্ণনা করেছে। অতঃপর তিনি (সা) হযরত বিলাল (রা)-কে এভাবে আযান দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, আনসারদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমণ করেন এবং তাঁকে চিন্তিত দেখতে পান। এ ব্যক্তি লোকজনের সাথে রাতে আহার করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ অবস্থা দেখে তিনি আহার পরিত্যাগ করে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতে থাকেন। এ অবস্থায় তাঁর তন্দ্রা এসে যায় এবং তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলে, তুমি কি জান রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেন চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ? তিনি বললেন ঃ না। ঐ ব্যক্তি বলল, এ আযানের কারণেই। তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে বল, তিনি যেন হযরত বিলাল (রা)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তি তাঁকে এভাবে আযান শিক্ষা দিলেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) দু'বার করে চারবার। اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) দু'বার। اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) দু'বার। حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়্যা আলাস সালাহ) দু'বার حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ (হাইয়্যা আলাল ফালাহ) দু'বার। اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ)।

অতঃপর এভাবে ইকামত শিক্ষা দিলেন। সর্বশেষ قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ (কাদাকা- মাতিস সালাতু) দু'বার। (বর্ণনাকারী বলেন) যেভাবে বর্তমানে লোকজন আযান ও ইকামত দিয়ে থাকে। এরপর আনসারী সাহাবী তন্দ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে নবী (সা)-এর ঘরের নিকট এসে দরজায় বসে পড়েন। এ সময় হযরত আবূ বকর (রা) আগমণ করেন। আনসারী বললেন ঃ আমার জন্য একটু অনুমতি প্রার্থনা করুন। হযরত আবূ বকর (রা) ভিতরে প্রবেশ করে আনসারীর স্বপ্নের মতই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আযানের কথা বর্ণনা করেন। এরপর আনসারী প্রবেশ করলেন এবং যা কিছু স্বপ্নে দেখেছেন, তা রাসূল (সা)-এর নিকট বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা) এ আযান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেন ঃ হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দাও সে যেন এরূপ আযান প্রদান করে।

ব্যাখ্যা ঃ আযান ও ইকামত নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেননা এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে আযানের মধ্যে সমস্ত বাক্য দু'-দু'বার এবং ইকামতে قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ ব্যতীত সমস্ত বাক্য এক-একবার। এছাড়া তিনি আযানে ترجيع করার পক্ষে মত পোষণ করেন। অর্থাৎ প্রথমবারে দু'শাহাদতকে (আশহাদু

আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্) নীচু আওয়াযে দু'বার আদায় করতে হবে, অতঃপর উচ্চস্বরে দু'বার মোট চারবার। একবার একবার (افراد) ইকামত বলা সম্পর্কে হযরত ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস ঃ اَمَرَ بِلاَلاً اَنْ يَشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاقَامَةَ الاَّ الاقَامَةَ "হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি আযানে প্রতিটি বাক্য দু'বার এবং একামতে একবার করে উচ্চারণ করেন।" কিন্তু قَدْقَامَتِ الصَّلُوةُ এর ترجيع সম্পর্কে তিনি স্বীয় মাযহাবের স্বপক্ষে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত আবূ মাহযূরা (রা)-এর হাদীস পেশ করেছেন। এ হাদীসে আবূ মাহযূরা (রা) বলেন ঃ হুযূর (সা) তাঁকে আযানের তালিম দিয়েছেন এবং ترجيع করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম মালিক (র) افراد ও ترجيع উভয়ের পক্ষে মত পোষণ করেছেন। কিন্তু তিনি قَدْقَامَتِ الصَّلُوةُ -এর মধ্যে افراد (একবার)-এর মতামত পেশ করেছেন। তিনি افراد ও ترجيع -এর প্রমাণ হিসেবে হযরত আবূ মাহযূরা (রা) এবং হযরত আনাস (রা)-এর হাদীস পেশ করেছেন। তবে افراد সম্পর্কে হযরত আনাস (রা)-র ঐ রিওয়ায়েতটি গ্রহণ করেছেন যাতে الاقَامَةَ শব্দটি নেই। কিন্তু অন্য একটি সনদের দ্বারা বুখারী শরীফে ঐ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ (র) ترجيع করার স্বপক্ষে মত পোষণ করেন নি।

ইমাম আবূ হানীফা (রা) افراد ও ترجيع কোনটির পক্ষেই মত পোষণ করেননি; বরং তাঁর মতে আযান ও ইকামতের প্রতিটি বাক্য দু'বার করে বলতে হবে। শুধু তাকবীরের বাক্য চারবার বলতে হবে। তিনি উভয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আবদে রাব্বিহ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন; যা ترجيع ও افراد উভয়কে বাতিল করে থাকে। আবূ দাউদ শরীফে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত ইবনে আবী শায়বা সহীহ সনদের দ্বারা এক রিওয়ায়েত বর্ণনা করেন বলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) হুযূর (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে সবুজ চাদর পরিধান করা অবস্থায় দেখি।.তিনি দেওয়ালের উপর দাঁড়িয়ে দু'বার দু'বার প্রতিটি বাক্য উচ্চারণ করে আযান ও ইকামত দিচ্ছেন। এ বিষয়ে আসার (اثار) মুতাওয়াতির পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, হযরত বিলাল (রা) মৃত্যু পর্যন্ত আযান ও ইকামতে প্রতিটি বাক্য দু'বার করে আদায় করতেন। চতুর্থত, হযরত আবূ মাহযূরা (রা)-এর এ হাদীস ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাবের জন্য শক্তিশালী দলীল। কেননা হযরত আবূ মাহযূরা (রা) ও অন্যান্যদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এ বিস্তারিত হাদীসটিকে রহিত (مَنْسُوخ) মানতে হবে। কারণ একটি বিষয় একবার তালীম দেওয়ার ফলে এটা পৃথক সুন্নত হিসেবে গণ্য হতে পারে না এবং তা কোন মাযহাব হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনা ছিল افراد সম্পর্কে। এবার ترجيع সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। ترجيع সম্পর্কে আবূ মাহযূরা (রা)-এর হাদীসের বিপরীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা)-এর হাদীস রয়েছে যা মূলনীতি ও দলীল এবং বিশুদ্ধতার কারণে খন্ডন করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ আবূ দাউদ, নাসাঈ, দারিমী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে আযানের শব্দ দু'বার বলে উল্লেখ রয়েছে। তৃতীয়তঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রিয় মুয়াযযিন হযরত বিলাল (রা)-এর আযান এ বিষয়ে শক্তিশালী দলীল। কেননা তাঁর আযানে তারজী (ترجيع) ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দ্বিতীয় মুয়াযযিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)-এর আযানেও তারজী' ছিল না। এমনিভাবে কূবা মসজিদের মুয়াযযিন হযরত সা'দ (রা)-এর আযানেও তারজী' ছিল না। সুতরাং এ সম্মানিত ব্যক্তিদের কার্যক্রম কিভাবে সুন্নত বিরোধী হবে ? তবে হযরত আবূ মাহযূরা (রা) হয়ত প্রথম কালেমায়ে শাহাদাত আস্তে বলেছেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে দ্বিতীয়বার উচ্চস্বরে বলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এটা সুন্নতে পরিণত হয়েছে। আল্লামা তাহাবী (র) এই মত প্রকাশ করেছেন। এছাড়া উক্ত বিষয়ে আরো শক্তিশালী দলীল হলো এই যে, হযরত আবূ মাহযূরা (রা)-এর হাদীস অন্য এক কারণেও তারজী'র প্রমাণ বহন করে না। কেননা এটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে যুক্ত ছিল। ইবনে জাওযী বলেন ঃ হযরত আবূ মাহযূরা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাই হুযূর (সা) তাঁকে কালেমায়ে শাহাদাত বার বার তালীম দিয়েছেন, যাতে এ কালেমা তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং তাঁর মুশরিক সাথীদের সামনে বার বার পাঠ করেন। কিন্তু তিনি মনে করেছেন এ অতিরিক্ত কালেমা আযানের অংশ। তাই সংখ্যা বর্ণনার সময় উনিশ শব্দ গণনা করেছেন। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে প্রতীয়মান হয় যে, আযানের জন্য حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বার বার উচ্চারণের অধিক প্রয়োজন। কিন্তু এই শব্দসমূহ যেহেতু পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়নি, সুতরাং অন্যান্য শব্দসমূহ কেন বার বার উচ্চারিত হবে ? অন্যদিকে এটা লক্ষণীয় যে, ইকামত আযানেরই প্রতিধ্বনি। যদি আযান অনুপস্থিত ব্যক্তিদের আহ্বানের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে উপস্থিত ব্যক্তিদের আহ্বানের জন্য বিবেক এ বলে যে, আযান ও ইকামত একই ধরনের হতে হবে। ইকামতে যেহেতু তারজী' নেই, সুতরাং আযানেও না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

٩١- اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ (رضـ) يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ *

হাদীস নং-৯১

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ নবী (সা) মুয়াযিযনের আযানের সময় ঐ বাক্যসমূহ উচ্চারণ করতেন, যা মুয়াযযিন বলত।

ব্যাখ্যাঃ ইমাম বুখারী (র) হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে মরফূ' রিওয়ায়েত করেন যে, যখন তোমরা আযান শোন, তখন মুয়াযযিন যেরূপ বলেন, তোমরাও তদ্রূপ বলতে থাক। ইবনে মাজাহ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মরফূ রিওয়ায়েত করেন যে, যখন মুয়াযযিন আযান দিবে তখন মুয়াযযিন যা বলবে, তোমরাও তা বলতে থাক। মোটকথা, সহীহ্ হাদীস ও সুনানে প্রায়

একই বাক্যের দ্বারা এ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু যখন মুয়াযযিন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاح বলবে, এর জবাবে لاَ حَوْلاَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰه পড়তে হবে। কেননা তাহাবী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন আঁ হযরত (সা) মুয়াযিযনের আযান শুনতেন তখন মুয়াযিযনের উচ্চারিত বাক্যসমূহ তিনিও উচ্চারণ করতেন। তবে যখন মুয়াযিযন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة এবং حَيَّ عَلَى الفَلَاح বলত, তখন তিনি لاَ حَولاَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰه বলতেন। নিশ্চয়ই এ বাক্যসমূহ উচ্চারণে যথেষ্ট সওয়াব ও ফযীলত রয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি আযানের জবাব প্রদান করবেন, তিনি কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের মধ্যে অধিক সম্মানের অধিকারী হবেন।

بَابُ مَنْ بَنى لِلّٰهِ مَسْجِداً

যে আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে

٩٢ – اَبُوْ حَنِفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهَ بْنِ اَبِىْ اَوْفى (رض) يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِداً وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاة بَنَى اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ *

হাদীস নং-৯২

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, যদিও তা কাত্তাতের (এক প্রকার পাখি) বাসার মত ক্ষুদ্র হোক না কেন, আল্লাহ তার প্রতিদানস্বরূপ বেহেশতে তার জন্য একটি বাড়ি তৈরি করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষায় একটি পাখির নাম হলো কাত্তাত (قطاة) এবং উপরে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে مفحص শব্দের অর্থ ছোট গর্ত। উর্দূ ভাষায় এই পাখির নাম হলো সংগেখার (سنگ خوار) কোন কোন অঞ্চলে এ পাখির নাম হলো মাছরাঙ্গা। এ ছোট পাখি ডিম দেওয়ার জন্য নদীর তীরে গর্ত করে ক্ষুদ্র বাসা তৈরি করে থাকে। আরবী ভাষায় প্রবাদ বাক্য রয়েছে لَيْسَ لَهُ مَفْحَصَ قَطَاة কাত্তাত পাখির ঘরের মতও তার কোন ঘর নেই। মোল্লা আলী ক্বারী লিখেছেন, قَطَاة مَفْحَص -এর উপমা এজন্যই দেওয়া হয়েছে যে, এই পাখির বাসা মাটির উপর তৈরি করে এবং মসজিদও মাটির উপর তৈরি করা হয়। তবে আমার মনে হয়, এরদ্বারা সবচেয়ে ক্ষুদ্র মসজিদ বুঝানো হয়েছে।

হাদীসে মসজিদ নির্মাণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মুসলমানদের সামাজিক জীবনে মসজিদ কত গুরুত্বপূর্ণ, এর ধারণা হুযূর (সা)-এর মদীনার জীবন থেকে লাভ করা যায়। মসজিদ

ইবাদতের জায়গা, আদালতের জায়গা। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের মীমাংসা করা হতো। মসজিদ বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের আলোচনার জায়গা। এখানেই রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সাথে মিলিত হতেন। এটাই মাদ্রাসা ছিল। লোকজন এখানে তালীম হাসিল করতেন। এখানেই যিকিরের আওয়াজ উচ্চারিত হতো। মসজিদই হলো শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান। সমস্ত দুনিয়া থেকে ভয়-ভীতি নিয়ে মসজিদের দিকে আগমণ করুন এবং আল্লাহর রহমতের উপর নিজকে সমর্পণ করে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করুন।

যে মহল্লায় মসজিদ নেই, তা এক নির্জন প্রান্তরের মত। মূলত মুসলমানদের জীবন মসজিদ থেকেই শুরু হয়। কেননা জন্মের সাথে সাথে কানে আযান দেওয়া হয় এবং মৃত্যুর পর এখানেই জানাযা সম্পন্ন হয়, মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা হয়। সুতরাং উপরের আলোচনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র মসজিদ থেকেই মুসলমানদের জীবনে যাবতীয় ন্যায়-নীতি ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। হুযূর (সা)-এর পবিত্র বাণীর এটাই মূল উদ্দেশ্য যে, মসজিদ মুসলমানদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মসজিদ তৈরি করবে, আল্লাহ তাঁর জন্য পরকালে বেহেশতে ঘর তৈরি করবেন।

بَابُ النَّهى عَن انشَادِ الضَّوَالِى فِى المَسجِدِ

মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা করা নিষেধ

٩٣- اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَن ابنِ بُرَيْدَةَ عَن اَبِيْهِ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يُنْشِدُ جَمَلاً فِى المَسْجِدِ فَقَالَ لاَ وَجَدْتَّ -

وَفِى رَوَايَةٍ سَمِعَ رَجُلاً يُنْشِدُ بَعِيْرًا فَقَالَ لاَ وَجَدْتَ اِنَّ هٰذِهِ الْبُيُوْتَ بُنِيَتْ هٰذِهِ لِمَا بُنِيَتْ لَه -

وَفِى رَوَايَةٍ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ رَأسَه فِى المَسْجِدِ فَقَالَ مَن دَعَا اِلَى الجَمَلِ الاَحْمَرِ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا وَجَدْتَ اِنَّمَا بُنِيَت هٰذِهِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَت لَه -

হাদীস নং- ৯৩

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা) কোন এক ব্যক্তিকে মসজিদে

তার উট খোঁজ করতে শুনেন। সে মসজিদে তার হারনো উটের ঘোষণা দিচ্ছে। তখন তিনি বললেন ঃ (তুমি তোমার উট) যেন না পাও।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) শুনেন এক ব্যক্তি মসজিদে তার উট খোঁজ করছে। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি এটা না পাও। নিশ্চয়ই এ ঘর তৈরি করা হয়েছে ঐ কাজের জন্য যে কাজের জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, এক ব্যক্তি মসজিদে তার মাথা প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং বলে, কে আমার হারানো লাল উটের সন্ধান দিতে পারবে? তখন রাসূল (সা) বলেন ঃ তুমি তোমার উট না পাও, নিশ্চয়ই মসজিদ ঐ কাজের জন্য, যে কাজের জন্য তা তৈরি করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের সহীহ কিতাবসমূহের মধ্যে এই হাদীস বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। দারিমী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মরফূ' রিওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সা) বলেছেন ঃ যদি তোমরা কাউকে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখতে পাও, তাহলে তাকে বল আল্লাহ তোমার ব্যবসায় লাভ না দিন। অথবা যদি কেউ মসজিদে তার হারানো উট খোঁজ করে, তাহলে তাকে বল, আল্লাহ যেন তোমার হারানো বস্তু ফিরিয়ে না দেন বা তুমি যেন তা না পাও।

কিন্তু হুযূর (সা) হাদীস اِنَّ هٰذِهِ الْبُيُوْتَ بُنِيَتْ لِمَا بُنِيَت لَه -এরদ্বারা নিষেধাজ্ঞার একটি সীমা নির্ধারণ করেছেন এবং এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যে কোন কাজ যা মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও হারাম। মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো, নামায পড়া ও আল্লাহর যিকির করা। সুতরাং যে কাজ এ উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে অথবা এতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে, তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এর উপর কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যেমন মসজিদে দুনিয়ার কথাবার্তা বলা, হস্তশিল্পের কাজ করা অথবা এরূপ আওয়াজে কথা বলা যাতে মুসল্লীদের নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। কোন কোন উলামায়ে কিরাম উচ্চস্বরে যিকির করতেও নিষেধ করেছেন। মোটকথা, এ হাদীসের দ্বারা মসজিদে কোন হারানো বস্তুর খোঁজ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ

নামায শুরু করার বর্ণনা

٩٤. اَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ .

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ وَائِلٍ اَنَّه رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَرْفَعُ

يَدَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ حَتّٰى يُحَاذِىَ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ .

হাদীস নং-৯৪

অনুবাদ ঃ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা) (নামায শুরু করার সময়) তাঁর উভয় হাত এতখানি উপরে উঠাতেন যে, তা কানের লতি বরাবর হয়ে যেত।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত ওয়ায়েল (রা) নবী করীম (সা)-কে নামাযে (প্রারম্ভে) হাত উঠাতে দেখেছেন, তখন ঐ হাত তাঁর কানের লতি পর্যন্ত উঠে যেত।

ব্যাখ্যা ঃ হুযূর (সা) কিভাবে নামায শুরু করতেন উপরে বর্ণিত হাদীসে এ মাসয়ালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তা হলো এই যে, তিনি (তাহরীমার সময়) এভাবে হাত উঠাতেন যে, হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠে যেত। কখনো এতখানি হাত উঠাতেন যে, তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী কান বরাবর উঠে যেতে।

এ মাসয়ালায় নামাযের প্রারম্ভে হাত কাঁধ বরাবর উঠানো উত্তম, না কানের লতি পর্যন্ত উঠানো উত্তম এ বিষয়ে হানাফী এবং শাফিঈ মাযহাবের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী মাযহাবে কানের লতি পর্যন্ত উঠানো উত্তম। তাঁরা উপরে বর্ণিত হাদীসসহ একই বিষয়ে যে সমস্ত সহীহ রিওয়ায়েত রয়েছে, তা দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। শাফিঈ মাযহাবে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো উত্তম। তাঁরা দলীল হিসেবে আবূ হুমাইদ সায়েদী (রা) বর্ণিত হাদীস অথবা ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস পেশ করে থাকেন।

মূলত উভয় মাযহাবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা উভয় মত সম্পর্কে সহীহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে এবং এ হাদীসসমূহের মধ্যে সমন্বয় করা খুবই সহজ। যেমন একবার ইমাম শাফিঈ (রা) মিসর গমন করেন। এখানে লোকজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ সমস্ত হাদীসের মধ্যে কি সমন্বয় করার কোন সুযোগ আছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, হাতের তালু কাঁধের সামনে থাকবে, বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের লতি বরাবর এবং অঙ্গুলীসমূহের শেষ অংশ কানের উপর অংশের বরাবর থাকবে। অবশ্য হানাফী মাযহাব এ সমন্বয় সমর্থন করেছে। হানাফী মাযহাবে ফাতহুল কাদীরের লেখক এটাই গ্রহণ করেছেন। উপরোক্ত হাদীসসমূহের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, আঁ হযরত (সা) কোন বিশেষ নির্ধারিত নিয়ম ব্যতীত কখনো কাঁধ পর্যন্ত, কখনো কানের লতি পর্যন্ত এবং কখনো কানের উপর মাথা বরাবর পর্যন্ত হাত উঠাতেন।

٩٥ - اَبُو حَنِيفَةَ عَن عَاصِمٍ عَن عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ (رض) عَن اَبِيْهِ قَالَ رَأَيتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكبِرِ وَ يُسَلِّمُ عَن يَمِيْنِهِ وَ يَسَارِهِ *

হাদীস নং-৯৫

অনুবাদ ঃ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাকবীরের সময় হাত উঠাতে দেখেছি এবং তিনি (নামায শেষে) ডান ও বাঁ দিকে সালাম ফিরাতেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের মধ্যে প্রথমতঃ দু'টি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল হাত উঠানো এবং সাথে সাথে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলা, অথবা একটার পর একটা বলা। অতঃপর এর মধ্যে অপর একটি বিষয় হলো এই যে, প্রথমে হাত উঠাতে হবে,পরে তাকবীর বলতে হবে, অথবা প্রথম তাকবীর বলতে হবে, পরে হাত উঠাতে হবে ?

দ্বিতীয়টি হলো এই যে, দুটি সালাম দিতে হবে, না একটি। উপরে বর্ণিত প্রথম বিষয় (হাত উঠানো ও তাকবীর বলা) সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফিকহবিদ যেমন ঃ তাহাবী, কাযীখান ও হযরত ইমাম আবূ ইউসূফ (র) প্রথম পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন। এ মতের সমর্থনে হযরত ওয়ায়েল (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত ইবনে উমর (রা), হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) এবং হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) বর্ণিত হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) যখন তাকবীর বলতেন, তখন কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন অথবা যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং হাত উঠাতেন। এখানে তাকবীর বলা এবং হাত উঠানোর সময়ের সূক্ষ্ম মিলনের কারণে একটি অপরটির শর্তবিশেষ। এছাড়া উপরোক্ত দল আরো একটি দলীল পেশ করে বলেন যে, হাত উঠানো তাকবীরের সুন্নত। সুতরাং এর সাথেই তা আদায় করতে হবে।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে প্রথম হাত উঠাতে হবে এরপর তাকবীর বলতে হবে। তাঁর যুক্তি হলো এই যে, হাত উঠানোর দ্বারা গায়রুল্লাহ্কে অস্বীকার করা বুঝায় এবং তাকবীর ও হাত উঠানোর মধ্যে এর স্বীকৃতি (اثبات) রয়েছে। যেহেতু নীতি অনুযায়ী অস্বীকৃতি (نفى) স্বীকৃতির (اثبات) উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে, তাই তাকবীরের পূর্বে হাত উঠানো প্রয়োজন। যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর মধ্যে (نفى) লা-ইলাহা (اثبات) ইল্লাল্লাহ-এর উপর অগ্রগামী হয়েছে। ইমাম নাসাঈ এটাকে সঠিক বলেছেন। অনেক উলামা ও মাশায়েখ এ মত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের মাযহাবের সমর্থনে আবূ দাউদ ও নাসাঈ শরীফে হযরত ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণিত মরফূ' হাদীস পেশ করেছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে كَانَ يَرفَعُ يَدَيْهِ حذَاءَ مَنكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ অর্থাৎ আঁ হযরত (সা) কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন অতঃপর তাকবীর বলতেন। এখানে ثُمَّ শব্দটি দ্বারা বিলম্ব বা সামান্য দেরী করা বুঝায়। আবূ হুমাইদ সায়েদী (রা) বর্ণিত হাদীসেও ثُمَّ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা ইবনে হুমাম তৃতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। একদল উলামায়ে কিরাম তা সমর্থন করেছেন। তাঁদের দলীল হলো বায়হাকী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত মারফূ' হাদীস اِذَا افتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ অর্থাৎ হুযূর (সা) যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন অতঃপর হাত উঠাতেন। এছাড়া হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ আঁ হযরত (সা) তাকবীর বলতেন, অতঃপর হাত উঠাতেন। উপরোক্ত হাদীসসমূহের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে,

হুযূর (সা) বিভিন্ন সময় এর উপর বিভিন্ন আমল করেছেন। সুতরাং এর মধ্যে যে কোন একটি আমল করা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সালাম। অর্থাৎ নামায শেষে কয়বার সালাম ফিরাতে হবে। এ ব্যাপারে ইমাম মালিক (র) ব্যতীত সমস্ত উলামায়ে কিরাম একমত যে, দু'বার সালাম ফিরাতে হবে। প্রায় পনেরজন সাহাবী সহীহ ও নির্ভুলভাবে হুযূর (সা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর উপর আঁ হযরত (সা) সর্বদা আমল করতেন এবং সাহাবা ও তাবেঈগণ এ আমল করতেন। একমাত্র ইমাম মালিক (র) এক সালামের উপর আমল করতেন। যেমন কোন ব্যক্তি যদি একা নামায আদায় করে, তখন আসসালামু আলাইকুম বলবে এবং মাথা সামান্য সোজা করে ফিরাবে অতঃপর সামনের দিকে নিয়ে আসবে। যদি মুকতাদী হয়, তাহলে সামান্য সোজা দিকে ফিরাবে। অতঃপর ইমামের দিকে মাথা রেখে ইশারা করবে। হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সনদের দিক দিয়ে এর মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। যদি তা সহীহ বলে গণ্য করা হয়, তবুও এরদ্বারা উদ্দেশ্য সফল হবে না। কেননা ঐ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) এত উচ্চস্বরে এক সালাম ফিরাতেন যে, আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে দিত। কিন্তু এরদ্বারা দ্বিতীয় সালামকে অস্বীকার করা বুঝায় না। হয়ত সালাম ফিরাতেন কিন্তু তা এত জোরে নয়। কেননা জাগ্রত করার জন্য প্রথম সালামই যথেষ্ট।

٩٦ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبرَاهِيْمَ اَنَّه قَالَ فِى وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رض) اَعْرَابِىٌّ لَم يُصَلِّى مَعَ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةً قَبْلَهَا قَطُّ أَهُوَ اَعلَمُ مِنْ عَبْدَ اللّٰهِ وَاَصْحَابِه حَفِظَ وَلَمْ يَحْفَظُوا- يَعْنِى رَفَعَ الْيَدَيْنِ .

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ ذَكَرَ حَدِيْثَ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ صَلَّى مَعَ النَّبِىَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّى صَلٰوةً قَبْلَهَا هُوَ اَعْلَمُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ .

وَفِى رِوَايَةٍ ذُكِرَ عِنْدَه حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّه رَأى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيه وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ السُّجُوْدِ فَقَالَ هُوَ اَعْرَابِىٌّ لَايَعْرِفُ الْاِسْلَامَ لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِىَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ صَلٰوةً وَاحِدَةً وَقَدْ حَدَّثَنِى مَنْ لاَ اُحْصِى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّه رَفَعَ يَدَيْهِ فِى بَدْءِ الصَّلٰوةِ فَقَطْ وَحَكَاهُ عَنِ النَّبِىَ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَبْدُ اللّٰهِ عَالِمٌ بِشَرَائِعِ الاِسْلاَمِ وَحُدُوْدِهِ مُتَفَقِّدٌ لاَحْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلاَزِمُهُ لَهُ فِي اِقَامَتِهِ وَفِي اَسْفَارِهِ قَدْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لاَ يُحْصِى .

হাদীস নং-৯৬

অনুবাদ ঃ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম নখঈ (র) সমালোচনা করে বলেছেন যে, তিনি একজন গ্রামের লোক ছিলেন। তিনি এর পূর্বে কখনো নবী (সা)-এর সাথে নামায আদায় করেননি। তিনি কি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং তাঁর সাথীদের থেকে অধিক জ্ঞাত ছিলেন ? তিনি কি (হাত উঠানো সম্পর্কে) হিফয করে নিয়েছিলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর সাথীগণ তা হিফয করতে পারেননি।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত ইবরাহীম নখঈ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজরের হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন ঃ তিনি একজন গ্রামের লোক ছিলেন। তিনি এ নামাযের পূর্বে নবী (সা)-এর সাথে আর কোন নামায আদায় করেননি। তিনি কি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে অধিক জ্ঞান রাখেন ?

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত ইবরাহীম নখঈ-এর সামনে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করা হলো যে, তিনি নবী (সা)-কে রুকূ ও সিজদার সময় হাত উঠাতে দেখেছেন। তখন তিনি (ইবরাহীম) বলেন ঃ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর একজন গ্রামের লোক। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মত) ইসলামের ফকীহ নন। তিনি মাত্র একবার নবী (সা)-এর সাথে নামায আদায় করেছেন। আমার নিকট অসংখ্য বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে রিওয়ায়েত করেছেন যে, তাঁরা শুধু নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন এবং তা নবী (সা) থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) শরীয়ত ও ইসলামের বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। নবী (সা)-এর সাথে সফরে ও বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে সাথে সাথে থাকতেন। তিনি নবী (সা)-এর সাথে অসংখ্য নামায আদায় করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ রুকূ ও সিজদার সময় হাত উঠান একটি বিতর্কিত মাসয়ালা। এতে উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। প্রত্যেক দল স্বীয় মতের স্বপক্ষে শক্তিশালী দলীল পেশ করে অপর দলের দুর্বলতা প্রমাণ করেছেন। এ গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালার এটাই প্রথম হাদীস। মাসয়ালার বিশ্লেষণ ও বিতর্ক পরবর্তী হাদীসে বর্ণনা করা হবে। এখানে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র)-এর হাদীসে হযরত ইবরাহীম নখঈ (র) ন্যায়-নীতি ও যুক্তিতর্কের সাথে যে মীমাংসা দিয়েছেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে যাচাই ও পরীক্ষা করা হয়েছে। কেননা বক্তার অবস্থা ও তার জ্ঞানের পরিধির উপর বক্তৃতা বা কথার গুরুত্ব নির্ভর করে। কিন্তু দ্বিতীয় দল ইবরাহীম-এর মতামতের বিরোধিতা করেছিলেন যা এ আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত নয়। উভয় দলের সমালোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর হাদীস হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজরের বর্ণনা অপেক্ষা অধিক

ইবনে উমর (রা) থেকে ইলমে ফিকহ সম্পর্কে কম জ্ঞানী ছিলেন না [আদবের কারণে অধিক জ্ঞানী বলেন নি]। যদি হযরত ইবনে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সোহবত হাসিলের সৌভাগ্য লাভ করে থাকেন, তবে হযরত আলকামা (রা) অন্য ফযীলত লাভে ধন্য হয়েছেন। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ (রা) (মর্যাদার দিক দিয়ে) হযরত আবদুল্লাহ্ই ছিলেন। তখন ইমাম আওযাঈ (র) চুপ হয়ে গেলেন।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আওযাঈ (র) এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এই বিতর্ক কয়েকটি বিষয়ের আলোচনাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এক দিক দিয়ে এটা খুবই উপকারী ও ফলদায়ক। এরদ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর জ্ঞানের গভীরতা ও উন্নত মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যার আলোকে তিনি নবী করীম (সা)-এর হাদীসসমূহ পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে এগুলো থেকে মাসয়ালাসমূহ বের করতেন। ফলে কোন প্রকার দুর্বল বর্ণনা তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে বাদ পড়েনি। সুতরাং এই বিতর্ক যদি একদিকে ইমাম সাহেবের এই গুণাবলীকে প্রকাশ করে, তা হলে অন্য দিকে ঐ সমস্ত মিথ্যা বর্ণনাকারীর দাঁতভাঙ্গা জওয়াব হয়েছে যারা তাঁকে ব্যক্তিগত মত পোষণকারী বা যুক্তিবাদী বলে আখ্যায়িত করে বলে যে, তাঁর মাযহাব যুক্তি ও কিয়াসের উপর নির্ভরশীল। বলা বাহুল্য, তিনি কি ইমাম আওযাঈ (র)-এর বিরুদ্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করেছেন, না হুযূর (সা)-এর হাদীস পেশ করেছেন ? অতঃপর ঐ হাদীস সনদের দিক দিয়ে আওযাঈ (র)-এর বর্ণিত হাদীসের মুকাবিলায় অধিক শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য ছিল, না দুর্বল ? এই বির্তক বর্ণনাকারীদের মর্যাদা ইলমে ফিকহের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে উঁচুমানের সনদ বা ন্যায়-নিষ্ঠার উপর করে না। এই বিতর্কের মাধ্যমে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, ইল্‌মে ফিকহের জ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানের গভীরতা সোহবত (সঙ্গ) লাভের ফযীলত থেকে উত্তম। তবে শর্ত হলো এই যে, উভয়ের নবী করীম (সা)-এর সোহবত সৌভাগ্য হতে হবে। তাই তিনি বলেছেন, হযরত আলকামা (রা) হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে কোন অংশে কম নন। মোট কথা এরদ্বারা ইমাম আযম (র)-এর আদব ও হাদীসের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

নামাযে رفع يدين বা হাত উঠানো সম্পর্কে আইম্মায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র) ও আহমদ (র)-এর মতে নামায আরম্ভের সময় ছাড়াও রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময় হাত উঠানো সুন্নত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে নামায আরম্ভ করার সময় ব্যতীত অন্য কোথাও হাত উঠানোর প্রয়োজন নেই। ইমাম মালিক (র) থেকে দু'টি রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। একটিতে ইমাম শাফিঈ (র) এবং অপরটিতে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতের সাথে একাত্মতা রয়েছে। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ অনুসারী প্রথম রিওয়ায়েতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তা অনুসরণ করে থাকেন।

ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁর অনুসারীগণ তাঁদের মাযহাবের স্বপক্ষে আশারায়ে মুবাশশারাসহ অনেক সাহাবায়ে কিরামের (রা) বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন। বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের হাদীস দু'প্রকার। প্রথমতঃ রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময় অথবা তাকবীরের সময় অথবা প্রতিবার ঝুকার সময় এবং উঠার সময়। মোট কথা বাকী হাদীসের মধ্যে দুর্বোধ্যতা রয়েছে যারদ্বারা সহীহ আমলের দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায় না ; বরং এত বিরোধী মতামতের

মিশ্রণ রয়েছে যা শাফিঈ মাযহাবের অনুসারিগণও মানেনি এবং হানাফী মাযহাবের অনুসারিগণও গ্রহণ করেনি।

সুতরাং তাদের সহীহ হাদীস ঐগুলো, যাতে রুকূ ছাড়া অন্য স্থানে হাত উঠানো থেকে অস্বীকার করা হয়েছে। অতঃপর এটাও উল্লেখযোগ্য যে, সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে যে হাদীস বর্ণিত আছে এবং তা শাফিঈ বা হানাফী যে কেউ গ্রহণ করুক না কেন, এরদ্বারা হাত না উঠানোর প্রমাণ বহন করে। এ ছাড়া অনেক সাহাবা (রা) থেকে হাত উঠানো সম্পর্কে এবং হানাফী মাযহাব হাত না উঠানো সম্পর্কে হাদীস রিওয়ায়েত করে থাকে এবং বলে থাকে আশারায়ে মুবাশশারা অথবা খলীফাগণ আমাদের সাথে আছেন। অথবা কেউ এমনি ত্রুটিপূর্ণ কথাও বলে থাকে যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম আমাদের সাথে রয়েছেন, এরূপ বলা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। পরবর্তী বর্ণনার দ্বারা এটা অনুমান করা যাবে যে, আহ্‌লে হাদীস দাবিকারিগণ হাত উঠানোর ব্যাপারে যেরূপ কঠোরতা অবলম্বন করে থাকেন, তা কতটুকু জায়েয। বুখারী শরীফে হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আঁ হযরত (সা) নামাযের জন্য দাঁড়ানোর পর হাত উঠাতেন এবং তা কাঁধ রবাবর এসে যেত এবং রুকূর জন্য তাকবীর বলার সময় ও রুকূ থেকে উঠার সময়ও এরূপ করতেন কিন্তু সিজদার সময় এরূপ করতেন না। মুসলিম শরীফেও একই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। অথবা সাহেবে সুনানে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের শেষ অংশে বর্ণিত আছে যে, যখন হুযূর (সা) সিজদা থেকে উঠতেন তখন এভাবে হাত উঠাতেন। হাত উঠানোর পক্ষ সমর্থনকারী দল এই হাদীসও দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে।

এবার হানাফী মাযহাবের দলীল একটু বিস্তারীতভাবে পেশ করা হবে। কেননা এটা বলা হয়ে থাকে যে, এই বিষয়ে হানাফীদের নিকট কোন সহীহ হাদীস নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসের শেষ অংশে لا يعود রয়েছে। অর্থাৎ হুযূর (সা) নামায শুরু করার সময় হাত উঠাতেন কিন্তু দ্বিতীয়বার আর কখনো তিনি এরূপ করতেন না। ইমাম তাহাবী, হুসাইন ও ইবরাহীম নখঈ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) নামায শুরু করার সময় ব্যতীত অন্য সময় হাত উঠাতেন না। ইমাম মুহাম্মদ (র) স্বীয় হাদীস গ্রন্থ মুয়াত্তায় একই অর্থবোধক বাক্য দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) স্বীয় হাদীস গ্রন্থ আবূ দাউদ শরীফে আসিম ইবনে কুলাইব (র) থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ (র) থেকে, তিনি আলকামা (র) থেকে এবং তিনি হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন: الا اصلى لكم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الامرة "তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামায কিরূপ ছিল, তা দেখাব? বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) নামায পড়েন এবং শুধু একবার হাত উত্তোলন করেন।" অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, "তিনি শুধু নামায শুরু করার সময় হাত উত্তেলন করেন।" কিন্তু বিরোধী পক্ষ উক্ত হাদীস বর্ণনাকারী আসিম ইবনে কুলাইব সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। কেউ বলেছেন, এই

হাদীসের কোন প্রমাণ নেই। কেউ বলেছেন, এই হাদীস সনদের দিক দিয়ে দুর্বল (ضعيف) আবার কেউ বলেছেন, এই হাদীস সহীহ্ নয়। পক্ষান্তরে ইবনে হাজম, দারে কুতনী ও ইবনে কাত্তান (র) এই হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম নাসাঈ (র) হাত না উঠানোর ব্যাপারে একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আসিমকে নির্ভরযোগ্য (ثقة) বলে উল্লেখ করেছেন। যদি আবদুর রহমান (র)-এর মধ্যে কিছু সন্দেহ থাকে কিন্তু ইমাম মুসলিম (র) তাঁর নিকট থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ হাদীসের মধ্যে কি দুর্বলতা থাকতে পারে? এই আসিম (র)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে ইমাম তিরমিযী (র)-ও হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এই হাদীস হাসান (حسن) । অনেক সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈন এই মত সমর্থন করেছেন। ইমাম সুফিয়ান সওরী (র) এবং কূফাবাসীদের মাযহাবও এটাই। সুতরাং আহ্লে হাদীস উলামায়ে কিরাম যখন এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মেনে নিয়ে এই হাদীসকে হাসান (حسن) বলেছেন, তাহলে অন্য দল এটাকে কিভাবে দুর্বল বলে থাকে ? কেউ কেউ এই অভিযোগ করেছেন যে, আবদুর রহমান (র) হযরত আলকামা (র) থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। ৭৯ হিজরীতে যখন আবদুর রহমান (র) ইন্তিকাল করেন তখন ইবরাহীম নখঈ জীবিত ছিলেন এবং সর্ব সম্মতিক্রমে তিনি হযরত আলকামা (র) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। অধিকন্তু খতীব বোগদাদী "কিতাবুল মুত্তাফিক ওয়াল মুতাফাররিক" নামক গ্রন্থে আবদুর রহমান (র) সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং হযরত আলকামা (র) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। সুতরাং এরপর কোন দিক থেকেই এ হাদীসের উপর কোন প্রকার অভিযোগ বাকী থাকে না।

এবার খলীফার মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর মতামত ও মাযহাব কি ছিল, তা আলোচনা করা প্রয়োজন। দারে কুতনী এবং ইবনে আদী (র) মুহাম্মদ ইবনে জাবির থেকে, তিনি হাম্মাদ ইবনে আবি সুলায়মান থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে, তিনি হযরত আলকামা থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ صليت مع رسول الله ﷺ وابى بكر وعمر فلم يرفعوا ايديهم الاعند افتتاح الصلوٰة– "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এবং হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর সাথে নামায পড়েছি। তাঁদের মধ্যে কেউ নামায শুরু করার সময় ব্যতীত হাত উত্তোলন করেননি।" এই রিওয়ায়েতের পর বিরোধী পক্ষ মুহাম্মদ ইবনে জাবির ইবনে ইয়াসারের রিওয়ায়েত উল্লেখ করে বলেন ঃ মুহাম্মদ ইবনে জাবির (র) সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে। অথচ মুহাম্মদ ইবনে জাবির থেকে আইউব ইবনে আউফ, হিশাম ইবনে হাসান, ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইমাম শুবা ও ইবনে উয়াইনার মত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন, তিনি কি কোন ইল্ম-এর অধিকারী ছিলেন না? এর মর্যাদা কিভাবে খাটো করে দেখা যায়? পক্ষান্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। সাথে সাথে তিনি হাদীসের সত্যতা বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর (সা)-এর সাথে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সত্যবাদিতা এবং হযরত উমর ফারুক (রা)-এর জ্ঞানকে একত্রিত করেছেন। বরং এটা হুযূর (সা)-এর আদর্শ পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণকারী হযরত আবূ বকর (রা) এবং উমর (রা)-এর হাদীস হিসেবেই গণ্য। মোট কথা এই হাদীস হানাফী মাযহাবের একটি শক্তিশালী দলীল।

হযরত আলী (রা)-এর মাযহাব সম্পর্কে ইমাম তাহাবী ও ইমাম মুহাম্মদ (র) আবূ বকর নাহ্শালী (র) থেকে, তিনি আসিম (র) থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়েত করেন যে, ان عليا كان يرفع فى اول تكبيرة من الصلوٰة ثم لايعود "হযরত আলী (রা) নামাযে প্রথম তাকবীরের সময় হাত উঠাতেন কিন্তু অতঃপর আর কখনো এরূপ করতেন না।" দারে কুতনী নাহ্শালী (র) থেকে এই হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদীস মরফূ' নয়, তবে মওকূফ সহীহ্। মুহাম্মদ ইবনে আবানও আসিম (র) থেকে এ ধরনের হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু দারেমী এর উপর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত আলী (রা) থেকে যে রিওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা হলো, তিনি প্রথম তাকবীরে হাত উঠাতেন অতঃপর এরূপ করতেন না– এটা সম্পূর্ণ দূর্বল (ضعيف)। কেননা হযরত আলী (রা) সম্পর্কে এটা কিভাবে ধারণা করা যায় যে, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের বিরোধিতা করবেন অথচ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময় হাত উঠাতেন। তাঁদের বক্তব্য হলো এই যে, হযরত আলী (রা)-এর এই আমল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরের এবং তা হাত উঠানো (رفع يدين) রহিত হওয়াকে প্রমাণ করে থাকে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ তাঁদের মতামতের বিপক্ষে অন্য কোন মত বা যুক্তি মানতে রাজী নয়। ইবনে দাকীকুল ঈদ (র) একই বাক্যের দ্বারা দারিমীর সমালোচনা করেছেন।

আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী হযরত আলী (রা) থেকে হাত উঠানোর (رفع يدين) স্বপক্ষে এক মরফূ' রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা প্রথমতঃ আবূ দাউদের রিওয়ায়েতের আবদুর রহমান ইবনে যিনাদ (র)-কে 'তাকরীব' নামক গ্রন্থে সত্যবাদী বলা হয়েছে কিন্তু যখন বাগদাদ আগমণ করেন তখন তাঁর হিফয শক্তির মধ্যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসে "اذا قام من السجدتين رفع يديه كذالك (যখন দু'সিজদা থেকে দাঁড়াতেন তখন দু'হাত উঠাতেন) খটকা রয়েছে যা সবার মতে রহিত অথবা যার কোন প্রমাণ নেই। এরপর আবূ দাউদের হাদীস মরফূ' যা হুযূর (সা)-এর আমলকে প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং এটা সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি প্রথমতঃ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর হাত উঠানো (رفع يدين) রহিত হয়ে যায়, তখন তিনি এর উপর আমল করতে থাকেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে ইমাম মুহাম্মদ থেকে সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম তাহাবী এবং বায়হাকী হাসান ইবনে আব্বাস (র)-এর সূত্রে সহীহ্ সনদের সাথে আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করে ঃ قال رأيت عمر بن الخطاب ورأيت ابراهيم والشعبى رفع يديه فى اول تكبيرة ثم لا يعود قال يفعلان ذلك. "হযরত আসওয়াদ (র) বলেছেন, আমি হযরত উমর (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি নামাযে প্রথম তাকবীরের সময় হাত উঠাতেন। এরপর আর এরূপ করেন নি। তিনি বলেছেন, আমি ইবরাহীম নখঈ ও হযরত শা'বী (র)-কে এরূপ করতে দেখেছি।" ইমাম তাহাবী (র) বলেন ঃ এই হাদীসের বর্ণনাকারী হাসান ইবনে আব্বাস (র) নির্ভরযোগ্য। ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (র) ও অন্যান্যরা তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। এটা তাঁরা এজন্য বলেছেন যে, তাঁরা জানেন যে,

সমস্ত সনদের মধ্যে এই এক ব্যক্তিকে নিয়ে সমালোচনা হতে পারে। তাই তাঁরা পূর্বেই তাঁর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে দলীল পেশ করেছেন। ইমাম হাকিম (র) তাউস (র)-এর সূত্রে হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে এর বিরোধী এক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমরা বলব, যখন এই হাদীস সনদের দিক দিয়ে সহীহ, তখন উপরে বর্ণিত হাদীসের সাথে এর বিরোধিতা হবে কিন্তু উভয়েই আহাদ এবং এরদ্বারা হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর হাদীসকে আরো শক্তিশালী করে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে উমর (রা)-এর উপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর যে ফযীলত ও সম্মান রয়েছে, এ সম্পর্কে আইম্মায়ে কিরাম অবগত আছেন।

হাত উঠানোর পক্ষ সমর্থনকারীগণ এই বিষয়ের উপর গর্ব করে থাকে যে, হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে উমর (রা)-এর মাযহাবের সাথে আমাদের মাযহাবের ঐকমত্য রয়েছে। সুতরাং এখানে ঐ হাদীসও বর্ণনা করা হলো যা হাত উঠানো সম্পর্কে বর্ণিত আছে। বুখারী শরীফে কিতাবুল মুফরাদে ওয়াকী' ইবনে আবী লায়লা (র) হাকাম (র)-এর সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শুধু সাত জায়গায় হাত উঠানো প্রয়োজন। নামাযের প্রারম্ভে, কিবলা দর্শনের সময়, সাফা-মারওয়া ও আরাফাতে একত্রিত হওয়ার সময়, মিনায় এবং দু'জামরায়। হযরত নাফে'(র)-এর সূত্রে বাযযায নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে একই হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। এই হাদীসে কোথাও রুকূর সময় হাত উঠানোর উল্লেখ নেই। কিন্তু বিরোধী পক্ষ এই হাদীসের রিওয়ায়েতের মধ্যে অভিযোগ উত্থাপন করে বলে যে, হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে আবী লায়লা (র) দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নন। অথচ তিনি এরূপ প্রখ্যাত তাবেঈ, যিনি একশ' বিশজন সাহাবার সাক্ষাত লাভ করেছেন। যদি তাঁর বর্ণিত মরফূ' হাদীস গ্রহণ করা না হয়, তাহলে কার হাদীস গ্রহণ করা হবে ? দ্বিতীয়তঃ এটা বলা হয়েছে ওয়াকী' (র)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস মওকুফ, সহীহ মরফূ' নয়; তাই এটা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব সঠিক।

অধিকন্তু হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে হযরত বারা' ইবনে আযিব (রা), হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত সহীহ্ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। খবর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হানাফী মাযহাব এই মাসয়ালায় সহীহ্ হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিরোধী পক্ষ প্রচার করে থাকে যে, হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে কোন সহীহ হাদীস নেই; তারা কিয়াসের উপর নির্ভরশীল। আমরা আহ্লে হাদীস। এখানে হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা হলো এই যে, হাত উঠানো ও না উঠানো উভয়ই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং উভয় হাদীসের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা একান্ত জরুরী। তাই এইভাবে সমন্বয় করা যায় যে, হাত উঠানো না উঠানো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন সময়ের দু'প্রকারের দু'টি আমল। অতঃপর হাত উঠানোর নির্দেশ রহিত হয়ে যায় এবং হাত না উঠানোর বিষয়টি বাকী থাকে। পক্ষান্তরে কোন কোন সাহাবা (রা), যেমন হযরত ইবনে উমর (রা) সহ যাঁরা হাত উঠানো সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা নিজেরাই হাত উঠানো পরিত্যাগ করেছেন। তাঁদের এই আমল এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁরা হাত উঠানো রহিত হওয়ার স্বপক্ষে ছিলেন। কেননা এটা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, যখন কোন সাহাবা

হাদীস বর্ণনা করার পর নিজেই এর বিপরীত আমল করেন, তখন এরদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই হাদীস রহিত হওয়া সম্পর্কে তিনি প্রমাণ পেয়েছেন। নতুবা হযরত ইবনে উমর (রা) এবং হযরত আলী (রা) সম্পর্কে এটা কিভাবে বলা যায় যে, তাঁরা উভয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বিরোধী আমল করেছেন ? অন্যদিকে এই নীতি রয়েছে যে, যখন সহীহ হাদীস পরস্পর বিরোধী হয়, তখন কিয়াসের মাধ্যমে একটি হাদীসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিয়াসও এটাই বলে যে, হাত না উঠানো হোক। কেননা হাত উঠানোর মাধ্যমে নামাযে একাগ্রতা, ভয় ও বিনয়ের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

٩٨. اَبُو حَنِيفَةَ عَن طُرَيفٍ اَبِى سُفيَانَ عَن اَبِى نَضرَةَ عَن اَبِى سَعِيدٍ الخُدرِيِّ (رض) اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلوَضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلواةِ وَالتَّكبِيرُ تَحرِيمُهَا وَالتَّسلِيمُ تَحلِيلُهَا وَفِى كُلِّ رَكعَتَينِ فَسَلِّم وَلاَ تَجزِئُ صَلوةٌ اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَمَعَهَا غَيرُهَا-

وَفِى رِوَايَةٍ اُخرٰى عَنِ المُقرِئِ عَن اَبِى حَنِيفَةَ مِثلَه وَزَادَ فِى اٰخِرِه قُلتُ لاَبِى حَنِيفَةَ مَايَعنِي بِقَولِه فِى كُلِّ رَكعَتَينِ فَسَلِّمْ فَقَالَ يَعنِى التَّشَهُّدَ قَالَ المُقرِى صَدَقَ-

وَفِى رِوَايَةٍ نَحوَهَ وَزَادَ فِى اٰخِرِه وَلاَ يَجْزِئُ صلوةٌ اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَمَعَهَا شَىءٌ *

হাদীস নং- ৯৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, উযূ হলো নামাযের চাবি, তাকবীর হলো এর তাহ্‌রীমা (তাকবীর নামায ব্যতীত সমস্ত কাজ হারাম করে দেয়), সালাম এর জন্য তাহ্‌লীল (অর্থাৎ সালাম হারাম হওয়া কাজকর্ম পুনরায় হালাল করে দেয়), প্রতি দু'রাকা'আতে সালাম ফিরাও অর্থাৎ তাশাহহুদ পাঠ কর এবং কোন নামায সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা মিলানো ব্যতীত পূর্ণ হয় না।

অন্য এক রিওয়ায়েতে মুকরী হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে একই ধরনের বাক্য বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে এতটুকু অধিক রয়েছে যে, আমি আবূ হানীফা (র)-কে জিজ্ঞাসা করি, প্রতি দু'রাকাআতে সালাম করার কি অর্থ ? তিনি বলেন ঃ এর অর্থ হলো তাশাহহুদ পড়া। মুকরী (র) বলেন ঃ সত্য বলেছেন।

অন্য রিওয়ায়েতের শেষদিকে এতটুকু অধিক রয়েছে যে, কোন নামায ফাতিহাতুল কিতাব (আলহামদু) এবং এর সাথে কোন সূরা মিলানো ব্যতীত পূর্ণ হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে কয়েকটি মাসয়ালা নিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, الوضوء مفتاح الصلوة (উযূ নামাযের চাবি) এরদ্বারা অতি সূক্ষ্মভাবে একটি মাসয়ালার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উযূর মধ্যে নিয়্যত ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নত। কেননা নামাযের মধ্যে উযূর গুরুত্ব হলো চাবির মত, এরদ্বারা নামায খোলা অর্থাৎ শুরু করা হয়, নামাযের হাকীকত প্রতিষ্ঠা করা হয়, নামায বাস্তবে আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং নামায যেহেতু একটি ইবাদত, তাই উযূ ইবাদতের মধ্যে গণ্য নয়; বরং ইবাদতের বাহন হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং ইবাদত সহীহ হওয়ার জন্য নিয়্যত শর্ত। কেননা নিয়্যত ব্যতীত ইবাদত সওয়াব থেকে শূন্য থাকে। যখন সওয়াব থেকে শূন্য থাকে, তখন এর শুদ্ধতা চলে যায়। এই অবস্থা ইবাদতের বাহন বা সরঞ্জামের সাথে যুক্ত নয়। আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ-এ এর স্পষ্ট দলীল রয়েছে ঃ لاصلوة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكراسم الله عليه "যার উযূ নেই তার নামায নেই এবং এটা উযূ নয় যার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় নি।"

অতঃপর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ والتكبير تحريمها এর মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে যে, তাকবীরে তাহ্‌রীমা কোন্ বাক্যের দ্বারা বলতে হবে। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ আল্লাহু আকবর অথবা আল্লাহুল আকবর (الله الاكبر অথবা الله اكبر) ব্যতীত অন্য কোন বাক্য দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা জায়েয নয়। অর্থাৎ اكبر -কে অনির্দিষ্ট অথবা নির্দিষ্ট (معرفة অথবা ناكرة) হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (র)-এর মতে আল্লাহু আকবর ব্যতীত অন্য কোন বাক্য দ্বারা জায়েয নয়। কাযী আবূ ইউসুফ (র) বলেন ঃ আল্লাহুল কবীর (الله الكبير) বলা জায়েয আছে। মোট কথা তাঁর মতে আল্লাহু আকবর, আল্লাহুল আকবর এবং আল্লাহুল কবীর এ তিন বাক্যের দ্বারা তাকবীরে তাহ্‌রীমা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ঐ সমস্ত বাক্যের দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা জায়েয হবে যা আল্লাহ্‌র মর্যাদা ও মহত্ব প্রকাশ করে থাকে। তবে এটা শুধু ফরয আদায়ের জন্য। কিন্তু হাদীসের বাহ্যিক বর্ণনা অনুযায়ী 'আল্লাহু আকবর' বলা সুন্নত।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতামত নিয়ে একটু বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। মূলত পবিত্র কুরআনের আয়াত وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ -এরদ্বারা তাকবীরে তাহরীমা ফরয হয়েছে। অন্যান্য উলামায়ে কিরাম উপরোক্ত আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা 'আকবর' (اكبر) শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে বলেন ঃ তাকবীর অভিধানে তা'যীমের অর্থে ব্যবহার হয়। সুতরাং যে বাক্য দ্বারা তা'যীম প্রকাশ পাবে, এরদ্বারা তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলা জায়েয হবে। তাই আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আজাল্লু (الله اجل) আল্লাহু আ'যামু (الله اعظم) অথবা আর-রাহ্‌মানির রাহিম (الرحمن الرحيم) বলা জায়েয হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ অর্থাৎ "অতঃপর যখন তারা এটা দেখল, তখন তারা এটা

বিরাট মনে করল।" এখানে আকবার দ্বারা বুযর্গ বুঝানো হয়েছে। অন্য এক স্থানে নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى এখানে ذكر-এরদ্বারা তাকবীরে তাহ্‌রীমা বুঝানো হয়েছে, এখানে যে ذكر এর উপর তাকবীর আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং এটা কিভাবে আকবর (اكبر) শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট করা যাবে? বরং اسم শব্দে দৃষ্টিকোণ থেকে فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى। অথবা হাদীসের বর্ণনা اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ। অনুযায়ী যদি কেউ لا اله الا الرحمن বলে, তাহলে তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা হবে, তার জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে। যখন মূল্যের মধ্যে এই প্রশস্ততা বিদ্যমান, তখন নামাযে তা কেন গ্রহণযোগ্য হবে না ?

অতঃপর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ والتسليم تحليلها "সালাম নামাযের জন্য তাহ্‌লীল।" অর্থাৎ সালামের সাথে সাথে নামাযের যে সমস্ত কাজ হারাম হয়েছিল, তা হালাল হয়ে যায়। এই মাসয়ালায় অর্থাৎ সালাম শব্দের মাধ্যমে নামায সমাপ্ত করা ফরয অথবা ওয়াজিব এটা নিয়ে শাফিঈ ও হানাফী মাযহাবের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম আহমদ (র) এটা ফরয বলে মতামত পেশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) এটা ওয়াজিব বলেছেন। হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে মুসাইয়্যেব (রা), হযরত ইবরাহীম নখঈ (র), ইমাম সুফিয়ান সওরী (র) এবং ইমাম আওযাঈ (র)-এর মাযহার এটাই ছিল। ইমাম শাফিঈ (র) বর্ণিত হাদীস والتسليم تحليلها দলীল হিসেবে পেশ করে বলেন ঃ এখানে বাহ্যিকভাবে তাহলীল (تحليل) অর্থৎ নামায থেকে অবসর হওয়াকে তাসলীম تسليم বলে, অর্থাৎ সালাম শব্দ আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। অথবা হাদীস صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ অর্থাৎ যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখ, তোমরাও সেভাবে নামায আদায় কর। হুযূর (সা) অবশ্য سلام শব্দ ব্যবহার করতেন। এ ছাড়া তিনি তাকবীরে তাহ্‌রীমার উপর কিয়াস করে বলেন যে, নামায শুরু করার জন্য তাকবীর বলা যেমন সর্বসম্মতিক্রমে ফরয, ঠিক তেমনিভাবে নামায সমাপ্ত করার জন্য সালাম বলা ফরয।

ইমাম আবূ হানীফা (র) সুনানে আবূ দাউদে হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلواتك "যখন তুমি এরূপ করবে অথবা এটা পূর্ণ করবে তখন তুমি তোমার নামায পূর্ণ করে নিলে", পেশ করে বলেন ঃ এখানে বর্ণনা এবং আমলের মধ্যে অধিকার বা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যদি সালাম ফরয হতো তাহলে ফরযের মধ্যে অধিকার দেওয়া সঠিক হতো না। এছাড়া এক আরববাসীর হাদীস তিনি দলীল হিসেবে পেশ করেছেন যাতে দেখা যায় হুযূর (সা) তাকে নামায শিক্ষা দিয়েছেন কিন্তু সালামের কথা উল্লেখ করেননি। যদি ফরয হতো, তাহলে কিভাবে তা ছেড়ে দিলেন ? হাঁ, দ্বিতীয় সালাম করা কারো মতেই ফরয নয়। সুতরাং এর উপর কিয়াস করে এটা বলা যায় যে, এটা কেন ফরয হবে ?

এবার শাফিঈ মাযহাবের কিয়াসের জওয়াব হলো এই যে, তাকবীর ও সালামের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এ দুটোর হাকীকত, হালত এবং ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। তাকবীর যেহেতু একমাত্র প্রশংসা এবং কিবলার দিকে মুখ করে আদায় করা হয়, তাই এটা ইবাদতের

মধ্যে গণ্য। অধিকন্তু এর ক্রিয়া হলো এই যে, এই ইবাদত (তাকবীর) মানুষকে নামাযে প্রবেশ করিয়ে দেয়। সুতরাং নামাযের মত এটাও ফরয। পক্ষান্তরে সালাম কিন্তু এরূপ নয়। এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটি প্রশংসামূলক নাম। অন্য কথায় এটা মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় এবং এরদ্বারা মানুষের সাথে কথাবার্তা শুরু করা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নামাযের মধ্যে সালাম করা নিষেধ এবং কিবলা থেকে গর্দান ফিরিয়ে তা আদায় করতে হয়। এমনিভাবে ক্রিয়ার দিক থেকেও সালাম তাকবীর থেকে পৃথক। তাকবীর ইবাদতে প্রবেশ ও মগ্ন হওয়ার উপায়। পক্ষান্তরে সালাম ইবাদত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপকরণ। এই পার্থক্যের কারণে তাকবীরের মত সালাম ফরয হয়নি। তবে সালামে যেহেতু আল্লাহর প্রশংসা নিহিত আছে, তাই ফরয ও নফলের মধ্যে একে ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বর্ণিত হাদীস والتسليم تحليلها -এরদ্বারা সালামের মাধ্যমেই তাহ্লীল অর্থাৎ নামায শেষ করতে হবে, এতে সীমাবদ্ধ করার প্রমাণ বহন করে না। অতঃপর এটা খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কাজেই এরদ্বারা ফরয প্রমাণ করা কিভাবে সম্ভব? অবশ্য হুযূর (সা)-এর সর্বদা বলা বা নির্দেশ প্রদানের দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব।

হাদীসে বর্ণিত- وَ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ (প্রতি দু'রাকাআতে সালাম ফিরাও) এই বাক্য দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথমতঃ বাহ্যিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে এবং প্রতি দু'রাকাআতেরদ্বারা নফল বুঝানো হবে। এখানে হুকুম নুদুব (ندب) বা নফল হিসেবে গণ্য হবে। উদ্দেশ্য হলো এই যে, প্রতি দু'রাকাআতের পর সালাম ফিরাও। এরদ্বারা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ হাদীস اَلصَّلٰوةُ مَثْنٰى مَثْنٰى অনুযায়ী নফল নামায দু'-দু' রাকাআত করে পড়া উচিত। অথবা فسلم -এরদ্বারা প্রকৃত সালাম উদ্দেশ্য নয়; বরং এরদ্বারা তাশহহুদ বুঝানো হয়েছে। যেমন এই হাদীসের দ্বারা তা-ই বুঝা যাচ্ছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) হাদীসের এই ব্যাখ্যা করেছেন। এই অবস্থায় উপরোক্ত নির্দেশ (امر) নফলের মধ্যে। আর ওয়াজিব ফরযের জন্য হবে অর্থাৎ তাশহহুদ পরিমাণ বসা ওয়াজিব হবে। অথবা তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামাযে ওয়াজিব হবে।

٩٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ نَادَ مَنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ لاَ صَلٰوةَ اِلاَّ بِقِرَائَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ -

হাদীস নং-৯৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি মদীনায় এই ঘোষণা প্রদান করে যে, কোন সূরা পাঠ করা ব্যতীত কোন নামায (সহীহ) হবে না। যদিও পঠিত সূরা ফাতিহাতুল কিতাব (الحمد) হোক না কেন।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা তিবরানী আওসাত নামক গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আমাকে হুযূর (সা) মদীনাবাসীদের নিকট ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। দারে কুতনীও প্রায় একই ধরনের বাক্যের দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادى فى اهل المدينة নামাযের মধ্যে আলহামদু পাঠ করা এবং এর সাথে সূরা মিলানো ফরয, ওয়াজিব অথবা সুন্নত এটা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র) এবং ইমাম মালিক (র)-এর মতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয এবং এর সাথে সূরা মিলানো সুন্নত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সূরা ফাতিহা পড়া এবং এর সাথে সূরা মিলানো ওয়াজিব। সূরা ফাতিহা ফরয হওয়া সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম মালিক (র)-এর দলীল মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস- من صلى صلواة لم يقرأ فيها بام القران فهى خداج غير تمام "যে ব্যক্তি এরূপ নামায আদায় করবে যাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয়নি, তাহলে এরূপ নামায অসম্পূর্ণ (خداج) হবে।" এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। সূরা মিলানো সুন্নত হওয়া সম্পর্কে এই দলীল পেশ করেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দু'রাকাআতে সর্বদা সূরা মিলিয়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) স্বীয় মাযহাবে কিরাআত ফরয হওয়া সম্পর্কে কয়েকটি দলীল পেশ করেছেন। প্রথম দলীল পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ فاقرؤا ما تيسر من القرآن "যতটুকু সম্ভব পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত কর।" এখানে কুরআনের আয়াতকে নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং কমপক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর হাদীস দ্বারা পবিত্র কুরআনের অকাট্য নির্দেশের মধ্যে ফাতিহাকে অন্তর্ভুক্ত করে এর সাধারণ (عام) প্রয়োগকে কিভাবে ভঙ্গ করা যায়? কেননা এটা এক প্রকার রহিতকরণ অর্থাৎ এই প্রয়োগের দ্বারা একটি বস্তুকে সামগ্রিকভাবে অবস্থান থেকে কোন অংশের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে তা স্বীয় সামগ্রিকতার মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। সুতরাং এটা রহিতকরণ হয়ে যায় এবং রহিতকারী বস্তু রদকৃত বস্তু থেকে শক্তিশালী হওয়া উচিত। অথচ হাদীস পবিত্র কুরআন থেকে স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল। সুতরাং আবূ হানীফা (র) পবিত্র কুরআনের আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা ফরয বলে মতামত পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে হাদীস যেহেতু আমল ওয়াজিব করে থাকে, তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে ফাতিহা পাঠ করা এবং সূরা মিলানো ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেছেন। ফলে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ের উপর আমল হয়ে যায়। অপরপক্ষে যাঁরা সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয বলে মনে করেন ,তাঁদের মাযহাবমতে কুরআনের আয়াত পরিত্যাগ বাধ্যতামূলক হয়ে যায় এবং সুন্নতের উপর আমল হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় দলীল হিসেবে তিনি ঐ হাদীস পেশ করেন যাতে হুযূর (সা) একজন আরববাসীকে সমস্ত আহকামের সাথে নামাযের তালীম দিয়েছেন কিন্তু এতে ফাতিহার উল্লেখ নেই। যদি সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয হতো, তাহলে এটা ত্যাগ করা কিভাবে সম্ভব হলো ? হ্যাঁ, তবে এতটুকু বলা হয়েছে ঃ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن (অতঃপর যতটুকু সম্ভব পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত কর)।

তৃতীয় দলীল হিসেবে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস পেশ করেছেন। এই হাদীস সূরা ফাতিহাকে ফরয বলে মতামত প্রদানকারী দলও তাঁদের দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন, কিন্তু হাদীসের বাক্য প্রকৃতপক্ষে তাঁদের পক্ষ সমর্থন করে না; বরং হানাফী মাযহাবের পক্ষ সমর্থন করে থাকে। হাদীসে বলা হয়েছে فهى خداج অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায খিদাজ হবে। অভিধানে خداج -এর অর্থ নাকিস বা অসম্পূর্ণ। হাদীসে غير تام বলে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যার অর্থ অসম্পূর্ণ। কিন্তু এখানে خداج নামায ফাসিদ হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা না হলে ওয়াজিব ত্যাগ করা হয়। এতে নামায অসম্পূর্ণ হয়। যদি ফাতিহা পাঠ করা ফরয হতো তাহলে তা পরিত্যাগ করার ফলে নামায ফাসিদ ও বাতিল হয়ে যেত। হাদীসে غير تام বলা হতো না।

চতুর্থ দলীল বর্ণিত হাদীস। এতে বলা হয়েছে ঃ ولو بفاتحة الكتاب (যদিও কেবল সূরা ফাতিহা হয়) এতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে ফাতিহার তিলাওয়াতকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। অর্থাৎ কুরআনের যে কোন অংশ হোক এবং যদিও তা সূরা ফাতিহা হোক না কেন।

পঞ্চম দলীল হলো এই যে, যদি সূরা ফাতিহাকে ফরয মেনে নিয়ে হাদীসের এই অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, নামায শুরু থেকে সহীহ হবে না, তা হলে এখানে এটাও বলা যায় যে, হুযূর (সা) আরো বলেছেন ঃ

لاصلوة لجار المسجد الا فى المسجد و لاصلوة للعبد الابق حتى يرجع .

"মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদ ব্যতীত হবে না" অথবা "পলাতক গোলামের নামায হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ফিরে না আসে," ولاوضوء لمن لم يسم الله "যে ব্যক্তি উযূর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলবে না, তার উযূ হবে না।" অথচ এই সবগুলো হাদীসেই বর্ণিত কাজগুলো পূর্ণাঙ্গ (كمال) না হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু মূল বিষয় না হওয়ার কথা বলা হয়নি।

ষষ্ঠ দলীল হলো এই যে, সূরা ফাতিহা ফরয হওয়ার মতামতের উপর অপর একটি প্রশ্ন হতে পারে। তা হলো এই যে, কোন সূরা মিলানো এর সাথে সাথে ফরয হয়ে যায়। কেননা لاصلوة الا بفاتحة الكتاب এর সাথে وسورة معها রয়েছে। এমতাবস্থায় ফাতিহার ফরযের সাথে সূরা মিলানোকে ফরয স্বীকার করতে হয়। কিন্তু অপর পক্ষ এটা মেনে নিতে সম্মত নন।

بَابُ لاَيَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ فِى الصَّلٰوةِ

নামাযে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়বে না

١٠٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ لَا يَجْهَرُوْنَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

হাদীস নং-১০০

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা), হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত উমর (রা) উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পাঠ করতেন না।

ব্যাখ্যা ঃ আলহামদু লিল্লাহ্-এর পূর্বে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া বা না পড়া সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র) এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বিসমিল্লাহ্ উচ্চস্বরে না পড়ার পক্ষে মতামত পেশ করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রা), হযরত ইবনে যুবায়র (রা), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা), হযরত হাসান (রা), হযরত শা'বী (র), হযরত ইবরাহীম নখঈ (র), ইমাম আওযাঈ (র), ইমাম সুফিয়ান সওরী (র), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (র), হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র), হযরত আমাস (র), ইমাম যুহরী (র), হযরত মুজাহিদ (র), হযরত হাম্মাদ (র), ইমাম আহমদ (র) এবং হযরত ইসহাক (র) এই মত পোষণ করতেন। এই বিষয়ে ইমাম বুখারী (র) হযরত আনাস (রা) থেকে এক হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ ان النبى صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتحون الصلوة بالحمد لله رب العلمين .

নবী করীম (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দ্বারা নামায শুরু করতেন।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে ঃ صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . "আমি নবী করীম (সা), হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা)-এর পিছনে নামায পড়েছি, কিন্তু তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহ্ পড়তে শুনিনি।

ইমাম শাফিঈ (র) স্বীয় দলীল হিসেবে দারে কুতনী নামক গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন। এতে বর্ণিত আছে, আমি মুজমার ইবনে সুলায়মান-এর পিছনে সকাল-সন্ধ্যা অনেক নামায পড়েছি। কিন্তু এই হাদীসের ব্যাখ্যা ইবনে খুযায়মা ও তিবরানী (র)-এর রিওয়ায়েতের পরস্পর বিরোধী যা মু'তামার (র)-এর সূত্রে হযরত হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) নিম্নস্বরে বিসমিল্লাহ পড়তেন।

সুতরাং উভয় প্রকারের হাদীসের মধ্যে এইভাবে সমন্বয় করা যায় যে, উচ্চস্বরে সম্পর্কিত হাদীসসমূহ শুধু তালীমের জন্য অথবা এটাও বলা যায় যে, এরূপ স্বল্প আওয়ায যা নিকটবর্তী কোন ব্যক্তি শুনতে পারে। মুকতাদী যদি ইমামের নিকটবর্তী হয়, তা হলে স্বল্প আওয়াযও উচ্চস্বরের

মত শুনা যায়; কিন্তু বাস্তবে তা উচ্চস্বর (جهر) নয়। যেমন কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা) যোহরের নামাযে দু'-এক আয়াত এরূপভাবে তিলাওয়াত করতেন যে, মুকতাদী সাহাবাগণ তা কখনো কখনো শুনে ফেলতেন। অথবা এটাও বলা যায় যে, প্রথমত উচ্চস্বরে পড়ান বিধান ছিল, অতঃপর তা রহিত হয়ে যায়। কেননা আবূ দাউদ শরীফে হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়। এই হাদীসের শেষ অংশ বলা হয়েছে ঃ فامر الله رسوله باخفائها فما جهر حتى مات "অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নিম্ন বা অনুচ্চ আওয়াযে পড়ার নির্দেশ দেন। সুতরাং তিনি ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ্ পড়েন নি।"

١٠١- اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) اَنَّه صَلّٰى خَلْفَ اِمَامٍ فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ احْبِسْ عَنَّا نُغْمَتَكَ هٰذِهِ فَاِنِّىْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِهَا -

وَهٰذَا صَحَابِىٌّ قَالَ الْجَامِعُ وَ رَوَتْ جَمَاعَةٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قِيْلَ وَ هُوَ الصَّوَابُ لِاَنَّ هٰذَا الْخَبَرَ مَشْهُوْرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ *

হাদীস নং-১০১

অনুবাদ ঃ ইয়াযিদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রা) কোন একজন ইমামের পিছনে নামায আদায় করেন, নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ্ পড়েন। নামায শেষ হওয়ার পর তিনি ইমামকে বলেন ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি তোমার গান (نغمة) বন্ধ কর (উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ্ পড়া বন্ধ কর)। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা), হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা) এবং হযরত উসমান (রা)-এর পিছনে নামায পড়েছি, কিন্তু আমি তাঁদেরকে বিসমিল্লাহ্ উচ্চস্বরে পড়তে শুনিনি।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। জামে' (جامع) গ্রন্থে বর্ণিত আছে, একটি দল এই হাদীস হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে, তিনি আবূ সুফিয়ান থেকে, তিনি ইয়াযীদ থেকে, তিনি স্বীয় পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে এবং তিনি

নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন (মোট কথা এই হাদীস মরফূ' হিসেবে গণ্য) এবং এটাই সঠিক। কেননা এই হাদীস আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে মশহুর (مشهور) হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রা)-এর হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। তিরমিযী এই আলোচনাকে দু'অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথমতঃ উচ্চস্বর পরিত্যাগ করা সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়তঃ উচ্চস্বরে বলা সম্পর্কে। প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যা পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

١٠٢- اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَدِيٍّ عَنِ الْبَرَاءِ (رضـ) قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْعِشَاءَ وَقَرَأَ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ -

হাদীস নং-১০২

অনুবাদ ঃ হযরত বারা' (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে ইশার নামায আদায় করি। তিনি এতে সূরা ওয়াত্-ত্বীনে ওয়ায্-যাইতুনে তিলাওয়াত করেন ।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইশার প্রথম রাকাআতে والتين والزيتون এবং দ্বিতীয় রাকাআতে اذا السماء انشقت তিলাওয়াত করেন। তিনি হযরত মুআয (রা)-কে বলেন ঃ ইশার নামাযে তুমি কেন সূরা বুরূজ এবং সূরা ইনশিকাক তিলাওয়াত কর না ? একই বাক্যের মাধ্যমে এই হাদীস তিরমিযী, নাসাঈ, আহমদ এবং ইমাম মালিক (র) রিওয়ায়েত করেছেন।

١٠٣- اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقْرَأُ فِيْ اِحْدٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالنَّخْلَ بِسِقَتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ -

হাদীস নং-১০৩

অনুবাদ ঃ হযরত কুতবা ইবনে মালিক (রা) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে ফজরের এক রাকাআতে والنخل باسقات لها طلع نضيد পাঠ করতে শুনেছি।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে হানাফী মাযহাবে ফজর নামাযে তিওয়ালে মুফাস্সাল (طوال مفصل) অর্থাৎ একশ' আয়াত তিলাওয়াত করা সুন্নাত বলা হয়েছে। তাঁদের এই মত হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে বিভিন্ন রাজ্যের শাসনকর্তাদের নামে যে দীনি নির্দেশ খলীফার দরবার থেকে জারী করা হয়েছিল, এর উপর নির্ভর করে পেশ করা হয়েছে।

باب قرأة الامام قرأة لمن خلفه

ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর কিরাআত

١٠٤- اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرٍ

بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَه اِمَامٌ فَقِرَأَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَأَةٌ -

وَ فِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ رَجُلاً قَرَأَ خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ وَ اَوْ مَأَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاه فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَنْهَانِىْ اَنْ اَقْرَءَ خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرَا ذٰلِكَ حَتّٰى سَمِعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الْاِمَامِ فَاِنَّ قَرَاءَةَ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ -

وَ فِىْ رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٌ قَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاه رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِىْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الاِمَامِ فَاِنَّ قِرَأَةَ الاِمَامِ له قِرَائَةٌ -

وَ فِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اِنْصَرَفَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ فَقَالَ مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فَسَكَتَ الْقَوْمُ حَتّٰى سَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ مِرَارًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ رَايْتُكَ تُنَازِعُنِىْ اَوْ تُخَالِجُنِىَ الْقُرْاٰنَ -

হাদীস নং-১০৪

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যার (নামাযে) ইমাম থাকবে, ইমামের কিরাআতই জন্য যথেষ্ট।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর পিছনে যোহর অথবা আসর নামাযে কিরাআত পাঠ করে, তখন এক ব্যক্তি ইঙ্গিতে তা থেকে নিষেধ করেন। যখন তিনি নামায থেকে

অবসর হলেন তখন বললেন, তুমি কি আমাকে নবী করীম (সা)-এর পিছনে পড়া থেকে বাধা প্রদান করছ? অতঃপর উভয়ে এটা নিয়ে তর্ক করতে লাগল। ফলে এটা নবী (সা) শুনে ফেললেন। তখন তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়বে, এ অবস্থায় ইমামের কিরাআতই তার কিরআত হবে অর্থাৎ মুকতাদী হিসেবে তাকে কিরাআত পড়তে হবে না।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে (কিরাআত) পাঠ করে। তখন তিনি তাকে কিরাআত পাঠ থেকে নিষেধ করেন।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) (ইমাম হিসেবে) লোকদের নামায পড়ান। তখন তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি কিরাআত পাঠ করেন। যখন তিনি নামায শেষ করেন, তখন তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে আমার পিছনে কিরাআত পাঠ করেছে? এটা তিনি তিনবার বললেন। তখন এক ব্যক্তি আরয করল, আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তখন তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়বে, এমতাবস্থায় ইমামের কিরাআত তার কিরাআত হিসেবে গণ্য হবে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, নবী (সা) একবার যোহর অথবা আসর নামায শেষ করার পর জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে কে سبح اسم ربك الاعلى পাঠ করেছে? (আদবের খাতিরে) সবাই চুপ থাকে। ফলে তিনি একই কথা তিনবার জিজ্ঞাসা করেন। তখন মুকতাদীদের মধ্য থেকে একজন আরয করলেন, আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই আমি দেখছি যে, তোমরা আমার পবিত্র কুরআন নিয়ে ঝগড়া করছ, অথবা (এটা বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে সন্দেহ) কুরআন পড়ার মধ্যে তোমরা আমাকে চিন্তার মধ্যে ফেলে দিচ্ছ।

ব্যাখ্যা ঃ ইমামের পিছনে মুকতাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা এবং না করা সম্পর্কে আইম্মায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উচ্চস্বরের নামায হোক যেমন ফজর, মাগরিব, ইশা ও জুমু'আ অথবা নিম্নস্বরের নামায, যেমন যোহর ও আসর, কোন অবস্থাতেই ইমামের পিছনে মুকতাদীর সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না। একই মত পোষণ করেছেন হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা), হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা), হযরত আলী ইবনে আাবী তালিব (রা), হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত সুফিয়ান সওরী (র), সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র), ইবনে আবী লায়লা (র), হাসান ইবনে সালেহ্ ইবনে হাসান (র), ইবরাহিম নখঈ (র) ও অন্যান্য হাদীস বিশারদগণ। মোট কথা প্রখ্যাত সাহাবা ও তাবেঈগণ এই মাযহাব অনুসরণ করতেন। আল্লামা আইনী (র) বলেন ঃ প্রথম যুগের মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবাদের মধ্যে আশিজন ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ না করার পক্ষ সমর্থন করেছেন। কারো কারো মতে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হয়ে প্রায় ইজমা হওয়ার স্তর পর্যন্ত পৌছেছে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাব (যখন তিনি মিসরে ছিলেন) হলো এই যে, নামায উচ্চস্বরের হোক অথবা নিম্নস্বরের হোক, ইমামের পিছনে মুকতাদীর সূরা ফতিহা পাঠ করা ফরয। এই মত পোষণ করতেন হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রা), হযরত উরওয়াহ্ ইবনে যুবায়র (রা), হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা), ইমাম আওযাঈ (র), হযরত হাসান বসরী (র),

হযরত লাইস ইবনে সা'দ (র), হযরত আবূ সওর (র) ও অন্যান্যগণ। ইমাম মালিক (র) উচ্চ স্বরের নামাযে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর পক্ষ এবং নিম্ন স্বরের নামাযে ইমাম শাফিঈ (র)-এর পক্ষ সমর্থন করেছেন। এই মত পোষণ করতেন হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব (রা), হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসঊদ (রা), হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা), ইবনে উমর (রা), ইমাম যুহ্রী (র), ইমাম কাতাদাহ্ (র), হযরত ইবনুল মুবারক (র) এবং হযরত ইসহাক (র)। ইমাম আহমদ (র) ইমাম মালিক (র)-এর মত সমর্থন করেছেন। তবে উচ্চ স্বরের নামাযে একটু মতপার্থক্য করে বলেছেন, যদি মুকতাদী এতটুকু দূরে থাকে যে, ইমামের কিরাআত শুনতে পায় না, তাহলে তাকে ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ইমাম শাফিঈ (র) যখন ইরাকে ছিলেন, তখন তিনিও এই মত পোষণ করতেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) ও অন্যান্যদের এই মাযহাব ছিল।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব অত্যন্ত শক্তিশালী দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এর স্বপক্ষে দলীল ও প্রমাণ রয়েছে। কিয়াসও এর সমর্থন করে। অধিকাংশ সাহাবার ঐকমত্য বিষয়টিকে ইজমা'র নিকটবর্তী পৌঁছে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ واذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا "যখন পবিত্র কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা শ্রবণ কর এবং চুপ থাক।" এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, এই আয়াত ইমামের পিছনে ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হুযূর (সা)-এর পিছনে মুকতাদী হিসেবে নামায পড়ার সময় এক ব্যক্তি যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করেন, তখন এই আয়াত নাযিল হয়। ইমাম আহমদ (র) থেকে বায়হাকী রিওয়ায়েত করেন, اجمع الناس على ان هذه الاية فى الصلوة "লোকজন এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছে যে, এই আয়াত নামায সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।"

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) নামাযে কিরাআত পাঠ করছিলেন, এ সময় তিনি পিছনে একজন আনসারীর কিরাআতের আওয়ায শুনতে পেলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনে মারদুয়া স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন, তা হলো, উসূলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো এই যে, কোন সাধারণ (مطلق) বিষয়কে এর প্রয়োগকৃত বস্তুর উপর স্থীর রাখতে হবে। সুতরাং এই নীতি অনুযায়ী উল্লিখিত আয়াতে- اذا قرى القرآن সাধারণ (مطلق) অর্থাৎ আয়াত উচ্চস্বরে বা নিম্নস্বরে পাঠ করা, উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এমনিভাবে انصتوا (চুপ থাকা) সাধারণ (مطلق وعام) অর্থাৎ উচ্চস্বরের অথবা নিম্নস্বরের কিরাআত হোক না কেন, উভয় অবস্থায় চুপ থাকার নির্দেশ রয়েছে। তবে আয়াত فاستمعوا-এর মধ্যে শ্রবণ করা উচ্চ-স্বরে নামাযের সাথে নির্দিষ্ট। কেননা উচ্চস্বরে পড়া না হলে শ্রবণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আয়াতের বিস্তারিত অর্থ হলো এই যে, যখন নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন উচ্চস্বরের নামাযে কিরাআত শ্রবণ করা এবং উচ্চস্বর ও নিম্নস্বরের উভয় নামাযে চুপ থাকা। সুতরাং নামাযে, বিশেষ করে উচ্চস্বরের নামাযে ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করা মাকরূহ তাহরীমি হবে।

খুলাসা (خلاصة) নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি উচ্চস্বরে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তার নিকট অন্য এক ব্যক্তি ইলমে ফিকহ্ লিখার কাজে এমনিভাবে মগ্ন থাকে যে, মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তা হলে কুরআন তিলাওয়াতকারী গুনাহ্গার হবে। কেননা লেখকের উপর শ্রবণ করা ওয়াজিব ছিল, কিন্তু যখন এটা সম্ভব হল না তখন এর গুনাহ্ তিলাওয়াতকারীর উপর পতিত হবে। এমনভাবে যদি কেউ রাতে ছাদের উপর উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করে এবং লোকজন শুয়ে থাকে, তা হলেও কুরআন তিলাওয়াতকারী গুনাহ্গার হবে। এরদ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নামাযে এবং নামাযের বাইরে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করা ওয়াজিব। যদিও বিধানের কারণ নির্ধারিত কিন্তু শব্দ সাধারণ (عام) হওয়ার কারণে বিধানের কারণও সাধারণ থেকে যায়। কেউ কেউ فاستمعوا له وانصتوا -এর মধ্যে একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত (عطف) করেছেন। এর ফলে তাঁরা উভয়কে এক নির্দেশের মধ্যে গণ্য করে انصتوا -কে উচুস্বরের নামাযের সাথে নির্দিষ্ট করে থাকেন। কিন্তু উভয়কে সংযুক্ত (عطف) করার কারণে এটা জরুরী নয় যে, উভয়ই উদ্দেশ্যের মধ্যে এক হতে হবে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ اقيموا الصلوة واتوا الزكوة এখানে তার মালের উপর যাকাত ওয়াজিব। সুতরাং কুরআন শ্রবণ করা এবং চুপ থাকা পৃথক পৃথক নির্দেশ। একটি হলো নির্দিষ্ট (خاص), অপরটি সাধারণ (عام)। কিন্তু এখানে এটা সন্দেহ করা যাবে না যে, এই আয়াত যেহেতু উচুস্বরের নামায সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তাই উভয়ে এর সাথে নির্দিষ্ট হবে। এবার দ্বিতীয় সন্দেহ হলো এই যে, এই আয়াত (اذا قرى القرآن) অপর এক আয়াত فاقرءوا ما تيسر من القرآن -এর বিরোধী যা সাধারণ (عام) হওয়ার কারণে ইমাম, মুকতাদী, একাকী নামায আদায়কারী, সবার উপর কিরাআত ওয়াজিব করে। এর একটি জওয়াব হলো এই যে, এই সমস্ত আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। কেননা সহীহ্ হাদীস ঃ قراة الامام له قرأة "ইমামের কিরাআত মুকতাদীর জন্য যথেষ্ঠ।" প্রকৃতপক্ষে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মুকতাদীকেও ক্বারী হিসেবে গণ্য করা হয়। শুধু পার্থক্য হলো এই যে, ইমামের কিরাআত হাকিকী (حقيقى) এবং মুকতাদীর কিরাআত হুকমী (حكمى)। অথবা তিলওয়াতের মাধ্যমে ইমামের কিরাআত আদায় এবং চুপ থাকার মাধ্যমে মুকতাদীর কিরাআত আদায় (فاقرؤا) হয়ে যায়। সুতরাং এর সাথে বিরোধিতা বাকী থাকে না।

দ্বিতীয় জওয়াব হলো এই যে, যদি কোন ব্যক্তি রুকূ'র মধ্যে অংশগ্রহণ করে ঐ রাকাআত পেয়ে যান, তাহলে তিনি এই আয়াত থেকে মুক্ত। সুতরাং যদি উপরোক্ত হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তাদীকে মুক্ত রাখা হয়, তাহলে উভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধিতা থাকে না।

এবার হাদীস দ্বারা উপরোক্ত বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অনেক সাহাবা থেকে বহু সহীহ্ মরফূ', মওকূফ ও মুরসাল হাদীস বর্ণিত আছে। এঁদের মধ্যে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত আবুদ-দারদা (রা) এবং ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস হানাফী মাযহাবের প্রধান দলীল। কিন্তু এই হাদীস অন্যান্য

সাহাবায়ে কিরাম, যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা), হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত জাবির (রা)-এর হাদীস মরফূ' হিসেবে বর্ণিত। বিরোধী পক্ষ এই হাদীসের সনদ দুর্বল (ضعيف) হিসেবে আখ্যায়িত করে বলে যে, মূসা ইবনে আবী আয়েশা থেকে কেউ এই হাদীস সহীহ্ পদ্ধতিতে বর্ণনা করেননি; বরং এই হাদীস মুরসাল। অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ (র) হযরত জাবির (রা)-এর মাধ্যমে ব্যতীত হুযূর (সা) থেকে এই হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। দারে কুতনীতে বলা হয়েছে, এই হাদীস মুরসাল সহীহ কিন্তু মুসনাদ সহীহ্ নয়। কেননা সুফিয়ান, আবুল আহ্ওয়াস, শু'বা, ইসরাঈল, আবূ খালিদ, শুরাইক (র) ও অন্যান্য থেকে এই হাদীস মুরসাল হিসেবে বর্ণিত আছে।

এখন প্রশ্ন হলো আবূ হানীফা (র)-এর মত একজন প্রখ্যাত ইমাম থেকে এই হাদীস মরফূ' বর্ণিত হয়েছে, তা হলে এর জওয়াব কি ? দারে কুতনী বলেন ঃ هذا الحديث لم يسند عن جابر بن عبد الله غير ابى حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان –

"এই হাদীস হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং হাসান ইবনে আম্মারা ব্যতীত কেউ রিওয়ায়েত করেনি। অথচ এই দু'জনই দুর্বল (ضعيف)।" নাউযুবিল্লাহ্! এমন একজন প্রখ্যাত ইমাম সম্পর্কে দারে কুতনীর এই মন্তব্য অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক, তার একবার চিন্তা করা উচিত ছিল যে, আমি কার সম্পর্কে এই উক্তি করছি। অথচ তার নিজের মুসনাদে মা'লুল, মুনকার, গরীব ও মওযূ' হাদীসে ভর্তি। ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে তার এই দুঃসাহস খুবই দুঃখজনক। যাঁর ইলম ও ফযীলত সম্পর্কে ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইবনুল মুবারক, হাম্মাদ ইবনে যায়দ, হুসায়ম, ওয়াকী' ইবনে জাররাহ্ ও অন্যান্য প্রখ্যাত উলামায়ে কিরাম (র) প্রশংসা করেছেন। যাঁর মতামতের উপর অনেক বিষয়ে ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ (র) ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবুও এই কূটিলতাপূর্ণ সমালোচনার জওয়াব হলো এই যে, যদি তোমাদের মতে এই হাদীস মুসালসাল (مسلسل) সহীহ্ হয়ে থাকে, তা হলে হানাফীদের মতে মুরসাল (مرسل) হাদীস দলীল হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এছাড়া এই অভিযোগ অত্যন্ত ভুল যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) ব্যতীত মূসা থেকে অন্য কেউ এই হাদীস মুসনাদ বর্ণনা করেনি। কেননা আহমদ ইবনে মানী স্বীয় মুসনাদে এই হাদীস দু'টি সহীহ পদ্ধতিতে মরফূ' বর্ণনা করেছেন। প্রথমটি হলো সুফিয়ান ও শুরাইক (র) মূসা (র) থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। দ্বিতীয়টির মধ্যে জারীর (র) ও অন্যান্যের রিওয়ায়েত। বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী প্রথম সনদ সহীহ এবং দ্বিতীয় সনদ মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। সুতরাং এবার দারে কুতনীর দাবি যে, সুফিয়ান, শুরাইক, জারীর (র) ও অন্যান্যগণ মূসা (র)-এর সূত্রে এই হাদীস মরফূ' (مرفوع) নয়, এটা ভুল প্রমাণিত হলো।

এরপর বায়হাকী, দারে কুতনী, তাহাবী ও ইবনে আদী (র) অন্য এক পদ্ধতিতে এই হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু এখানে বায়হাকী আবূ যুবায়র (র) থেকে বর্ণনাকারী জাবির, লাইস, ইবনে আবী সুলায়ম (র) ও অন্যান্যদেরকে নিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছেন- جابر و

ليث لا يحتج بهما "জাবির ও লাইস (র) দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নন।" কেননা তাঁদের মতে বর্ণনাকারীর দুর্বল (ضعيف) হওয়া তার অবস্থার উপর নির্ভর করে না; বরং একজন নির্ভরযোগ্য (ثقة) বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অপর একজন বর্ণনাকারীর বিপক্ষে আসার উপর নির্ভর করে। মোট কথা বিরোধী পক্ষের কথা হলো, হানাফীদের নিকট এ বিষয়ে কোন হাদীস নেই এবং আসমাউর রিজাল (اسماء الرجال) -এর জ্ঞান নেই, সব কিছু তাদের কাছেই রয়েছে। মোট কথা হানাফী মাযহাবের বিরোধিতা করাই হলো মূল উদ্দেশ্য। অথচ এই জাবির (রা)-এর হাদীস নির্ভরযোগ্য (توثيق) বলে ওয়াকী, শু'বা, সুফিয়ান সওরী (র) ও অন্যান্য আইম্মায়ে কিরাম মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে আবদুল হাকিম (র) বলেন ঃ ইমাম শাফিঈ (র) থেকেও আমি এই হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য শুনেছি। লাইস (র) সম্পর্কে ইবনে মাঈন (র) বলেন ঃ لابأس به ; আবদুল ওয়ারিস বলেন ঃ كان من اوعية العلم। এরপর শু'বা তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাই এতে কিভাবে সন্দেহ করা যায় যে, এমনিভাবে ইবনে আবী শায়বা আবুয-যুবায়রের সূত্রে হযরত জাবির (রা) থেকে এই মরফূ' হাদীস বর্ণনা করেছেন ? আল-জাওহারুন নকীতে বলা হয়েছে যে, এই হাদীসের রিজাল (رجال) সবাই নির্ভরযোগ্য (ثقة)। আবূ নুআইম (র) এই হাদীস মরফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এবার কিছুক্ষণের জন্যও যদি ধরে নেয়া যায় যে, এই হাদীস অন্য কোন পদ্ধতিতে মরফূ' সহীহ্ নয়, তা হলেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এই হাদীসকে মরফূ' হিসেবে গ্রহণ করা নিশ্চিতভাবে এটা দলীলের উপযুক্ত হবে। অধিকন্তু তা মওকুফ ও সহীহ্ পদ্ধতিতেও বর্ণিত আছে। সুতরাং ইমাম মুহাম্মদ (র) মালিক (র)-এর সূত্রে ওহাব ইবনে কায়সান (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন ঃ তিনি হযরত জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ

من صلى وكعة لم يقرأ فيها بام القران فلم يصل الا وراء الامام

"যে ব্যক্তি এক রাকাআত নামায পড়লো এবং এতে সূরা ফাতিহা পড়ল না, তা হলে সে যেন নামাযই পড়লো না; ইমামের পিছনে ছাড়া।"

এবার হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো। প্রকৃতপক্ষে প্রথম রিওয়ায়েত মূল হাদীসের একটি অংশ যা অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। হযরত জাবির (রা) কখনো মূল বিষয় (محل) (حكم) বর্ণনা করেন। আবার কখনো এর সাথে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম রিওয়ায়েতেরদ্বারা দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। একটি হলো এই যে, قرأت خلف الامام। (ইমামের পিছনে কিরাআত) এই বাক্যের দ্বারা নিম্নস্বরের নামাযেও কিরাআতের নিষেধাজ্ঞা বুঝানো হয়েছে। কেননা যোহর ও আসর নামায সম্পর্কে এই আলোচনা। এরদ্বারা ইমাম মালিক (র) ও অন্যান্যদের মাযহাবকে স্পষ্ট বাক্যের দ্বারা খন্ডন করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ হুযূর (সা) বলেছেন ঃ من صلى خلف الامام এই হাদীসের বাক্য وتنازعنى يارايتك -এরদ্বারা ইমামের পিছনে কিরাআতের নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ এরদ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করেছেন। তারা বলেন ঃ হুযূর (সা) শুধু এটা বলেছেন যে, ইমামের কিরাআত মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যদি মুকতাদী ইচ্ছা করে, তা হলে নিজেও পড়তে পারে।

এই অর্থ নয় যে, মুকতাদী মোটেই পড়তে পারবে না। এর জওয়াব হলো এই যে, যদি তা সঠিক হতো তা হলে যখন ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠকারী এবং নিষেধকারীর ঘটনা হুযূর (সা)-এর নিকট পেশ করা হয়, তখন তিনি নিষেধকারীর পক্ষ সমর্থন করে কিরাআত পাঠকারীর মতামতকে খন্ডন করেন। কেননা তিনি সুস্পষ্টভাবে কিরাআত থেকে বাধা প্রদান করে বলেন ঃ যখন ইমামের কিরাআত মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট, এ অবস্থায় তোমরা কেন অযথা কিরাআত পাঠ কর ? অধিকন্তু যদি কিরাআতের আজ্ঞা ও নিষেধাজ্ঞা উভয়ই গ্রহণযোগ্য হতো, তা হলে পঞ্চম রিওয়ায়েতে তিনি যে জিজ্ঞাসা করেন ঃ من قرء منكم سبح اسم ربك الاعلى তখন সবাই আদব ও নবুওয়তের বিশেষ মর্যাদার কারণে জওয়াব দেননি; এরদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর (সা)-এর পবিত্র চেহারায় অসন্তোষ ও ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। ফলে কারো জওয়াব দেওয়ার সাহস হয়নি। অবশেষে আঁ হযরত (সা) তিনবার একই কথা জিজ্ঞাসা করেন। যদি কিরাআত জায়েয হতো, তা হলে তিনি কেন প্রশ্ন করতেন? যদিও প্রশ্ন করতেন, তা হলে পাঠক তা প্রথমেই স্বীকার করতেন যে, আমি কিরাআত পাঠ করেছি।

যদি কিছু সময়ের জন্য এটা মেনে নেওয়া যায় যে, ইমামের কিরাআত মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট হওয়ার অর্থ এই যে, ইচ্ছা করলে মুকতাদীও কিরাআত পাঠ করতে পারে। তা হলে এর স্পষ্ট অর্থ হলো এই যে; মুকতাদীর উপর কিরাআতের ফরয হওয়ার বিষয়টি ইমামের কিরাআতের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং ইমাম যখন মুকতাদীর পক্ষ থেকে কিরাআত পাঠ করে এবং সাথে সাথে মুকতাদীও কিরাআত পাঠ করে, তাহলে এ অবস্থায় মুকতাদীর উপর শরীয়ত যতটুকু কিরাআত নির্ধারণ করছে; এর চেয়ে তা অতিরিক্ত হবে। কিন্তু এ ধরনের অতিরিক্ত কাজ শরীয়তে জায়েয নেই। দ্বিতীয়তঃ মুকতাদীর কিরাআত যখন ইমামের যিম্মায় মেনে নেওয়া হয়েছে, এ অবস্থায় যদি মুকতাদীও কিরাআত পাঠ করে, তা হলে মুকতাদী যেন একই রাকাআতে দু'টি কিরাআত পাঠ করল, এটাও জায়েয নয়। এছাড়া হাদীসের দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, মুকতাদীর কিরআতের বদল বা স্থলাভিষিক্ত হলো ইমামের কিরাআত। যদি মুকতাদীও কিরআত পাঠ করে মূল ও স্থলাভিষিক্ত (بدل ومبدل منه বা اصل ونائب) একত্র জমা হয়ে যাবে। বস্তুত এটা জায়েয নয়। প্রকাশ থাকে যে, হাদীস صلى خلف الامام الخ একটু গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, এতে একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিরআতের জন্য উচুস্বরে বা নিম্নস্বরের নামাযের শর্ত আরোপ করা হয়নি। কেননা ইমামের কিরাআত মুকতাদীর পক্ষ থেকে বদল হওয়ার জন্য ইমামের পিছনে ইকতিদা করা আবশ্যক করা হয়েছে এবং এর জন্য মুকতাদীর উপর কিরাআতের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এখানে ইকতিদা হলো সাধারণ (عام বা مطلق) উচুস্বর ও নিম্নস্বর উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং এখানে ইমাম মালিক (র) ও অন্যান্যদের মাযহাব অনুযায়ী উচুস্বরের (جهرى) শর্ত আরোপ (قيد) করা কিভাবে সম্ভব? যদি তা করা হয়, তা হলে এটা হাদীসের মূল উদ্দেশ্যের বিরোধী হবে।

তৃতীয় রিওয়ায়েতে فنهاه এই শব্দ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এতে ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। এবার প্রশ্ন হলো, যখন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো, তা হলে এরদ্বারা কিরাআত সাধারণভাবে হারাম হওয়া প্রয়োজন ছিল এবং নামায ফাসেদ হওয়া উচিত ছিল। এ ব্যাপারে একটি দুর্বল রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। কিন্তু অন্যান্য রিওয়ায়েতের সাথে যেহেতু বিরোধ সংঘটিত হয়েছে, তাই হারাম থেকে নমনীয় করে মাকরূহ তাহ্‌রীমী স্থির করা হয়েছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম থেকে এই রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। ইবনে আদী (র) স্বীয় কামিল নামক গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে একই বাক্যের মাধ্যমে হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু এতে অভিযোগ করা হয় যে, এই হাদীসে ইসমাঈল ইবনে উমর হাসান ইবনে সালেহ থেকে রিওয়ায়েত করেছেন, যিনি দুর্বল (ضعيف) এবং কেউ তাঁকে অনুসরণ করেনি। অথচ তিবরানী এই হাদীসও একই সনদ উল্লেখ করেছেন। এতে নযর ইবনে আবদুল্লাহও হাসান সালেহ থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। হযরত ইবনে উমর (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে দারে কুতনী, হযরত আনাস (রা) থেকে ইবনে হাব্বান কিতাবুয যুআফা (كتاب الضعفاء) নামক গ্রন্থে মরফূ' হাদীস বর্ণনা করেছেন। কোন কারণ ব্যতীত এই হাদীসসমূহকে দুর্বল (ضعيف) বলা হয়েছে। এরপর যদি মেনে নেওয়া হয় যে, কোন কোন রিওয়ায়েত দুর্বল, কিন্তু অধিক সংখ্যক রিওয়ায়েতের দ্বারা হাদীসের দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে যায়। সুতরাং এবার কোন অভিযোগ অবশিষ্ট থাকল না।

এবার ঐ সাহাবাদের হাদীসের উপর দৃষ্টিদান করা যায়, যাঁরা ইমামের পিছনে কিরাআতের নিষেধাজ্ঞার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এঁদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

انما جعل الامام ليوتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرء فانصتوا واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد

"ইমাম এইজন্য নিয়োজিত করা হয়েছে যে, তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং যখন তিনি তাকবীর বলবেন, তখন তোমরাও তাকবীর বল, যখন তিনি কিরাআত পাঠ করবেন, তখন তোমরা চুপ থাক। যখন তিনি سمع الله لمن حمده বলবেন, তখন তোমরা ربنا لك الحمد বল।" এই হাদীস ইমাম মালিক, আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) এবং অন্যান্যরা গ্রহণ করেছেন। সবরাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলেন ঃ اذا قرء فانصتوا অতিরিক্ত এবং এটা মাহফূয (محفوظ) নয়। আবূ দাউদ, আবূ হাতিম, ইবনে মুঈন, হাকিম ও দারে কুতনী (র) বলেন ঃ ليست بمحفوظة ইবনে হাম্মাম জওয়াবে বলেন ঃ যদি সনদের ধারা সহীহ্ হয় এবং বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (ثقة) হন, তাহলে এই شاذ -ও গ্রহণযোগ্য (مقبول) হয়ে থাকে। কিন্তু মাযহাবী সম্পর্কের কারণে আবূ দাউদ (র) আবূ খালিদ (র) সম্পর্কে সমালোচনা ও সন্দেহ করেছেন। তবে আবূ দাউদের এই সন্দেহের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, এই আবূ খালিদ সুলায়মান ইবনে হাইয়ান হলেন ঐ ব্যক্তি, যাঁর থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম দলীল গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর দলীল গ্রহণযোগ্য। এছাড়া ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে হযরত আবূ

মূসা (রা) থেকে সুলায়মান তাইমীর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে এই অতিরিক্ত (زيادت) বিদ্যমান রয়েছে। স্বয়ং ইমাম মুসলিম (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এই হাদীস সহীহ্ বলে মতামত প্রদান করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি এই হাদীসকে সহীহ্ বলে থাকেন কিন্তু স্বীয় গ্রন্থে কেন অন্তর্ভুক্ত করেন নি ? তিনি বলেন ঃ প্রত্যেকটি হাদীস যা আমি সহীহ্ বলে জানি এবং এর উপর ইমামদের ইজমা রয়েছে, ঐ সকল এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়নি। এমনিভাবে হযরত আবুদ্ দারদা (রা), হযরত ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সহীহ্ পদ্ধতিতে এই হাদীস বর্ণিত আছে যা কিরাআতের নিষেধাজ্ঞা প্রমাণ করে। এই বিষয়ে আসারে (آثار) সাহাবাও উত্তম সনদের দ্বারা বর্ণিত আছে। যেমন হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করতেন না। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন তিনি বলেন, চুপ থাক। ইমামের কিরাআত তোমার জন্য যথেষ্ট। ইমাম মুহাম্মদ (র) স্বীয় মুয়াত্তা নামক হাদীস গ্রন্থে হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি বলেছেন, যদি ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠকারীর মুখে পাথর হতো! হযরত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রা) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি এটা পসন্দ করি যে, ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠকারীর মুখে আগুনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠুক। মোট কথা এমনি আরো অনেক আসার রয়েছে।

এবার ইজমা' ও কিয়াসের মাধ্যমে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। উপরের বর্ণনা অনুযায়ী আশি থেকে অধিক সাহাবা (রা) থেকে কিরাআতের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে। এটা প্রায় ইজমা'র নিকটবর্তী হয়েছে। কিয়াসও হানাফী মাযহাবের সমর্থন করে থাকে। কেননা হাদীস الامام ضامن-এর দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম কিরাআতের যিম্মাদার হয়ে যান। সুতরাং নিষেধাজ্ঞার হাদীসেও এইদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইমাম হলেন কিরাআতের যিম্মাদার। তাই ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করা ইমামের যিম্মাদারী ভঙ্গ করারই নামান্তর এবং শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করার ফলে বিষয়টি হারাম না হলেও অবশ্যই মাকরূহ তাহরীমী হবে। সুতরাং পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের দৃষ্টিকোণ থেকে হানাফী মাযহাব সঠিক বলে প্রমাণিত হলো।

উপরে হানাফী মাযহাবের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে উঁচু ও নিম্নস্বরে নামাযের মধ্যে মুকতাদীর উপর কিরাআত ফরয বলে মতামত প্রদানকারীদের মাযহাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো, তাঁদের মাযহাবের স্বপক্ষে তাঁরা হাদীস ও কিয়াসের দৃষ্টিকোণ থেকে দলীল পেশ করে থাকেন। ফাতিহা ফরয হওয়ার স্বপক্ষে তাঁরা হাদীস لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب পেশ করেন। কিন্তু এই হাদীসে ইমাম, মুকতাদী, মুনফারিদ (একাকী নামায আদায়কারী) উঁচুস্বর ও নিম্নস্বরের শর্ত আরোপের কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং এরদ্বারা ফরয প্রমাণিত হয় না। অতঃপর এটা সাধারণ (عام) নয়; বরং ইকতিদার অবস্থা এর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। যদি মেনে নেয়া হয় যে, এটা সাধারণ (عام), তা হলে কিরাআতের

নিষেধাজ্ঞা দ্বারা এর সাধারণ (عموم) হওয়া ঐ সময় লংঘিত হবে যখন মুকতাদীর চুপ থাকাকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরী মান্য করা হবে। এছাড়া যখন রুকূতে অংশগ্রহণ করে ঐ রাকাআত পাওয়ার ফলে ঐ ব্যক্তিকে সর্ব সম্মতিক্রমে এই সমস্ত হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন (مستثنى) করা হয়েছে, তা হলে এই নিষেধাজ্ঞার হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে মুকতাদীকে কেন বিচ্ছিন্ন করা হবে না ? দ্বিতীয়তঃ ইমামের পিছনে কিরাআত ফরয হওয়া সম্পর্কে অপর দলীল হলো হযরত উবাদাহ (রা) বর্ণিত হাদীস, বুখারী ও মুসলিম শরীফের রিওয়ায়েত অনুযায়ী এই হাদীস সাধারণ (عام) لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب কিন্তু এরদ্বারা তাঁদের দাবি পূর্ণাঙ্গভাবে সফল হয় না। সুতরাং হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে এর জওয়াব হলো এই যে, মুকতাদী প্রকৃতপক্ষে তিলাওয়াতকারী। নিজে না হলেও ইমামের যিম্মায়। ফজর নামাযের কিস্‌সা তিনটি পদ্ধতিতে আবূ দাউদ থেকে বর্ণিত আছে। কিন্তু এগুলোর নির্ভুল হওয়া সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে। প্রথমত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার হলো মুদাল্লিস (مدلس), মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কারো নিকট তার রিওয়ায়েত দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত নাফে' ইবনে মাহমূদ, তাকে তাহযীবুত্-তাহ্‌যীব নামক গ্রন্থে অজ্ঞাত পরিচয় (مجهول) বলা হয়েছে। আল্লামা তাহাবী বলেছেন ঃ لايعرف (অপরিচিত)। তৃতীয়ত হযরত উবাদাহ্ (রা) থেকে মাজহুল ব্যক্তি হাদীস শ্রবণ করেননি। তাহ্‌যীবুত-তাহযীব গ্রন্থে এই হাদীস আবূ বকর রাযী (র) থেকে একইভাবে বর্ণিত আছে।

যুক্তি হিসেবে (عقلى دليل) তাঁরা এই বলে থাকেন যে, কিরাআত হলো নামাযের রুকন, যাতে ইমাম ও মুকতাদী উভয়কে অংশগ্রহণ করতে হয়। আমরা বলব এটা কুরআনের মুকাবিলায় কিয়াস, যা গ্রহণযোগ্য নয়। অতঃপর রুকনের মধ্যে অংশগ্রহণ যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এটা প্রকৃত কিরাআতের সাথে ইমামের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে এবং অপরটি اذا قرئ ..... فانصتوا-এর দৃষ্টিকোণ থেকে চুপ থাকা ও শ্রবণ করার সাথে মুকতাদীর ইমামের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় যুক্তি হিসেবে তারা এটা বলে থাকে যে, নিম্নস্বরের নামাযে যখন মুকতাদী কোন কিরাআত শ্রবণ করবে না এবং নিজেও পড়বে না, তখন মুকতাদী কর্মহীন থাকবে, অথচ ইবাদত হলো কাজে নিবিষ্ট থাকা। আমরা বলব, শরীয়ত যখন মুকতাদীর চুপ থাকাকে কিরাআত হিসেবে মেনে নিয়েছে, তা হলে এটা কিভাবে বেকার হতে পারে? এছাড়া এটা তাদের মাযহাবেও বিদ্যমান। কেননা ফাতিহা পাঠ করার পরও নিম্নস্বরের নামাযে ইমামের অবসর না হওয়া পর্যন্ত মুকতাদীকে বেকার থাকতে হয়। না পড়তে পারে, না শুনতে পায়। এমনিভাবে তাশাহহুদে-মুকতাদীকেও তাশাহহুদ, সালাত ও দু'আ পাঠ করার পর কিছু সময় বেকার বসে থাকতে হয়। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হলো এই যে, এই মাযহাবের সমর্থকদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ফাতিহা কখন পড়তে হবে? তারা বলবে, সাক্‌তার (سكتة) সময়। যদি এরপর জিজ্ঞাসা করা হয় যে, শরীয়তে সাক্‌তার প্রমাণ কোথায় আছে? এর জওয়াবে তাদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। এই ধারণার মূল বিষয় হলো এই যে, ইমামের জন্য চারটি সাক্‌তা রয়েছে। প্রথমত তাকবীরে তাহরীমার পর কিরাআত শুরু হওয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত ولا الضالين

এর পর আমীন (آمين) বলার পূর্বে। তৃতীয়ত আমীন (آمين) বলার পর মুকতাদীকে ফাতিহা পাঠ করার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। চতুর্থত কিরাআত শেষ করার পর রুকূতে যাওয়ার পূর্বে। হানাফী মাযহাবমতে শুধু প্রথম সাক্তা (سكتة) ব্যতীত অন্য কোন সাক্তা নেই। সুতরাং এতে নীতি ও যুক্তির যে জটিলতা রয়েছে, তা হলো এই যে, প্রথমত এই সাকতার মধ্যে এই পরিমাণ সময় পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কেননা এতে ফাতিহা পাঠ করার সময় পাওয়া যায় না। এ ছাড়া এই সাকতার মধ্যে থামা ইমামের জন্য মুস্তাহাব। অর্থাৎ থামা বা না থামা ইমামের ইচ্ছা এবং না থামার ফলে ইমামের গুনাহ্ হবে না। পক্ষান্তরে ফাতিহা পাঠ করা মুকতাদীর জন্য ওয়াজিব, পাঠ না করলে গুনাহ্ হবে। যদি ইমাম না থামেন তা হলে মুকতাদী কোন কারণ ব্যতীত ফাতিহা পাঠ না করার ফলে গুনাহ্গার হবে। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই।

بَابُ نَسْخِ التَّطْبِيْقِ

তাতবীক রহিত হওয়ার বর্ণনা

١٠٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرَ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ كُنَّا نُطَبِّقُ ثُمَّ اُمِرْنَا بِالرُّكَبِ -

হাদীস নং-১০৫

অনুবাদ ঃ হযরত সাআদ ইবনে মালিক (রা) বলেন ঃ আমরা তাতবীক করতাম, এরপর আমাদের প্রতি নির্দেশ হলো, যেন আমরা হাঁটু আঁকড়িয়ে ধরি।

ব্যাখ্যা ঃ তাতবীক (تطبيق) হলো উভয় হাত মিলিয়ে উভয় রানের মাঝে চেপে ধরা। প্রথমত রুকূ এইভাবে আদায় করা হতো। অতঃপর হুযূর (সা)-এর নির্দেশে এই পদ্ধতি রহিত হয়ে যায় এবং রুকূ করার সময় হাত দ্বারা হাঁটু ধরার সুন্নাত চালু হয়ে এখনো তা অব্যাহত আছে। রহিত হওয়া সম্পর্কে এই হাদীস প্রমাণ বহন করে। এছাড়া অন্যান্য সহীহ হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে। হানাফী মাযহাব সহ অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এই আমলের উপর বিদ্যমান। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) এবং তাঁর ছাত্র ও অনুসারীগণ তাতবীক সমর্থন করেন। এর উপর কোন বিরোধী মতবাদের লোক হানাফীদের অভিযোগ করে থাকে যে, হাত (رفع يدين) উঠানোর মাসয়ালায় তারা সমস্ত সাহাবাকে ছেড়ে হযরত ইবনে মাসঊদ (রা)-এর রিওয়ায়েতের অনুসরণ করেছে, অথচ এখানে হযরত ইবনে মাসঊদ (রা)-এর বিরোধিতা করেছে। সুতরাং বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে যে, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর চিন্তাধারা অভিযোগের উপযুক্ত, না প্রশংসার যোগ্য। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, হাত উঠানো (رفع يدين) সম্পর্কে তাঁরা হযরত ইবনে মাসঊদ (রা)-এর সহীহ্ হাদীস পেয়েছেন এবং তা রহিত হওয়া সম্পর্কে কোন মরফূ' (مرفوع), মওকূফ (موقوف), সহীহ (صحيح), যঈফ (ضعيف) সুস্পষ্ট বা ইঙ্গিত (سراحة وكناية) মূলক হাদীস পাননি। তাই এই হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং হাত না উঠানো সুন্নাত বলে ঘোষণা করেছেন। এখানে তাতবীক রহিত হওয়া সম্পর্কে সহীহ

হাদীস রয়েছে, তাই রহিত হওয়ার সম্পর্কে পক্ষে মতামত পেশ করেছেন। সুতরাং তাতবীক সুন্নাত নয়, বরং হাঁটু ধরা সুন্নাত। সুতরাং তাঁরা সহীহ্ হাদীস ও সহীহ সুন্নাতের উপর আমল করেছেন এবং অপরটি পরিত্যাগ করেছেন।

بَابُ الاِمَامِ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه

ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলে

١٠٦ - اِبْنُ اَبِىْ السَّبِعِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ يَسْأَلُ عَطَاءً عَنِ الاِمَامِ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه اَيَقُوْلُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ مَا عَلَيْهِ اَنْ يَقُوْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ رَوٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَه مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقَالَ رَجُلٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَن ذَا الْمُتَكَلِّمُ بِهٰذِه قَالَهَا ثَلٰثَ مَرأَتٍ قَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا نَبِىَ اللّٰهِ ـ قَالَ فَوَ الَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَّ ثَلٰثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَ اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا لَكَ وَ اَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُهَا -

হাদীস নং-১০৬

অনুবাদ ঃ ইবনে আবিস সাবআ ইবনে তালহা (র) বলেন ঃ আমি হযরত আবূ হানীফা (র)-কে আতা (র)-এর নিকট এটা জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি যে, ইমাম যখন سمع الله لمن حمده বলেন, তখন এর সাথে কি ربنا لك الحمد বলতে হবে? হযরত আতা (রা) বলেন ঃ এটা ইমামের জন্য জরুরী নয়। অতঃপর হযরত আতা (র) হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী (সা) আমাদের নামায পড়ান। যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠান এবং سمع الله لمن حمده বলেন, তখন (মুকতাদীর মধ্যে থেকে) এক ব্যক্তি ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبركا فيه বলেন। যখন নবী করীম (সা) নামায শেষ করেন, তখন জিজ্ঞাসা করেন ঃ এই সমস্ত বাক্য কে উচ্চারণ করেছে ? তিনি এটা তিনবার জিজ্ঞাসা করেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র নবী (সা) ! আমি বলেছি। তখন নবী (সা) বললেন ঃ ঐ পবিত্র সত্তার শপথ! যিনি আমাকে সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, নিঃসন্দেহে আমি ত্রিশের অধিক সংখ্যক ফিরিশতাকে এই বাক্যটি কে আগে লিখবে এবং কে আগে উঠিয়ে নিবে, এটা নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি।

ব্যাখ্যা ঃ একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তি سمع الله لمن حمده এবং ربنا لك الحمد উভয়ই পাঠ করবে এবং ইমামের পিছনে নামায আদায় করার সময় মুকতাদী سمع الله لمن حمده না বলে শুধু ربنا لك الحمد বলবে। এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। তবে ইমাম সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে ইমামের উভয় বাক্য বলতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম আহমদ (র)-এর মতে ইমাম শুধু سمع الله لمن حمده বলবে। ইমাম শাফিঈ (র) দলীল হিসেবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস: ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الذكرين "নবী করীম (সা) উভয় যিকির একত্রে আদায় করতেন" পেশ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) দলীল হিসেবে এই হাদীস এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদীস পেশ করেন যাতে হুযূর (সা) শুধু سمع الله لمن حمده বলেছেন। তাই হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (রা) হাদীসের এই অংশের মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন যে, ইমাম শুধু سمع الله لمن حمده বলবে এবং মুকতাদী শুধু ربنا لك الحمد বলবে। কেননা এইক্ষেত্রে নবী করীম (সা) ইমাম ও মুকতাদীর আমল বন্টন করে দিয়ে বলেছেন ঃ اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد "যখন ইমাম سمع الله لمن حمده বলবে, তখন তোমরা ربنا لك الحمد বল"। অতঃপর ইমাম কিভাবে মুকতাদীর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন এবং মুকতাদী কিভাবে ইমামের কাজে হস্তক্ষেপ করবে ? হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের জওয়াব হলো এই যে, এটা একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

باب هيئة السجود

সিজদার অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা

١٠٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَ اِذَا قَامَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ -

হাদীস নং-১০৭

অনুবাদ ঃ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা) সিজদা করার সময় উভয় হাত রাখার পূর্বে মাটির উপর স্বীয় হাঁটুদ্বয় রাখতেন এবং উঠার সময় হাঁটুর আগেই উভয় হাত উঠাতেন।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম শাফিঈ (র) এবং ইমাম আহমদ (র)- এর মতে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথম মাটির উপর হাঁটুদ্বয়, এরপর দু'হাত রাখতে হবে এবং সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথম দু'হাত এরপর দু'হাঁটু উঠাতে হবে। দলীল হিসেবে তাঁরা ওয়ায়েল ইবনে

হুজর (রা) বর্ণিত হাদীস পেশ করে থাকেন। ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আওযাঈ (র)-এর মতে সিজদায় যাওয়ার সময় মাটির উপর প্রথম দু'হাঁটুর পূর্বে হাত রাখতে হবে। তাঁরা দলীল হিসেবে আবূ দাউদ শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত মরফূ' হাদীস পেশ করে থাকেন ঃ اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ويضع يديه قبل ركبتيه - "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ সিজদা করবে, তখন উটের মত বসবে না, বরং হাঁটুর আগে স্বীয় হাত (মাটিতে) রাখবে।" অথবা হযরত ইবনে উমর (রা) -এর মওকূফ (موقوف) হাদীস, তিনি হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখতেন। উপরোক্ত তিনজন ইমামের মাযহাব সহীহ ও সঠিক। কেননা হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা)-এর হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস থেকে সহীহ, সুস্পষ্ট এবং অগ্রগণ্য। ইমাম তিরমিযী এটাকে গরীব (غريب) বলেছেন। এর সনদের ক্রমধারায় আবদুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ ইবনে মাকবুরী রয়েছেন, ইবনে খুযায়মা যার থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। তিনি বলেন, আমরা হাঁটুর পূর্বে হাত রাখতাম কিন্তু এর পর আমাদেরকে হাতের পূর্বে হাঁটু লাগানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের মূল বিষয়ের সাথে বিরোধ রয়েছে। কেননা যখন হাত প্রথমে রাখবে এবং হাঁটু পরে, তখনই উট বসার সাদৃশ্য হবে। অথচ প্রথম থেকে এর উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

ইবনে হুমাম বলেন, হযরত ওয়ায়েলের হাদীসে রয়েছে اذا انحض اعتمد على فخذيه "নবী করীম (সা) যখন উঠতেন তখন তিনি রানের সাহায্য গ্রহণ করতেন।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা) নামাযে উঠার সময় হাতেরদ্বারা সাহায্য নিয়ে উঠতে নিষেধ করেছেন। এখন হুযূর (সা) থেকে মাটির উপর থেকে হাতের সাহায্য নিয়ে উঠা সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে, তা তাঁর পরিণত বয়সের উপর যুক্ত হবে। এটা শুধু জায়েয এ বিষয়টি বলার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত আঁ হযরত (সা)- এর এই আমল ছিল।

١٠٨ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَو غَيْرِه مِن اَصحَابِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اُوحِىَ اِلى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَن يَّسجُدَ عَلى سَبعَةِ اَعظُمٍ -

হাদীস নং-১০৮

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বা অন্য সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তিনি যেন সাত হাড়ের উপর সিজদা করেন (অর্থাৎ কপাল, দু'হাত, দু'হাটু এবং দু'পা)।

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واليدين والركبتان واطراف القدمين .

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন সাত হাড়ের অর্থাৎ কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু এবং দু'পা-এর উপর সিজদা করি।" এই হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে সিজদার সময় উপরে বর্ণিত অঙ্গসমূহ মাটির রাখা ফরয এবং তিনি امرت শব্দ দ্বারা এর দলীল পেশ করে থাকেন। হিদায়া (هدايه) নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ ورفع اليدين والركبتين سنة عندنا – "আমাদের (হানাফীদের) মতে দু'হাত ও দু'হাঁটু রাখা সুন্নত অর্থাৎ ফরয বা ওয়াজিব নয়।" এই জন্য ফরয নয় যে, পবিত্র কুরআনে (نص قطعى) সাধারণ (مطلق) সিজদার নির্দেশ রয়েছে। হাদীস (خبر واحد) দ্বারা এর উপর অতিরঞ্জিত করা জায়েয নয়। ওয়াজিব এই জন্য নয় যে, নবী করীম (সা) আরাবী সাহাবীকে যে ওয়াজিবসমূহের কথা শিক্ষা দিয়েছেন, এর মধ্যে ঐ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ নেই। তাই এখানে امرت শব্দ নফল (ندب) হিসেবে গণ্য হবে, ফরয বা ওয়াজিব হিসেবে নয়।

١٠٩ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلاِنْسَانُ يَسْجُدُ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ جَبْهَتِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ مُقَدَّمِ قَدَمَيْهِ وَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ كُلَّ عُضْوٍ مَوْضَعَهُ وَ اِذَا رَكَعَ فَلَا يُدَبِّحُ تَدْبِيْحَ الْحِمَارِ –

হাদীস নং-১০৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মানুষ (নামাযে) সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করে থাকে; কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও উভয় পায়ের অগ্রভাগ এবং যখন তোমাদের কেউ সিজদা করবে, তখন (উল্লেখিত) প্রত্যেকটি অঙ্গ এর স্বীয় স্থানে রাখবে। যখন রুকূ করবে, তখন গাধার মত মাথা ঝুকাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে সিজদার সাথে সাথে রুকূ করার পদ্ধতিও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রুকূ'র মধ্যে মাথা অধিক উপরে উঠবে না এবং বেশি নিচুও হবে না। বরং পিঠের বরাবর হতে হবে। কেননা মাথা যখন পিঠ থেকে অধিক নিচু হবে, তখন পিঠের মধ্যে বক্রতা সৃষ্টি হবে। ফলে মাথা ও পিঠ বরাবর থাকবে না; বরং এতে উট বা ষাঁড়ের পিঠের উঁচু হাড় বা কুঁজের আকৃতি ধারণ করবে এবং এটা হুযূর (সা)-এর নির্দেশের বিরোধী হবে, তাই এটা নিষিদ্ধ। সুতরাং ইবনে মাজাহ ইবনে মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমি হুযূর (সা)-কে নামায আদায় করতে দেখেছি। যখন তিনি রুকূ' আদায় করতেন তখন পিঠ এমনভাবে বরাবর রাখতেন যে, যদি এর উপর পানি ঢালা হতো তাহলে তা স্থীর হয়ে যেত।

١١٠ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَمُدَّ رِجْلَيْهِ فَاِنَّ الاِنْسَانَ يَسْجُدُ عَلٰى سَبْعَةُ اَعظُمٍ جَبْهَتَهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ –

وَفِىْ رِوَايَةٍ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَمُدَّ صُلْبَه –

وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ يَّمُدَّ الرَّجُلُ صُلْبَه فِىْ سُجُوْدِه –

হাদীস নং-১১০

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ নাদরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সিজদা করার সময় তোমাদের মধ্যে কেউ যেন স্বীয় পা (উপরের দিকে) না উঠায়। কেননা মানুষ সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করে থাকে। কপাল, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পা (এর হাড়ের উপর)।

অপর এক রিয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ সিজদা করবে, তখন যেন স্বীয় পিঠ বিছিয়ে না দেয়।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিজদার সময় মানুষকে স্বীয় পিঠ বিছানো থেকে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসের ব্যাখ্যা দেখা যেতে পারে।

١١١ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ وَلاَ اَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا –

হাদীস নং-১১১

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করা এবং চুল ও কাপড় ধরে না রাখার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসেও সিজদার বর্ণনা রয়েছে। এখানে আরো একটি মাসয়ালা বর্ণনা করা হয়েছে যে, নামাযে সিজদা করার সময় সামনে ও পিছনে চুল বা কাপড় না টানে অথবা ধরে না রাখে। জামার হাতা গুটানোও এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। কারো কারো অভ্যাস এই যে, নামাযে সিজদা করার সময় কেউ কেউ কাপড় উঠিয়ে থাকে, কখনো হাতা গুটিয়ে থাকে। এই কাজ নামাযের আদব, বিনয় এবং নম্রতার পরিপন্থী। বিনয় ও নম্রতার মধ্যেই নামাযের সৌন্দর্য নিহীত।

এমন কি নামাযের সফলতা ও মূল উদ্দেশ্য অর্জন করা এই বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বলেছেন: قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ – অর্থাৎ "নিশ্চয়ই ঐ মুমিনগণ সফলতা লাভ করেছে যারা বিনয় ও নম্রতার সাথে নামায আদায় করেছে।"

١١٢– اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ صَلّٰى فَلاَ يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ الْكَلْبِ –

হাদীস নং-১১২

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামায আদায় করবে, সে যেন (সিজদায়) স্বীয় বাহু কুকুরের মত (মাটির উপর) বিছিয়ে না দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস সিহাহ সিত্তাহর সকল গ্রন্থে বিভিন্ন বাক্যের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এমন কি হুযূর (সা) কখনো কুকুরের সাথে আবার কখনো অন্য প্রাণীর সাথে এর উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন ঃ আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সা) (নামাযের মধ্যে) কাকের মত ঠোকর মারা, বিভিন্ন প্রাণীর মত বাহু বিছানো এবং উটের মত মসজিদে স্থান নির্দিষ্ট করা থেকে নিষেধ করেছেন।

بَابُ الْقُنُوْتِ فِىْ الْفَجْرِ

ফজর নামাযে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করা সম্পর্কে

١١٣– اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ يَقْنُتْ فِىْ الْفَجْرِ قَطُّ اِلاَّ شَهْرًا وَاحِدًا لَمْ يُرَقَبْلَ ذٰلِكَ وَلاَ بَعْدَه يَدْعُوْ عَلٰى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ –

হাদীস নং-১১৩

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক মাস ব্যতীত নবী করীম (সা) কখনো ফজর নামাযে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করেননি। এর পূর্বে বা পরে কখনো তা পাঠ করতে দেখা যায়নি। তিনি (এই দু'আয়ে কুনূতে) কয়েকজন মুশরিকের বিরুদ্ধে বদদু'আ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে সমস্ত কাফিরের বিরুদ্ধে হুযূর (সা) বদ দু'আ করেছেন, তারা হুযূর (সা)-এর সাথে চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে এবং ধোকা দিয়ে কয়েকজন ক্বারী (সাহাবা)-কে নিয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করে। এর ফলে আঁ হযরত (সা) অন্তরে এত দুঃখ ও ব্যথা পেয়েছেন যে, তিনি এই অপকর্মকারীদের বিরুদ্ধে দু'আয়ে কুনূতের মাধ্যমে বদ দু'আ শুরু করেন এবং এক মাস পর্যন্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে কুনূতের মাধ্যমে এই বদ দু'আ অব্যাহত রাখেন।

এই হাদীসে বর্ণিত দু'আয়ে কুনূত সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আহমদ (র)-এর মতে বিতর নামাযে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করা সুন্নাত। কেননা তাঁদের মতে ফজরে দু'আয়ে কুনূত একটি বিশেষ সময়ে এবং বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে শুরু হয়েছিল যা এক মাস অব্যাহত থাকার পর সমাপ্ত হয়ে যায়। এটা হুযূর (সা)-এর অব্যাহত আমল নয়। যার ফলে এটা স্থায়ী সুন্নাত হতে পারে না। ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে ফজর নামাযে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করা সুন্নাত। তাঁরা আবূ জা'ফরের সূত্রে হযরত আনাস (রা) থেকে দারে কুতনী গ্রন্থে বর্ণিত এ হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন ঃ

مازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت فى الصبح حتى فارق الدنيا "রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইনতিকালের পূর্বে পর্যন্ত ফজর নামাযে সর্বদা দু'আয়ে কুনূত পাঠ করেন।" দ্বিতীয় দলীল হিসেবে বুখারী শরীফের হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ "আমি নামাযে তোমাদের চেয়ে হুযূর (সা)-এর অতি নিকটবর্তী ছিলাম।" অর্থাৎ আমি হুযূর (সা)-এর সাথে তোমাদের চেয়ে অধিক নামায আদায় করেছি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ফজর নামাযের দ্বিতীয় রাকাআতে سمع الله لمن حمده পাঠ করার পর মুমিনদের জন্য দু'আ করতেন এবং কাফিরদের জন্য বদ দু'আ করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল-মাকবিরী (র)-এর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অপর রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) ফজর নামাযের দ্বিতীয় রাকাআতে রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর দু'আয়ে কুনূত পাঠ করতেন।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর প্রথম দলীল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের দু'আয়ে কুনূত নাযিলা আকারের ছিল। এই দু'আয়ে কুনূত নাযিলা এক মাস অব্যাহত ছিল। এরপর তা বন্ধ হয়ে যায়। এই হাদীস ইবনে আবী শায়বা, বাশশার ও তিবরানী (র) রিওয়ায়েত করেছেন। প্রথমত হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) এরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক, যাঁর উপর হানাফী মাযহাবের ফিকহ নির্ভরশীল। এ ছাড়া তিনি এমন একজন মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী যিনি হুযূর (সা)-এর খাদিম হিসেবে বিশেষ সম্মানের অধিকারী। তাঁর সব সময়ের সাথী হওয়ার গৌরব তিনি অর্জন করেছিলেন। আঁ হযরত (সা)-এর পারিবারিক ও বাইরের সমস্ত খবর সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। এরূপ ব্যক্তির সম্পর্কে কি এই ধারণা করা যায় যে, বাধ্যতামূলকভাবে ফজর নামাযে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করা হয়েছে এবং তিনি এ সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন? এই আমল ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত ছিল অথচ তিনি এটার খবর রাখেন নি? তা কখনো হতে পারে না।

দ্বিতীয় দলীল হলো বায়হাকী বর্ণিত হযরত ইবনে উমর (রা)-এর হাদীস। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে উমর (রা)-এর সাথে ফজর নামায আদায় করি। তিনি এই নামাযে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করেন নি। ইবনে আবী শায়বা ও হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রা) ফজর নামাযে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করেন নি। ইমাম শা'বী (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রা) পড়েননি। যদি হযরত উমর (রা) পাঠ করতেন তাহলে হযরত ইবনে উমর (রা)-ও তা পাঠ করতেন। হযরত ইবনে আবী শায়বা (র) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা) এবং হযরত উসমান (রা) ফজর নামাযে দু'আ কুনূত পাঠ করতেন না। মুহাম্মদ ইবনে হাসান আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমি দু'বৎসর সফরে ও বাড়িতে হযরত উমর (রা)-এর সাথে ছিলাম। কিন্তু আমি তাঁকে ফজর নামাযে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করতে দেখিনি। ইবনে আবী শায়বা বলেন, একবার হযরত আলী (রা) শত্রুদের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফজর নামাযে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করেন। এই নূতন ঘটনায় মুকতাদীগণ অবাক হলেন। ফলে হযরত আলী (রা) বলেন, এই দু'আ দ্বারা আমরা শত্রুদের উপর জয়ী হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চেয়েছি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এটা কুনূতে নাযিলা ছিল। যদি সব সময় পাঠ করা হতো, তা হলে সাহাবায়ে কিরাম এতে অবাক হতেন না।

তৃতীয় দলীল হলো, আবূ মালিক সাআদ ইবন তারেক আশজাঈ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি হুযূর (সা)-এর পিছনে ইকতিদা করে নামায আদায় করেছি, কিন্তু তিনি কুনূত পাঠ করেননি। এমনিভাবে হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)-এর পিছনে নামায আদায় করেছি, কিন্তু তাঁরা নামাযে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করেননি। অতঃপর তিনি বলেছেন হে পুত্র! এটা বিদআত। তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ এই হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান (حسن) বলেছেন এবং এটাও বলেছেন যে, অধিকাংশ আলিম এই মত পোষণ করেছেন। সুতরাং উপরোক্ত দলীলের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাবই সঠিক।

এবার বিরোধী পক্ষের দলীল নিয়ে একটু আলোচনা প্রয়োজন। তাঁদের দলীল হলো হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস। এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন হলেন আবূ জা'ফর (র)। তাঁর সম্পর্কে সমালোচকগণ বলেছেন, তিনি অন্য বর্ণনাকারীদের পরীক্ষা নীরিক্ষা করেছেন কিন্তু নিজের বর্ণনাকারীদের পরীক্ষা করেন নি। ইবনে মুঈন (র) বলেছেন, তিনি প্রায়ই ভুল করতেন। আহমদ (র) বলেছেন, বর্ণনায় তিনি শক্তিশালী নন। আবূ যারআ (র) বলেন, তিনি বর্ণনার মধ্যে সন্দেহ পোষণ করতেন। ইবনে হাব্বান (র) বলেছেন, তিনি মুনকার (منكر) হাদীস বর্ণনা করতেন। অতঃপর এই হাদীস খন্ডন করে তিবরানী গালিব ইবনে ফরকদ (র)থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি দু'মাস হযরত আনাস (রা)-এর নিকট অবস্থান করেছি কিন্তু আমি তাঁকে ফজর নামাযে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করতে দেখিনি। এছাড়া খতীব (র) হযরত আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) ফজর নামাযে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করতেন না। তবে যখন কোন জাতির (قوم) জন্য দু'আ করতেন অথবা বদ দু'আ করতেন, তখন দু'আয়ে কুনূত পাঠ করতেন। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যে দু'আ করতেন তা ছিল কুনূতে নাযিলা।

এরপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের জওয়াব হলো এই যে, এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হলেন আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ মাকবুরী যাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, অধিকাংশের মতে দলীল হিসেবে তিনি গ্রহণযোগ্য নন। ইবনে হাব্বানে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও এর খন্ডন করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে ঃ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت فى صلوٰة الصبح الا ان يدعو تقوم او علىٰ قوم "রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজর নামাযে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করতেন না। তবে যখন কোন জাতির জন্য দু'আ করতেন অথবা বদ দু'আ করতেন" (তখন তিনি কুনূত পাঠ করতেন)। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এটা কুনূতে নাযিলা ছিল। বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসের একই জওয়াব দেওয়া যায়। অধিকন্তু মুসলিম, তিরমিযী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে ফজর নামাযের সাথে মাগরিবের নামাযের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মাগরিবের বিরোধী পক্ষও সব সময়ের জন্য কুনূতের পক্ষে মত পোষণ করেন না। সুতরাং উভয় নামাযে ঐ দু'আ কুনূতে নাযিলা হিসেবে গণ্য করা ছাড়া কোন উপায় নেই। নতুবা মাগরিবের নামাযেও দু'আয়ে কুনূত এসে যায়। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হানাফী মাযহাবের দলীল তাদের মতামত সম্পর্কে খুবই স্পষ্ট। কিন্তু বিরোধী পক্ষের হাদীস কুনূতে নাযিলার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, আবার কুনূত অর্থে দীর্ঘ কিয়ামের উপরও গণ্য হতে পারে। যেমন বলা হয়েছে ঃ افضل الصلوٰة طول القنوت "উত্তম নামায হলো দীর্ঘক্ষণ কুনূত ও কিয়াম করা" এবং ফজর নামাযে সাধারণত সমস্ত নামাযের চেয়ে বেশি দীর্ঘ কিয়াম হয়ে থাকে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে কুনূতে নাযিলা এখনো জায়েয আছে, না রহিত (منسوخ) হয়েছে, এটা অবগত হওয়া প্রয়োজন। পরবর্তী উলামায়ে কিরামের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর (সা)-এর পরেও এই আমল অব্যাহত রয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) যুদ্ধের সময় কুনূতে নাযিলা পাঠ করতেন। হযরত আলী (রা) হযরত মুআবিয়া (রা)-এর বিরুদ্ধে এবং হযরত মুআবিয়া (রা) হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় কুনূতে নাযিলা পাঠ করেছেন।

١١٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه لَمْ يَقْنُتْ اِلاَّ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يَدْعُوْ عَلٰى عُصَيَّةَ وَ ذَكْوَانَ ثُمَّ لَمْ يَقْنُتْ اِلٰى اَنْ مَاتَ –

হাদীস নং-১১৪

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) (নামাযে) কুনূত পাঠ করেন নি। তবে উসায়্যা ও যাকওয়ান গোত্রের উপর চল্লিশ দিন কুনূতের মাধ্যমে বদ দু'আ করেছেন। অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কুনূত পাঠ করেন নি।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী হাদীসের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে তা দেখা যেতে পারে। এই হাদীসে চল্লিশ দিনের কথা অতিরিক্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো এই যে, চল্লিশ দিন কুনূত পাঠ করা হয়েছে। এরদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শত্রু দমন ও প্রতিহত করার জন্য হুযূর (সা) চল্লিশ দিন দু'আ কুনূত পাঠ করেন।

بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِى التَّشَهُّدِ

তাশাহহুদে বসার পদ্ধতি

١١٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا جَلَسَ فِىْ الصَّلٰوةِ اَضْجَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَ قَعَدَ عَلَيْهَا وَ نَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى -

হাদীস নং-১১৫

অনুবাদ ঃ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন নামাযের তাশাহহুদে বসতেন, তখন বাম পা' বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন।

ব্যাখ্যা ঃ তাশাহহুদের সময় কিভাবে বসতে হবে এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) উভয় তাশাহহুদে বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে রাখা সুন্নাত বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র) প্রথম তাশহহুদে ইমাম আবূ হানীফার মত এবং দ্বিতীয় তাশাহহুদে তাওয়াররুক (تورك) অর্থাৎ নিতম্বের উপর বসা সুন্নাত বলেছেন। ইমাম মালিক (র) উভয় তাশাহহুদে তাওয়াররুককে সুন্নাত বলেছেন। ইমাম আহমদ (র) এক তাশাহহুদ বিশিষ্ট নামাযে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সাথে এবং দু' তাশাহহুদ বিশিষ্ট নামাযে ইমাম শাফিঈ (র)-এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বর্ণিত হাদীস দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র) দলীল পেশ করে বলেন যে, হুযূর (সা) নামাযে তাশাহহুদের সময় বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। ইমাম তিরমিযী হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা)-এর হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি মদীনায় গমন করার পর নবী করীম (সা)-কে নামায আদায় করতে দেখেছি। তিনি তাশাহহুদে বাম পা বিছিয়ে বসতেন এবং বাম হাত বাম রান-এর উপর রাখতেন, ডান পা খাড়া রাখতেন। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান (حسن) বলেছেন এবং অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের এই মত বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সমর্থনে মুসলিম শরীফে আবুল হাওয়ার সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন ঃ كان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى "হুযূর (সা) বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন।" এছাড়া আহমদ রিফা' ইবনে রাফি (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) জনৈক আরাবীকে বললেন ঃ যখন তুমি নামাযে তাশহহুদে বসবে, তখন বাম পা-এর উপর বস। নাসাঈ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ من سنة الصلوٰة ان ينصب القدم اليمنى و يستقبل باصابعها القبلة و يجلس على اليسرى "নামাযের সুন্নাত হলো এই যে, ডান পা খাড়া রাখবে,এর অঙ্গুলীসমূহ কিবলার দিকে রাখবে এবং বাম পা-এর উপর বসবে।" এবার যে সমস্ত হাদীসে তাওয়াররুক বা নিতম্বের উপর বসার কথা বলা হয়েছে, তা

বৃদ্ধাবস্থার সাথে সংযুক্ত হবে। কেননা পূর্ববর্তী সহীহ্ হাদীসের দ্বারা সুন্নাত নির্ধারিত হয়েছে, এতে প্রথম বা দ্বিতীয় তাশাহহুদের কোন কথা উল্লেখ নেই, তবে যেহেতু দ্বিতীয় তাশাহহুদে দীর্ঘ সময় বসতে হয়, এতে অবস্থা বিবেচনা করার কিছুটা যুক্তি রয়েছে। তিরমিযী শরীফে ইমাম শাফিঈ (র) আবূ হুমাইদ সাঈদী (র) থেকে বর্ণনা করেন এবং সেখানে আবূ হুমাইদের হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেখানে বলেছেন ঃ و به يقول بعض اهل العلم "কোন কোন উলামায়ে কিরাম এটা বলেছেন।" এরদ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাবকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়।

١١٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كُنَّ يَتَرَبَّعْنَ ثُمَّ اُمِرْنَ اَنْ يَحْتَفِزْنَ -

হাদীস সং-১১৬

অনুবাদ ঃ হযরত নাফে' (র) বলেন, হযরত ইবনে উমর (রা) -এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে মহিলাগণ কিভাবে নামায আদায় করতেন (অর্থাৎ তাশাহহুদের সময় কিভাবে বসতেন) ? তিনি উত্তরে বলেছেন, প্রথমত চার উরুর উপর বসে নামায আদায় করতেন। পরে নিতম্বের উপর বসার জন্য তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের দ্বারা মহিলাদের তাশাহহুদে বসার পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এটা পর্দার খুবই উপযোগী।

بَابٌ فِى التَّشَهُّدِ
তাশাহহুদের বর্ণনা

١١٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -

হাদীস নং-১১৭

অনুবাদ ঃ হযরত বারা' (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) আমাদেরকে এমনভাবে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে পবিত্র কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাশাহহুদ শিক্ষা করা অতি প্রয়োজনীয় এবং নামাযের ওয়াজিবসমূহ পবিত্র কুরআন শিক্ষা ও শিক্ষাদানের মত গুরুত্ব সহকারে শিখতে হবে।

١١٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ عَلَّمَنَارَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الصَّلٰوةِ يَعْنِى التَّشَهُّدَ

হাদীস নং-১১৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে খুতবাতুস সালাত (خطبة الصلٰوة) অর্থাৎ তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে তাশাহহুদকে খুতবা বলা হয়েছে। এই হাদীসও তাশাহহুদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব বহন করে।

١١٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ شَفِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ زِيَادَةٌ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلٰى جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ فَاِذَا تَشَهَّدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُونَ اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلٰى جِبْرِيْلَ اَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا تَقُوْلُوا اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اِلٰى اٰخِرِ التَّشَهُّدِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَّمَهُمْ اَلتَّحِيَّاتِ اِلٰى اٰخِرِ التَّشَهُّدِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ عَلَّمَنَا -

وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَقُوْلُ اِذَا جَلَسْنَا فِىْ اٰخِرِ الصَّلٰوةِ ، اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى مَلَائِكَةِ نُسَمِّيْهِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا تَقُوْلُوْا كَذَا وَ قُوْلُوْا التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ..... –

হাদীস নং-১১৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন, যখন আমরা নবী করীম (সা)-এর পিছনে নামায আদায় করতাম তখন (তাশাহহুদে) আমরা বলতাম السلام على الله (আস্‌সালামু আলাল্লাহ্‌)।

অন্য এক রিওয়ায়েতে এতটুকু অধিক আছে, (বলা হয়েছে) من عباده السلام على جبريل وميكائيل "আল্লাহ্‌র বান্দাদের পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ)-এর উপর সালাম।" তখন হুযূর (সা) আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহ্‌ স্বয়ং সালাম সুতরাং যখন তোমাদের কেউ তাশাহহুদ পাঠ করবে তখন বলবে ঃ التحيات لله والصلوة والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله –

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তিনি তাশাহহুদে বলতেন ঃ السلام على الله السلام على جبريل السلام على رسول الله তখন হুযূর (সা) বলেন, السلام على الله বলো না, বরং বল ঃ التحيات لله والصلوة والطيبات অর্থাৎ সম্পূর্ণ তাশাহহুদ পাঠ কর।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) লোকদেরকে التحيات لله عبده ورسوله..... পর্যন্ত অর্থাৎ তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন।

অন্য এক বর্ণনায় (علمنا) শব্দ রয়েছে অর্থাৎ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, যখন আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে নামায আদায় করতাম এবং শেষ বৈঠকে বসতাম তখন আমরা বলতাম السلام على الله السلام على رسول الله وعلى ملائكته -এর সাথে ফিরিশতাদের নাম উচ্চারণ করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন , এরূপ বল না, বরং বল ঃ التحيات لله والصلوة والطيبات

ব্যাখ্যা ঃ বিশজনের অধিক সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে তাশাহহুদের বাক্যসমূহ বর্ণিত আছে। তাশাহহুদ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)

তাশাহহুদ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর এবং ইমাম মালিক (র) হযরত উমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করছেন। কিন্তু হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণিত তাশাহহুদ কয়েকটি কারণে অধিক গ্রহণযোগ্য। আয়িম্মায়ে হাদীস এর বিশুদ্ধতার উপর একমত। ইমাম তিরমিযী (র) বলেছেন, তাশাহহুদ সম্পর্কে এটা সবচেয়ে সহীহ হাদীস এবং অধিকাংশ আলিম, সাহাবা ও তাবেঈন এর উপর আমল করেছেন। বাযযায (র) বলেছেন, তাশাহহুদ সম্পর্কে আমার নিকট হযরত ইবনে মাসঊদ (রা)-এর হাদীস সর্বাধিক বিশুদ্ধ। ইমাম মুসলিম (র) বলেছেন, তাশাহহুদ সম্পর্কে লোকজন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা)-এর হাদীসের উপর ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। তিরবানী বলেছেন, তাশাহহুদ সম্পর্কে এর চেয়ে উত্তম হাদীস আমি শুনিনি।

এছাড়া কয়েকজন সাহাবা (রা) তাশাহহুদ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসঊদ (রা)-এর সমর্থন করেছেন। যেমন ঃ হযরত আবূ বকর (রা), হযরত মু'আবিয়া (রা) প্রমুখ। অধিকন্তু তাশাহহুদের তা'লীমের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইমাম হাম্মাদ (র) ইমাম আবূ হানীফা-এর (র) হাত ধরে তাশাহহুদের তা'লীম দিয়েছেন। ইমাম হাম্মাদের হাত ধরে ইবরাহীম নখঈ (র) ইবরাহিম নখঈর হাত ধরে হযরত আলকামা (র), হযরত আলকামার হাত ধরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা), হযরত ইবনে মাসঊদ (রা)-এর হাত ধরে নবী করীম (সা) তাশাহহুদের তা'লীম দিয়েছেন। মোট কথা উপরোক্ত দলীল ও প্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাশাহহুদ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসঊদ (রা)-এর হাদীস অধিক গ্রহণযোগ্য।

١٢٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى شِقُّ وَجْهِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ

وَفِىْ رِوَايَةٍ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَ عَنْ شِمَالِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ -

হাদীস নং-১২০

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্' বলে ডান দিকে সালাম ফিরাতেন। ফলে তাঁর পবিত্র গাল দৃষ্টিগোচর হতো। একইভাবে বামদিকেও সালাম ফিরাতেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, (সালাম ফিরানোর সময়) হুযূর (সা) এমনভাবে গর্দান ফিরাতেন যে, এতে তাঁর ডান গালের শুভ্রতা লক্ষ্য করা যেত। বামদিকে সালাম ফিরানোর সময়ও একই অবস্থা হতো।

ব্যাখ্যা ঃ উপরের হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সালাম ফিরানোর সময় গর্দান এমনভাবে ফিরাতে হবে যাতে মুখমণ্ডল দেখা যায়।

١٢١ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ تَسْلِيْمَتَيْنِ –

হাদীস নং-১২১

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ডান ও বামদিকে দু'সালাম ফিরাতেন।

ব্যাখ্যা ঃ নামায শেষে দু'সালামের ব্যাপারে প্রায় ঐকমত্য রয়েছে। শুধু ইমাম মালিক (র) -এর মতপার্থক্য রয়েছে। তিনি এক সালামের পক্ষে মত পোষণ করেন এবং দলীল হিসেবে হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস পেশ করেন كان يسلم فى الصلوة بتسليمة "হুযূর (সা) নামাযে এক সালাম ফিরাতেন।" হানাফীগণ বলেন, নবী করীম (সা)-এর নামাযের সঠিক অবস্থা পুরুষেরা যতটুকু অবগত আছে, মহিলারা ততটুকু নেই এবং পুরুষদের সবগুলো রিওয়ায়েত দু'সালামের পক্ষে রয়েছে।

بَابُ تَخْفِيْفِ الاِمَامِ الصَّلٰوة

ইমামের সংক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করা

١٢٢ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ (رضـ) وَ حُذَيْفَةُ (رضـ) وَ اَبُوْ مُوْسٰى (رضـ) وَغَيْرُهُمْ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِجْتَمَعُوْا فِىْ مَنْزِلٍ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ تَقَدَّمْ يَافُلَانُ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ فَاَبٰى فَقَالَ تَقَدَّمْ اَنْتَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى صَلٰوةً خَفِيْفَةً وَ جِيْزَةً اَتَمَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ الْقَوْمُ لَقَدْ حَفِظَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ –

হাদীস নং-১২২

অনুবাদ ঃ হযরত ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে

মাসঊদ (রা), হযরত হুযায়ফা (রা), হযরত আবূ মূসা (রা) সহ বেশ কয়েকজন সাহাবায়ে কিরাম (রা) কোন এক বাড়িতে একত্রিত হলেন। এ সময় নামাযের জন্য ইকামত বলা হলো। সবাই বাড়ির মালিককে বললেন, জনাব! আপনি (ইমামতির জন্য) সামনে অগ্রসর হোন। কিন্তু তিনি এতে অস্বীকৃতি জানিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা)-কে বলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আপনি (ইমাম হওয়ার জন্য) সামনে অগ্রসর হোন। অবশেষে তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে রুকূ-সিজদার সাথে নামায আদায় করেন। যখন তিনি নামায শেষ করেন, তখন সাথীগণ বললেন, আবূ আবদুর রহমান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামায উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছেন। (অর্থাৎ কিরাআত সংক্ষিপ্ত কিন্তু রুকূ' ও সিজদা পূর্ণাঙ্গ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে কয়েকটি মাসয়ালা রয়েছে। প্রথমত মুকতাদীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে হুযূর (সা) নিজেও সংক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করতেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে এভাবে নামায আদায় করার জন্য নির্দেশ দান করতেন। এরূপভাবে নামায পড়ানোর উপর তিনি অসন্তুষ্ট হতেন যার দ্বারা মুকতাদীগণ বিরক্তিবোধ করে এবং নামাযকে বোঝা মনে করে। যার ফলে লোকজন জামাআতে নামায আদায় করতে পিছু হটে থাকে। ইবনে মাজাহ্ হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে একই বিষয়ের উপর হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হুযূর (সা)-এর দরবারে এসে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজর নামাযের জামাআতে অংশগ্রহণ করতে পারি না। কেননা তিনি নামায দীর্ঘ করে থাকেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হুযূর (সা)-কে ঐ দিনের চেয়ে অধিক কখনো অসন্তুষ্ট হতে দেখিনি। তিনি বলেছেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা লোকদের মনে নামাযের ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি করছ। তোমরা যখন কেউ নামাযে ইমামতি করবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত কর। কেননা মুকতাদীদের মধ্যে কেউ বৃদ্ধ এবং কেউ বিশেষ কাজের লোকও থাকতে পারে। এমনিভাবে আঁ হযরত (সা) একবার দীর্ঘ নামায পড়ানোর কারণে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে হুশিয়ারী প্রদান করেন।

উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, ঘরের মধ্যে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও ছিলেন। কিন্তু ইমামতের জন্য হযরত ইবন মাসঊদ (রা)-কে নির্বাচন করা হয়। কেননা ইমামতের জন্য ইলমে ফিকহ্ জানতে হবে। উপস্থিত সকলের মধ্যে হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) ইলমে ফিকহ্ সম্পর্কে সবচেয়ে বিজ্ঞ ছিলেন বলে তাঁকে ইমামতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অধিকন্তু চার খলীফার পরে তাঁকেই ইলমে ফিকহ্ সম্পর্কে সবচেয়ে বিজ্ঞ বলা হয় থাকে। এই ঘটনার দ্বারা এটাও প্রতীয়মান হয় যে, মুকতাদীদের অবস্থা বিবেচনা করে নামায সংক্ষিপ্ত করা হলেও নামাযের অন্যান্য আরকান অত্যন্ত ধীরে ও বিনয়ের সাথে আদায় করতে হবে। তাই বর্ণিত হাদীসে فصلى صلوة خفيفة এর সাথে اتم الركوع والسجود বলা হয়েছে।

بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى الْحَصِيْرِ

চাটাই-এর উপর নামায পড়ার বর্ণনা

١٢٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ (رض) عَنْ اَبِىْ

سَعِيْدٍ (رضـ) اَنَّه دَخَلَ عَلى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَوَجَدَه يُصَلِّى عَلى حَصِيْرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ –

হাদীস নং-১২৩

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বণিত আছে, একবার তিনি হুযূর (সা)-এর খিদমতে আগমণ করেন এবং তাঁকে চাটাই- এর উপর নামায আদায় করতে ও সিজদা করতে দেখেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, মাটির উপর কার্পেট ও বিছানা ইত্যাদি বিছিয়ে নামায পড়া জায়েয! জমহুর অর্থাৎ অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এর উপর মত পোষণ করেছেন। এটা মাটির উপর গজিয়ে উঠা কোন বস্তুদ্বারা তৈরি হোক অথবা অন্য কিছু থেকে হোক। তবে কেউ কেউ এখানে সামান্য মতপার্থক্য করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মাটির উপর নামায পড়াতে অধিক ফযীলত। এতে নামাযে একাগ্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়ে থাকে। মাটি বা জমির উপর যতটুকু বিনয় সৃষ্টি হয়,অন্য কিছুতে তা হয় না। তিরমিযী باب ما جاء فى الا ان قوما الصلوة على الحصير অধ্যায়ে লিখেছেন, উলামায়ে কিরামের মত এটাই من اهل العلم اختاروا الصلوة على الارض استحبابا অর্থাৎ "কোন কোন আলিম জমির উপর নামায পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন।" আল্লামী নববী এ প্রসঙ্গে কাযী আয়াযের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন, যদি জায়নামায মাটির তৈরি না হয়, তা হলে জমির উপর নামায পড়া উত্তম لان الصلوة سرها التواضع "কেননা জমির মধ্যে বিনয় রয়েছে।"

بَابَ صَلٰوةِ الْمَرِيْضِ
অসুস্থ ও রোগীর নামায

١٢٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلّٰى قَاعِدًا وَ قَائِمًا وَ مُحْتَبِئًا –

হাদীস নং-১২৪

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসে, দাঁড়িয়ে এবং হাঁটু গেড়ে বসে নামায পড়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ ওযরের কারণে ফরয অথবা নফল, যে কোন নামায উপরোক্ত নিয়মে পড়া জায়েয।

١٢٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ الْحَسَنِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلّٰى مُحْتَبِئًا مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِعَيْنِه –

হাদীস নং-১২৫

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) চোখ ব্যথার কারণে হাঁটু গেড়ে বসে নামায আদায় করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে ওযরের আরো একটি প্রকার বর্ণিত হয়েছে।

١٢٦ - مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ قَاضِى الدَّامِغَانِ قَالَ كَتَبْتُ اِلٰى اَبِى حَنِيْفَةَ فِى الْمَرِيْضِ اِذَا ذَهَبَ عَقْلُه كَيْفَ يَعْمَلُ بِه فِىْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَكَتَبَ اِلَىَّ يُخْبِرُنِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِىْ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَمَعَه اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ قَدْ اُغْمِىَ عَلَىَّ فِىْ مَرَضِىْ وَ جَائَتِ الصَّلٰوةُ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَصَبَّ عَلَىَّ مِنْ وُضُوْئِه فَاَفَقْتُ فَقَالَ كَيْفَ اَنْتَ يَا جَابِرُ ثُمَّ قَالَ صَلِّ مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَوْ اَنْ تُؤْمِئَ -

হাদীস নং-১২৬

অনুবাদ ঃ দামেগানের কাযী মুহাম্মদ ইবনে বুকাইর (র) বলেন, আমি হযরত আবূ হানীফা (র) -এর নিকট এই বিষয় পত্র লিখি যে, যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখন সে নামাযের সময় কি করবে? তখন তিনি আমার নিকট একটি পত্র লিখেন এবং মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকে একটি হাদীস রিওয়ায়েত করেন যে, হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি (একবার) অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং নবী করীম (সা) হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-কে সাথে নিয়ে আমার রোগের অবস্থা দেখার জন্য আগমণ করেন। এ সময় রোগের কারণে আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। তখন নামাযের সময় হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন উযূ করেন এবং উযূর পানি আমার উপর ছিটিয়ে দেন। অতঃপর আমার জ্ঞান ফিরে আসে এবং তিনি আমাকে বলেন ঃ জাবির ! তোমার অবস্থা কেমন ? এরপর তিনি বলেলন ঃ ইশারা করে হলেও নামায আদায় কর, যতক্ষণ শক্তি থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রুগ্ন ব্যক্তি কোন অবস্থায়ই যেন নামায পরিত্যাগ না করে। দাঁড়িয়ে হোক, বসে হোক, চিৎ হয়ে হোক অথবা মাথার ইশারায় হোক, নামায আদায় করবে। এ সম্পর্কে হযরত জাবির (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে মরফূ' মওকূফ হাদীস বর্ণিত আছে যে, সামান্যতম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যেন কেউ নামায পরিত্যাগ না করে।

١٢٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ

اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ (رضـ) قَالَتْ لَمَّا اُغْمِىَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيْلَ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ حَصِرٌ وَ هُوَ بِنَفْسِهِ يَكْرَهُ اَنْ يَّقُوْمَ مَقَامَكَ قَالَ افْعَلُوْا مَا اٰمُرُكُمْ بِهِ –

হাদীস নং-১২৭

অনুবাদ ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন (রোগের কারণে) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেতনা ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়, তখন তিনি আমাকে বলেন ঃ আবূ বকর (রা)-কে বল, তিনি যেন জামাআতে লোকদেরকে নামায পড়ান। হযরত আয়েশা (রা) আরয করলেন, হযরত আবূ বকর (রা) একজন নরম মেজাজের লোক (এ অবস্থায় কিরাআত পাঠ করতেও কষ্ট হবে) এবং তিনি নিজেও এর থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছা করেন যে, তিনি আপনার স্থানে দাঁড়াবেন। হুযূর (সা) বলেন ঃ আমি তোমাকে যা বলেছি, তা কর।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা)-এর মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। কেননা দীনের সমস্ত কাজে তাঁর আবদান শীর্ষস্থানীয়। তাই হুযূর (সা)-এর নির্দেশে তিনি ইমামতের (امامت صغرى) জন্য মনোনীত হন। কেননা ইমামতের জন্য ইলমে ফিকহ্র জ্ঞান ও তাকওয়ায় শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিকেই মনোনীত করা হয়। নামায যেহেতু দীনের ভিত্তি, তাই শুধু ইমামতের দায়িত্বই তাঁকে দেওয়া হয়নি; বরং সম্পূর্ণ দীন ও মাযহাবের নেতৃত্বও তিনি লাভ করেন। এই হাদীস শীআ ও রাফিযীদের আকীদার উপর একটি চরম আঘাত। কেননা তারা হযরত আবূ বকর (রা)-এর মর্যাদা ও ফযীলতের প্রতি কটাক্ষ করে থাকে। অথচ তাদের উক্তি ও সন্দেহ সম্পূর্ণ অর্থহীন। স্বয়ং হযরত আলী (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে নির্বাচন করার সময় তাঁর মর্যাদা ও ফযীলতের কথা স্বীকার করে বর্ণনা করেন ঃ كيف لانوثره علينا فى امر دينا فاوقد اثره النبى صلى اللّٰه عليه وسلم علينا فى امر ديننا "দুনিয়ার কাজে আমরা কেন তাঁকে খলীফা মানব না, অথচ নবী করীম (সা) দীনি কাজে তাঁকে আমাদের নেতৃত্বের জন্য মনোনীত করেছেন।" উপরোক্ত রিওয়ায়েতের দৃষ্টিকোণ থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআত চার খলীফার ক্রমধারাকে ন্যায়সংগত মনে করেন।

١٢٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ (رضـ) قَالَتْ لَمَّا اُغْمِىَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ حَصِرٌ وَ هُوَ يَكْرَهُ اَنْ يَّقُوْمَ

مَقَامَكَ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ يَا صَوَاحِبَاتُ يُوْسُفَ وَ كَرَّرَ -

হাদীস নং-১২৮

অনুবাদ ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর (রোগের তীব্রতার কারণে) সংজ্ঞাহীনতার উপক্রম হয়, তখন তিনি বলেন ঃ আবূ বকর-কে বল, তিনি যেন ইমাম হয়ে লোকদেরকে নামায পড়ান। তখন তাঁর নিকট আরয করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা) ! হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত দুর্বল চিত্তের লোক। তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়াকে অপসন্দ করেন। তখন হুযূর (সা) বলেন ঃ হে ইউসুফের সঙ্গিণীগণ! হযরত আবূ বকর (রা)-কে বল, তিনি যেন নামায পড়ান। (এটা তিনি কয়েকবার বলেন)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ বকর (রা)-এর ফযীলত সম্পর্কে পূর্ববর্তী হাদীসের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর চেয়ে অধিক জানার প্রয়োজন হলে বুখারী শরীফ দেখা যেতে পারে। বুখারী শরীফে এই হাদীস বিস্তারিতভাবে কয়েকটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

١٢٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا مَرِضَ الْمَرْضَ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ خَفَّ مِنَ الوَجْعِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ لِعَائِشَةَ مُرِىْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَارْسَلْتُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْ مُرُكَ اَنْ تُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا اَنِّى شَيْخٌ كَبِيْرٌ رَقِيْقٌ وَ اِنِّى مَتٰى لَا اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِىْ مَقَامِهِ اَرِقُّ لِذٰلِكَ فَاجْتَمِعِى اَنْتِ وَ حَفْصَةُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيُرْسِلُ اِلٰى عُمَرَ فَيُصَلِّىَ بِهِمْ فَفَعَلَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرِىْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَلَمَّا نُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ سَمِعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمُؤْذِنَ وَ هُوَ يَقُوْلُ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِرْفَعُوْنِىْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ اَمَرْتُ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُّصَلِّىَ

بِالنَّاسِ وَ اَنْتَ فِىْ عُذْرٍ قَالَ ارْفَعُوْنِىْ فَاِنَّه جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَرَفَعْتُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَقَدْ مَاهُ تَخُطَنِ الاَرْضَ فَلَمَّا سَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ لِحِسِّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَاَخَّرَ فَاَوْمَأَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَجَلَسَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ يَسَارِ اَبِىْ بَكْرٍ وَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِذَائَهُ يُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرُ اَبُوْ بَكْرٍ بِتَكْبِيْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ يُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيْرِ اَبِىْ بَكْرٍ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ غَيْرَ تِلْكَ الصَّلٰوةِ حَتّٰى قُبِضَ وَ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ الاِمَامُ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَجِعٌ حَتّٰى قُبِضَ -

হাদীস নং-১২৯

অনুবাদ ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) যখন ঐ রোগে আক্রান্ত হন, যাতে তিনি ইন্তিকাল করেন, রোগের ব্যথা ও তীব্রতার কারণে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। যখন নামাযের সময় হয়ে এল, তখন তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেন ঃ আবূ বকরকে বল, তিনি যেন লোকদেরকে নামায পড়ান। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদেরকে নামায পড়ানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবূ বকর (রা) হযরত আয়েশাকে এই বলে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল চিত্তের লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর জায়গায় দেখতে না পেলে আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না। সুতরাং তুমি এবং হাফসা উভয়ে মিলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বল, তিনি যেন লোক পাঠিয়ে হযরত উমর (রা)-কে নামায পড়ানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি সে ব্যবস্থা করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা হলে ইউসুফের সঙ্গিণীদের মত। আবূ বকরকে বল তিনি যেন নামায পড়ান। অতঃপর নামাযের জন্য যখন আযান দেওয়া হয় এবং নবী করীম (সা) মুয়াযযিনের কণ্ঠে حى على الصلٰوة -এর আওয়ায শুনতে পেলেন, তখন তিনি বলেন ঃ আমাকে উঠাও। হযরত আয়েশা (রা) আরয করেন, আমি হযরত আবূ বকর (রা)-কে নামায পড়ানোর জন্য বলে দিয়েছি, আপনি অসুস্থ (এরপর আপনি কেন কষ্ট করবেন)। হুযূর (সা) বলেন ঃ আমাকে উঠাও, আমার চোখের শান্তি হলো নামায। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এরপর আমি তাঁকে উঠালাম এবং দু'জন মানুষের উপর ভর করে তিনি এভাবে চললেন যে, তাঁর উভয় পা জমির উপর হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল। যখন হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র পা-এর আওয়ায পেলেন তখন পিছনে আসতে চাইলেন। কিন্তু হুযূর (সা) ইশারায় তাঁকে পিছনে আসতে নিষেধ

করেন। অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর বামদিকে এসে বসে পড়েন (যাতে তিনি ইমামতি করতে পারেন)। নবী (সা) তাঁর বরাবর তাকবীর বলতেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) নবী (সা)-এর তকবীরের অনুসরণ করতেন। লোকজন হযরত আবূ বকর (রা)-এর তকবীরের অনুসরণ করতেন, এভাবেই নামায সমাপ্ত করা হয়। অতঃপর ইনতিকাল পর্যন্ত এই নামায ব্যতীত নবী (সা) অন্য কোন নামায পড়ান নি। এরপর থেকে হযরত আবূ বকর (রা) নামাযে ইমামতি করতে থাকেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইন্তিকাল করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসও পূর্ববর্তী হাদীসের মত। তবে এতে ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

بَابُ اِمَامَةِ وَلَدِالزِّنَا وَالْعَبْدِ وَالْاَعْرَابِ

জারজ সন্তান, ক্রীতদাস ও গ্রাম্য লোকের নামাযে ইমাম হওয়া

١٣٠ - حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَلَدُ الزِّنَا وَالْعَبْدُ وَالْاَعْرَابِىُّ اِذَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ -

হাদীস নং-১৩০

অনুবাদ ঃ ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, জারজ সন্তান, ক্রীতদাস (গোলাম) এবং গ্রাম্য লোক যদি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে, তা হলে সে নামাযে লোকদের ইমামতি করতে পারবে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত না জানলে জারজ সন্তান, ক্রীতদাস ও গ্রাম্য লোকের ইমামত জায়েয নয়। ইমামতের জন্য বিশেষভাবে ইলম, ফযীলত, তাকওয়া ও বুযর্গী অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু এগুলো অধিকাংশই তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাই তাদের ইমামত মাকরূহ থেকে মুক্ত নয়। জারজ সন্তানের নীচু বংশ এবং সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে অধম হওয়ার কারণে অধিকাংশ সময় নম্রতা ও ভদ্রতা অর্জন করতে পারে না। তারা শিক্ষার আলো এবং তাকওয়া থেকে দূরে থাকে। যদি সে শিক্ষার আলো ও জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হয়, তা হলে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সে নিঃসংকোচে ইমামতের দায়িত্ব পালন করতে পারবে। শিক্ষার আলো ও জ্ঞানার্জন তার বংশগত দুর্বলতা দূরীকরণের জন্য যথেষ্ট। কেননা পবিত্র কুরআনের আয়াত وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى -এর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকেই নিজের কৃত পাপের জন্য দায়ী হয়ে থাকে। অন্যের পাপের বোঝা তার কাঁধে চাপানো যায় না। অথবা যেমন ক্রীতদাস। এই দাসত্ব বৃত্তির জন্য সে শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত থাকে। এমনিভাবে তাকওয়া অর্জন থেকেও দূরে থাকে। যদি সে শিক্ষা লাভ ও

তাকওয়া অর্জন করতে পারে, তাহলে তার এই গোলামী ও দাসত্ব ইমামতের জন্য বাধা নয়। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হলো জাহালত বা মূর্খতা এবং সবচেয়ে সৌভাগ্য হলো ইল্‌ম ও তাকওয়া অর্জন করা। সাধারণত গ্রাম্য লোক ইল্‌ম ও তাকওয়া অর্জন থেকে বঞ্চিত থাকে। যদি সে ইলম ও তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হয়, তা হলে যে কোন অবস্থায় তার ইমামত জায়েয হবে।

بَابُ الاِثْنَيْنِ جَمَاعَةٌ

দু'জনের জামাআত

١٣١ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَّى بِرَجُلٍ فَصَلَّى خَلْفَهُ وَ اِمْرَاَةٍ خَلْفَ ذٰلِكَ صَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً –

হাদীস নং-১৩১

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তির পিছনে এক মহিলাকে নিয়ে জামাআতে নামায আদায় করেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসে এটা বর্ণনা করা হয়নি যে, এই পুরুষ ও মহিলা কে ছিলেন। সম্ভবত হযরত আনাস (রা) এবং তাঁর মা হযরত উম্মে সুলায়ম (রা) সম্পর্কে এই ঘটনা হতে পারে। হুযূর (সা)-এর পিছনে হযরত আনাস (রা) এবং তাঁর পিছনে হযরত উম্মে সুলায়ম ছিলেন। অথবা এই ঘটনা হযরত আলী (রা) এবং হযরত খাদীজা (রা) সম্পর্কে হতে পারে। হুযূর (সা)-এর পিছনে হযরত আলী (রা) একা ছিলেন এবং তাঁর পিছনে হযরত খাদীজা (রা) একা ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) এরদ্বারা দলীল পেশ করেন যে, নামাযে পুরুষ ও মহিলা বরাবর দাঁড়ালে পুরুষের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি এই আশংকা না হতো, তা হলে মহিলাদেরকে পুরুষদের সাথে দাঁড়াবার অনুমতি দেওয়া হতো। কেননা কাতারে একা দাঁড়ানোও ঠিক নয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মাকরূহ এবং ইমাম আহমদ (র)-এর মতে ফাসেদ। কিন্তু যখন দু'টি মন্দ একত্র হয়, তখন সাধারণত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দকে গ্রহণ করা হয়। এখানে পুরুষ ও মহিলা বরাবর দাঁড়ানোর মন্দ থেকে অপেক্ষাকৃত কম দূষণীয় হলো একা দাঁড়ানো। তাই এটা গ্রহণ করা হয়েছে ।

بَابُ فَضِيْلَةِ وَصْلِ الصُّفُوْفِ

কাতার মিলানোর ফযীলতের বর্ণনা

١٣٢ – اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِى

(رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتَه يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ الصُّفُوْف –

হাদীস নং-১৩২

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এবং ফিরিশতাগণ ঐ সমস্ত লোকের উপর দরূদ পাঠ করেন যারা (নামাযে) কাতার বরাবর রাখে [(কাতারের) মাঝে ফাঁক ও খোলা না রাখে]।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম ইবনে মাজাহ হযরত আয়েশা (রা) থেকে এই হাদীস মরফূ' রিওয়ায়েত করেছেন। এতে শুধু এতটুকু বেশি আছে من صد فرجة رفعه الله بها درجة "যে ব্যক্তি ফাঁকা জায়গা পূরণ করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।" আহমদ, ইবনে হাব্বান, হাকিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এই রিওয়ায়েত করেছেন। মোট কথা কাতার মিলানোর ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে জোর তাকীদ ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অবহেলা করার জন্য কঠোর শাস্তির করা বর্ণিত আছে। হাকিম হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কাতার কাটবে (ফাঁক রাখবে), আল্লাহ্ তাকে কাটবেন (শাস্তি প্রদান করবেন)। কাতার মিলানোর অর্থ হলো এই যে, দু'জনের মধ্যে কোন ফাঁক রাখবে না, বরং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। খলীফা চতুষ্টয় তাঁদের খিলাফত আমলে এর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করতেন। হযরত আলী (রা) এবং হযরত উসমান (রা) স্বয়ং এর তত্ত্বাবধান করতেন। হযরত আলী (রা) মুকতাদীদের কাউকে বলতেন, তুমি সামনে যাও এবং কাউকে বলতেন তুমি পিছনে যাও।

بَابُ مَنْ شَهِدَ الْفَجْرَ وَالْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ

যে ব্যক্তি ফজর ও ইশার জামাআতে অংশগ্রহণ করে

١٣٣ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْفَجْرَ وَالْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَتْ لَه بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ وَ بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ –

হাদীস নং-১৩৩

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজর ও ইশার জামাআতে উপস্থিত হয়, তার জন্য দু'টি মুক্তি (সুসংবাদ) রয়েছে। একটি হলো নিফাক থেকে আর অপরটি হলো শিরক থেকে।

ব্যাখ্যা ঃ নিফাক ও শিরক থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তার জন্য এই দু'নামাযকে এই জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, এই নামাযের সময় মানুষের উপর নিদ্রা ও অলসতা প্রবল থাকে। স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষকে জামাআতে অংশগ্রহণ করা থেকে ফিরিয়ে রাখে। সুতরাং যার ঈমান শক্তিশালী, যিনি নিফাক ও শিরক থেকে মুক্ত, জামাআতে অংশগ্রহণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে তিনি এই নামাযের জন্য উৎসাহ ও তাকওয়া প্রদর্শন করেন। এমতাবস্থায় তিনি অন্য নামায কিভাবে পরিত্যাগ করবেন ? পক্ষন্তরে যার অন্তর নিফাক ও শিরক দ্বারা পরিপূর্ণ, সে বিশেষভাবে এই দু'টি নামায থেকে বিরত থাকবে। নিদ্রা ও অলসতা তাকে জড়িয়ে ফেলবে। যখন সে এরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করবে এবং নিফাক ও রিয়ার প্রমাণ করবে, এরূপ অবস্থায় তার জন্য মুক্তি কিভাবে লিখা হবে ?

١٣٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَامَ اَرْبَعِيْنَ يَومًا عَلَى الصَّلٰوةِ الغَدْوَةِ وَالعِشَاءِ فِى جَمَاعَةٍ كُتِبَ لَه بَرَائَة مِّنَ النِّفَاقِ وَ بَرَائَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ *

হাদীস নং-১৩৪

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রিওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত ফজর ও ইশা জামাআতের সাথে আদায় করবে, তার জন্য নিফাক ও শিরক থেকে মুক্তি লিখা হবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বারায়াত (برائة) লিখার জন্য চল্লিশ দিন এই জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যে, যাতে চল্লিশ দিন একাধারে জামাআতে অংশগ্রহণ করে। কেননা এতদিন একটি কাজ একাধারে করা হলে মানুষ ঐ কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তার সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করা যায় যে, সে এই অভ্যাস কখনো পরিত্যাগ করবে না।

١٣٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الشَّعْبِىْ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِى الخُرُوْجِ لِصَلٰوةِ الْغَدَاةِ وَالْعِشَاءِ لِلنِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ اِذًا يَتَّخِذُوْنَه دَغَلاً فَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ اُخْبِرُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَقُوْلُ هٰذَا.

হাদীস নং-১৩৫

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) মহিলাদেরকে

ফজর ও ইশার জামাআতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। এক ব্যক্তি (এটা শুনে) বললেন, [অন্য রিওয়ায়েতে জানা যায় যে, এই ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) -এর পুত্র হযরত বিলাল (রা) ছিলেন] লোকজন এই সুযোগকে এখন প্রতারণার কাজে লাগাবে। তখন হযরত ইবনে উমর (রা) (ক্রোধান্বিত হয়ে) বলেন ঃ আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করছি, অথচ তুমি এরূপ বলছ !

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত বিষয়টি অন্যান্য হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। কোথাও কোথাও বাক্য কম ও বেশি রয়েছে। মুসলিম শরীফে স্বয়ং হযরত বিলাল (রা) স্বীয় পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে উমর (র) রিওয়ায়েত করেন, হুযূর (সা) বলেছেন ঃ মহিলাদেরকে নিষেধ করো না, তারাও যেন মসজিদে হাযির হয়ে বরকত হাসিল করতে পারে । হযরত বিলাল (রা) বলেন আল্লাহর শপথ! আমি নিষেধ করব। হযরত ইবনে উমর (রা) তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে বলছি, হুযূর (সা) এরূপ বলেছেন, অথচ তুমি এরূপ বলছ যে, আল্লাহ্র শপথ! আমি নিষেধ করব! ইমাম আহমদ মুজাহিদের সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে আরো কিছু অতিরিক্ত রয়েছে যে, এরপর হযরত ইবনে উমর (রা) তাঁর পুত্রকে অভিনন্দন বা ধন্যবাদ জানান নি; বরং তিনি এতে মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন এবং এটা অপসন্দ করেছেন যে, কেউ পবিত্র হাদীসের বিরুদ্ধে স্বীয় বিবেক, জ্ঞান এবং মতামত পেশ করে কোন ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

এখানে মাসয়ালা হলো এই যে, উলামায়ে কিরাম এই অনুমতি বৃদ্ধা ও প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন কিন্তু তারাও যেন এখানে আসার জন্য সাজসজ্জা না করে। সুগন্ধি ব্যবহারও এ সময় তাদের জন্য মাকরূহ মনে করেছেন। কেননা বর্তমান যুগে অশ্লীলতা, অনাচার ও ব্যভিচার চতুর্দিকে এমনিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা অনেকেই এর কুফল থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। সম্ভবত হযরত বিলাল (রা) তৎকালীন সমাজের বিদ্যমান অবস্থা লক্ষ্য করে অথবা ভবিষ্যতে সামাজিক অবক্ষয়ের আশংকা করে স্বীয় মতামত পেশ করেছেন। কিন্তু এই মতামত মহানবী (সা)-এর পবিত্র বাণীর বিরোধিতা হয়ে যায়, তাই হযরত ইবনে উমর (রা) ক্রোধান্বিত হয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আঁ হযরত (সা)-এর যুগেও মহিলাগণ বিভিন্ন মাসয়ালা অবগত হওয়ার জন্য মসজিদে আগমণ করতেন। কিন্তু বর্তমানে অনেক নরনারীর মধ্যে দীনি মাসয়ালা জানার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই। এছাড়া বর্তমান যুগে নৈতিক অবক্ষয়ের চরম বিপর্যয়ের কারণে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়াও বিপদজ্জনক।

بَابُ اِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَالْعَشَاءُ

ইশার নামায শুরু হওয়ার সময় খাবার এলে কি করতে হবে

١٣٦- اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا نُوْدِىَ بِالْعِشَاءِ وَ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ -

হাদীস নং -১৩৬

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন ইশার নামাযের আযান দেওয়ার হয় এবং মুয়ায্যিন তকবীর বলে (এ সময় খাবার উপস্থিত হয়), তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নিবে।

ব্যাখ্যা ঃ তিবরানীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, উপরোক্ত নির্দেশ মাগরিব নামাযের জন্য এবং এটা রোযাদারদের কিছুটা আরামের জন্য দেওয়া হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে মরফূ' হাদীস বর্ণিত আছে যে, যখন খাবার সামনে আসবে, অপরদিকে নামাযের ইকামত শুরু হবে, এ সময় প্রথমে খাবার খেয়ে নিবে এবং এতে তাড়াহুড়া করবে না। স্বয়ং হযরত ইবনে উমর (রা)- এর অভ্যাস ছিল এই যে, যখন খাবার তাঁর সামনে হাযির করা হতো, এদিকে নামাযের জামাআতও দাঁড়িয়ে যেত, এই মুহূর্তে তিনি প্রথমে খাবার খেয়ে নিতেন। এমনকি এ সময় তিনি ইমামের কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন। এখানে হযরত জাবির (রা) থেকে এক মরফূ' হাদীস বর্ণিত আছে, যা উপরোক্ত হাদীসের বিরোধী। তা হলো لا توخروا الصلوة و لا بغيره "খাবার বা অন্য কোন কারণে নামায বিলম্ব কর না।" উভয় হাদীসের মধ্যে এইভাবে সমন্বয় করা হয়েছে যে, (১) নামায বিলম্ব করার অনুমতি ঐ সময় দেওয়া হয়েছে যখন খাবার খাওয়া শুরু করা হয়েছে ; (২) অথবা যদি এই আশংকা থাকে যে, এই খাবার পরে পাওয়া যাবে না; (৩) অথবা যদি প্রচন্ড ক্ষুধা পেয়ে থাকে, যার ফলে নামায শুরু করা হলে মন খাবারের দিকে পড়ে থাকবে। যেমন পায়খানা-প্রস্রাবের চাপ যদি অধিক হয়, তা হলে নামায বিলম্ব করার অনুমতি রয়েছে। পক্ষান্তরে নামায বিলম্ব না করার বিষয়টি একটি বিশেষ সময়ের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। যদি নামাযের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা যদি এখনো খাবার সামনে না এসে থাকে; বরং খাবার কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে, এ সমস্ত অবস্থায় প্রথমে নামায আদায় করতে হবে। অবশ্য এ সময় খাবার সামনে না আনা উচিত। তবে এটা নয় যে, খাবার আসার পর যেতে পারবে না,বরং দস্তরখান থেকে উঠে আসবে এবং নামাযে সর্বক্ষণ এই ভাবতে থাকবে যে, কখন নামায থেকে অবসর হব এবং কখন খাবার খাব। ফলে নামাযে বিনয় ও একাগ্রতা বিনষ্ট হবে।

بَابُ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ

যদি কেউ একা নামায আদায় করে অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে এবং এ সময়ে নামাযের জামাআত শুরু হলে তখন কি করতে হবে

١٣٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ جَابِرِ بْنِ الاَسْوَدِ اَو الاَسْوَدِ بْنِ

جَابِرٍ عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) اَنْ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا الظُّهْرَ فِىْ بُيُوْتِهِمَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُمَا يَرَيَانِ اَنَّ النَّاسِ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ اَتَيَا الْمَسْجِدَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ فَقَعَدَا نَاحِيَةً مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُمَا يَرَيَانِ اَنَّ الصَّلٰوةَ لاَ تَحِلُّ لَهُمَا فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَرَاَهُمَا اَرْسَلَ اِلَيْهِمَا فَجِيْئَ بِهِمَا وَفَرَائِصُهُمَا تَوْقَعِدُ مَخَافَةَ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ حَدَثَ فِىْ اَمْرِهِمَا شَئٌ - فَسَأَلَ هُمَا فَاَخْبَرَاهُ الخَبْرَ فَقَالَ اِذَا فَعَلْتُمَا ذٰلِكَ فَصَلِيَّا مَعَ النَّاسِ وَاَجْعَلاَ الاَوْلٰى هِىَ الفَرْضِ -

وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ جَمَاعَةٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ فَقَالُوْا عَنِ الهَيْثَمَ يَرْفَعُه اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ *

হাদীস নং-১৩৭

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইবনে আসওয়াদ (রা) অথবা হযরত আসওয়াদ ইবনে জাবির (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা)-এর যুগে দু' ব্যক্তি যোহরের নামায ঘরে আদায় করেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, হয়ত লোকজন জামাআতের সাথে নামায শেষ করেছেন। অতঃপর মসজিদে এসে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযে মগ্ন রয়েছেন। তখন তাঁরা এই ভেবে মসজিদের এক কোণায় গিয়ে বসে পড়লেন যে, (একবার ফরয আদায়ের পর) এবার জামাআতে অংশগ্রহণ করা তাদের জন্য জায়েয নয়। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায থেকে অবসর হলেন এবং তিনি তাদেরকে (এক কোণায় পৃথকভাবে) বসে থাকতে দেখলেন, তখন লোক পাঠিয়ে তাদেরকে ডেকে আনালেন। অতঃপর তাদেরকে এমন অবস্থায় সেখানে উপস্থিত করা হলো যে, তাঁদের কাঁধের গোশ্ত এই ভয়ে কাঁপছিল যে, (হয়ত) তাদের সম্পর্কে কোন শাস্তির নির্দেশ জারী হয়েছে। হুযূর (সা) তাঁদেরকে জামাআতে অংশগ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা তখন নবী করীম (সা)-কে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমরা যখন এরূপ করবে (ঘরে নামায পড়ে আসবে) তখন লোকদের সাথে জামাআতে অংশগ্রহণ করবে এবং প্রথম নামাযকে ফরয মনে কর।

একদল এই হাদীসকে হযরত আবূ হানীফা (র) থেকে, তিনি হযরত হায়সাম (র) থেকে এবং তিনি এই হাদীস মরফূ' বর্ণনা করেছেন [অর্থাৎ এই হাদীস মুরসাল (مرسل) এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এই হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য]।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা ফিকহর এই মাসয়ালা জানা যায় যে, যদি কেউ ঘরে নামায আদায় করার পর মসজিদে লোকদেরকে জামাআতে নামায আদায় করতে প্রত্যক্ষ করেন, তবে তিনি যেন জামাআতে অংশগ্রহণ করেন, পৃথকভাবে বসে না থাকেন । তার একা আদায়কৃত নামায ফরয হিসেবে গণ্য হবে এবং জামাআতের সাথে আদায় করা নামায নফল হবে। যেমন তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসাঈসহ অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে انما ذلكم نافلة কিন্তু হানাফী মাযহাবে ফজর, মাগরিব ও আসর এই নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়। কেননা সহীহ হাদীস অনুযায়ী ফজর, মাগরিব ও আসরের পর নফল নামায জায়েয নয়। এছাড়া দারে কুতনী সহীহ সনদের মাধ্যমে হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ اذا صليت فى اهلك ثم ادركت الصلوة فصلها الا الفجر والمغرب "যখন তুমি পরিবারবর্গের মধ্যে নামায আদায় করবে, এরপর জামাআতে নামায পাবে, তখন ঐ নামাযে অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু ফজর ও মাগরিব ব্যতীত।" এ ব্যাপারে হাদীসের মধ্যে ব্যতিক্রম নির্দেশ রয়েছে। মাগরিব নামাযে যদিও নফল নামায জায়েয, কিন্তু তিন রাকাআত নফলের প্রমাণ নেই। সুতরাং এ তিন ওয়াক্ত নামায এই নির্দেশের আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে।

باب الغسل يوم الجمعة

জুমুআর দিন গোসল করা

١٣٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانُوْا يَرُوْحُوْنَ اِلَى الْجُمْعَةِ وَ قَدْ عَرِقُوْا وَ تَلَطَّخُوْا بِالطِّيْنِ فَقِيْلَ لَهُمْ مَنْ رَاحَ اِلَى الْجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

وَفِىْ رِوَايَةٍ كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ اَرْضِهِمْ وَكَانُوْا يَرُوْحُوْنَ يُخَالِطُوْنَ الْعَرَقَ وَالتُّرَابَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا حَضَرْتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوا -

হাদীস নং-১৩৮

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ লোকজন জুমুআর নামাযে অংশগ্রহণের জন্য এই অবস্থায় আগমণ করতেন যে, তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হতো এবং শরীরে ধূলিমাখা থাকত। অতঃপর তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, যারা জুমুআর নামাযে অংশগ্রহণের জন্য আগমণ করবে, তারা যেন (নামাযের পূর্বে) গোসল করে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে যে, লোকজন কৃষিকাজ করত। যখন জুমুআর নামাযের জন্য

ওয়াজিব নয়; বরং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য জুমুআর দিনে গোসলের জোর তাকিদ করা হয়েছে। অতঃপর এই গোসলের মধ্যে ওয়াজিব নয় এমন বিষয়, যেমন মিসওয়াক করা ও সুগন্ধি ব্যবহারের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু এ দু'টি ওয়াজিব নয়। সুতরাং গোসল কিভাবে ওয়াজিব হবে ?

١٣٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالْمَنْصُوْرُ وَ مُحَمَّدَ بْنُ بِشْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنُ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ -

হাদীস নং-১৩৯

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জুমুআর দিনে ঐ ব্যক্তির উপর গোসল করা একান্ত কর্তব্য যারা জুমুআর নামায আদায়ের জন্য আগমণ করবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসেও গোসল ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। কিন্তু এখানে এর ব্যাখ্যা এই করতে হবে যে, জুমুআর নামাযে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য গোসল করার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস দ্বারা রহিত (منسوخ) করা হয়েছে। এখন শুধু তাকিদ বাকী রয়েছে।

بَابُ فِى الْخُطْبَةِ

খুতবার বর্ণনা

١٤٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا صَعَدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جَلَسَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ جَلْسَةً خَفِيْفَةً -

হাদীস নং-১৪০

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা), জুমুআর দিন যখন মিম্বরের উপর আরোহণ করতেন, তখন খুতবার পূর্বে অল্প কিছুক্ষণ বসতেন।

ব্যাখ্যা ঃ আবূ দাউদ শরীফের হাদীসে حتى يفرغ المؤذن অতিরিক্ত বাক্য রয়েছে অর্থাৎ মুয়ায্যিন আযান শেষ না করা পর্যন্ত হুযূর (সা) মিম্বরের উপর বসে থাকতেন। এই মাসয়ালায় ইমাম আবূ হানীফা (রা), ইমাম মালিক (র) এবং শাফিঈ (র) ঐকমত্য পোষণ করেছেন। জমহুর (جمهور) উলামার মাযহাবও এটা। তবে ইমাম নববী বলেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রা)

গমন করত, তখন ঘাম ও ধূলিবালিতে জর্জরিত থাকত। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন তোমরা জুমুআর নামাযের জন্য আগমণ করবে, তখন এর পূর্বে গোসল করে নেবে।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীস জুমুআর দিন গোসল করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। জমহুর (جمهور) উলামা এবং অধিকাংশ আয়িম্মার মতে জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত। কারো কারো মতে জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব। কাযী আয়ায এটা ইমাম মালিক (র)-এর মাযহাব বলে উল্লেখ করেছেন। ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে মতামত প্রদানকারী দল বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস পেশ করেনঃ اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ জুমুআর নামায আদায়ের জন্য আগমণ করবে, তবে সে যেন পূর্বে গোসল করে নেয়"। অথবা বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীস ঃ غسل الجمعة واجب على كل محتلم "প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর জুমুআর গোসল ওয়াজিব।" বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই হাদীসের দ্বারা গোসল ওয়াজিব প্রমাণিত হয়।

জমহুর (جمهور) উলামায়ে কিরাম সহীহ্ হাদীসের দ্বারা তাঁদের দলীল পেশ করেন। প্রথমতঃ বর্ণিত হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন ঃ জুমুআর দিন গোসলের নির্দেশ এইজন্য করা হয়েছে যে, লোকজন কৃষিকাজ করার ফলে ধূলিবালি ও ঘামে জর্জরিত হয়ে জুমুআর নামাযে আগমণ করত, যার ফলে মুসল্লীদের কষ্ট হতো। মোটা কাপড় পরিধান করে আরবের তীব্র গরমের দ্বিপ্রহরে কৃষিকাজ করে ধূলিবালি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তাদের অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদেরকে গোসল করার জোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যখন এই অবস্থা দূরীভূত হয়ে যায়, তখন ঐ নির্দেশও সহজ করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দলীল হলো হযরত উমর (রা) এবং হযরত উসমান (রা)-এর ঘটনা। একবার হযরত উসমান (রা) বিলম্ব করে জুমুআর নামাযে আগমণ করেন। এতে হযরত উমর (রা) খুতবা চলাকালেই বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। হযরত উসমান (রা) ওযর বর্ণনা করে বলেন ঃ একটি কাজে এই বিলম্ব হয়েছে যার ফলে শুধু উযূ করে এসেছি। এতে হযরত উমর (রা) আরো অধিক আশ্চর্য হয়ে বলেন ঃ নিশ্চয়ই আপনি গোসলের সুন্নত পরিত্যাগ করেছেন। যদি গোসল ওয়াজিব হতো তাহলে হযরত উমর (রা) তাঁকে গোসলের জন্য ফেরত পাঠাতেন এবং তাঁর ওজরের উপর চুপ থাকতেন না। এছাড়া উপস্থিত সাহাবীগণের মধ্যে কেউ বলেননি যে, আমীরুল মু'মিনীন! হযরত উসমান (রা) ওয়াজিব ত্যাগ করেছেন। এ অবস্থায় তিনি কিভাবে চুপ থাকবেন ? তৃতীয় দলীল মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, لو اغسلتم লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, (যদি তোমরা গোসল করতে) তা হলে কত ভাল হতো! এই বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গোসল ওয়াজিব নয়। চতুর্থ দলীল তিরমিযী, আবূ দাউদ ও অন্যান্য হাদীসে হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বর্ণিত হাদীস ঃ من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل "যিনি উযূ করেছেন ; তিনি ভাল মূলত সুন্নতের উপর আমল করেছেন আর যিনি গোসল করেছেন, তিনি উত্তম কাজ করেছেন কেননা গোসলই উত্তম।" উপরোক্ত হাদীসসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াজিব সম্পর্কিত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা এইভাবে করা যায়, যেমন فليغتسل এর মধ্যে امر (নির্দেশ) ওয়াজিবের জন্য নয়; বরং মুস্তাহাবের জন্য বলা হয়েছে। এখানে واجب শব্দের অর্থ প্রকৃত

এটা মানদূব (مندوب) মানতেন না। এটা ইমাম নববীর ব্যক্তিগত উক্তি। সুতরাং এই হাদীস ইমাম আযম (র)-এর মাযহাবের মতামতের সমর্থনে রয়েছে।

١٤١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَقَالَ لَهُ اَمَا تَقْرَأُ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لاَ اَعْلَمُ - قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ وَ اِذَا رَاَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنِ انفَضُّوْا اِلَيْهَا وَ تَرَكُوْكَ قَائِمًا -

হাদীস নং-১৪১

অনুবাদ ঃ হযরত ইবরাহীম (র) থেকে বলেন ঃ কোন ব্যক্তি [ইবনে মাজাহ্ শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন হযরত আলকামা ইবনে কাসেম (রা)] হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) এর নিকট নবী করীম (সা)-এর জুমুআর খুতবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ তোমরা কি সূরা জুমুআ পাঠ কর না ? তখন ঐ ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ। কিন্তু আমি এর মর্ম যথাযথ উপলব্ধি করতে পারিনি। অতঃপর হযরত ইবনে মাসউদ (রা) পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

وَاِذَا رَأوا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنِ انْفَضُّوا اِلَيْهَا وَ تَرَكُوْكَ قَائِمًا .

"যখন তারা দেখলো ব্যবসা ও কৌতুক, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তার দিকে ছুটে গেল।" (৬২ ঃ ১১)

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) যে পবিত্র কুরআনের উপর গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি এই আয়াতের দ্বারা সূক্ষ্ম দলীল পেশ করে হুযূর (সা)-এর দাঁড়ানো অবস্থায় খুতবা প্রদানকে প্রমাণিত করেছেন। দলীলের মূল উৎস হলো وتركوك قائما অর্থাৎ (হে রসূল) আপনাকে তারা দাঁড়ানো অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর (সা) দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করেছেন। হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সহ অন্যান্য সাহাবা (রা) থেকে এটাই বর্ণিত আছে। খুতবা সম্পর্কে এখানে কয়েকটি বিষয় আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমত খুতবা দাঁড়িয়ে পড়া সুন্নত অথবা খুতবা সহীহ হওয়ার জন্য দাঁড়ানো শর্ত। ইমাম আবূ হানীফা (রা)-এর মতে দাঁড়িয়ে পড়া সুন্নত। অর্থাৎ যদি কেউ বসে খুতবা পাঠ করে, তবুও খুতবা সহীহ হবে। কেননা খুতবা প্রকৃতপক্ষে বক্তৃতা প্রদান করা, যা বসেও করা যেতে পারে। কিন্তু এটা যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাহাবায়ে কিরামের আমলের বিরোধী, তাই এটা মাকরূহ বলে গণ্য হয়েছে। অবশ্য উত্তম হলো দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করা যাতে খতীবের আওয়ায বহু দূর পর্যন্ত পৌছতে পারে। ইমাম শাফিঈ (র) দাঁড়ানোকে খুতবার শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ যে, যদি কেউ বসে খুতবা পাঠ করে, তা হলে যেন খুতবা দেওয়া হল না। তাঁদের দলীল হলো এই যে, নবী করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে এরূপ প্রমাণিত

আছে। ইমাম মালিক (র) এক রিওয়ায়েতে ইমাম শাফিঈ (র)-এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইমাম আহমদ (র)-ও এ ব্যাপারে তাঁদেরকে অনুসরণ করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) মুসলিম শরীফে হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা) বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। বর্ণিত আছে, তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন, সেখানে আবদুর রহমান ইবনে উম্মুল হিকামকে বসে বসে খুতবা প্রদান করতে দেখে বলেন ঃ انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعداً "এই খবীস ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর, সে বসে বসে খুতবা দিচ্ছে।" পবিত্র কুরআনের আয়াত- واذا راؤا تجارة او لهو الاية এরদ্বারা নামায ফাসেদ হওয়া সম্পর্কে কেউ কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হলো, সংক্ষিপ্ত খুতবা এবং দীর্ঘ নামায। সুন্নত হলো এই যে, খুতবা সংক্ষিপ্ত করে নামায দীর্ঘ করতে হবে। মুসলিম শরীফে হযরত আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ ان طول صلوة الرجل وقصر خطبة منة من فقهه فاطليوا الصلوة واقصروا الخطبة فان من البيان لسحرا ـ "পুরুষের নামায দীর্ঘ করা এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত করা তাদের ইলমে ফিকহ্‌র জ্ঞানের পরিচায়ক। সুতরাং নামায দীর্ঘ কর এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত কর। অবশ্য কোন কোন বর্ণনা যাদুমিশ্রিত।" মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হযরত আম্মার (রা) বলেন ঃ হুযূর (সা) আমাদেরকে খুতবা সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তৃতীয় হলো, লাঠির উপর হাত রেখে খুতবা প্রদান করা। এটাও হুযূর (সা) থেকে বর্ণিত আছে। আবূ দাউদে হাকাম ইবনে হাযম (র) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা জুমুআর নামাযে হাযির হয়েছি তখন হুযূর (সা)-কে লাঠি অথবা ধনুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে দেখেছি। হযরত বারা' (রা) বলেন ঃ আঁ হযরত (সা) ঈদের সময় ধনুকের উপর ভর দিয়ে খুতবা দিতেন।

باب ما يقرأ فى الجمعة

জুমুআর নামাযে কি সূরা পড়তে হবে

١٤٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ الْكُوْفِىْ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ جُنَادَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ -

হাদীস নং-১৪২

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) জুমুআর নামাযে সূরায়ে জুমুআ এবং সূরায়ে মুনাফিকূন তিলাওয়াত করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ সময় হুযূর (সা)-এর আমল এটাই ছিল। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবী রাফে (র) থেকে বর্ণিত আছে, মারওয়ান পবিত্র মক্কা গমনের সময় হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে স্বীয়

স্থলাভিষিক্ত করেন। তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) জুমুআর নামাযের প্রথম রাকাআতে সূরায়ে জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরায়ে মুনাফিকূন তিলাওয়াত করেন এবং তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জুমুআর নামাযে এই দুটি সূরা তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

١٤٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيْرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّه كَانَ يَقْرَأُ فِىْ الْعِيْدَيْنِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ -

হাদীস নং-১৪৩

অনুবাদ ঃ হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) দু'ঈদ এবং জুমুআর নামাযে, "সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল আ'লা" এবং "হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ্" তিলাওয়াত করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন রিওয়ায়েতে সূরা ক্বাফ এবং সূরায়ে ক্বামারের উল্লেখ রয়েছে। এতে প্রতীমান হয় যে, আঁ হযরত (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সূরা তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ فِىْ فَضِيْلَةِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَمَنْ مَاتَ فِيْهَا

জুমুআর রাত এবং ঐ রাতে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত

١٤٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا مِنْ لَيْلَةِ جُمُعَةِ اِلاَّ وَ يَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلٰى خَلْقِه ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِه شَيْئًا -

হাদীস নং-১৪৪

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জুমুআর এমন কোন রাত অতিবাহিত হয় না যে রাতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু স্বীয় মাখলূকের বা সৃষ্টিজগতের দিকে (রহমত ও স্নেহ- সহানুভূতির দৃষ্টিতে) তিনবার দেখে না থাকেন। আল্লাহ্ (রাতে) ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে থাকেন যিনি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেন না।

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে হাদীসে বর্ণিত গুনাহ্র দ্বারা ছোট গুনাহের কথা

বর্ণনা করা হয়েছে, গুনাহ্ কবীরা বা বড় গুনাহ্ নয়। কেননা কবীরা গুনাহ্ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। কেউ কেউ এর মধ্যে কবীরা গুনাহ্ও অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। তবে যে গুনাহ্ বান্দার সাথে সম্পৃক্ত, তা সর্বসম্মতিক্রমে এর থেকে বহির্ভুক্ত। কেননা এটা মাফ করা বা না করা বান্দার উপর নির্ভর করে।

١٤٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الهَيْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وُقِىَ عَذَابَ الْقَبْرِ –

হাদীস নং-১৪৫

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন মৃত্যুবরণ করবে, সে কবরের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে তিরমিযী ও বায়হাকীর বর্ণনায় لَيلَةَ الجمعة অতিরিক্ত রয়েছে। অর্থাৎ এই হাদীসে বলা হয়েছে , যে ব্যক্তি জুমুআর দিন অথবা রাতে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এভাবে মিলিত হবে যে, তার কোন হিসেব নেয়া হবে না। হাকেম ও তিরমিযী (র)-এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, জুমুআর দিন দোযখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, এর কঠোরতা হ্রাস পায়, এর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সুতরাং এরূপ পবিত্র দিনে কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে তার সৌভাগ্যের কারণে তার উপর আযাব রহিত হয়ে যায়।

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِىْ الْخُرُوْجِ اِلَى الْخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ

মহিলাদের কোন কল্যাণকর কাজে এবং সমস্ত মুসলমানদের দু'আয় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে গমনের অনুমতি

١٤٦ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَمَّنْ سَمِعَ اُمَّ عَطِيَّةَ (رضـ) تَقُوْلُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِى الْخُرُوْجِ اِلَى الْعِيْدَيْنِ حَتّٰى لَقَدْ كَانَتِ الْبِكْرَانِ تَخْرُجَانِ فِى الثَّوْبِ الوَاحِدِ حَتّٰى لَقَدْ كَانَتِ الحَائِضُ تَخْرُجُ فَتَجْلِسُ فِى عُرْضِ النَّاسِ يَدْعُوْنَ وَلَا يُصَلِّيْنَ *

হাদীস নং-১৪৬

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা) বর্ণনা করেন, [নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে] মহিলাদেরকে দু'ঈদের নামাযে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে । ফলে দু'টি বালিকা একটি কাপড়ে (ওড়না) আবৃত হয়ে বের হতো । এমনকি ঋতুবতী মহিলাও বের হতো এবং মানুষ থেকে দূরে গিয়ে পৃথক হয়ে বসত। এ সমস্ত মহিলা দু'আর মধ্যে অংশগ্রহণ করত কিন্তু নামায পড়ত না।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যে, হুযূর (সা)-এর যুগে মহিলাদের মসজিদ ও ঈদগাহে গিয়ে নামাযে অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল। এমন কি যুবতী মেয়ে এবং ঋতুবতী মহিলারাও উপস্থিত হতো কিন্তু তারা নামাযে অংশগ্রহণ করত না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, لا تمنعوا اماء الله مساجد الله "আল্লাহ্র বান্দীদের (মহিলাদের)-কে আল্লাহ্র মসজিদে (গমনে) বাধা প্রদান কর না।" অবশ্য তাদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার না করার কঠোর নির্দেশ ছিল। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্র স্ত্রী হযরত যয়নব (রা) থেকে মরফূ' হাদীস বর্ণিত আছে, যখন তোমাদের (মহিলাদের) মধ্যে কেউ মসজিদে গমন করবে, তখন সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। কিন্তু এর সাথে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ যদি নবী করীম (সা) তাঁর পরে বর্তমান মহিলাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে মসজিদে আগমণে বাধা দান করতেন। এই কারণেই পরবর্তী উলামায়ে কিরাম (علماء متأخرين) মহিলাদের মসজিদে গমণকে নিষেধ করে দিয়েছেন। সায়দালানী (صيدلانى) বলেন ঃ এ অনুমতি ঐ সময় ছিল কিন্তু বর্তমানে মহিলাদের পূর্বের ন্যায় বের হওয়া মাকরূহ। কেননা বর্তমানে সামাজিক অবস্থা খুবই বিপদজ্জনক। তাই এর থেকে নিরাপদ থাকাই উত্তম। তবে বর্তমানেও যদি কোন মসজিদে মহিলাগণ উপস্থিত হয় এবং এতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে ক্ষতি নেই।

١٤٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ (رض) قَالَتْ كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِى الْخُرُوْجِ اِلَى الْعِيْدَيْنِ مِنَ الْفَطْرِ وَالاَضْحٰى –

وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَتْ اِنْ كَانَ الطَّامِثُ لَتَخْرُجُ فَتَجْلِسُ فِىْ عُرُضِ النِّسَاءِ فَتَدْعُوْا فِى الْعِيْدَيْنِ –

وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُخْرِجَ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الفَطْرِ ذَوَاتَ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضِ فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلٰوةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا كَانَتْ اِحْدٰنَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا اُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا –

হাদীস নং-১৪৭

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, ঋতুবতী মহিলাও বের হতো কিন্তু অন্যান্য মহিলাদের থেকে পৃথক হয়ে বসত এবং উভয় ঈদে দু'আয় অংশগ্রহণ করত ।

অপর এর রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমরা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন (পর্দার সাথে) ঋতুবতী মহিলাদেরকেও ঈদগাহে নিয়ে যাই। অবশ্য ঋতুবতী মহিলা নামায থেকে দূরে থাকত কিন্তু অন্যান্য ইবাদত ও দু'আয় অংশগ্রহণ করত। একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আমাদের মধ্যে কারো ওড়না না থাকে ? তখন তিনি বললেন ঃ তাকে তার কোন বোন (বা সাথী) স্বীয় চাদরের মধ্যে শরীক করে নিবে।

ব্যাখ্যা ঃ এমন কি আঁ হযরত (সা)-এর কন্যা এবং উম্মুল মু'মিনীনদেরকে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যেমন ইবনে মাজাহ-এ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। বুখারী শরীফেও প্রায় একই বিষয়বস্তুর হাদীস উম্মে আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত আছে। এই নির্দেশ আঁ হযরত (সা)-এর পবিত্র যুগের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যেমন পূর্ববর্তী হাদীসের দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয়েছে।

بَابُ عَدْمِ الصَّلٰوةِ قَبْلَ الْعِيْدِ وَ بَعْدِهَا

ঈদের নামাযের পূর্বে এবং পরে (নফল) নামায আদায় না করা প্রসঙ্গে

١٤٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ اِلَى الْمُصَلّٰى فَلَمْ يَصَلِّ قَبْلَ الصَّلٰوةِ وَلَا بَعْدَهَا شَيْأً –

হাদীস নং-১৪৮

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) ঈদের দিন ঈদগাহে গমন করেছেন কিন্তু তিনি ঈদের নামাযের পূর্বে অথবা পরে কোন (নফল) নামায আদায় করেন নি।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত বিধান ঈদগাহের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা হুযূর (সা) ঈদগাহের মধ্যে ঈদের নামাযের পূর্বে অথবা পরে অন্য কোন নামায আদায় করেন নি। সিহাহ্ সিত্তাহ গ্রন্থসমূহে এ ধরনের আরো অনেক রিওয়ায়েত রয়েছে। কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে ঃ اذا رجع

الى منزله صلى ركعتين "যখন তিনি বাড়ি ফিরে আসতেন, তখন দু'রাকাআত নামায পড়তেন"। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে ইবনে মাজাহ একই বাক্যে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। এবার এই মাসায়ালার গূঢ় তত্ত্ব হলো এই যে, ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরে অথবা ঈদগাহে নামায পড়া জায়েয নয়। তবে ঈদের নামাযের পরে ঘরে দু'রাকাআত পড়া যেতে পারে। যদি কেউ ঈদের নামাযের পূর্বে অথবা পরে ঈদগাহে নফল নামায আদায় করে, তাহলে এটা মাকরূহ তাহরীমি না হলেও মাকরূহ তানজীহি হবে। কেননা সে সুন্নত বিরোধী আমল করেছে যা মাকরূহ তানজীহি। যদি তা মাকরূহ না হতো তাহলে হুযূর (সা)-এর নামাযের প্রতি এত আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তিনি কিভাবে নামায ত্যাগ করতে পারেন ? এটাই হানাফীদের মাযহাব। ইমাম শাফিঈ (র)-ও এই মত পোষণ করেন।

بَابُ تَقْصِيْرِ الصَّلٰوةِ فِى السَّفْرِ

সফরে (ভ্রমণে) নামায কসর করা

١٤٩- اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَالعَصْرَ بِذِى الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ -

হাদীস নং-১৪৯

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মদীনায় জোহর নামায চার রাকাআত আদায় করেছি এবং যুল-হুলায়ফাতে আসরের নামায দু'রাকাআত আদায় করেছি।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস হযরত আনাস (রা) থেকে ইমাম তিরমিযী রিওয়ায়েত করেছেন। তিরমিযী এই হাদীসকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সফরে নামায কসর পড়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট দলীল।

١٥٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّى فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ لَا يَزِيْدُوْنَ عَلَيْهِ -

হাদীস নং-১৫০

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফরে দু'রাকাআত পড়তেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) এর উপর অতিরিক্ত কিছু করতেন না।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী মাসয়ালা হলো এই যে, মুসাফির (ভ্রমণকারী) সফরের সময় চার রাকাআত বিশিষ্ট নামায কসর অর্থাৎ দু'রাকাআত পড়বে। এই মাসয়ালা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য হলো এই যে, সফরের সময় চার রাকাআত পড়ার অধিকার আছে কি না ? যদি চার রাকাআত আদায় করে, তবে এই আমল কি হিসেবে গণ্য হবে ? ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে এটা ঐ ব্যক্তির ইচ্ছা, তিনি চার রাকাআত পড়তে পারেন, আবার দু'রাকাআতও পড়তে পারেন। এক রিওয়ায়েত ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আহমদ (র) এই মত পোষণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ মুসাফিরের চার রাকাআত আদায় করার কোন অধিকার নেই। কসর ব্যতীত তার জন্য অন্য কোন উপায় জায়েয নয়। যদি চার রাকাআত আদায় করে, তা হলে গুনাহ্গার হবে এবং তা মাকরূহ তাহরীমি বলে গণ্য হবে।

ইমাম শাফিঈ (র) দলীল হিসেবে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পেশ করেন ঃ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ "তোমাদের উপর কোন গুনাহ্ নেই যদি তোমরা নামাযে কসর কর।" এ আয়াতে অনুমতি ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ কসর পড়ুক অথবা চার রাকাআত পড়ুক এতে মুসাফিরের উপর কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। তিনি হযরত আলী ইবনে রবীআ (রা)-এর হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে বলেন ঃ তিনি হযরত উমর (রা)-এর নিকট বলেনঃ এখন তো শত্রুর ভয় নেই, সুতরাং আমরা এখন কেন কসর পড়ব? কেননা আয়াত বলা হয়েছে ঃ اِنْ خِفْتُمْ (যদি তোমাদের ভয় হয়)। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমার মনেও এই প্রশ্ন জেগেছিল। তাই আমি এ ব্যাপারে হুযূর (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন ঃ এটা এক প্রকার অনুগ্রহ যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে দান করা হয়েছে। তোমরা এটা গ্রহণ কর। এছাড়া তিনি এটা রোযার উপর কিয়াস করেছেন। রোযা রাখা ও না রাখার ব্যাপারে মুসাফিরকে অনুমতি ও সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং নামাযের ব্যাপারেও তাই হবে। এ পর্যায়ে তিনি স্বীয় মতামতের স্বপক্ষে হযরত উসমান (রা)-এর একটি হাদীস পেশ করেন। তিনি মুসাফির অবস্থায় মিনায় চার রাকাআত নামায আদায় করেন। দ্বিতীয় হাদীস হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সফরে কসর না পড়ে চার রাকাআত আদায় করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) স্বীয় মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে কয়েকটি সহীহ হাদীস পেশ করেছেন। প্রথমতঃ মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি হুযূর (সা)-এর সাথে যুল- হুলায়ফাতে নামায কসর করে পড়েছেন। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। দ্বিতীয়তঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর হাদীস এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা পেশ করেছে। এই হাদীস অন্যান্য সহীহ হাদীস গ্রন্থেও বিদ্যমান রয়েছে। যখন তাঁর নিকট বলা হলো যে, হযরত উসমান (রা) মিনাতে চার রাকাআত নামায আদায় করেছেন। তিনি তখন اِنَّا لِلّٰهِ পাঠ করেন এবং বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দু'রাকাআত পড়েছি। হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত উমর (রা)-এর সাথেও দু'রাকাআত পড়েছি। মোট কথা তিনি খুব হতবাক হলেন। শরীয়তের আহ্কাম সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) যে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, এতে তিনি যদি কোন ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ

করেন, তা হলে এটা স্বাভাবিকভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এর অবস্থা কি ? অতঃপর তিনি আঁ হযরত (সা) এবং হযরত আবূ বকর (র) ও হযরত উমর (রা)-এর আমলের কথাও উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় দলীল হিসেবে বুখারী শরীফে উদ্ধৃত, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন। এই হাদীসে হুযূর (সা)-এর সাথে হযরত আবূ বকর (রা) এবং এবং হযরত উমর (রা)-এর আমলের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ আমি তাঁদের সাথে মিনায় নামায পড়েছি। তাঁরা দু'-দু'রাকাআত করে (কসর) পড়েছেন। তিনি আরো বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা) খিলাফতের প্রথম যুগে কসর পড়েছেন, এরপর চার রাকাআত পড়েছেন। চতুর্থ দলীল হিসেবে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন। এই হাদীসকে তিনি সহীহ বলেছেন। হাদীসের বিষয়বস্তু হলো এই যে, তাঁকে মুসাফিরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হজ্জ করেছি। তিনি এ সময় দু'রাকাআত নামায পড়েছেন (কসর পড়েছেন)। হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে হজ্জ আদায় করেছি, তিনিও দু'রাকাআত আদায় করেছেন। পঞ্চম দলীল হিসেবে ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত মরফূ' (مرفوع) হাদীস পেশ করেছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা) যখন মদীনা থেকে বাইরে গমন করতেন, তখন ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি চার রাকাআত বিশিষ্ট নামায দু'রাকাআত আদায় করতেন। সুতরাং সহীহ হাদীসসমূহে আঁ হযরত (সা), হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর পক্ষ থেকে অব্যাহত আমলের প্রমাণ বহন করে। এটা অস্বীকারের কোন অবকাশ নেই। এর প্রমাণ হিসেবে আরো বলা যায় যে, সফরে দু'রাকাআত সুন্নত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। সুতরাং শরীয়ত যখন এটাকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্র মর্যাদা দান করেছে, তাই এর অতিরিক্ত কিছু করা জায়েয হবে না। বস্তুত এর উপর অতিরিক্ত বা বেশি নামায এরূপ হবে যেমন কেউ জুমুআ' এবং ঈদের নামায দু'রাকাআতের পরিবর্তে চার রাকাআত আদায় করে। নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্, ইবনে আবী লায়লা হযরত ইবনে উমর (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, সফরের নামায, ঈদুল আযহার নামায, ঈদুল ফিতরের নামায এবং জুমুআর নামায দু'রাকাআত দু'রাকাআত । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সহীহ রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, من صلى فى السفر اربعا كمن صلى فى الحضر ركعتين "যে ব্যক্তি সফরে চার রাকাআত নামায পড়ে, সে যেন বাড়িতে অবস্থানের সময় (চার রাকাআতের পরিবর্তে) দু'রাকাআত আদায় করল।" মোট কথা সে উভয় ক্ষেত্রেই শরীয়তের বিধান লংঘন করল।

এবার শাফিঈ মাযহাবের উপর একটু আলোচনা প্রয়োজন। তাঁদের মাযহাবের ভিত্তি হলো এই যে, ফরয মূলত চার রাকাআত কিন্তু সফরে তা একটু সহজ করে দু'রাকাআত করে দেওয়া হয়েছে এবং মুসাফিরকে এই সুযোগ গ্রহণ করা বা না করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা সহীহ রিওয়ায়েত ও বাস্তবতা বিরোধী। কেননা নামায প্রথমত দু'রাকাআত হিসেবে ফরয ছিল। অতঃপর স্থায়ী বাসস্থানে (حضر) দু'রাকাআতের সাথে আরো দু'রাকাআত যুক্ত করে পূর্ণ চার রাকাআত করে দেওয়া হয়েছে এবং সফরে পূর্ববর্তী দু'রাকাআত ফরয বাকী রয়েছে। এই মতের স্বপক্ষে বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস পেশ করা হয়েছে ঃ

الصلوة اول ما فرضت ركعتان فاقرت صلوة السفر ركعتان واتممت صلوة الحضر "প্রথমত দু'রাকাআত নামায ফরয হয়েছিল। অতঃপর সফরে দু'রাকাআত স্থায়ী থাকে এবং স্থায়ী বাসস্থান (حضر) নামায চার রাকাআত হয়ে যায়।" নাসাঈ শরীফে সহীহ সনদের সাথে হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ صلوة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم (ص)

"তোমাদের নবী (সা)-এর বাণী অনুযায়ী কসর ব্যতীত সফরের নামায দু'রাকাআত"। মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তোমাদের নবী (সা)-এর বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদের উপর বাসস্থানে চার রাকাআত, সফরে দু'রাকাআত এবং ভয় ও আশংকার (خوف) অবস্থায় এক রাকাআত ফরয করেছেন। সুতরাং উপরোক্ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শাফিঈ মাযহাবের দলীল সঠিক নয়।

এবার প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত উসমান (রা) মিনায় কেন চার রাকাআত পড়লেন এবং হযরত আয়েশা (রা) সফরে কেন পূর্ণ চার রাকাআত আদায় করেন? এর জওয়াব হলো এই যে, হজ্জ সমাপনের পর হযরত উসমান (রা) সেখানে অবস্থানের নিয়্যত করেন এবং এই অবস্থানকে তিনি বাসস্থান (وطن) হিসেবে গণ্য করেছেন। বাসস্থানে অবস্থান করলে কসর পরিত্যাগ করে পূর্ণ চার রাকাআত পড়তে হয়। যেমন আবদুর রায্যাক (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম আহমদ (র) এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে, যখন তাঁর এই আমলের উপর লোকজন বিস্ময় প্রকাশ করেন, তখন তিনি ওজর পেশ করে বলেন ঃ আমি হুযূর (সা)-কে এটা বলতে শুনেছিঃ من تاهل فى بلد فليصل صلوة المقيم "যখন কেউ কোন শহরে অবস্থান করে এবং পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস শুরু করে, তখন সে যেন মুকীম (مقيم) বা স্থায়ী বাসিন্দার মত নামায আদায় করবে।" অথবা হযরত উসমান (রা) হয়ত পূর্ণ ও কসর (اتمام و قصر) উভয় মত পোষণ করতেন। যেমন প্রায় এই ধারণা হযরত আয়েশা (রা) পোষণ করতেন। ইমাম যুহরী বলেন ঃ হযরত উরওয়া (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত আয়েশা (রা) সফরে কেন চার রাকাআত পড়তেন? হযরত উরওয়াহ্ (রা) বলেন ঃ তিনি এই বিষয়ে ঐ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা হযরত উসমান (রা) পোষণ করতেন। আমরা বলব, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) থেকে যখন কসরের উপর স্থায়ী ও অব্যাহত আমল প্রমাণিত হয়েছে, তাই এটাই মাযহাবের ভিত্তি হওয়া উচিত। যদি এ পর্যায়ে কোন সহীহ্, হাসান, যঈফ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণ করা হতো যে, হুযূর (সা) সফরে পূর্ণ চার রাকাআত পড়েছেন, তা হলে এটা মেনে নেওয়া যেত যে, বিরোধী পক্ষের মাযহাবের একটি ভিত্তি রয়েছে। সুতরাং সফর ব্যতীত যেহেতু এর অন্য কোন প্রমাণ নেই, তাই বাধ্য হয়ে এটাই মানতে হবে যে, সফরে পূর্ণ চার রাকাআত পড়া মাকরূহ।

বুদ্ধি ও বিবেকের দৃষ্টিতেও ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাব সঠিক নয়। কেননা তিনি সফরে যে অতিরিক্ত দু'রাকাআতের কথা বলেছেন তা কি ফরয ? তাঁদের মতানুযায়ী যদি তা ফরয হয় তা হলে তা আদায় করা কেন ওয়াজিব করা হয়নি ? ইচ্ছার উপর কেন এর ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়েছে?

এমনিভাবে প্রত্যেক ফরযের কাযা রয়েছে, কিন্তু এই অতিরিক্ত দু'রাকাআতের কাযা নেই কেন? প্রত্যেক ফরয ত্যাগ করা গুনাহের কাজ, কিন্তু এ দু'রাকাত ত্যাগ করলে কেন গুনাহ হয় না? এটা কিরূপ ফরয যার মধ্যে ফরযের কোন চিহ্ন নেই? বরং এই সমস্ত নীতি বা নিদর্শন নফলের মধ্যে বিদ্যমান। এরদ্বারা নামাযকে রোযার উপর অনুমান করার বিষয়টি বাতিল হয়ে যায়। কেননা রোযা যদিও অধিকার বা ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এতে কাযা রয়েছে, অথচ নামাযে তা নেই। সুতরাং এই অতিরিক্ত দু'রাকাআতকে কিভাবে ফরয মেনে নেওয়া যায়?

এবার পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة -এর মধ্যে কিছু সমালোচনা রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কসর করা অথবা না করার মধ্যে তাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে ; বরং প্রকৃতপক্ষে এই বাক্য এইজন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে যাতে এই সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে,বাসস্থানের নামাযে কিছু হ্রাস পেয়েছে এবং চার রাকাআতের স্থলে দু'রাকাআত অবশিষ্ট রয়েছে ; বরং এটা পৃথক ফরয এবং বাসস্থানের (حضر) এই পূর্ণ নামায অর্ধেক নয় যে, এটাতে গুনাহের আশংকা করবে।

١٥١ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَتى فَقِيْلَ صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى اَرْبَعًا فَقَالَ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَ مَعَ اَبِى بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَ مَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَضَرَ الصَّلٰوةَ مَعَ عُثْمَانَ فَصَلّٰى مَعَه اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَقِيْلَ لَه اِسْتَرْجَعْتَ وَ قُلْتُ مَا قُلْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ اَرْبَعًا –

قَالَ الخِلَافَةُ ثُمَّ قَالَ وَ كَانَ اَوَّلَ مَنْ اَتَمَّهَا اَرْبَعًا بِمِنًى –

হাদীস নং -১৫১

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, হযরত উসমান (রা) মিনার নামায চার রাকাআত পড়েছেন, তখন তিনি বললেন ঃ انا لله وانا اليه راجعون (অতঃপর বলেন) আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দু'রাকাআত, হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে দু'রাকাআত এবং হযরত উমর (রা)-এর সাথে দু'রাকাআত নামায পড়েছি, এরপর [হযরত ইবনে মাসঊদ (রা)] হযরত উসমান (রা)-এর সাথে নামাযে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে চার রাকাআত নামায পড়েন। ফলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি এ ব্যাপারে انا لله পড়েছেন অথচ আপনি নিজেই চার রাকাআত পড়েছেন?

তিনি উত্তরে বলেন ঃ এটা খিলাফতের আদব রক্ষা করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হযরত উসমান (রা) হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি মিনায় চার রাকাআত পড়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসের ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

সওয়ারী বা বাহনের উপর নামায

١٥٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّهُ صَحِبَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَصَلّٰى ابْنُ عُمَرَ (رض) عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ يُوْمِئُ اِيْمَاءً اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ وَالْوِتْرَ فَاِنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ لَهُمَا عَنْ دَابَّتِهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَتِهِ عَلى رَاحِلَتِهِ وَ وَجْهُهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّى عَلٰى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُوْمِئُ اِيْمَاءً -

হাদীস নং-১৫২

অনুবাদ ঃ হযরত মুজাহিদ (র) বলেন ঃ মক্কা থেকে মদীনা গমনের সময় আমি হযরত ইবনে উমর (রা)-এর সাথী ছিলাম। তিনি নিজের সাওয়ারীর (উটের) উপর বসে মদীনার দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। (রুকূ ও সিজদার জন্য) তিনি ইশারা করতেন। কিন্তু ফরয ও বিতর সওয়ারী থেকে অবতরণ করে পড়তেন। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ মদীনার দিকে সওয়ারীর মুখমন্ডল থাকা অবস্থায় (কিবলা থেকে অন্যদিকে) সওয়ারীর উপর নামায পড়া সম্পর্কে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীর উপর নফল নামায আদায় করতেন এ অবস্থায় যে, মুখ যে দিকে হোক না কেন এবং তিনি রুকূ ও সিজদা ইশারা করে আদায় করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা যে সমস্ত মাসয়ালা বের হয়ে থাকে, তা হলো এই যে, সফরে সওয়ারীর উপর কোন্ কোন্ নামায আদায় করা যায় এবং কোন্‌টি আদায় করা যায় না। ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম আহমদ (র) -এর মাযহাব হলো এই যে, সফরে দু'নামায সওয়ারীর উপর আদায় করা যাবে। শুধু ফরয মাটির উপর নেমে আদায় করতে হবে। ইমাম শাফিঈ (র) দলীল হিসেবে বুখারী শরীফে হযরত নাফে'(রা)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন ঃ كان ابن عمر يصلى على راحلته و يؤتر عليها "হযরত ইবনে উমর (রা) সওয়ারীর উপর নামায পড়তেন এবং এর উপর বিতরের নামাযও পড়তেন।" وَيُخْبَرُ ان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم كان يفعله "এবং নবী করীম (সা) এরূপ করতেন বলে বর্ণনা করতেন।" এছাড়া হযরত সাঈদ ইবনে ইয়াসার (রা) বর্ণিত হাদীস [যা ইমাম

মালিক (রা) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। হাদীসের মূল বক্তব্য হলো এই যে, আমি এক সফরে হযরত ইবনে উমর (র)-এর সহযাত্রী ছিলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমি পিছনে পড়ে যাই। হযরত ইবনে উমর (রা) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, বিতর আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, এ সম্পর্কে হুযূর (সা)-এর কোন উত্তম পদ্ধতি কি তোমার জানা নেই? আমি তাঁকে সাওয়ারীর উপর বিতর পড়তে দেখেছি।

ইমাম আবূ হানীফা (র) হযরত ইবনে উমর (রা)-এর হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এই হাদীস তিনটি সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে। প্রথমত মুজাহিদ (র)-এর সূত্রে সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে উমর (রা) ফরয ও বিতর নামায মাটির উপর আদায় করতেন। দ্বিতীয়ত হুসাইন (র)-এর সূত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসে ঃ فاذا كانت الفريضة او الوتر نزل فصلى "যখন ফরয অথবা বিতর নামায হতো তখন মাটিতে অবতরণ করতেন এবং নামায পড়তেন।" তৃতীয়ত হযরত নাফে' (রা)-এর সূত্রে ইমাম তাহাবী উল্লেখ করেছেন ঃ كان يصلى على راحلته ويوتر بالارض "সওয়ারীর উপর তিনি (নফল) নামায পড়তেন এবং বিতর মাটির উপর পড়তেন।" এবার এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবনে উমর (রা) সওয়ারীর উপর বিতর আদায় করেছেন। অথবা হযরত সাঈদ ইবনে ইয়াসার (রা)-কে এরজন্য হিদায়াত প্রদান-এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, সম্ভবত কোন ওযরের কারণে এরূপ হয়েছে, যেমন কাদা-পানি অথবা কোন ভয়ের কারণে তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করতে পারেন নি। কেননা ওযরের কারণে ফরযও সওয়ারীর উপর পড়া যায়। অথবা ঐ সময় পর্যন্ত হয়ত বিতর ওয়াজিব হয়নি। কেননা ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরীয়াতের আহ্কামের মধ্যে অনেক কিছু সহজ ও স্বাধীন ছিল। পরে এর সাথে কিছু বিধি-নিষেধ ও কঠোরতা আরোপ করা হয়। সওয়ারীর উপর যা পড়া হতো, তা শুধু সুন্নতের মধ্যে গণ্য হতো। নতুবা এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে সওয়ারীর উপর নামায পড়া সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে, অথচ তিনি এর বিপরীত আমল করবেন?

بَابُ الوِتْرِ

বিতরের বর্ণনা

١٥٣ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ يَفُوْرَ الْعَبْدِىْ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ زَادَكُمْ صَلٰوةً وَهِىَ وِتْرٌ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ وَ زَادَكُمُ الْوِتْرَ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ اللّٰهَ زَادَكُمْ صَلٰوةً وَهِىَ الْوِتْرُ فَحَافِظُوْا عَلَيْهَا –

হাদীস নং-১৫৩

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তেমাদের উপর ফরয নামাযের পর আর এক নামায অতিরিক্ত করে দিয়েছেন, তা হলো বিতর।

অপর এর রিওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর নামায ফরয করেছেন এবং অতিরিক্ত করে দিয়েছেন বিতর।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এক নামায অতিরিক্ত করেছেন তা হলো বিতর। সুতরাং এর হিফাযত কর।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বিতর সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে, সুতরাং এটা জানা একান্ত প্রয়োজন যে, তিনি বিতরকে ফরয, ওয়াজিব অথবা সুন্নত মনে করতেন। তবে ওয়াজিব হওয়ার রিওয়ায়েত অধিক সহীহ বলে মনে হয়। কেননা বিতর ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে কয়েকটি সহীহ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যায়। উপরোক্ত হাদীস এর মধ্যে অন্যতম। এই হাদীস বিভিন্ন সাহাবা (রা) থেকে বর্ণিত আছে । এঁদের মধ্যে হযরত খারিজা ইবনে হুযাফা (রা), হযরত আমর ইবনে আস (রা), হযরত উকবা ইবনে আমের (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবূ বসরা গাফফারী (রা), এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) অন্যতম। এই হাদীসের সনদের ক্রমধারায় কারো কারো কিছু সমালোচনা রয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে থাকে। মোটকথা এই হাদীস সর্বদিক দিয়ে ওয়াজিব হওয়াকে সমর্থন করে। কেননা হাদীসে زادكم শব্দ রয়েছে। এতে বিতর সুন্নত না হওয়ার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। বরং এরদ্বারা ওয়াজিব হওয়াকেই প্রমাণ করেছে। কেননা অতিরিক্ত (زيادتى) হওয়ার ইঙ্গিত আল্লাহর দিকে করা হয়েছে, নবী করীম (সা)-এর দিকে নয়, হলে এটা সুন্নত হতো। ফরয এইজন্য নয় যে, এ হাদীস অকাট্য দলীল (دليل قطعى) নয়। সুতরাং ফরয ও সুন্নতের মধ্যবর্তী একটি হতে হবে। দ্বিতীয়ত অতিরিক্ত (زيادتى) দ্বারা এই বিষয়ের দিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা ওয়াজিবের জন্য অতিরিক্ত (زيادتى) নির্ধারিত সংখ্যা দ্বারা হবে। অধিকন্তু এর কোন সংখ্যা গণনা নির্ধারিত নেই যার দ্বারা অতিরিক্ত (زيادتى) করা যাবে। তৃতীয়ত কোন বস্তুর উপর অতিরিক্ত বৃদ্ধি করতে হলে একই শ্রেণীর বস্তু দ্বারা তা স্বাভাবিক। এখানে ফরযের উপর বৃদ্ধি করা হয়েছে, তাই এটাও ফরয হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এর জন্য অকাট্য দলীল (دليل قطعى) নেই বলে ফরয না হয়ে ওয়াজিব হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ দারে কুতনী গ্রন্থে আমর ইবনে শুআইব (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন আমরা একত্র হলাম। হামদ ও সানার পর তিনি এই বাক্য বর্ণনা করেন। অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তিনি এই অবস্থায় বের হলেন যে, তাঁর পবিত্র চেহারা লাল ছিল। তিনি মিম্বরের উপর আরোহণ করেন এবং হামদ ও সানার পর এই হাদীস বর্ণনা করলেন। সুতরাং একত্র করা, চেহারা লাল হওয়া, হামদ ও সানা পাঠ করা, এই সমস্ত বিতরের

সুন্নতের উপর অন্য কিছু হওয়ার গুরুত্ব প্রমাণ করে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে فصلوها নির্দেশবাচক শব্দ রয়েছে। আমর ইবনে শুআইব (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে امرنا শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । দ্বিতীয়ত হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীস বিতর ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ বহন করে। এ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ الوتر حق على كل مسلم "বিতর আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর হক বা কর্তব্য"। হক-এর আদায় যেহেতু ওয়াজিব, তাই এরদ্বারাও বিতর ওয়াজিব বলে প্রমাণিত হয়। আবূ দাউদ শরীফে ইবনে বুরায়দা (রা) থেকে একই হাদীস বর্ণিত আছে। এতে কিছু অতিরিক্ত রয়েছে ঃ فمن لم يوتر فليس منا "যে বিতর আদায় করে না, সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়।" এ বাক্যটি তিনি তিনবার বলেছেন। সুতরাং এরূপ কঠোর হুশিয়ারী এবং উচ্চস্বরে তা তিনবার উচ্চারণ করা বিতর ওয়াজিব হওয়াকে প্রমাণিত করে। মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে امرنا শব্দ বর্ণিত আছে যা ওয়াজিব হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে। হযরত ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন, কোন এক ব্যক্তি হযরত ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, বিতর কি ওয়াজিব ? তিনি বলেন ঃ বিতর হুযূর (সা) ও মুসলমানগণ পড়েছেন। প্রশ্নকারী পুনরায় একই প্রশ্ন করেন। তিনিও একই জওয়াব প্রদান করেন। তিনবার একই ধরনের প্রশ্ন ও উত্তর চলে। এরদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতর ওয়াজিব। অধিকন্তু এ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি এ কথা বলতে চেয়েছেন যে, আঁ হযরত (সা) এবং মুসলমানগণ যখন সর্বদা এই নামায আদায় করেছেন, তা হলে কেন এটা ওয়াজিব হবে না ? সুতরাং এই সমস্ত রিওয়ায়েতের বাক্যসমূহ কোনটা সুস্পষ্ট, কোনটা ইঙ্গিতে বিতর ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে প্রকাশ্য ও স্পষ্ট দলীল- যাতে কোন সন্দেহ নেই।

١٥٤ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْوِتْرِ اَحَقٌّ هُوَ قَالَ اَمَّا كَحَقِّ الصَّلٰوةِ فَلاَ وَلٰكِنْ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلاَ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ اَنْ يَتْرُكَه -

হাদীস নং-১৫৪

অনুবাদ ঃ হযরত আসিম ইবনে যামরাহ্ (রা) বলেন ঃ আমি হযরত আলী (রা)- এর নিকট বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, এই নামায কি হক (ওয়াজিব বা ফরয) ? তিনি বলেন ঃ অন্যান্য নামাযের মত হক (ফরয) নয়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাত। সুতরাং এই নামায ত্যাগ করা কারো জন্য উচিত নয়।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীস বিতরের গুরুত্ব প্রমাণ করে। যদিও তা ফরযের মত অকাট্য দলীল (دليل قطعى) দ্বারা প্রমাণিত নয় বলে ফরয হয়নি, তবে নবী করীম (সা)-এর সুন্নাতের দ্বারা প্রমাণিত বলে তা অবশ্যই ওয়াজিব। ফলে এটা ত্যাগ করা কারো জন্য জায়েয নয়।

١٥٥ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ يَقْرَأُ فِى الاُوْلٰى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ -

وَفِى رِوَايَةٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَةِ الاُوْلٰى مِنَ الْوِتْرِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ -

وَفِى رِوَايَةٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ -

হাদীস নং-১৫৫

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিতরের তিন রাকাআত আদায় করতেন। প্রথম রাকাআতে سبح اسم ربك الاعلى, দ্বিতীয় রাকাআতে قل يايها الكفرون এবং তৃতীয় রাকাআতে قل هو الله احد তিলাওয়াত করতেন।

অন্যএক রিওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিতরের প্রথম রাকাআতে الحمد لله এবং سبح اسم ربك الاعلى, দ্বিতীয় রাকাআতে الحمد لله এবং قل يايها الكفرون এবং তৃতীয় রাকাআতে قل هو الله احد এবং الحمد لله তিলাওয়াত করতেন।

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিতর তিন রাকাআত পড়তেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসের প্রেক্ষাপটে বিতর কত রাকাআত, এটা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বিতর তিন রাকাআত এবং ইমাম মালিক (রা) ও ইমাম শাফিঈ (র) বিতর এক রাকাআতের পক্ষে মত পোষণ করেছেন। উভয় দল বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হযরত ইবনে উমর (রা)-এর হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। বাক্য বিভিন্ন হলেও এ সবের অর্থ প্রায় নিকটবর্তী। যেমন এক ব্যক্তি হুযূর (সা)-এর নিকট রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন ঃ مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فصل ركعة توتر لك صلوتك "(রাতের নামায) দু'-দু'রাকাআত, যখন তুমি ভোর হওয়ার আশংকা কর, তখন এক রাকাআত পড়ে নাও। এতে তোমার নামায বিতর (বেজোড়) হয়ে যাবে।" অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে ঃ فاوتروا بواحدة "এক রাকাআত মিলিয়ে দু'রাকাআতকে বিতর করে নাও।"

ইমাম আবূ হানীফা (র) স্বীয় মযহাবের স্বপক্ষে কতিপয় জোরালো দলীল পেশ করেছেন। প্রথমতঃ হাদীস يوتر بثلث "আঁ হযরত (সা) বিতর তিন রাকাআত পড়তেন।" অতঃপর প্রত্যেক রাকাআতের জন্য পৃথক কিরাআত নির্ধারিত ছিল এবং পৃথক তাহরিমা ব্যতীত তৃতীয় রাকাআত মিলিয়ে পড়ার বিধান জারী ছিল। দ্বিতীয়তঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফের শর্ত অনুয়ায়ী হাকেম হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلث لايسلم الا فى اخرهن "রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিতর তিন রাকাআত পড়তেন এবং শেষে সালাম ফিরাতেন।" তৃতীয়তঃ নাসাঈ শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে– "নবী করীম (সা) বিতরের দু' রাকাআতে সালাম ফিরাতেন না।" চতুর্থতঃ দারে কুতনী হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلوة المغرب "রাতের বিতর নামায হলো তিন রাকাআত যেমন দিনের বিতর নামায মাগরিব হলো তিন রাকাআত।" এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এই হাদীস মরফূ, সহীহ্ নয়। সুফিয়ান সাওরী ও অন্যান্য আইম্মা এটি মওকূফ (موقوف) হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এখানে বলা যায়, হাদীসে মওকূফও দলীল হওয়ার মর্যাদা রাখে। সুতরাং তৃতীয় রাকাআতকে প্রথম দু'রাকাআত থেকে পৃথক করার কোন সুযোগ নেই। অতঃপর এই মতের স্বপক্ষে আরো দলীল হলো এই যে, ইমাম তাহাবী আবূ খালিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবুল আলিয়াকে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেছেন ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা) আমাদেকে মাগরিবের নামাযের মত বিতর শিক্ষা দিয়েছেন। এটা হলো রাতের বিতর এবং মাগরিব হলো দিনের বিতর। পঞ্চমতঃ ইমাম বুখারী (র) কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ আমরা লোকদেরকে বিতরের তিন রাকাআত পড়তে দেখেছি। ষষ্ঠতঃ হযরত উমর (রা)-এর আমলও এটাই ছিল। হাকেম মুস্তাদরাক নামক গ্রন্থে হাবীবে মুআল্লিম থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসান (রা)-এর নিকট বলেন ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) বিতরের দু'রাকাআতের পর সালাম ফিরিয়ে থাকেন। হযরত হাসান (রা) বলেন ঃ হযরত উমর (রা) হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে অধিক ফকীহ্ ছিলেন। তিনি দু'রাকাআতের পর তাকবীর বলে উঠে যেতেন। সপ্তমতঃ ইবনে আবী শায়বা হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ اجتمع المسلمون على ان الوتر ثلث لا يسلم الا فى اخر منها "জমহুর মুসলমান এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বিতর হলো তিন রাকাআত এবং নামায শেষ করা ব্যতীত কেউ সালাম ফিরায়নি।" এরপর ইমাম মুহাম্মদ (র) মুয়াত্তায় হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, এক রাকাআত কখনো যথেষ্ট নয় এবং উভয় ইমামের দলীল দেখা যেতে পারে। فاوتر بواحدة অথবা تُوْتِرْ لَكَ صَلوتكَ যদি উপরোক্ত দু'হাদীস শাফিঈ ও মালিকী মাযহাবের দলীল হয়, তা হলে হানাফী মাযহাবেরও এই হাদীস দলীল হবে। কেননা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, ঐ দু'রাকাআত নামাযের সাথে এক রাকাআত মিলিয়ে তিন রাকাআত বিতর করে নাও। কিন্তু নতুন তাহরীমার মাধ্যমে বিতরকে এক রাকাআত হিসেবে পৃথক আদায় করে নেয়া– এটা হাদীসের অর্থ নয়। এটা শুধু মনের খেয়াল ও ধারণা। অতঃপর এরূপ শব্দ, যাতে উভয় অর্থের প্রকাশ পায়, তা কিভাবে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে ? বিশেষ করে বিরোধী

পক্ষের নিকট যখন সুস্পষ্ট মরফূ' ও মওকূফ সহীহ্ হাদীস রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ فاذا خشيت الصبح এর দৃষ্টিকোণ থেকে ভোরে সূর্য উদয় হওয়ার আশংকার সাথে সম্পৃক্ত। বস্তুত এই নির্দেশ শর্ত না পাওয়ার ফলে অকার্যকর হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে তৃতীয় পদ্ধতি জায়েয নয় এবং দু'রাকাআতের পর নতুন তাহ্রিমার মাধ্যমে পৃথক করে এক রাকাআত পড়া জায়েয নয়।

١٥٦ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْيَامِىْ عَنْ اَبِىْ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقْرَأُ فِىْ وِتْرِهِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ فِى الثَّانِيَةِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فِى الثَّالِثَةِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ فِى الرَّكْعَةِ الاُوْلٰى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَعْنِىْ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ فَهٰكَذَا فِىْ قِرَائَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ فِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ فِى الرَّكْعَةِ الاُوْلٰى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ كَانَ يُوتِرُ بِثَلٰثِ رَكْعَاتٍ يَقْرَأُ فِيْهَا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ -

হাদীস নং-১৫৬

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় বিতর নামাযে (প্রথম রাকাআতে) سبح اسم ربك الاعلى , দ্বিতীয় রাকাআতে قل يايها الكافرون এবং তৃতীয় রাকাআতে قل هو الله احد তিলাওয়াত করতেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের প্রথম রাকাআতে قل অর্থাৎ قل للذين كفروا , দ্বিতীয় রাকাআতে سبح اسم ربك الاعلى তিলাওয়াত করতেন। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) এরূপ পাঠ করেছেন, يايها الكافرون এবং তৃতীয় রাকাআতে قل هو الله احد পাঠ করতেন।

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা) বিতর নামাযের প্রথম রাকআতে سبح اسم ربك الاعلى , দ্বিতীয় রাকআতে قل يايها الكافرون এবং তৃতীয় রাকআতে قل هو الله احد পাঠ করতেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সা) বিতরের তিন রাকাআত আদায় করতেন। প্রথম রাকাআতে سبح اسم ربك الاعلى, দ্বিতীয় রাকাআতে قل يايها الكافرون এবং তৃতীয় রাকাআতে قل هو الله احد তিলাওয়াত করতেন।

١٥٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ فَصْلَ فِى الْوِتْرِ –

হাদীস নং-১৫৭

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ বিতর নামাযে (শেষ রাকআতের মাঝে নতুন তাহরিমার মাধ্যমে) কোন বিভক্তি নেই।

١٥٨ – اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ الْوِتْرُ اَوَّلَ اللَّيْلِ سَخَطَةً لِلشَّيْطَانِ وَاَكْلُ السَّحُوْرِ مَرْضَاةَ الرَّحْمٰنِ –

হাদীস নং-১৫৮

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ প্রথম রাতের বিতর শয়তানকে ক্রোধান্বিত করে এবং (মধ্যরাতে) সেহরী খাওয়া আল্লাহ্ রাহমানুর রাহীমের সন্তুষ্টির উপায়।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম রাতের বিতর এই জন্য শয়তানের ক্রোধের কারণ যে, এরদ্বারা তার সমস্ত আশা-আকাঙক্ষা এবং ধোকা দেওয়ার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়। যদি নামাযী শুয়ে যায় এবং গভীর নিদ্রার কারণে বিতর কাযা হয়ে যায়, তা হলে বিতরের মত গুরুত্বপূর্ণ নামায বাদ দেওয়ার কারণে শয়তান আনন্দ লাভ করে। কিন্তু প্রথম রাতে বিতর আদায় করা হলে শয়তান অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হয়।

সেহরীর ফযীলত সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। প্রথমত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ فى اكل السحور بركة অর্থাৎ "সেহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে।" একদিকে নবী করীম (সা)-এর অনুসরণের মধ্যে বরকত ও মঙ্গল রয়েছে, অপরদিকে সেহরী খাওয়ার ফলে রোযা পালনকারী দুর্বল হয় না। সুস্থ ও সবল দেহে ইবাদত ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

١٥٩ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِىْ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الاَنْصَارِىِّ (رضـ) قَالَ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَاَوْسَطَه وَاٰخِرَه لِكَىْ يَكُوْنَ وَاسِعًا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَىَّ ذٰلِكَ اَخَذُوْا بِه كَانَ صَوَابًا غَيْرَ اَنَّه مَنْ طَمَعَ لِقِيَامِ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ وِتْرَه فِى اٰخِرِ اللَّيْلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ اَفْضَلُ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِىْ عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَاَبِىْ مُوْسٰى الاَشْعَرِىِّ اَنَّهُمَا قَالاَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ اَحْيَانًا اَوَّلَ اللَّيْلِ وَ اَوْسَطَه وَ اٰخِرَه لِيَكُوْنَ سَعَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ -

হাদীস নং-১৫৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম রাতে, মধ্যরাতে এবং শেষরাতে বিতর নামায আদায় করেছেন, যাতে এ নামায আদায় করার জন্য মুসলমানদের দীর্ঘ সময় হাতে থাকে। এর মধ্যে যে কোন এক সময় এই নামায আদায় করলেই চলবে। অবশ্য যে ব্যক্তির রাতে (তাহাজ্জুদের জন্য) জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে একান্ত ভরসা থাকে, তার জন্য শেষরাতে বিতর পড়া উচিত। কেননা তাহলে (এরূপ ব্যক্তির জন্য) শেষরাতে বিতর পড়া উত্তম।

অন্য এক রিওয়ায়েতে হযরত উকবা ইবনে আমির (রা) এবং হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো প্রথম রাতে, কখনো মধ্যরাতে এবং কখনো শেষরাতে বিতর আদায় করতেন। যাতে এ বিষয়ে মুসলমানগণ স্বাধীন থাকে এবং যথেষ্ট সময় হাতে থাকে (যার ফলে এই তিনটি সময়ের যে কোন একটি সময়ে বিতর আদায় করা হলে তা সুন্নত অনুযায়ী আদায় হবে)।

ব্যাখ্যা ঃ হুযূর (সা) স্বীয় আমলের দ্বারা বিতরের জন্য দীর্ঘ সময়ের সুযোগ করে দিয়েছেন, ফলে রাতের যে কোন অংশে তা আদায় করলে সুন্নতের অনুসরণ করা হবে। দ্বিতীয়তঃ শেষরাতে বিতর আদায় করার ফযীলত অধিক। কেননা সহীহ হাদীসসমূহে এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে ঃ فان قرأة القران فى اخر لليل محضورة وهى فضل "শেষরাতের তিলাওয়াতে কুরআনের সময় ফিরিশতা হাযির হয়ে থাকেন এবং এটা অধিক ফযীলতের কারণ।"

بَابُ سَجْدَتِى السَّهْوِ

সাহু সিজদার (ভুলের সিজদা) বিবরণ

١٦٠ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلّٰى صَلٰوةً اِمَّا الظُّهْرَ وَ اِمَّا الْعَصْرَ فَزَادَ اَوْ نَقَصَ فَلَمَّا فَرَغَ وَ سَلَّمَ فَقِيْلَ لَه لِحَدَثٍ فِى الصَّلٰوةِ اَمْ نَسِيْتَ قَالَ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا اُنْسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِىْ ثُمَّ حَوَّلَ وَجْهَه اِلَى الْقِبْلَةِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ وَ تَشَهَّدَ فِيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِه وَ عَنْ شِمَالِه -

হাদীস নং-১৬০

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার যোহর অথবা আসর নামায পড়ালেন এবং এতে কিছু হ্রাস অথবা বৃদ্ধি করেন। যখন তিনি নামায শেষ করলেন এবং সালাম ফিরালেন তখন তাঁর নিকট আরয করা হলো, হযরত! নামাযে কি কোন নতুন আহকাম জারী হলো, না কি হুযূর (সা) ভুলে গিয়েছেন? তখন তিনি ইরশাদ করেন ঃ আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। সুতরাং আমাকে যখন ভুলিয়ে দেওয়া হয়, তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। অতঃপর তিনি কিবলার দিকে মুখ করে ভুলের জন্য দুটি সিজদা আদায় করেন এবং এতে তাশাহহুদ পাঠ করেন। এরপর ডানে ও বামে সালাম ফিরান।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, হুযূর (সা) কথা বলার পর কিভাবে সাহু সিজদা আদায় করলেন ? কেননা নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলা জায়েয নেই, এরদ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যায়। সিজদায়ে সাহুর পরিবর্তে নামায পুনরায় আদায় করতে হয়। এর জওয়াব হলো এই যে, এ ঘটনা ঐ সময়ের, যখন নামাযে কথা বলা জায়েয ছিল। এরদ্বারা নামায ফাসেদ হতো না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমাম শাফিঈ (র) বলেছেন ঃ হুযূর (সা) ইচ্ছাকৃত নয়; বরং ভুলে কথা বলেছেন ; ভুলে কথা বলা জায়েয। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র)-এর এই বর্ণনা সঠিক নয়। কেননা যদি নবী করীম (সা)-এর এই কথা বলাকে ভুল হিসেবে গণ্য করা হয়, যুলইয়াদাইন (ذو اليدين) অথবা অন্যান্য সাহাবীগণ যখন কথা বলেন, তাহলে তখন তাঁদের নামায দ্বিতীয়বার আদায় করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। অথচ হুযূর (সা) তাঁদেরকে পূনর্বার নামায আদায় করার নির্দেশ দান করেননি। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, তাঁদের নামাযও পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু মুকতাদী যেহেতু ইমামের আওতাধীন, তাই তাঁদের নামাযে কোন ত্রুটি হয়নি। এ অবস্থায় ইমামের নামায ত্রুটিমুক্ত ও পবিত্র

থাকে। কেননা মুকতাদীর নামায ফাসেদ হওয়ার কারণে ইমামের নামায ফাসেদ হয় না, শুধু মুকতাদীর নামাযই ফাসেদ হয়ে থাকে।

بَابُ سَجِدَةُ التِّلَاوَةِ

সিজদায়ে তিলাওয়াতের বর্ণনা

١٦١ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ سَمَاكٍ عَنْ عِيَاضٍ الاَشْعَرِىْ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىْ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَجَدَ فِىْ ص -

হাদীস নং-১৬১

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) সূরায়ে সাদ (ص)-এ সিজদা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের অনুসরণ করে হুযূর (সা) এই সিজদা আদায় করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মালিক (র) এই আয়াতকে সিজদার আয়াত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র) তা সিজদার আয়াত হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তিনি বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। এতে বলা হয়েছে, সূরায়ে সাদ (ص) -এর সিজদা আবশ্যকীয় নয়। দ্বিতীয়তঃ আবূ দাউদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবা পড়ার সময় সূরায়ে সাদ (ص) তিলাওয়াত করেন এবং সিজদা আদায় করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও সিজদা আদায় করেন। পুনরায় তিনি একই আয়াত তিলাওয়াত করেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম সিজদার জন্য তৈরি হলেন, অতঃপর হুযূর (সা) বলেন, এটা তো ছিল নবীর তওবা। কিন্তু উপরোক্ত দু'হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে মাযহাব প্রমাণিত হয় না। আবশ্যকীয় (عزائم) না হওয়ার অর্থ ফরযের মধ্যে গণ্য নয়; বরং ওয়াজিব হিসেবে গণ্য– যা শুকরিয়া হিসেবে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের ইকতিদা (اقتدا) বা অনুসরণে ওয়াজিব হয়েছে। তৃতীয়তঃ হাদীসে যে সিজদার কথা বলা হয়েছে, এটা হলো নবী করীম (সা)-এর সিজদা, এটাও এর ওয়াজিব হওয়াকে বাতিল করে না। কেননা সমস্ত ফরয এবং ওয়াজিবসমূহ আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্যই ফরয বা ওয়াজিব করা হয়েছে। সুতরাং এটা এগুলোর মধ্যে একটি। ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আহমদ (র)-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। তিনি বকর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযনী (র) -এর সূত্রে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে সূরায়ে সাদ (ص) লিখছিলাম। যখন সিজদার আয়াতে পৌঁছলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, দোয়াত-কলম সহ যা কিছু আশেপাশে বিদ্যমান ছিল, সমস্ত কিছুই মাথানত করে সিজদা দিচ্ছে। এই ঘটনা আমি হুযূর

(সা)-এর নিকট বর্ণনা করি। এরপর থেকে আঁ হযরত (সা) সিজদা করতে থাকেন। এরদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ঘটনার পর সিজদার এই আমল অব্যাহত থাকে।

بَابُ مَنْعِ الْكَلَامِ فِى الصَّلٰوةِ

নামাযে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ

١٦٢ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّه لَمَا قَدِمَ مِنَ الارْضِ الْحَبْشَةِ سَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سَخَطِ نِعْمَةِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَىَّ قَالَ اِنْ فِى الصَّلٰوةِ لَشُغْلاً قَالَ فَلَمْ نَرُدُّ السَّلَامَ عَلٰى اَحَدٍ مِنْ يَوْمَئِذٍ -

হাদীস নং-১৬২

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন আবিসিনিয়া হতে আগমণ করেন, তখন হুযূর (সা)-কে সালাম পেশ করেন। এই সময় তিনি নামাযে মগ্ন ছিলেন। সুতরাং তিনি সালামের জওয়াব দান করেন নি। যখন তিনি নামায থেকে অবসর হলেন, তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর নিয়ামত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্রোধ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। নবী করীম (সা) বললেন ঃ আশ্রয় চাওয়ার কারণ কি ? হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) আরয করলেন, আমি আপনাকে সালাম পেশ করেছি কিন্তু আপনি এর জওয়াব দান করেন নি (এর ফলে আমি চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছি)। তখন নবী (সা) বলেন ঃ নিশ্চয়ই নামাযে আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়ে থাকে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এরপর থেকে আমরা নামাযের মধ্যে কারো সালামের জওয়াব দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযের মধ্যে কথাবার্তা এবং সালামের জওয়াব দেওয়া জায়েয ছিল। ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে সাথে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাই ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণনা যে, ইসলামের প্রথম যুগে আমরা নামাযে লোকের সাথে কথাবার্তা

বলতাম। কিন্তু যখন পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ وقوموا لله قانتين (আল্লাহ্‌র জন্য নামাযে চুপ হয়ে দাঁড়াও) নাযিল হয়, তখন আমাদের উপর চুপ থাকার নির্দেশ হয় এবং আমরা নামাযে কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দেই। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) আবিসিনিয়া গমনের পূর্বে নামাযে কথাবার্তা ও সালামের জওয়াব দেওয়ার বিধান ছিল। যখন তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন, তখন তাঁর মনে পূর্ববর্তী বিধানের কথা স্মরণ ছিল। অথচ ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী বিধান রহিত হয়ে নামাযে চুপ থাকার বিধান (وقوموا لله قانتين) নাযিল হয়। হুযূর (সা)-এর পক্ষ থেকে যখন সালামের জওয়াব পাওয়া যায়নি, তখন হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, তাঁর কোন আচরণের কারণে হুযূর (সা) কোন প্রকার মনঃক্ষুণ হলেন কিনা। তাই প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, নামাযে যেহেতু সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগ ও একাগ্রতা সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাই নামাযে কথাবার্তা বলা হলে ঐ একাগ্রতা বিনষ্ট হয়ে যায়। তবে প্রথম যুগে তা জায়েয ছিল এবং পরে রহিত হয়ে যায়।

١٦٣ – اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَ اَنَا نَائِمَةٌ اِلَى جَنْبِهِ وَ جَانِبُ الثَّوْبِ وَاقِعٌ عَلَىَّ –

হাদীস নং-১৬৩

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন,নবী করীম (সা) রাতে নামায আদায় করতেন এবং আমি তাঁর পাশে এই অবস্থায় শুয়ে থাকতাম যে, কাপড়ের একটি অংশ আমার উপর পড়ে থাকত।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফে এভাবে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) রাতে নামায আদায় করতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এই সময় আমি হুযূর (সা) এবং কিবলার মধ্যে জানাযার মত শুয়ে থাকতাম। এরদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আয়েশা (রা) হুযূর (সা)-এর সামনে শুয়েছিলেন। কিন্তু উপরে বর্ণিত হাদীসে (পাশে) শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এখানে শব্দের অর্থ সামনে গ্রহণ করা হলে সমস্ত রিওয়ায়েতের একই অর্থ হতে পারে। অথবা এর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে যে, হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ডান অথবা বাঁ পাশে শায়িত ছিলেন।

এই মাসয়ালার দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসের ব্যাখ্যা পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে।

بَابُ التَّسْبِيْحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقِ لِلنِّسَاءِ

নামাযে ভুল প্রকাশ করার জন্য পুরুষের তাসবীহ্ এবং মহিলাদের হাতে তালি দেওয়া

١٦٤ – اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَنَّ فِى الصَّلٰوةِ اِذَانَا بِهِمْ فِيْهِ شَئٌ اَلتَّسْبِيْحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقَ لِلنِّسَاءِ -

হাদীস নং-১৬৪

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযের মধ্যে এই পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন তাদের (মুকতাদীদের) নামাযে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় (যার উপর ইমামকে সংকেত প্রদান করতে হবে), তা হলে পুরুষদের জন্য তাসবীহ্ অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ্ বা আল্লাহু আকবর বলতে হবে এবং মহিলাদের জন্য হাতের উপর হাত রেখে আওয়ায দিতে হবে।

ব্যাখ্যা ঃ মহিলাদের জন্য উচ্চস্বরে আওয়ায করে তাসবীহ্ বলা এইজন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, যাতে তাদের আওয়ায অন্য পুরুষ শুনতে না পায়। তাই কোন কোন আলিমের মতে মহিলাদের কণ্ঠস্বরও সতরের (গোপন অঙ্গের) মধ্যে গণ্য।

بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ وَمَا لاَ يَقْطَعُ

নামাযে কিসের দ্বারা ভঙ্গ হয় এবং কিসের দ্বারা ভঙ্গ হয় না

١٦٥ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ (رضـ) عَمَّا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ فَقَالَتْ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ تَزْعَمُوْنَ الصَّلٰوةَ قَرَنْتُمُوْنَا بِهِمْ اِدْرَأُوْا مَا اسْتَطَعْتَمْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّى وَ اَنَا نَائِمَةٌ اِلٰى جَنْبِهِ عَلَيْهِ ثَوْبٌ جَانِبُهُ عَلَىَّ -

হাদীস নং-১৬৫

অনুবাদ ঃ হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ হযরত আয়েশা (রা)-কে ঐ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যা দ্বারা (নামাযীদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার ফলে) নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। তিনি বললেন, হে ইরাকবাসী! তোমরা মনে করেছ গাধা, কুকুর ও বিড়াল (নামাযীদের) সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। সম্ভবত তোমরা আমাদেরকে (মহিলাদের) তাদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছ। যতটুকু সম্ভব নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াতকারীকে বাধা প্রদান কর। কেননা নবী করীম (সা) নামায আদায় করতেন এবং আমি তাঁর পাশে শুয়ে থাকতাম। তাঁর কাপড়ের একটি অংশ আমার উপর পড়ে থাকত।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত বিষয়ে সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সা) বলেছেন ঃ নামাযীর সামনে যদি সুতরা (سترة) না থাকে, তা হলে মহিলা, গাধা ও কাল কুকুর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। এই হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে জাহিরীয়াদের মাযহাব হলো এই যে, এগুলো নামাযীদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নামায ভঙ্গের কারণ। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাব এর বিরোধী। ইমাম আহমদ (র) মহিলা ও গাধার ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত প্রদান করেন নি, তবে কুকুরকে নামায ভঙ্গের কারণ বলে মতামত পেশ করেছেন। মূলত এটাই হলো ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্যের মূল কারণ।

এবার ইমামগণের দলীল নিয়ে আলোচনা করা যায়। যে হাদীসের দ্বারা উপরোক্ত তিনজন ইমাম নামায ভঙ্গের হাদীসের রহিত হওয়া বা এর ব্যাখ্যা (تاويل) করে থাকেন, তাঁদের সামনে এই হাদীসের বিপরীতে অন্যান্য সহীহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো সহীহ ছয় কিতাবের মধ্যে সামান্য শাব্দিক পার্থক্যের সাথে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে অন্যতম। যার মধ্যে কারো কোন সমালোচনা নেই। এই হাদীসে মহিলাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা পেশ করা হয়েছে যে, কোন মহিলার নামাযরত ব্যক্তির পাশে অবস্থান বা যাতায়াতের কারণে নামায ভঙ্গ হয় না। হুযূর (সা)-এর আমল এ বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গাধা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন ঃ আমি একবার এমন সময় আঁ হযরত (সা)-এর দরবারে আগমণ করলাম যখন তিনি নামায আদায় করছিলেন, তখন আমি কাতারের সামনে গাধাটি ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু এর প্রতি তিনি কোন গুরুত্ব দেননি।

এবার কুকুর সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। নামায ভঙ্গের হাদীসে কুকুরের বর্ণনা امرأة و حمار (মহিলা ও গাধা)-এর উপর করা হয়েছে। সুতরাং এই সংযোগের (عطف) কারণে কুকুরের বিধানও মহিলা এবং গাধা সম্পর্কীয় বিধানের আওতাভুক্ত হয়েছে। ইমাম আহমদ (র) নামায ভঙ্গ না হওয়ার হাদীসের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহিলা ও গাধার ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদান করতে পারেননি। অবশ্য কুকুর সম্পর্কে যেহেতু তিনি কোন বিরোধী হাদীস দেখতে পাননি, তাই তিনি কুকুরের কারণে নামায ভঙ্গের ব্যাপারে মতামত পেশ করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী এর গূঢ় রহস্য সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অন্যান্য আইম্মায়ে কিরাম হাদীসে নামায ভঙ্গের দ্বারা নামাযে ভীতি ও একাগ্রতা দূরীভূত হওয়াকে বুঝিয়েছেন, প্রকৃতই নামায ভঙ্গ হওয়া নয়।

بَابُ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

সূর্য গ্রহণের নামায

١٦٦ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا وَاحْمَدُوا اللّٰهَ وَكَبِّرُوْهُ وَسَبِّحُوْهُ حَتّٰى يَنْجَلِىَ اَيُّهُمَا انْكَسَفَ ثُمَّ نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ -

হাদীস নং-১৬৬

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুত্র হযরত ইবরাহীমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হয়। তখন তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করে বলেন ঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর চিহ্নসমূহের মধ্যে একটি চিহ্ন। এতে কারো মৃত্যু বা কারো জন্মের কারণে গ্রহণ লাগে না। সুতরাং যখন তোমরা এতে গ্রহণ লাগতে দেখ, তখন নামায পড়, আল্লাহ্র হাম্দ বর্ণনা কর, তাকবীর বল, তাসবীহ পড়, যার ফলে গ্রহণ দূরীভূত হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করেন এবং দু'রাকাআত (কুসুফের নামায) আদায় করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের দ্বারা সূর্য গ্রহণের নামায প্রমাণিত হয়। এই নামায আদায়ের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। পরবর্তী হাদীসে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

١٦٧ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامًا طَوِيْلاً حَتّٰى ظَنُّوْا اَنَّه لاَ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوْعُه قَدْرَ قِيَامِه ثُمَّ رَفَعَ رَأسَه فَكَانَ قِيَامُه قَدْرَ رُكُوْعِه ثُمَّ سَجَدَ قَدْرَ قِيَامِه ثُمَّ جَلَسَ فَكَانَ جُلُوْسُه بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَدْرَ سُجُوْدِه ثُمَّ سَجَدَ قَدْرَ جُلُوْسِه ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ مِنْهَا بَكٰى فَاشْتَدَّ بُكَاؤُه فَسَمِعْنَاه وَهُوَ يَقُوْلُ اَلَمْ تَعِدْنِىْ اَنْ لاَ تُعَذِّبَهُمْ وَاَنَا فِيْهِمْ ثُمَّ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ اَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِمَا عِبَادَه لاَ يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِه فَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِىْ اُدْنِيْتُ مِنَ الْجَنَّةِ حَتّٰى لَوْ شِئْتُ اَنْ اَتَنَاوَلَ غُصْنًا مِنْ اَغْصَانِ شَجَرِهَا فَعَلْتُ وَلَقَدْ رَاَيْتُنِىْ اُدْنِيْتُ مِنَ

النَّارِ حَتّٰى جَعَلْتُ اَتَّقِىْ وَلَقَدْ رَأَيْتُ سَارِقَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ سَارِقَ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ يُعَذَّبُ بِالنَّارِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيْهَا عَبْدَ بْنَ دَعْدَعٍ سَارِقَ الْحُجَّاجِ بِمِحْجَنَةٍ وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيْهَا امْرَأَةً اَدْمَاءَ حِمْيَرِيَّةً تُعَذَّبُ فِى هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ الاَرْضِ وَ حَشَرَاتِهَا *

وَفِىْ رِوَايَةٍ نَحْوَه وَ فِيْهِ لَقَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ بْنَ دَعْدَعٍ سَارِقَ الْحَجَّاجِ بِمِحْجَنَةٍ فَكَانَ اِذَا خَفِىَ ذَهَبَ وَ اِذَا رَأَى اَحَدٌ قَالَ اِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِىْ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ كَانَ اِذَا خَفِىَ لَه شَىْءٌ ذَهَبَ بِه وَ اِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ قَالَ اِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِىْ -

হাদীস নং-১৬৭

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা)-এর পুত্র হযরত ইবরাহীম (রা)-এর ইনতিকালের দিন সূর্য গ্রহণ হয় (লোকজন বলতে থাকে যে, হযরত ইবরাহীমের ইন্তিকালের কারণেই সূর্য গ্রহণ লেগেছে)। নবী করীম (সা) নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে (قيام) থাকেন যে, যার ফলে লোকজন মনে করেন তিনি রুকূ' করবেন না। অতঃপর তিনি রুকূ'র মধ্যে কিয়ামের (قيام) মত দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। এরপর রুকূ' থেকে পবিত্র মাথা উত্তোলন করেন এবং রুকূর মত দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করেন। অতঃপর সিজদা করেন এবং কিয়ামের মত দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। এরপর তিনি বসেন এবং এই দু'সিজদার মধ্যে বসায় সিজদার মত দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। অতঃপর বসার ন্যায় দীর্ঘক্ষণ সিজদা করেন। এরপর প্রথম রাকাআতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকাআত আদায় করেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতের সিজদায় গিয়ে তিনি তীব্রভাবে কাঁদতে থাকেন। আমরা তাঁকে এই বলতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ্! তুমি কি আমার নিকট এই ওয়াদা করনি যে, তুমি তাদেরকে আযাব দেবে না যতক্ষণ আমি তাদের মধ্যে অবস্থান করি। অতঃপর তিনি বসেন এবং তাশাহহুদ পাঠ করেন। এরপর নামায শেষ করেন এবং আমাদের দিকে মুখ করে ইরশাদ করেন ঃ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ আল্লাহ্র চিহ্ন ও প্রমাণসমূহের মধ্যে একটি প্রমাণ। আল্লাহ্ এরদ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকেন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয় না। সুতরাং এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হলে নামায আদায় কর (এবং আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর)। নিঃসন্দেহে আমি দেখেছি, বেহেশত আমার এমনি নিকটবর্তী করা হয়েছিল যে, যদি আমি ইচ্ছে করতাম তা হলে এর বৃক্ষসমূহের কোন একটি

বৃক্ষের ডাল আমার দিকে নিয়ে আসতে পারতাম। আবার আমি দেখেছি, দোযখ আমার এমন নিকটবর্তী করা হয়েছিল যে, আমি এর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করেছি। এছাড়া আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চোর (অর্থাৎ যারা তাঁর লাশ চুরি করতে চেয়েছিল) অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, আমি রাসূলের ঘরের চোরকে শাস্তি দিতে দেখেছি। আমি আরো দেখেছি, আবদা ইবনে দা'দা' (عَبْدَ بن دَعْدَعْ) নামক এক ব্যক্তিকে, যে হাজীদের কাপড় ইত্যাদি তার বাঁকা লাকড়ির দ্বারা চুরি করেছে, আমি আরো দেখেছি যে, হিমায়ার গোত্রের একজন সুন্দরী মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কারণ সে ঐ বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, এটাকে কোন খাদ্যও দেয়নি আবার ছেড়েও দেয়নি যাতে বিড়ালটি মাটি থেকে পোকা-মাকড় খেতে পারে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে একই ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এতে বর্ণিত আছে, আমি আবদা ইবনে দা'দা' নামক এক ব্যক্তিকে দেখেছি যে তার বাঁকা লাঠি দ্বারা হাজীদের কাপড় চুরি করে থাকে। যদি কেউ না দেখে, তা হলে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যদি কেউ দেখে ফেলে, তা হলে বলে, আমার বাঁকা লাঠির সাথে এটা আটকিয়ে গেছে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, যদি কোন বস্তু কারো দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে যেত, তখন সে তা নিয়ে যেত এবং যখন তা কেউ দেখে ফেলত, তখন বলত, এটা আমার লাঠির সাথে আটকে গেছে।

ব্যাখ্যা ঃ কুসূফের নামায আদায়ের পদ্ধতি অর্থাৎ প্রতি রাকাআতে এক রুকূ' অথবা দু'রুকূ আদায় করতে হবে এটা নিয়ে হযরত ইমাম শাফিঈ (র), ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে প্রতি রাকাআতে দু'টি রুকূ' আদায় করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) অন্যান্য নামাযের মত প্রতি রাকাআতে একটি রুকূ' আদায় করার পক্ষে মতামত পেশ করেছেন্। ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম মালিক (র) সিহাহ্ সিত্তাহ গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত রুকূর সংখ্যা সম্পর্কিত এই হাদীসে দ্বিধা ও সংশয় রয়েছে। যার ফলে এই হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন হযরত আয়েশা (রা) থেকে দু' এবং তিন রুকূর কথাই হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত জাবির (রা) থেকে দু' এবং তিন রুকূর কথা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে চার রুকূর রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে, হযরত উবাই (রা) থেকে পাঁচ রুকূর কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। সুতরাং হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) বাধ্য হয়ে হুযূর (সা)-এর বর্ণনা ও আমলের (قولى و فعلى) সাথে সংযুক্ত ঐ সমস্ত রিওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন, কিয়াসের সাথেও যার মিল রয়েছে। قولى হাদীস নাসাঈ শরীফে হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ اذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كاحدث صلوه صليتموها من المكتوبة "যখন সূর্য অথবা চন্দ্র গ্রহণ হয়, তখন তোমরা এরূপভাবে নামায পড় যেরূপ তোমরা কিছুক্ষণ পূর্বে (ফজর) নামায আদায় করেছ।" কেননা হযরত সামুরা (রা) বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী এমন সময় গ্রহণ লেগেছিল যখন সূর্য দু'বর্শা পরিমাণ উপরে উঠেছিল। فعلى হাদীস হিসেবেও এই হাদীস দলীল রূপে পেশ

করা হয়েছে। কেননা এতে এক রুকূর কথা প্রমাণিত আছে। এরপর সম্ভবত অত্যাধিক ভীড়ের কারণে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। হুযূর (সা) যেহেতু রুকূর মধ্যে অস্বাভাবিক বিলম্ব করেছেন, তখন সামনের কাতারের লোকজন ধোকায় পড়ে রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে ফেলেন, তাদেরকে দেখে পিছনের কাতারের লোকজনও একই পন্থা অবলম্বন করেন। অতঃপর সামনের কাতারের লোকজন যখন দেখতে পান যে, হুযূর (সা) এখনো রুকূতে অবস্থান করছেন, তখন তাঁরা পুনরায় রুকূতে ফিরে যান। তখন পিছনের কাতারের লোকজনও একইভাবে পুনরায় রুকূ' করেন। অত্যধিক ভীড়ের কারণে এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

بَابُ صَلٰوةِ الاِسْتِخَارَةِ
ইস্‌তিখারার নামাযের বর্ণনা

١٦٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَاصِحٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ القُراٰنِ –

হাদীস নং-১৬৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে ইস্‌তিখারা (ইস্‌তিখারার নামায, দু'আ ইত্যাদি) এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যেভাবে পবিত্র কুরআনের কোন সূরা শিক্ষাদান করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ পরবর্তী হাদীসে বিস্তারিতভাবে এর ব্যাখ্যা করা হবে।

١٦٩ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الاَمْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ –

وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَمْرًا فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَالُكَ مِنْ فَضْلِكَ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لاَ اَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا الاَمْرُ خَيْرًا لِى فِىْ مَعِيْشَتِىْ وَ خَيْرًا لِىْ فِىْ عَاقِبَةِ

اَمْرِىْ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ –
وَ زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ وَاِنْ كَانَ غَيْرُهُ فَاقْدِرْ لِىْ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِى بِهِ –

হাদীস নং-১৬৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সূরার মত ইস্তিখারার নামাযের তালীম প্রদান করতেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন কাজ করার ইচ্ছা করবে, তখন ফরয ব্যতীত দু'রাকাআত (নফল) নামায পড়বে। এরপর বলবে, হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার ইলমের উসীলায় তোমার কাছ থেকে মঙ্গল কামনা করছি । তোমার কুদরতের উসীলায় তোমার কুদরতের আশা করছি। আমি তোমার ফযল ও বরকতের প্রার্থী। কেননা তুমি সর্বজ্ঞানী কিন্তু আমি অজ্ঞ, তুমি ক্ষমতাবান কিন্তু আমার কোন ক্ষমতা নেই। তুমি অদৃশ্যের খবর সম্পর্কে জ্ঞাত। হে আল্লাহ্ ! যদি এই কাজ আমার জীবনের জন্য মঙ্গল হয়, আমার সর্বশেষ পরিণামের জন্য উত্তম হয়, তা হলে এটা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং এতে আমার জন্য বরকত দান কর।

অন্য এক রিওয়ায়েতে একটু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, যদি এর বিপরীত হয়, তা হলে আমার জন্য কল্যাণ দান কর, যেখানেই হোক না-কেন। অতঃপর আমাকে এর উপর সন্তুষ্ট রাখ।

ব্যাখ্যা ঃ ইস্তিখারার নামায এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কাজের জন্য পড়া হয়ে থাকে, যে সমস্ত কাজের ভাল-মন্দ ও লাভ-লোকসান সম্পর্কে মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি কোন একটিকে প্রাধান্য দিতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে। যেমন কোনদিকে ভ্রমণে রওয়ানা হওয়া, বাড়ি নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। তবে সাধারণ কাজে ইস্তিখারার কোন প্রয়োজন নেই।

بَابُ صَلٰوةِ الضُّحٰى

চাশতের নামায

١٧. – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَضَعَ لِاُمَّتِهِ وَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَصَلّٰى فِيْهِ –
وَزَادَ فِىْ رِوَايَةٍ مُتَوَشِّحًا –

وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَضَعَ لأُمَتِهِ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَأُتِىَ بِهِ فِىْ جَفْنَةٍ فِيْهَا خُبْزُ الْعَجِيْنِ فَاسْتَتَرَ بِثَوْبٍ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَعَا بِثَوْبٍ فَتَوَشَّحَ بِهِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَهِىَ الضُّحٰى *

وَفِىَ رِوَايَةٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَضَعَ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ لأُمَتِهِ وَ دَعَا بِمَاءٍ فَأُتِىَ بِهِ فِىْ جَفْنَةٍ فِيْهَا اَثَرُ عَجِيْنٍ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى اَرْبَعًا اَوْ رَكْعَتَيْنِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا –

হাদীস নং-১৭০

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) মক্কা বিজয়ের দিন স্বীয় যুদ্ধের পোশাক খোলেন এবং পানি চেয়ে এরদ্বারা গোসল করেন। অতঃপর একটি কাপড় চেয়ে (তা পরিধান করেন এবং) এরদ্বারা নামায পড়েন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে متوشحا শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থাৎ متوشح অবস্থায় নামায পড়েছেন। متوشح অর্থ হলো একটি কাপড় দু'বগল থেকে বের করে পিছনের উপর গিরা দিয়ে বেঁধে দেওয়া।

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) মক্কা বিজয়ের দিন স্বীয় যুদ্ধের পোশাক খোলেন এবং পানি দিতে বলেন। তখন কাঠের একটি পাত্রে পানি দেওয়া হয় যার মধ্যে খামির করা আটা লেগে ছিল। তিনি একটি কাপড় দিয়ে পর্দা করে গোসল করেন। এরপর কাপড় দিতে বলেন। এরদ্বারা তিনি توشح করেন। অতঃপর দু'রাকাআত নামায আদায় করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ এটা ছিল চাশতের নামায।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) যুদ্ধের পোশাক খোলেন এবং পানি দিতে বলেন। তখন একটি বিরাট পেয়ালার মধ্যে পানি আনা হলো যার মধ্যে আটা খামির করার দাগ লেগেছিল। তখন ঐ পানি দ্বারা তিনি গোসল করেন। অতঃপর তিনি এক কাপড় দিয়ে متوشح অবস্থায় চার অথবা দু'রাকাআত নামায করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এটা চাশতের নামায ছিল বলে ইমাম আবূ হানীফা (র) উপরোক্ত হাদীসে তা উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ঃ এটা শুকরিয়ার নামায ছিল যা মক্কা বিজয়ের আনন্দে আদায় করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন ঃ এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত নামায ছিল যা মক্কা বিজয়ের হাঙ্গামার কারণে কাযা হয়ে যায় এবং সুযোগ পাওয়ার পর তিনি তা আদায় করেন।

بَابُ الاِعْتِكَافِ

ইতিকাফের বর্ণনা

١٧١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَامَ وَ نَامَ وَ اِذَا دَخَلَ عَشَرُ الْاَوَاخِرِ شَدَّ الْمِيْزَرَ وَاَحْيَى اللَّيْلَ -

হাদীস নং-১৭১

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, যখন পবিত্র মাহে রমযান শুরু হতো তখন নবী করীম (সা) রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন, আবার কখনো নিদ্রা যেতেন। যখন শেষের দশদিন আসত, তখন কোমর বেঁধে নিতেন এবং রাত্রি জাগরণ করতেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন হয়ে যেতেন।

بَابُ التَّهَجُّدِ

তাহাজ্জুদ নামাযের বর্ণনা

١٧٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَن زِيَادٍ عَنِ الْمُغِيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْمُ عَامَّةَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقَالَ لَهُ اَصْحَابُه اَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا *

হাদীস নং-১৭২

অনুবাদ ঃ হযরত মুগীরা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতের অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। ফলে তাঁর পবিত্র পা' দু'খানা ফুলে যেত। সাহাবায়ে কিরাম (রা) আরয করলেন, আল্লাহ্ কি আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করে দেননি (তবু কেন এত কষ্ট করছেন) ? তখন হুযূর (সা) বলেন ঃ আমি কি (এরজন্য) আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না ?

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী শরীফেও এই হাদীস হযরত মুগীরা (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে وساقاه শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যার অর্থ আঁ হযরত (সা)-এর পায়ের নলা দুটি ফুলে যেত।

١٧٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ اَنَّ صَلٰوةَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ كَانَتْ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِّنْهُنَّ ثَلٰثُ رَكْعَاتِ الْوَتْرِ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ -

হাদীস নং-১৭৩

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ জাফর (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা)-এর রাতের নামায ছিল তের রাকাআত। এর মধ্যে তিন রাকাআত বিতর এবং দু'রাকাআত ফজরের সুন্নত ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের দ্বারা তাহাজ্জুদের নামায আট রাকাআত প্রতীয়মান হয়। এর সাথে বিতর অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসে হানাফী মাযহাবের সত্যতা প্রমাণ করে। তাহাজ্জুদ সম্পর্কে তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র মাহে রমযান ও রমযানের বাইরে এগার রাকাআতের অধিক তাহাজ্জুদ পড়তেন না। চার রাকাআত পড়তেন যার সময়ের দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ নেই। অতঃপর তিন রাকাআত (বিতর) পড়তেন। তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান ও সহীহ বলেছেন। তাহাজ্জুদ সম্পর্কে মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের শেষে বলা হয়েছে. ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلٰث অর্থাৎ "এরপর তিন রাকাআত বিতর আদায় করেন।" উপরোক্ত দু'টি হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিতর তিন রাকাআত। তবে তিন রাকাআত থেকে কমবেশির রিওয়ায়েতে ঐ সময়ের কথা বলা হয়েছে, যখন বিতর সম্পর্কে স্থীর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। অতঃপর তিন রাকাআত হিসেবে চূড়ান্তভাবে গ্রহণযোগ্য হয় এবং এর উপর আমল চলতে থাকে। সুতরাং এই সমস্ত সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ এর বিরোধিতা করে বলে যে, তিন রাকাআত সম্পর্কে কোন হাদীস নেই, তা হলে কোন বিবেকবান ব্যক্তি এটা গ্রহণ করতে সম্মত হবে না।

বস্তুত ফজরের সুন্নত তাহাজ্জুদ নামাযের অন্তর্ভুক্ত। শুধু একই সময় হওয়ার কারণে এবং অধিকাংশ রিওয়ায়েত অনুযায়ী হুযূর (সা) এরপর আরাম করতেন না– এই কারণে। রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ بعد تبين الفجر অর্থাৎ "সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পর তিনি সুন্নত আদায় করেন।" আবার, কোন কোন রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ بين الندائين অর্থাৎ "আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে" এই সুন্নত পড়া হয়। মোট কথা, সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, ফজরের সুন্নত তাহাজ্জুদের সাথে আদায় করা হয়নি ; বরং সুবহে সাদিকের পর তা পড়া হয়।

তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়েত পাওয়া যায়। এতে তের, এগার, সাত ও পাঁচ রাকাআতের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে তের রাকআতের অধিক কোন বর্ণনা নেই। এ ছাড়া তাহাজ্জুদ হুযূর (সা)-এর উপর ফরয ছিল, না উম্মতের উপরও ফরয ছিল, এটা নিয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হলো এই যে, তাহাজ্জুদ শুধু আঁ হযরত (সা)-এর উপর ফরয ছিল, অথবা উম্মতের উপরও, কিন্তু পরে তা রহিত করা হয়।

بَابُ سُنَّةِ الْفَجْرِ

ফজরের সুন্নাত

١٧٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ الاَقْمَرِ عَنْ حُمْرَانَ (رضـ) قَالَ مَا لَقِىَ ابْنُ عُمَرَ قَطُّ اِلاَّ وَ اَقْرَبُ النَّاسِ مَجْلِسًا حُمْرَانُ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا حُمْرَانُ لاَ اَرَاكَ تَوَظَّبْنَا اِلاَّ وَ اَنْتَ تُرِيْدُ لِنَفْسِكَ خَيْرًا فَقَالَ اَجَلْ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَمَّا اِثْنَتَانِ فَاِنِّى اَنْهَاكَ عَنْهُمَا وَ اَمَّا وَاحِدَةٌ فَاِنِّى اٰمُرُكَ بِهَا فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْمُرُبِهَا -

قَالَ مَا هِىَ تِلْكَ الْخِصَالُ الثَّلَثُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ -

قَالَ لاَ تَمُوْتَنَّ وَ عَلَيْكَ دَيْنٌ اِلاَّ دَيْنًا تَدَعُ وَ فَاءً -

وَلاَ تُسْمِعُنَّ مِنْ تِلاَوَةِ اٰيَةٍ فَاِنَّه يُسَمِّعُ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا سَمَّعْتَ بِه قِصَاصًا وَلاَ يُظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا -

وَاَمَّا الَّذِىْ اٰمُرُكَ بِه كَمَا اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّىْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكْعَتَا الْفَجْرَ فَلاَ تَدَعْهُمَا فَاِنَّ فِيْهِمَا الرَّغَائِبَ -

হাদীস নং-১৭৪

অনুবাদ ঃ কোন ব্যক্তি হযরত ইবনে উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে দেখতে পায় যে, হুমরান (রা) মজলিসের মধ্যে সবার চেয়ে হযরত উমর (রা)-এর নিকটবর্তী উপবিষ্ট। একদিন হযরত ইবনে উমর (রা) বললেন, হে হুমরান ! আমি তোমাকে সর্বদা আমার সাহচর্যে থাকতে এইজন্য দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি তোমার জীবনের জন্য কোন কল্যাণের আশা করছ ? তখন তিনি উত্তরে বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান ! আপনি ঠিকই বলেছেন। হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ আমি তোমাকে দু'টি কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করছি এবং অপর একটি কাজ করার জন্য আদেশ করছি। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কাজ সম্পর্কে নির্দেশ দিতে শুনেছি । তখন হুমরান (রা) বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান ! ঐ তিনটি কাজ কি ? তখন হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ তুমি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর না। তবে এরূপ ঋণ গ্রহণ করতে পার যা তোমার মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি দ্বারা পরিশোধ করা যায়

এবং (রিয়ার উদ্দেশ্যে) মানুষকে শুনানোর জন্য পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও তিলাওয়াত করবে না। নতুবা কিয়ামতের দিন তোমার এই অপকর্ম (মানুষের মধ্যে) প্রচার করে দেওয়া হবে। এটা শুধু তোমার অপকর্মের প্রতিদান স্বরূপ। কেননা আল্লাহ্ কারো উপর যুলুম করেন না।

এবার ঐ বিষয় সম্পর্কে তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তা হলো এই যে, ফজর নামাযে দু'রাকাআত সুন্নত রয়েছে, তা কখনো পরিত্যাগ করবে না। কেননা এর মধ্যে অনেক ফযীলত ও বরকত রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি মুআন'আন রিওয়ায়েতের অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসে রিয়া বা লোক দেখানো কাজের নিন্দা করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ শ্রবণকারী ও দর্শনকারী। প্রত্যেক ইবাদত তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। এতে নাম প্রচার ও প্রসারের আশা করা হারাম। এ জন্য কিয়ামতের দিন কিসাসের মাধ্যমে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া এই হাদীসে ফজরের সুন্নতের গুরুত্বের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে।

١٧٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى شَئٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ –

হাদীস নং-১৭৫

অনুবাদ ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ কঠোরভাবে অন্য কোন নফল নামাযের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন না যেরূপ ফজরের দু'রাকাআত সুন্নতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসে এই বিষয়টির প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলমানগণ যাতে অন্যান্য নফল ও সুন্নতের তুলনায় ফজর নামাযের সুন্নতের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করে; কোনমতেই যেন এটা পরিত্যাগ করা না হয়। সহীহ হাদীসে বিভিন্ন বাক্যের দ্বারা এর ফযীলত ও গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। কোথাও হুযূর (সা) বলেছেন ঃ "এই দু'রাকাআত নামায আমার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে এর চেয়েও অধিক পসন্দনীয়।" (মুসলিম) কোথাও তিনি বলেছেন ঃ "কখনোও এই সুন্নাত পরিত্যাগ করো না, যদিও ঘোড়া তোমাকে পদদলিত করে।" (আবূ দাউদ) তিবরানী কিতাবে বর্ণিত আছে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ নবী করীম (সা) কখনো ফজরের সুন্নত পরিত্যাগ করেননি। এমন কি ভ্রমণকালে, বাড়িতে এবং অসুখের সময়ও এই নামায ত্যাগ করেন নি।

এই গুরুত্বের কারণেই হানাফী মাযহাব এবং অধিকাংশ আইম্মায়ে কিরামের মতে সুন্নতে মুয়াক্কাদা হলো ৫টি। প্রথম ফজর নামাযের দু'রাকাআত সুন্নত, দ্বিতীয় যোহর নামাযের পূর্বে চার রাকাআত, তৃতীয় যোহরের ফরযের পরে দু'রাকাআত সুন্নত, চতুর্থ মাগরিব নামাযের ফরযের পর দু'রাকাআত সুন্নত, এবং পঞ্চম ইশার নামাযের ফরযের পর দু'রাকাআত সুন্নত।

١٧٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ رَمَقْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْشَهْرًا فَسَمِعْتُه يَقْرَأُ فِىْ رَكْعَتَىْ الْفَجْرِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ -

হাদীস নং-১৭৬

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে দেখেছি, তিনি চল্লিশ দিন অথবা এক মাস পর্যন্ত ফজর নামাযের দু'রাকাআত সুন্নাত قل هو الله احد এবং قل يايها الكفرون তিলাওয়াত করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ হাদীসে এভাবে বর্ণিত আছে। আবূ দাউদ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা) ফজর নামাযের সুন্নাতের প্রথম রাকাআতে امنا بالله এবং দ্বিতীয় রাকাআতে وما انزل علينا امنا بالله واشهد بانا مسلمون তিলাওয়াত করতেন।

١٧٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ ابنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا صَلَّى الصُّبْحَ لَمْ يَبْرَحُ عَنْ مَكَانِه حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ تَبْيَضَّ -

হাদীস নং-১৭৭

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজর নামায আদায় করার পর সূর্য উদিত হয়ে ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় জায়গা থেকে প্রস্থান করতেন না।

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ সময় হুযূর (সা) কিব্লার দিকে হয়ে বসতেন না ; বরং ডানে বামে অথবা কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসতেন। হুযূর (সা) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। কারো কারো মতে নামাযের পর কিবলার দিকে ফিরিয়ে থাকা মাকরূহ । আবূ দাউদ সিমাক (রা) থেকে, তিনি হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজর নামায আদায় করার পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত মুসল্লা থেকে উঠতেন না। সূর্য উদয় হওয়ার পর তিনি ইশরাক নামায আদায় করার জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন।

بَابُ مَنْ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِىْ الْمَسْجِدِ

যে ব্যক্তি মসজিদে ইশার পর চার রাকাআত নামায আদায় করে

١٧٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ عُدِلْنَ مِثْلَهُنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ –

হাদীস নং-১৭৮

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে চার রাকাআত (নফল) আদায় করে, তার এই নামায শবে কদরের একই সমান রাকাআতের সমপরিমাণ হবে (অর্থাৎ তিনি যেন শবে কদরে চার রাকাআত নফল আদায় করলেন)।

ব্যাখ্যা ঃ নফল নামাযের অধিক ফযীলত ও বরকত সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এই হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পর চার রাকাআত নফল আদায় করবে, সে যেন শবে কদরে এই নামায আদায় করল। অর্থাৎ কদরের বরকতময় রাত্রে নামায পড়লে যে সওয়াব পাওয়া যায়, এই চার রাকাআতে ঐ সওয়াব অর্জিত হবে। হযরত সাঈদ ইবনে মানসূর (র) স্বীয় মুসনাদে এই হাদীসের সাথে আরো একটু সংযোজন করে বলেন যে, ইশার পূর্বে চার রাকাআত নফল আদায় করার ফযীলত তাহাজ্জুদের নামাযের সমান।

١٧٩ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ يَقْرَأُ فِى الْاُوْلٰى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ تَنْزِيْلِ السَّجْدَةِ وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحم الدُّخَانِ وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيس وَفِى الرَّكْعَةِ الْاَخِيْرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ تَبَارَكَ الْمُلْكُ كُتِبَ لَهُ كَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ شُفِّعَ لَهُ فِى اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ مِمَّنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ وَاُجِيْرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ رُوِىَ مَوْقُوْفًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ –

হাদীস নং-১৭৯

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পর চার রাকাআত নামায আদায় করবে (কিন্তু দু'রাকাআতের) মধ্যে সালাম ফিরাবে না (এবং এভাবে নামায আদায় করবে যে,) প্রথম রাকাআতে সূরায়ে ফাতিহা এবং সূরায়ে তান্যীল পাঠ করবে, দ্বিতীয় রাকাআতে সূরায়ে ফাতিহা এবং সূরায়ে হামীম দুখান, তৃতীয় রাকাআতে সূরায়ে ফাতিহা এবং সূরায়ে ইয়াসীন ও চতুর্থ রাকাআতে সূরায়ে ফাতিহা এবং সূরায়ে মুল্ক পাঠ করবে, তা হলে তার জন্য শবে কদরে ইবাদতের সওয়াব লিখা হবে, তার শাফাআত

গ্রহণ করা হবে তার ঘরের সবার জন্য- যাদের উপর দোযখের আযাব ওয়াজিব হয়ে গেছে। সে নিজেও কবরের আযাব থেকে মুক্তি লাভ করবে। এই হাদীস হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে মওকূফরূপে বর্ণিত আছে।

ব্যাখ্যা ঃ আবূ দাউদ এই চার রাকাআত নামাযের স্বপক্ষে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل على الا صلى بعدها اربع ركعات او ستا অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ইশার নামায আদায় করে আমার নিকট আগমণ করতেন, তখন চার অথবা ছয় রাকাআত নামায আদায় করতেন।"

بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلوةِ الظُّهْرِ

যোহর নামাযের পর দু'রাকাআত সুন্নাত আদায়ের বর্ণনা

١٨٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ -

হাদীস নং-১৮০

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যোহর নামাযের (ফরযের) পর দু'রাকাআত সুন্নত নামায আদায় করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, হুযূর (সা) যোহরের নামাযের পর উক্ত দু'রাকাআত অব্যাহতভাবে আদায় করতেন। তাই এই দু'রাকাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الْبُيُوْتِ

ঘরের মধ্যে নামায আদায় করার বিবরণ

١٨١ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَجْعَلُوْهَا قُبُوْرًا -

হাদীস নং-১৮১

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ঘরের মধ্যে নামায আদায় কর এবং ঘরকে কবরস্থান বানিও না।

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা) ঘরে নামায পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে ঃ اجعلوا من صلواتكم ولا تتخذوها قبورا অর্থাৎ "নামাযের কিছু অংশ ঘরের জন্য রাখ এবং ঘরকে কবরস্থান বানিও না।" জমহুর উলামায়ে কিরামের মত হলো এই যে, এ হাদীস সুন্নত ও নফল নামায সম্পর্কে, ফরযের জন্য নয়। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ افضل الصلواة المرء فى بيته الا المكتوبة "পুরুষের জন্য ফরয ব্যতীত অধিক ফযীলত হল অন্য নামায ঘরে আদায় করা।" কেউ কেউ اجعلوا من صلواتكم الخ হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ফরয নামাযের জন্যও মনে করে থাকেন। যেমন কাযী আয়ায (র) লিখেছেন, যারা মসজিদে আসে না, তারা ঘরে ফরয পড়ে থাকে। যেমন গোলাম, অসুস্থ এবং মহিলা। এরাও জামাআতে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তাদেরও ইক্তিদা করার সুযোগ থাকতে পারে। তবে প্রথম মাযহাব হলো উত্তম।

ঘরের মধ্যে নামায না পড়ার কারণে ঘরকে হুযূর (সা) কবরস্থানের সাথে তুলনা করেছেন এ জন্যে যে, কবরস্থানে যেহেতু নামায পড়া হয় না, তাই নামায না পড়ার কারণে ঘরও কবরস্থানের মত হয়ে যায়। এই নির্দেশের মধ্যে আরো একটি রহস্য হলো এই যে, ঘরে নামায পড়ার কারণে মানুষ রিয়া ও প্রচারণা থেকে অনেকাংশে নিরাপদ থাকতে পারে। বস্তুত আল্লাহর নিকট ঐ সমস্ত ইবাদত পসন্দনীয়, যাতে কোন প্রকার রিয়া থাকে না। ঘরে নামায পড়ার ফলে ঐ ঘরে বরকত হয়ে থাকে, রহমতের ফিরিশতা নাযিল হন, শয়তান পলায়ন করে। মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে এবং এতে এই অংশটুকু অতিরিক্ত রয়েছে ঃ ان الشيطان ينفر من البيت الذى تقرء فيه سورة البقرة অর্থাৎ "ঐ ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে যেখানে সূরায়ে বাকারা পাঠ করা হয়।" কোন কোন রিওয়ায়েতে আঁ হযরত (সা) থেকে এই হাদীসও বর্ণিত আছে যে, ঐ ঘর, যেখানে আল্লাহ্র যিকির করা হয় এবং যে ঘরে যিকির করা হয় না, উভয় ঘর জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়।

بَابُ سُنَّةِ الرَّكْعَتَيْنِ فِى الْكَعْبَةِ

কা'বা ঘরে দু'রাকাআত সুন্নাত পড়া সম্পর্কে

١٨٢ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سَأَلْتُ بِلاَلاً اَيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْكَعْبَةِ وَكَمْ صَلَّى قَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِمَّا يَلِى الْعَمُوْدَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ بَابَ الْكَعْبَةِ وَالْبَيْتُ اِذْ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ -

হাদীস নং-১৮২

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ আমি হযরত বিলাল (রা)-এর নিকট জানতে

চাই যে, (মক্কা বিজয়ের দিন) রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বা ঘরে কোথায় এবং কত রাকাআত নামায আদায় করেছেন ? তিনি বলেন ঃ দরওয়াজার নিকট এই দু'টি স্তম্ভের নিকট দু'রাকাআত নামায পড়েছেন। ঐ সময় কা'বা ঘরে ছ'টি স্তম্ভ ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ এটা মক্কা বিজয়ের দিনের ঘটনা। কেননা নবী করীম (সা) যখন কা'বা শরীফে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর সাথে হযরত উসামা (রা), হযরত বিলাল (রা) এবং হযরত উসমান ইবনে তালহা (রা) ছিলেন, তখন দরওয়াজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। হযরত ইবনে উমর (রা) হুযূর (সা)-এর সাথে ছিলেন। তাই যখন তিনি বাইরে আগমণ করেন, তখন হযরত ইবনে উমর (রা) হযরত বিলাল (রা) -এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামাযের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

١٨٣ – اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَجُلاً سَأَلَه عَنْ صَلٰوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْكَعْبَةِ يَوْمَ دَخَلَهَا فَقَالَ صَلّٰى فِى الْكَعْبَةِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَقَالَ لَه اَرِنِى الْمَكَانَ الَّذِى صَلّٰى فِيْهِ فَقَالَ فَبَعَثَ مَعَه اِبْنَه ثُمَّ ذَهَبَ تَحْتَ الْاُسْطَوَانَةِ بِحِيَالِ الْجَذْعَةِ –

وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْكَعْبَةِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قُلْتُ لَه اَرِنِى الْمَكَانَ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ فَبَعَثَ مَعِىَ اِبْنَه فَاَرَانِى الْاُسْطُوَانَةَ الْوُسْطٰى تَحْتَ الْجَذْعَةِ –

হাদীস নং-১৮৩

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা)-এর নিকট কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন যে, নবী করীম (সা) যখন কা'বা শরীফে প্রবেশ করেন, তখন তিনি কোথায় এবং কত রাকাআত নামায আদায় করেছেন? তিনি এর উত্তরে বলেছেন ঃ হুযূর (সা) কা'বা ঘরে চার রাকাআত নামায আদায় করেছেন। ঐ লোকটি তখন বললেন, আমাকে উক্ত স্থানটি একটু দেখিয়ে দিন। তখন হযরত ইবনে উমর (রা) স্বীয় পুত্রকে (ঐ স্থান দেখাবার জন্য) তাঁর সাথে প্রেরণ করেন। অতঃপর তারা খেজুরের শাখা বরাবর মধ্যবর্তী স্তম্ভ পর্যন্ত গমন করেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) কা'বা ঘরে চার রাকাআত নামায আদায় করেন। তখন আমি [হাদীস বর্ণনাকারী হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা)] বললাম, আমাকে ঐ স্থানটি একটু দেখিয়ে দিন, যেখানে হুযূর (সা) নামায আদায় করেছেন। তখন তিনি স্বীয় পুত্রকে আমার সাথে প্রেরণ করেন। তিনি আমাকে ঐ মধ্যবর্তী স্তম্ভ দেখালেন যা খেজুরের শাখার নীচে অবস্থিত।

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী শরীফেও এই হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ الْجَنَائِزِ

জানাযার বর্ণনা

١٨٤ – اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اِبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ لَه ثَلٰثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى الْجَنَّةَ فَقَالَ عُمَرُ اَو اِثْنَانِ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَو اِثْنَانِ –

হাদীস নং-১৮৪

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যদি কারো তিনটি (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) শিশু সন্তান ইনতিকাল করে, তবে তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে দাখিল করবেন। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ যদি দু'জন হয় ? তখন হুযূর (সা) বলেন ঃ (হ্যাঁ) দু'জন হলেও।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস বিভিন্ন বাক্যের মাধ্যমে সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে । মুসলিম ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে, যে মুসলমান ব্যক্তির তিনটি শিশু সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তা হলে তারা তাকে বেহেশতের দরওয়াযায় ইস্তিকবাল বা স্বাগত জানাবে। বেহেশতের আটটি দওয়াযার মধ্যে ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন দরওয়াযা দিয়ে সে প্রবেশ করতে পারবে। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত আছে, দোযখের আগুন তাকে নামেমাত্র স্পর্শ করতে পারবে। কোন কোন হাদীসে আছে, ঐ সমস্ত শিশু তার জন্য শক্ত প্রাচীরের (দোযখ থেকে রক্ষার জন্য) মত হয়ে যাবে।

١٨٥ – اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِنَّكَ لَتَرٰى السقَط مُحْبَنْطِئًا يُقَالُ لَه اُدْخِلِ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ لَهُ لاَ حَتّٰى يَدْخُلَ اَبْوَايَ –

হাদীস নং-১৮৫

অনুবাদ ঃ শাম দেশের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ হাশরের দিন তুমি দেখতে পাবে যে, পেটের উপর গড়াগড়ি দিয়ে কোন কোন শিশু যেন কাউকে খুঁজছে। তাকে বলা হবে, তুমি বেহেশতে চলে যাও। তখন সে বলবে, না, যাব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পিতামাতা বেহেশ্তে প্রবেশ না করবে।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এগুলোর বাক্যের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক রয়েছে। তিবরানী কবীরে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর শেষে বর্ণিত আছে, فيقال

ادخل الجنة انت و ابواك "অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি এবং তোমার পিতামাতা বেহেশতে প্রবেশ কর"। এটাই হলো বান্দার প্রতি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানী যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু সন্তানকে তার জন্য মুক্তির উপায় করে দিয়েছেন এবং তিনটি সন্তানের মৃত্যুর কারণে বেহেশ্‌তী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এরপর তিন থেকে হ্রাস করে দু'টি সন্তানের মৃত্যুতেও একই পুরস্কার অব্যাহত রেখেছেন। এমন কি অনেক রিওয়ায়েতে একটি সন্তানের ব্যাপারেও একই কথা বলা হয়েছে। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে মরফূ' হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তির জীবিতকালে তার তিনটি শিশু সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তারা তার জন্য পরকালে আগুন থেকে মুক্তির উপায় এবং প্রাচীরের মত হয়ে যাবে। হযরত আবূ যার (রা) নিজের উদাহরণ সামনে রেখে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমার দু'টি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে। হুযূর (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ দু'টি হলেও। অন্যদিকে হযরত উবাই (রা) স্বীয় উদাহরণ সামনে রেখে বললেন, আমি একজন পাঠিয়েছি। অর্থাৎ আমার একটি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে। তখনও নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ একটি হলেও। এভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বীয় বান্দার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রসারিত করেছেন এবং গর্ভজাত শিশু সন্তানকে বেহেশত পাওয়ার উপায় করেছেন।

١٨٦ – اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّسْتَرِيْ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مِنْهُ شَرًّا وَ يَقُوْلُ النَّاسُ فِيْ حَقِّهِ خَيْرًا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلَائِكَتِهِ قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَاتِ عِبَادِيْ عَلٰى عَبْدِيْ وَ غَفَرْتُ عِلْمِيْ –

হাদীস নং-১৮৬

অনুবাদ ঃ হযরত আমের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দা মৃত্যুবরণ করে এবং আল্লাহ্ তার মন্দ আমল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে থাকেন। কিন্তু লোকজন তাকে ভাল বলে আলোচনা করে থাকে, তখন আল্লাহ্ স্বীয় ফিরিশতাদেরকে বলে থাকেন যে, আমি এই বান্দার উপর আমার অন্যান্য বান্দাদের সাক্ষী গ্রহণ ও কবূল করে নিয়েছি এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছি যা আমার জানা রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত বিষয়ে কিছু বাক্যের পার্থক্য সহ ছয়টি সহীহ হাদীসে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। তিব্‌রানী হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে মরফূ' হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ انتم شهداء الله على الارض والملائكة شهداء الله فى السماء ـ "তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সাক্ষী এবং ফিরিশতাগণ আকাশে আল্লাহ্‌র সাক্ষী।"

١٨٧ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلِمَ اَنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ لَهٗ فَهُوَ مَغْفُوْرٌ لَهٗ -

হাদীস নং-১৮৭

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এটা জানে অথবা মনে করে যে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন, তা হলে তাকে ক্ষমা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসের মূল হলো অন্য একটি হাদীস যা বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ শরীফে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার পর (অনুতপ্ত হয়ে) বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমি পাপ করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন তার প্রতিপালক (আল্লাহ্) বলেন ঃ আমার বান্দা এটা জানে যে, তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন যিনি পাপ মার্জনা করে থাকেন এবং শাস্তিও দিয়ে থাকেন। সুতরাং আমি আমার বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম।এরপর আল্লাহ্র যতদিন ইচ্ছা, সে এভাবে চলতে থাকে এবং দ্বিতীয়বার সে পাপকাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর বলে থাকে, হে আমার রব! দ্বিতীয়বার আমার দ্বারা গুনাহ্ সাধিত হয়েছে, অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা কর। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমার বান্দা কি মনে করে যে, তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন যিনি গুনাহ্ মার্জনা করেন এবং গুনাহ্র কারণে তাকে শাস্তিও দিয়ে থাকেন ? সুতরাং আমার বান্দার গুনাহ মার্জনা করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু দিন থাকার পর পুনরায় সে তৃতীয়বার গুনাহ্র কাজে লিপ্ত হয় এবং (অনুতপ্ত হয়ে) বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমি পুনরায় গুনাহ্ করেছি, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, সে কি এটা জানে যে, তার একজন রব রয়েছেন, যিনি গুনাহ্ মাফ করে থাকেন এবং এরজন্য শাস্তিও দিতে পারেন। সুতরাং আমি তৃতীয়বারও আমার বান্দার গুনাহ্ মাফ করে দিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার এই ক্ষমা প্রদর্শন ঐ সময়, যখন গুনাহ্ করার সাথে সাথে বান্দা খালেসভাবে তাওবা করে থাকে। এরপর ঘটনাক্রমে হঠাৎ করে মানবীয় জৈবিক চাহিদার কারণে ত্রুটি ও গুনাহ্ হয়ে যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, উক্ত আদেশের দ্বারা (নাউযুবিল্লাহ্) মানুষের জন্য গুনাহ্ করার এক প্রশস্ত ও সহজ রাস্তা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে মানুষ গুনাহ্ করতে থাকবে এবং প্রত্যেক গুনাহ্র পর ইয়াহূদীদের মত سَيُغْفَرُلَنَا উচ্চারণ করবে। এটা গুনাহ্ মাফের আবেদন নয় ; বরং আল্লাহর সাথে ঠাট্টা করার নামান্তর বৈ আর কিছু নয়। نعوذ بالله من ذلك

١٨٨ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فِسْطَاسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّه قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ تَحْمِلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيْرِ فَمَا زَادَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَ نَافِلَةٌ -

হাদীস নং-১৮৮

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ সুন্নত তরীকা (পদ্ধতি) হলো এই যে, জানাযার চার পায়া একবার উঠাবে, এরপর যা কিছু অতিরিক্ত করা হবে, তা হবে নফল।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে জানাযা উঠানো সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু এক দলের দলীলসমূহ খুবই শক্তিশালী। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মত হলো এই যে, জানাযাকে আগে পিছনে অর্থাৎ মাথার দিক থেকে উঠাতে হবে। সামনের লোক স্বীয় গ্রীবার উপর রাখবে এবং পিছনের ব্যক্তি বুকের উপর রাখবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ চার পায়া বিশিষ্ট জানাযার খাটিয়ার চারটি পা একত্রে উঠাতে হবে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের স্বপক্ষে অনেক মওকূফ হাদীস পেশ করা হয়েছে। এগুলোর মূল রিওয়ায়েত ইবনে সাআদ তাবাকাতে হযরত সাআদ ইবনে মাআয (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর জানাযা এভাবে উঠানো হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল হিসেবে উপরোক্ত হাদীস পেশ করেছেন। এতে স্পষ্ট বর্ণিত আছে, যে, চারদিক থেকে জানাযা উত্তোলন করা সুন্নত। সাহাবীর من السنة শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত হাদীস মরফূ' হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এছাড়া অন্যান্য সহীহ রিওয়ায়েতেরদ্বারা এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন ইবনে আবী শায়বা এবং আবদুর রাজ্জাক তাঁদের গ্রন্থে আওযাঈ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত ইবনে উমর (রা)-কে এমনিভাবে জানাযা উঠাতে দেখেছেন। আবদুর রাজ্জাক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যিনি জানাযাকে চার কোণ থেকে উত্তোলন করেছেন, তিনি তার উপর অর্পিত যিম্মাদারী আদায় করেছেন। সুতরাং এরদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এটাই একমাত্র সুন্নত তরীকা ও পদ্ধতি।

এবার শাফিঈ মাযহাবের স্বপক্ষে যে সমস্ত মওকূফ হাদীস রয়েছে, এগুলোর মধ্যে যথেষ্ঠ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন হযরত সাআদ (রা) সম্পর্কে যে রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে, ঐ হাদীস বিশেষ ওযরের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা তাঁর জানাযায় সত্তর হাজার ফিরিশতা উপস্থিত হওয়ায় অধিক ভীড়ের কারণে যাতায়াত করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। জানাযা কাঁধে উঠানো তখন সম্ভব ছিল না, সুতরাং এটা হওয়া সম্ভব যে, যেখানে যার সুযোগ হয়েছে স্পর্শ করে, কাঁধে উঠিয়ে নেকী হাসিল করেছেন। এরূপ বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) ভীড়ের কারণে স্বীয় অঙ্গুলীর উপর ভর করে চলেছেন। কোন কোন সময় রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে জানাযা উঠানোর এই ব্যবস্থা করতে হয়। কোন কোন সময় লোকজন কম হওয়ার কারণেও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু অপারগতার কারণে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, এটা পৃথক মাসয়ালায় পরিণত হতে পারে না এবং তা সুন্নতের স্থান অধিকার করতে পারে না। অতঃপর কিয়াসের দৃষ্টিতে হানাফী মাযহাব অধিক অগ্রগণ্য। কেননা এই অবস্থায় মৃতের সম্মান অধিক হয়ে থাকে। দ্রুত চলার সুন্নতও সহজে আদায় করা যায়। কিন্তু এর বিপরীত অবস্থায় দ্রুত চলা তো দূরের কথা, কোন কোন সময় জানাযা ভারী হলে অথবা কবরস্থান দূরে হলে জানাযা উঠানো এবং চলা কঠিন হয়ে পড়ে।

জানাযা উঠানোর মধ্যে সুন্নত হলো এই যে, প্রত্যেকটি পায়া উঠিয়ে কমপক্ষে দশ কদম

চলবে। কেননা ইবনে আসাকির এ বিষয় থেকে মরফূ' হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন, এর সারমর্ম হলো এই যে, যে ব্যক্তি চার দিক থেকে জানাযা উঠাবে, তার চল্লিশটি গুনাহ মাফ হবে। অর্থাৎ প্রতিটি পায়া নিয়ে যখন একজন মানুষ দশ কদম চলবে, তখন প্রতিটি কদমে এক-একটি গুনাহ্ মাফ হবে এবং প্রতিটি পায়ার উপর দশ গুনাহ্ হিসেবে চল্লিশ কদমে চল্লিশটি গুনাহ্ মাফ হবে।

١٨٩ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الاَقْمَرِ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ بْنِ الْوَدَّاعِىْ (رض) اَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِىْ جَنَازَةٍ فَرَاَى اِمْرَأَةً فَاَمَرَبِهَا فَطُرِدَتْ فَلَمْ يُكَبِّرْ حَتّٰى لَمْ يَرَهَا -

হাদীস নং-১৮৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবী আতিয়্যা ইবনে ওয়াদদাঈ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) একটি জানাযার সঙ্গী ছিলেন, তিনি জানাযার পিছনে একজন মহিলাকে আগমণ করতে দেখলেন। এরপর তিনি ঐ মহিলাকে জানাযার দল থেকে বের করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন, অতঃপর ঐ মহিলা দৃষ্টির আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি (জানাযার) তাকবীর বলেন নি।

ব্যাখ্যা ঃ সুনানে বায়হাকী নামক হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে মরফূ' রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, জানাযার পিছনে পিছনে গমন করার মধ্যে মহিলাদের জন্য কোন সওয়াব নেই। তিবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মরফূ' হাদীস বর্ণনা করেন, যে মহিলাদের জন্য জানাযার মধ্যে কোন অংশ নেই।

١٩٠ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ جَمَعَ اَصْحَابَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيْرِ قَالَ لَهُمْ اُنْظُرُوْا اٰخِرَ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَوَجَدُوْهُ قَدْ كَبَّرَ اَرْبَعًا حَتّٰى قُبِضَ قَالَ عُمَرَ فَكَبِّرُوْا اَرْبَعًا -

হাদীস নং-১৯০

অনুবাদ ঃ অনেক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত আছে, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) নবী করীম (সা)-এর অনেক সাহাবা (রা)-কে একত্র করলেন এবং জানাযার তাকবীর সম্পর্কে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করে বলেন ঃ তোমরা নবী (সা)-এর ঐ শেষ নামাযকে স্মরণ কর যাতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ নামাযে তিনি কয়টি তাকবীর বলেছিলেন ? সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম চিন্তা করে বললেন, তিনি ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত চার তাকবীর বলেছেন। তখন হযরত উমর (রা) জানাযার নামাযে চার তাকবীর বলার জন্য নির্দেশ দান করেন।

ব্যাখ্যা ঃ চার ইমাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, জানাযার নামাযে চার তাকবীর সঠিক। কেননা অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে। হাকেম মুসতাদরাক নামক গ্রন্থে ও আবূ নুয়াইম হিলয়া নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, ফিরিশতাগণ হযরত আদম আলাইহিস সালামের উপর নামায পড়ার সময় চার তাকবীর বলেছেন এবং বলেছেন ঃ হে বনী আদম! তোমাদের জন্য এটাই সুন্নত। জানাযার তাকবীরের ক্ষেত্রে হুযূর (সা)-এর সর্বশেষ আমল কয়েকটি ছিল। এই ব্যাপারে প্রশ্ন উথাপনের কারণ ছিল এই যে, তিনি বায়য়াতে রিদওয়ান ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জানাযায় নয় তাকবীর এবং যারা শুধু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের জানাযায় সাত তাকবীর বলেছিলেন। এছাড়া তিনি সকল জানাযায় চার তাকবীর বলেছেন।

١٩١ – اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا صَلّٰى عَلَى الْمَيِّتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا –

হাদীস নং – ১৯১

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) যখন জানাযার নামায পড়তেন তখন বলতেন ঃ

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا و صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا ،

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জীবিতদের, মৃতদের, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ ও মহিলাদেরকে মা'ফ করে দাও।"

ব্যাখ্যা ঃ অন্য রিওয়ায়েতে অতিরিক্ত এই বাক্যও রয়েছে ঃ

اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان .

"হে আল্লাহ্ ! যারা আমাদের মধ্যে জীবিত আছে, তাদেরকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং যারা আমাদের মাঝে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের ঈমানের উপর মৃত্যু দাও।"

এছাড়া কোন দু'আর মধ্যে এর চেয়েও কিছু অতিরিক্ত বাক্য রয়েছে ।

١٩٢ – اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) قَالَ اُلْحِدَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَ نُصِبَ

عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا -

হাদীস নং-১৯২

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম (সা)-এর জন্য লহদ (কবর) তৈরি করা হয়েছে এবং তাঁকে কিব্‌লার দিকে করে নামানো হয়েছে এবং তাঁর কবরের উপর কাঁচা ইঁট স্থাপন করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে দু'টি বিষয় উল্লেখযোগ্য এবং এ বিষয় দু'টি নিয়ে ইমামদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। প্রথম লহদ (لحد) এবং দ্বিতীয় হলো শক্ (شق) অর্থাৎ মৃতের জন্য লহদ (বগলী) কবর উত্তম অথবা সিন্দুকী কবর উত্তম এটা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বগলী কবর এবং ইমাম শাফিঈ (র) -এর মতে সিন্দুকী কবর উত্তম।

ইমাম আবূ হানীফা (র) স্বীয় মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস পেশ করেন- اللحد لنا والشق لغيرنا "অর্থাৎ লহদ কবর আমাদের জন্য এবং শক্ বা সিন্দুকী কবর অন্যদের জন্য।" কেননা ইয়াহূদীদের মধ্যে এ ধরনের কবরের প্রচলন ছিল। দ্বিতীয় দলীল হলো এই যে, আঁ হযরত (সা)-এর জন্য লহদ বা বগলী কবর তৈরি করা হয়েছিল। সুতরাং লহদ কবরের ফযীলত সম্পর্কে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? অবশ্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) দু'প্রকার কবর খননের জন্যই লোক ডেকেছিলেন এবং বিষয়টি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল যে, যে দল প্রথম আসবে, তারা কাজ করবে। অবশেষে লহদ কবর খননকারী লোকজন প্রথম আগমণ করে, তাই হুযূর (সা)-এর জন্য লহদ কবর তৈরি করা হয়। তৃতীয় দলীল হলো এই যে, মুসলিম শরীফের রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) নিজের জন্য লহদ কবর তৈরি করার ব্যাপারে ওসীয়ত করেছেন। এরূপ একজন সম্মানিত ও শীর্ষস্থানীয় সাহাবীর নিজের জন্য লহদ কবর পসন্দ করা এর উত্তম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। সুতরাং উপরোক্ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লহদ কবর সুন্নত।

হযরত ইমাম শাফিঈ (র) দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ সিন্দুক কবর উত্তম হওয়ার স্বপক্ষে মুসনাদে ইমাম শাফিঈ-এর মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেন ঃ سل رسول الله صلعم من قبل رأسه "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মাথার দিক থেকে বের করা হয়েছে এবং কবরে নামানো হয়েছে।" এর পদ্ধতি এই যে, জানাযা কবরের কিনারায় এভাবে রাখতে হবে যাতে মৃতের মাথার দিক থেকে সহজেই কবরে নামানো যায়। এই পদ্ধতি এরূপও হতে পারে যে, জানাযা কবরের শিয়রে রাখতে হবে এবং মৃতের পা কবরের শিয়রে থাকবে এবং মৃতকে পা-এর দিক থেকে কবরে নামাতে হবে । কেউ কেউ এই মত গ্রহণ করেছেন এবং তাদের মাযহাবের পক্ষে কিছু রিওয়ায়েত রয়েছে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র) থেকে সিন্দুকের রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। শাফিঈ মাযহাবের জওয়াবে হানাফী মাযহাবের দলীল হলো এই যে, হুযূর (সা)-এর দাফন সংক্রান্ত বিষয়ে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত আছে, এগুলোর মধ্যে মত্যনৈক্য রয়েছে। কেননা তাঁকে কিবলার দিক থেকে কবরে নামানো হয়েছে বলেও সহীহ হাদীস

বর্ণিত আছে। অধিকন্তু ইবনে আবী শায়বা স্বীয় মুসান্নাফ নামক গ্রন্থে এবং আবূ দাউদ স্বীয় মারাসিলে ইবরাহীম নখঈ (র) থেকে মরফূ' মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা)-কে কবরে কিবলার দিকে মুখ করে নামানো হয়েছে, মাথার দিক থেকে বের করা হয়নি। ইসতিকবালের নিয়ম বা পদ্ধতি হলো এই যে, জানাযা কবর থেকে কিবলার দিকে মুখ করে রাখা হবে এবং মৃতকে কবরে যে ব্যক্তি নামাবে, তিনি কিবলার দিকে হয়ে মৃতকে কবরে নামাবেন।

এমনিভাবে ইমাম ইবনে মাজাহ স্বীয় হাদীস গ্রন্থ সুনানে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে মরফূ' হাদীস বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সা)-কে কবরে কিবলামুখী করে নামানো হয়েছিল। যখন হাদীসসমূহের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়, তখন বাধ্য হয়ে কিয়াসের উপর নির্ভর করতে হবে। কিয়াস হানাফী মাযহাবকে সমর্থন করে। কেননা সমস্ত উত্তম কাজে কিবলামুখী হওয়া উত্তম বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

যদি কেউ বলে, শাফিঈ মাযহাবের স্বপক্ষে সহীহ হাদীস রয়েছে, তা হলে এর জওয়াবে বলা যায় যে, ঐ সময় একটি বিশেষ ওযর বিদ্যমান ছিল, যার ফলে কিবলামুখী হওয়ার সুন্নতের উপর আমল করা হয়নি। কারণ পবিত্র কবর দেওয়ালের সাথে মিলিত হওয়ার ফলে কিবলার দিকে জানাযা রাখা সম্ভব হয়নি। হানাফী মাযহাবের পক্ষে হুযূর (সা)-এর আমলের সহীহ হাদীস তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) রাতে কবরে নামেন এ জন্য আলোর ব্যবস্থা করা হয়। তিনি মৃতকে কিবলার দিক থেকে গ্রহণ করেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন, তুমি আল্লাহর ভয়ে অনেক ক্রন্দন করতে এবং অধিক পরিমাণে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতকারী ছিলে, অতঃপর চার তাকবীর বলেন। এই হাদীসকে ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন। সুতরাং এই হাদীসকে কিভাবে অস্বীকার করা যাবে ? অতঃপর সাহাবায়ে কিরামের আমল এরজন্য দলীল হিসেবে রয়েছে। কেননা ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) ইয়াযীদ ইবনে মুকাফ্ফাফ-এর জানাযায় চার তাকবীর বলেছেন এবং তাঁকে কিবলার দিক থেকে নামান হয়েছে।

بَابُ السُّؤَالِ فِى الْقَبْرِ

কবরে প্রশ্ন ও উত্তর

١٩٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وُضِعَ الْمُؤْمِنُ فِىْ قَبْرِهِ اَتَاهُ الْمَلَكُ فَاَجْلَسَهُ فَقَالَ مَنْ رَبُّكَ فَقَالَ اللّٰهُ قَالَ وَمَنْ نَبِيُّكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَمَا دِيْنُكَ قَالَ الْاِسْلَامُ - قَالَ فَيُفْسَحُ لَه فِى قَبْرِهِ وَ يُرى مَقْعَدُه مِنَ الْجَنَّةِ -

فَاِذَا كَانَ كَافِرًا اَجْلَسَهُ الْمَلَكَ فَقَالَ مَن رَبُّكَ فَقَالَ هَاهَ لاَ اَدْرِىْ كَالْمُضِلِّ شَيْئًا - فَيَقُوْلُ مَنْ نَبِيُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهَ لاَ اَدْرِىْ كَالْمُضِلِّ شَيْئًا فَيُقَالُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهَ لاَ اَدْرِىْ كَالْمُضِلِّ شَيْئًا -

فَيَضَّيَقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ وَ يُرى مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَىْءٍ اِلاَّ الثَّقَلَيْنِ اَلْجِنِّ وَالاِنْسِ -

ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الاٰخِرَةِ وَ يَضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ -

হাদীস নং-১৯৩

অনুবাদ ঃ হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন একজন মুমিনকে তার কবরে রাখা হয়, তখন তার নিকট ফিরিশতা আগমণ করেন এবং বসানোর পর তাকে বলেন ঃ তোমার রব কে ? তখন তিনি বলেন ঃ আল্লাহ। ফিরিশতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নবী কে ? তিনি বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা)। অতঃপর ফিরিশতা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দীন কি ? মুমিন বলেন ঃ ইসলাম। হুযূর (সা) বলেন ঃ অতঃপর তার কবর চওড়া ও বিস্তৃত করা হয় এবং বেহেশতে তার যে আসন রয়েছে, তাকে তা দেখানো হয়।

কিন্তু ঐ মৃত ব্যক্তি যদি কাফির হয়, তাহলে ফিরিশতা তাকে বসানোর পর জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে ? তখন সে একজন ভুলে যাওয়া লোকের মত বলে, আফসোস, আমি জানি না। অতঃপর ফিরিশতা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নবী কে ? সে বলে, আফসোস, আমি জানি না। এরপর (তৃতীয়বারের মত) ফিরিশতা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দীন কি ? তখন ঐ কাফির আতঙ্কিত অবস্থায় বলবে, আফসোস, আমি জানি না। অতঃপর তার কবর সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় এবং দোযখে তার স্থানটি দেখানো হয়। এরপর ফিরিশতা তার উপর এমন জোরে আঘাত করেন যে, যার আওয়াজ মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত সবকিছুই শুনতে পায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الاٰخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ -

ব্যাখ্যা ঃ কবরে প্রশ্ন ও উত্তরের (سوال و جواب) ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। শুধু এতটুকু প্রয়োজন যে, কবরের প্রশ্ন ও উত্তর সত্য হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ পোষণ করা যাবে না।

١٩٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقَبْرِ ثَلٰثُ سُؤَالٍ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى وَ دَرَجَاتٌ فِى الْجِنَانِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنَ عِنْدَ رَأْسِكَ -

হাদীস নং-১৯৪

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে হানী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, কবরে তিনটি বিষয় (সামনে) পেশ করা হবে ঃ (এক) আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তাআলা সম্পর্কে, (দ্বিতীয়) (মুমিন বান্দার সামনে) বেহেশতের স্থান পেশ করা বা দেখানো হবে এবং (তৃতীয়) তিলাওয়াতকৃত কুরআন মাথার সামনে পেশ করা হবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে কবরের প্রথম অবস্থার কথা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য হাদীসে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

١٩٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةٍ فَاَتٰى قَبْرَ اُمِّهِ فَجَاءَ وَ هُوَ يَبْكِىْ اَشَدُّ الْبُكَاءِ حَتّٰى كَادَتْ نَفْسُهُ اَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْنَ جُنْبَيْهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ اَسْتَأْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ زِيَارَةِ قَبْرِ اُمِّ مُحَمَّدٍ فَاَذِنَ لِىْ وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِى الشَّفَاعَةِ فَاَبٰى عَلَىَّ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اِسْتَأْذَنَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فِىْ زِيَارَةِ قَبْرِ اُمِّهِ فَاَذِنَ لَهُ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَتّٰى انْتَهُوْا اِلٰى قَرِيْبٍ مِنَ الْقَبْرِ فَمَكَثَ الْمُسْلِمُوْنَ وَ مَضَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثَ طَوِيْلاً ثُمَّ اَشْتَدَّ بُكَاؤُهُ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ لاَ يَسْكُنُ فَاَقْبَلَ وَ هُوَ يَبْكِىْ فَقَالَ لَهُ عُمَرَ (رضـ) مَا اَبْكَاكَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَ اُمِّىْ -

قَالَ اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ زِيَارَةِ قَبْرِ اُمِّىْ فَاَذِنَ لِىْ وَاَسْتَأْذَنْتُهُ فِىْ

الشَّفَاعَةَ فَاَبى فَبَكَيْتُ رَحْمَةً لَهَا وَ بَكى الْمُسْلِمُوْنَ رَحْمَةً لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

হাদীস নং-১৯৫

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে এক জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। (মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর) তিনি তাঁর মা'-এর কবরে গমন করেন এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন, যেন মনে হয় তাঁর পবিত্র দেহ থেকে রূহ বের হয়ে যাবে। আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)। আপনি এভাবে কেন কাঁদছেন ? তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহর কাছে আমার 'মা -এর কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছিলাম, আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। এরপর আমি তাঁর শাফায়াতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি। কিন্তু তা দেয়া হয়নি।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) তাঁর মা-এর কবর যিয়ারতের জন্য আল্লাহ্র নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। অনুমতি দেওয়া হলে তিনি কবরের নিকট গমন করেন। কিছুসংখ্যক মুসলমান (সাহাবায়ে কিরাম) তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় কবরের নিকট অবস্থান করেন এবং ঐ সময় তিনি অঝোরে ক্রন্দন করতে থাকেন যে, মনে হয় তিনি আর থামবেন না। অতঃপর ক্রন্দনরত অবস্থায় আমাদের দিকে ফিরেন। তখন হযরত উমর (রা) বলেন ঃ হে নবী (সা)! আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হোক, কি বিষয় আপনাকে এমনভাবে কাঁদিয়েছে ? তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট আমার 'মা'-এর কবর যিয়ারতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি। অনুমতি দেওয়া হয়। অতঃপর তাঁর শাফায়াতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি। কিন্তু তা মঞ্জুর করা হয়নি। তাই 'মা'-এর মহব্বত আমাকে কাঁদিয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম নবী করীম (সা)-এর মহব্বতে কেঁদে ফেলেন।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক ও বিতর্কিত হওয়ায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কিরাম (علماء متقدمين و متأخرين) বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। পূর্ববর্তী (متقدمين) আলিমদের মতে হুযূর (সা)-এর পিতামাতা ইসলামের উপর ইনতিকাল করেননি। পরবর্তী (متأخرين) আলিমদের মতে তাঁরা ইসলামের উপর ইনতিকাল করেছেন। পূর্ববর্তী আলিমগণ উপরে বর্ণিত হাদীস সহ অন্যান্য হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এই হাদীস দ্বারা উভয়ের কাফির অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁরা পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ পেশ করে থাকেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِى قُرْبٰى -

"নবী করীম (সা) এবং মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, কোন মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদি তারা নিকট-আত্মীয়ও হয়।"

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ وَلاَ تُسْئَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيْمِ "জাহান্নামীদের সম্পর্কে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।"

পরবর্তী (متأخرين) আলিমগণ এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং তাঁদের মতে আঁ হযরত (সা)-এর পিতামাতা মুসলমান ছিলেন। তাঁদের মতামতের স্বপক্ষে তিনটি ব্যাখ্যা পেশ করা যায়। প্রথমত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করে ঈমান দান করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁদের নিকট অনেক হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো তাঁরা সহীহ ও হাসান বলে প্রমাণ করে থাকেন। হয়ত পূর্ববর্তী আলিমগণের এতটুকু চিন্তা ও গবেষণা করার অবকাশ হয়নি। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ

দ্বিতীয়ত হুযূর (সা)-এর পিতামাতা সর্বশেষ নবীর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী যুগ পেয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাওহীদবাদী ও আনুগত্য প্রকাশকারীকে শাস্তি প্রদান করেন না। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وَاَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى

"নিশ্চয়ই শাস্তি তার জন্য, যে দীনকে মিথ্যা বলে এবং এর থেকে ফিরে থাকে।"

তৃতীয়ত তাঁরা হযরত ইবরাহীম আলাইহি সালামের দীনে বিশ্বাসী ছিলেন, যার ফলে তাঁরা আযাব থেকে মুক্তি পাবেন। মোট কথা এটা অত্যন্ত আদব ও সতর্কতার বিষয়। প্রকাশ্যভাবে তাঁদেরকে কুফরীর দিকে ইঙ্গিত করা উচিত নয়। যদি এ বিষয়ে কেউ কোন দলীলও পেয়ে থাকে, তবুও কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা শ্রেয়। বলা বাহুল্য, বিশ্বের সকল মানুষ হুযূর (সা)-এর পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ। সুতরাং তাঁদের প্রতি কিভাবে কুফরীর অভিযোগ উত্থাপন করা সম্ভব ? পক্ষান্তরে এটা এরূপ কোন মাসয়ালা নয় যে, যার উপর প্রত্যেক মুসলমানকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে ; এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না। সুতরাং কোন অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে চিন্তা করে অন্তরে সন্দেহ পোষণ করা এবং ঈমানের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই।

بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ وَالسَّلاَمِ عَلٰى اَهْلِهَا

কবর যিয়ারত এবং কবরবাসীদের প্রতি সালাম দেয়ার বর্ণনা

١٩٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مُرْثَدٍ حَمَادٍ اَنَّهُمَا حَدَّثَاه عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ اَنْ تَزُوْرُوْهَا فَزُوْرُوْهَا

وَلَاتَقُوْلُوْا هُجْرًا -

হাদীস নং-১৯৬

অনুবাদ ঃ হযরত বুয়ায়দা (রা) হুযূর (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, আমি প্রথম তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে তোমরা যিয়ারত করতে থাক। কিন্তু মুখে শরীয়ত বিরোধী কোন কথা উচ্চারণ করবে না।

ব্যাখ্যা ঃ আবূ দাউদ শরীফে উপরোক্ত হাদীসের সাথে فان فى زيارتها تذكرة বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে। অর্থাৎ "নিশ্চয়ই কবর যিয়ারতে নসীহত হয়েছে ।" তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

فقد اذن لحمد فى زيارة قبر امه فزورها فانها تذكر الاخرة .

অর্থাৎ "মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর 'মা'-এর কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, সুতরাং তোমরাও কবর যিয়ারত কর। কেননা কবর যিয়ারত আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" এখানে প্রথমত একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে কবর যিয়ারত জায়েয কি না ? সুতরাং এখানে আমাদের জানা প্রয়োজন যে, কবরস্থানে গমন করা সর্বসম্মতিক্রমে (بالاجماع) মুস্তাহাব। কেননা এতে অনেক উপকারিতা রয়েছে। এরদ্বারা অন্তরে কোমলতা, পরকালের চিন্তা, নিজের মৃত্যু এবং দুনিয়া ও যাবতীয় বস্তুর বিলীন হয়ে যাওয়ার চিন্তা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এটা তাকওয়া ও আল্লাহ-ভীরুতার জন্য খুবই প্রয়োজন। তবে এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে এই যে, কবর যিয়ারতে গিয়ে মৃত ব্যক্তির গুনাহ মাফের জন্য এবং তার মঙ্গলের জন্য দু'আ করতে হবে।

এবার দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, কবরবাসীর নিকট কিছু চেয়ে দু'আ করা কতটুকু বৈধ ? এর জওয়াবে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম ও ফিকহ্‌বিদগণ এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তবে কোন কোন সূফীয়ায়ে কিরাম ও ফকীহ্‌ এর অনুমতি দিয়েছেন।[১] বরং অনেক কাশফধারী ও কামিল (اهل كشف و كمال) ব্যক্তির মত হলো এই যে, তাঁরা কবর যিয়ারত থেকে অনেক ফায়দা লাভ করে থাকেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ হযরত কাযিম (র)-এর কবর দু'আ কবূলের জন্য এক আশ্চর্য জায়গা।

কবর যিয়ারত সম্পর্কে তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো এই যে, মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত বৈধ বা জায়েয কিনা ? এ বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কবর যিয়ারতে গমনকারী মহিলাদের উপর লা'নত করেছেন। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান-সহীহ (حسن صحيح) বলেছেন। এই হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কোন উলামায়ে কিরাম মহিলাদের কবর যিয়ারতে গমন থেকে নিষেধ করেছেন, আবার কোন কোন উলামায়ে কিরাম মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন। তাঁদের মত হলো, হুযূর (সা)-এর এই নিষেধাজ্ঞা ঐ সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল, যখন সকল পুরুষ ও মহিলার জন্য

১. 'তবে এটি সহীহ নয়।

কবর যিয়ারত নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী যখন আঁ হযরত (সা) অনুমতি প্রদান করেন, তখন এই সাধারণ অনুমতির মধ্যে মহিলাগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেউ কেউ মহিলাদের কবর যিয়ারতে গমনের ব্যাপারে এইজন্য নিষেধ করেছেন যে, তাদের ধৈর্য ও সহ্যশক্তি অপেক্ষাকৃত কম। তাই তারা কবরে গিয়ে অস্থির ও অধৈর্য হয়ে পড়ে। বস্তুত এরূপ করা জায়েয নয়। যদি এগুলো থেকে মুক্ত থেকে যিয়ারত করে, তবে কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং হানাফী মাযহাবে মহিলাদের কবর যিয়ারত জায়েয রাখা হয়েছে। ফতওয়ায়ে আলমগীরি কিতাবেও এই মত পোষণ করা হয়েছে।

١٩٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ اِلَى الْمَقَابِرِ قَالَ السَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ –

হাদীস নং-১৯৭

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) যখন কোন কবরস্থানে গমন করতেন তখন তিনি (কবরবাসীর উদ্দেশ্যে) এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ

السلام على اهل الديار من المسلمين و انا ان شاء الله بكم لاحقون . نسأل الله لنا ولكم العافية –

"হে কবরবাসী মুসলমানগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হব । আমরা নিজেদের এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও শান্তির দু'আ করছি।"

ব্যাখ্যা ঃ অন্যান্য সহীহ হাদীসেও এই দু'আ বর্ণিত আছে।

كِتَابُ الزَّكٰوةِ
যাকাত অধ্যায়

بَابُ الرِّكَازِ
রিকাযের বিধান

١٩٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّكَازُ مَا رَكَزَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْمَعَادِنِ الَّذِىْ يَنْبُتُ فِى الاَرْضِ -

হাদীস নং-১৯৮

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যা আল্লাহ্ খনির মধ্যে প্রোথিত করে রেখেছেন বা জমির মধ্যে তৈরি হয়ে থাকে, তাকে রিকায বলে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রশ্ন হতে পারে রিকায (ركاز) কি ? রিকায ঐ বস্তুকে বলা হয় যা আল্লাহ্ খনির মধ্যে তৈরি করে থাকেন। এটা জমির মধ্যে তৈরি হয়ে থাকে। ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মধ্যে রিকায (ركاز) সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। মতপার্থক্যের মূল বিষয় হলো এই যে, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালিক (র) খনির মধ্যে যাকাত আরোপ করে থাকেন এবং রিকাযকে আইয়ামে জাহিলিয়াতের গুপ্তধনের অন্তর্ভুক্ত করে এতে এক-পঞ্চমাংশ (خمس) যাকাতের বিধান আরোপ করে থাকেন। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালিক (র) নিজেদের মাযহাবের স্বপক্ষে মুয়াত্তা ইমাম মালিক থেকে বিলাল ইবনে হারিস আল-মুযানী (রা) বর্ণিত হাদীস পেশ করে থাকেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) ফরা' নামক খনিসমূহ হযরত বিলাল ইবনে হারিস আল-মুযানীর নিকট জায়গীর হিসেবে প্রদান করেন। কিন্তু ঐ খনি থেকে যাকাত ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হয়নি। ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁর মতামতের স্বপক্ষে পবিত্র কুরআন থেকে দলীল পেশ করেছেন। মূলত আরবী ركاز শব্দের অভিধানিক অর্থ নিয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মাটির ভিতর থেকে যে মালামাল বের করা হয়ে থাকে, তা তিনভাগে বিভক্ত। কান্য (كنز), মাদান (معدن) এবং রিকায (ركاز)।

كنز ঐ কোষাগারকে বলা হয় যা মানুষ নিজেরাই মাটির ভিতর পুঁতে রাখে। معدن ঐ খনিকে বলা হয় যা জমি সৃষ্টির সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে ركاز হলো আম তথা সাধারণ অর্থবোধক শব্দ এবং কানয ও মাদান উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে "وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَئَى فَاَنَّ لِلّٰه خُمُسَهُ তোমরা অবশ্যই এটা জেনে রাখ যে, গনীমত হিসেবে তোমরা যা লাভ করবে, এর এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য।"

প্রকাশ থাকে যে, গুপ্তধন এবং এর এলাকার ভূমি উভয়ের উপর গনীমত (غنيمت) শব্দ আরোপিত হয়ে থাকে। কেননা এটা প্রথমে কাফিরদের অধিকারে ছিল। অতঃপর মুসলমানদের অধিকারে এসেছে। যখন এ সমস্ত গনীমতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তখন এর উপর এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়েছে। সুন্নতের দলীল হিসেবে সিহাহ্ সিত্তাহ হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে ঃ "العجماء جبار والبير جبار والمعدن خيار وفى الركاز الخمس পশু, কূপ এবং খনির মধ্যে কিছু ধার্য করা হয়নি। কিন্তু রিকায (ركاز) -এর মধ্যে এক-পঞ্চমাংশের বিধান রয়েছে।" সুতরাং ركاز -এর আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করে শুধু গুপ্তধনের (دفينة) অর্থ গ্রহণ করার মধ্যে কোন গুরুত্ব বহন করে না। বিশেষ করে যখন হুযূর (সা)-এর বর্ণনার দ্বারা এর স্বপক্ষে দলীল পাওয়া যায়। ইমাম মুহাম্মদ (র) স্বীয় হাদীস গ্রন্থ মুয়াত্তায় এবং ইমাম বায়হাকী (র) বর্ণনা করেন যে, যখন হুযূর (সা) বলেছেন ঃ রিকাযে (ركاز) এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে, তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! রিকায (ركاز) কি? তখন তিনি বললেন, রিকায (ركاز) ঐ সম্পদকে বলা হয় যা আল্লাহ জমিতে খনির মধ্যে আকাশ ও পৃথিবী তৈরির সময় সৃষ্টি করেছেন।

এবার শাফিঈ মাযহাবের দলীলের জওয়াব হলো এই যে, ঐ হাদীসে বিলাল ইবনে হারিস আল-মুযানী প্রথমত মুনকাতি' (منقطع)। যেমন আবূ উবাইদ কিতাবুল আমওয়ালে এর ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়া কোথায় এটা প্রকাশ করা হয়েছে, যে খনি থেকে যাকাত আদায় করতে হবে এ ব্যাপারে হুযূর (সা) নির্দেশ দিয়েছেন। বরং কিয়াস এটাই বলে যে, ইজাতিহাদের মাধ্যমে এই মতামত দেয়া হয়েছে। কেননা এই বিষয়ে নবী করীম (সা) থেকে কোন রিওয়ায়েত নেই।

হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে কিয়াসের দৃষ্টিকোণ থেকে দলীল হলো এই যে, খনি পূর্ণাঙ্গভাবে গনীমতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা প্রথমত এটা কাফিরদের অধিকারে ছিল। অতঃপর মুসলমানগণ স্বীয় ক্ষমতার বলে ঐ খনি অধিকার করার ফলে তা গনীমতের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেহেতু গনীমতে এক-পঞ্চমাংশ দেওয়ার বিধান রয়েছে, তাই খনির মধ্যেও এক-পঞ্চমাংশ (خمس) দিতে হবে।

بَابُ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ

প্রত্যেক সৎকাজ সদকা

١٩٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوْفٍ فَعَلْتَهُ اِلٰى غَنِىٍّ وَفَقِيْرٍ صَدَقَةٌ –

হাদীস নং-১৯৯

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেকটি সৎকাজ যা তোমরা ধনী ও দরিদ্রদের প্রতি করে থাকো, তা সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস একই বাক্য অথবা দুই-এক শব্দ পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন হাদীসের সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে। তিবরানী হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসে فعلته এর পরিবর্তে صنعته শব্দ রয়েছে। হাকেমে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, মুসলমান নিজের জন্য যা ব্যয় করে অথবা পরিবারবর্গের জন্য অথবা এরদ্বারা স্বীয় ইয্যত-সম্মান রক্ষা করে, তা সদকার মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়।

بَابُ كَوْنِ الصَّدَقَةِ هَدِيَّةً لِلْغَيْرِ

সদকার মাল অন্যের জন্য হাদিয়া হতে পারে

٢٠٠ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ تُصُدِّقَ عَلٰى بَرِيْرَةَ بِلَحْمٍ فَرَاٰهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ –

হাদীস নং -২০০

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত বারীরা (রা)-কে সদকা হিসেবে কিছু গোশত প্রদান করা হয়। নবী করীম (সা) তা দেখেন এবং বলেন ঃ এই গোশত তার জন্য সদকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া।

ব্যাখ্যা ঃ হুযূর (সা)-এর হাদীসে বর্ণিত কথার মূল উদ্দেশ্য এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যে, বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমে কোন বস্তুর পরিবর্তনের কারণে এর বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন, হযরত বারীরা (রা)-এর অধিকারে সদকার গোশত আসার পর এর বিধান পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং কোন দরিদ্র লোক যদি সদকা দিয়ে কোন ধনী ব্যক্তির মেহমানদারী করে, তাহলে ঐ ধনী ব্যক্তির জন্য ঐ সদকার দ্রব্য খাওয়া জায়েয হবে। অথবা যদি কোন ধনী ব্যক্তি ঐ সদকার মাল খরিদ করে, তবুও এটা জায়েয হবে। তবে ধনী ব্যক্তি অথবা বনূ হাশিম গোত্রের জন্য সদকার মাল সাধারণভাবে ব্যবহার করা বা নিজের অধিকারে নিয়ে যাওয়া কোনমতেই জায়েয হবে না। সুতরাং হুযূর (সা) স্বীয় আমল এবং উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা এই মাসয়ালাটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

كِتَابُ الصَّوْمِ

রোযা অধ্যায়

بَابُ فَضِيْلَةِ الصَّوْمِ

রোযার ফযীলত

٢٠١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ الزَّيَّات عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدمَ لَه اِلاَّ الصِّيَامُ فَهُوَ لِىْ وَ اَنَا اَجْزِىْ بِه -

হাদীস নং-২০১

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ মানুষের সমস্ত আমল তার নিজের জন্য। কেবল রোযা ব্যতীত। কেননা রোযা আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর পুরস্কার দান করব।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস অন্যান্য আমল ও ইবাদতের উপর রোযার ফযীলত প্রমাণ করে। বস্তুত হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হলো এই যে, অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে লোক দেখানো বা রিয়ার অবকাশ থাকে এবং রিয়ার কারণে মানুষের অনেক ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। কিন্তু রোযা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই রাখা হয়। এতে কোন রিয়া আসতে পারে না। বায়হাকী শুআবুল ঈমানে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মরফূ' (مرفوع) হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন ঃ

الصيام لا رياء فيه قال الله تعالى هولى و انا اجزى به يدع طعامه و شرابه اجلى -

"রোযার মধ্যে রিয়া নেই, আল্লাহ বলেন ঃ রোযা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব। রোযা পালনকারী আমার জন্যই পানাহার ত্যাগ করে।"

এছাড়া হাদীসের দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের আমলের প্রতিদান তার কষ্ট ও পরিশ্রমের দৃষ্টিকোণ থেকে দশ হতে সাত শ' গুণ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। কিন্তু রোযার

প্রতিদানের কোন পরিমাণ নেই। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণার দ্বারা যে পরিমাণ ইচ্ছা, দান করতে পারেন।

٢٠٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ جَاعَ يَوْمًا فَاجْتَنَبَ الْمُحَارَمَ وَ لَمْ يَأْكُلْ مَالَ الْمُسْلِمِيْنَ بَاطِلاً اِلاَّ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ -

হাদীস নং - ২০২

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে কোন মুমিন ব্যক্তি সারাদিন অভুক্ত থাকে এবং হারাম কাজ (যেমন গীবত ইত্যাদি) থেকে মুক্ত থাকে, অবৈধভাবে কোন মুসলমানের মাল না খায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশতের ফল থেকে আহার করাবেন।

ব্যাখ্যা ঃ হুযূর (সা) এই হাদীসে যদি অভুক্ত বা ক্ষুধার্ত থাকা সাধারণভাবে বুঝায়, এটা রোযার অবস্থায় হোক অথবা অন্য কোন কারণে, তবুও এতে রোযার ফযীলত লাভ করবে। রোযা ব্যতীত অভুক্ত থাকার কারণে একজন মুমিন বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র এরূপ করুণা হয় যে, এরজন্য আল্লাহ তাকে বেহেশতের ফল দ্বারা তৃপ্তি দান করবেন। রোযা অবস্থায় অভুক্ত থাকা একটি দৈহিক ও উত্তম ইবাদত। সুতরাং এর প্রতিদানে আল্লাহ অনেক বেশী উন্নত পুরস্কার দান করবেন।

٢٠٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىْ (رضـ) عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُوْمُوْا هٰذَا الْيَوْمَ قَالَ اِنَّهُمْ طَعِمُوْا قَالَ وَ اِنْ كَانُوْا قَدْ طَعِمُوْا -

হাদীস নং - ২০৩

অনুবাদ ঃ হযরত হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান হিময়ারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) আশূরার দিন তাঁর সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হতে একজনকে বললেন ঃ তোমার কওমকে নির্দেশ প্রদান কর যেন তারা আজ রোযা রাখে। তিনি আরয করলেন, তারা তো আহার করে ফেলেছে। হুযূর (সা) তখন বলেন ঃ যদিও তারা খাবার খেয়ে থাকে (অর্থাৎ ঐ দিনের বাকী অংশে কিছু খাবে না)।

ব্যাখ্যা ঃ আঁ হযরত (সা) আশূরার দিনের মর্যাদাকে অত্যন্ত কর্যকর ভাষায় প্রকাশ করে বলেছেন ঃ যারা খাবার খেয়ে ফেলেছে, তারা যেন দিনের বাকী অংশে কিছু না খায় এবং যারা

খাবার খায়নি, তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের রোযা পূর্ণ করবে। এটা রোযা ফরয হওয়ার পূর্ববর্তী ঘটনা, যতক্ষণ পর্যন্ত আশূরার রোযা বাধ্যতামূলক ছিল। সাহাবায়ে কিরাম (রা) বলেছেন ঃ এরপর আমরা এবং আমাদের সন্তানগণ রোযা রাখতাম। মোট কথা আশূরার দিনের রোযার ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। যখন রমযান শরীফের রোযা ফরয হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যার ইচ্ছা, ঐ দিন রোযা রাখবে এবং যার ইচ্ছা, রাখবে না।

٢٠٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ مُوْسى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحُوْتَكِيَّةِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَرْنَبٍ فَاَمَرَ اَصْحَابَهُ فَاكَلُوْا وَ قَالَ لِلَّذِىْ جَاءَ بِهَا مَالَكَ لاَ تَأْكُلُ مِنْهَا قَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ وَ مَا صَوْمُكَ قَالَ تَطَوُّعٌ قَالَ فَهَلاَّ البِيْضَ -

হাদীস নং-২০৪

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে (রান্না করা) খরগোশ পেশ করা হয়। তিনি তাঁর সাহাবাদেরকে বলেন ঃ খাও। তখন তাঁরা খাওয়া শুরু করেন। হুযূর (সা) (এই খাদ্য) নিয়ে আগমণকারী ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি কেন খাও না ? তিনি বলেন ঃ আমি রোযা রেখেছি। হুযূর (সা) বললেন ঃ এটা কিসের রোযা ? তিনি বললেন, নফল রোযা। তখন হুযূর (সা) বললেন ঃ আইয়ামে বীযের রোযা কেন রাখ না ?

ব্যাখ্যা ঃ এখানে কয়েকটি বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। সংক্ষিপ্ত আকারে তা বর্ণনা করা হলো। প্রথমত আইয়ামে বীযের ফযীলত উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। প্রতি আরবী মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ হলো আইয়ামে বীয। দ্বিতীয়ত, খরগোশের গোশত খাওয়া সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী মাযহাবে খরগোশের গোশত মুবাহ (مباح)। উপরোক্ত হাদীসই এর প্রমাণ। তৃতীয়ত নফল রোযা সম্পর্কিত। এ বিষয়ে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে। একটি হলো সর্বসম্মতিক্রমে ওযরের কারণে,যেমন মেহমানদারী ইত্যাদি কারণে রোযা ভঙ্গ করে ইফতার করা যাবে। বিভিন্ন হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। দ্বিতীয় মতপার্থক্য হলো উক্ত রোযার কাযা ওয়াজিব হবে কি না ? হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এর কাযা ওয়াজিব হবে। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন ঃ আমি এবং হযরত হাফসা (রা) রোযা ছিলাম। আমাদের নিকট তখন এ ধরনের কিছু খাদ্য এল যা আমাদের নিকট খুবই প্রিয় ছিল। আমরা তা খেয়ে ফেললাম। হযরত হাফসা (রা) এই ঘটনা হুযূর (সা)-এর নিকট বর্ণনা করেন। তখন তিনি এই রোযার পরিবর্তে অন্যদিন রোযা রাখার নির্দেশ দান করেন। আমর (امر) বাহ্যত ওয়াজিবের জন্য এসে থাকে, তাই এখানেও ওয়াজিব হওয়াকেই প্রমাণ করে। তবে এখানে একটি সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, সম্ভবত এই রোযা কাযা (قضا) অথবা মান্নতের (نذر) ছিল। যদি

তা এরূপ হতো, তাহলে প্রশ্ন করার কি প্রয়োজন ছিল ? এর ওয়াজিব কিভাবে বাতিল হতে পারে ? এ অবস্থায় হুযূর (সা) তাঁদেরকে এই কাজের জন্য ধমক দিতেন। এছাড়া সাহাবায়ে কিরাম নিজেরাই ফরয ও ওয়াজিবসমূহের উপর এমন কঠোরভাবে আমল করতেন যাতে কোন অবস্থাতেই তা ছুটে না যায়। সামান্য খানা বা মজার জন্য তা হতেই পারে না।

٢٠٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ بِلَالاً يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىْ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ يُؤَذِّنُ وَ قَدْ حَلَّتِ الصَّلٰوةُ –

হাদীস নং–২০৫

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, বিলাল যখন রাতে আযান দিতে থাকে তখন তোমরা পানাহার করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত ইবনে উম্মে মাকতূম আযান না দেয়। কেননা যখন সে আযান দেয়, তখন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীস একই বাক্য সহকারে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও অন্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি বিতর্কিত মাসয়ালা রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র), ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম আহমদ (র)-এর মতে ফজরের নামাযের আযান, বিশেষ করে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ সুবহে সাদিকের পূর্বে দেওয়া জায়েয আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ফজর নামায সহ অন্য যে কোন নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া জায়েয নেই। উপরে বর্ণিত হাদীসের দ্বারা তিনজন ইমাম তাঁদের দলীল পেশ করে থাকেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অনেক সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে,ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে ফজরের আযান দেওয়া কখনো জায়েয নয়। যেমন আবূ দাউদ শরীফে হযরত শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত বিলাল (রা) একবার সুবহে সাদিকের পূর্বে ফজরের আযান দেন। তখন হুযূর (সা) তাঁকে নির্দেশ দান করেন, যেন তিনি চিৎকার করে এই ঘোষণা দেন যে, আমি ভুলক্রমে সময় হওয়ার পূর্বেই আযান দিয়ে ফেলেছি। এটা শুধু এইজন্য, যাতে মানুষের ভুল ধারণা দূর হয়ে যায় এবং এটা যেন মনে না করে যে, ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান জায়েয আছে।

এবার ইমামত্রয়ের দলীল উপরোক্ত হাদীসের জওয়াবে বলা যায়. উক্ত ঘটনা ছিল রমযান মাসের। যেমন ইমাম মুহাম্মদ (র) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, পবিত্র রমযান মাসে হযরত বিলাল (রা)-এর আযান সাহরী খাওয়ার জন্য একটি আহবানের মত ছিল, এটা ফজর নামাযের আযান ছিল না এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) ফজর নামাযের আযান দিতেন। সুবহে সাদিকের পর কিভাবে পানাহার জায়েয হতে পারে ? সুতরাং হযরত বিলাল (রা)-এর থেকে ফিরে থাকা ঠিক নয়। খুব সম্ভব বরং কিয়াসও এটাই বলে যে, আঁ হযরত (সা)-এর উপরোক্ত নির্দেশের

মূল উদ্দেশ্য হলো এই যে, হযরত বিলাল (রা) যেহেতু ভুল করেন, তাই সাহরী শেষ করার ব্যাপারে তাঁর আযানের উপর নির্ভর করো না ; বরং হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)-এর আযানের উপর নির্ভর কর। কেননা তিনি অন্ধ ছিলেন। তিনি যখন আযান দিতেন, তখন ফর্সা হয়ে যেত এবং লোকজন তাকে বলত, সুবহে সাদিক হয়ে গেছে। যেমন মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিকে বর্ণিত আছে, ঐ সময় পানাহার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে। এরদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হানাফী মাযহাব সঠিক।

فسخ الافطار بالحجامة

শিংগা লাগানোর কারণে রোযা ভংগের বিধান রহিত

٢٠٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ السَّوَارِ وَ يُقَالُ لَه اَبُوْ السَّوْرَاءِ وَهُوَ السَّلَمِى عَنْ ابْنِ حَاضِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِحْتَجَمَ بِالْقَاحَةِ وَ هُوَ صَائِمٌ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ -

وَ فِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَ اَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَه وَ لَوْ كَانَ خَبِيْثًا مَا اَعْطَاه -

হাদীস নং-২০৬

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) "ক্বাহা" নামক স্থানে শিংগা লাগান, তখন তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোযা অবস্থায় "ক্বাহা"নামক স্থানে শিংগা লাগিয়েছেন।

অন্য রিওয়ায়েতে আছে, নবী করীম (সা) একবার শিংগা লাগান এবং শিংগা লাগানোকারীকে তার পারিশ্রমিক প্রদান করেন। যদি এই পারিশ্রমিক হারাম হতো তাহলে তিনি তাকে এটা প্রদান করতেন না।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকাংশ (جمهور) উলামায়ে কিরামের মত হলো এই যে, রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানোর কারণে কোন অসুবিধা নেই এবং এরদ্বারা রোযার কোন অসুবিধা হবে না। দ্বিতীয়ত শিংগা লাগানোকারীর পারিশ্রমিক দেওয়া জায়েয অথবা হারাম। যে হাদীস দ্বারা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, ঐ হাদীসের হারামকে মাকরূহ্ তানযীহি

ইসেবে গণ্য করা যায়। অথবা ঐ হারামকে রহিত (منسوخ) বলে গণ্য করা যায়। এ মত মাল্লামা তাহাবী গ্রহণ করেন।

٢٠٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ اِحْتَجَمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا قَالَ اَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُوْمُ –

হাদীস নং-২০৭

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে শিংগা লাগায় এবং যাকে শিংগা লাগানো হয়, উভয়ের রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ কথা বলার পর নবী করীম (সা) শিংগা লাগালেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই রিওয়ায়েএরদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শিংগা লাগানোর কারণে রোযা ভঙ্গ হওয়ার বিধান হুযূর (সা)-এর পরবর্তী আমলের দ্বারা রহিত (منسوخ) হয়ে যায়।

٢٠٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ –

وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ اَنَسًا –

হাদীস নং-২০৮

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (র) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) রোযা অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রা) বলেছেন ঃ আমাকে ইবনে শিহাব খবর দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রোযা অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন। এই বর্ণনায় হযরত আনাস (রা)-এর কথা উল্লেখ করা হয়নি।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী হাদীসের মত হওয়ায় পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা দেখা যেতে পারে।

بَابُ الاِصْبَاحِ جُنُبًا فِى الصَّوْمِ

অপবিত্র অবস্থায় রোযা পালনকারীর ভোর হওয়া

٢٠٩ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ يُصْبِحُ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ اِحْتِلَامٍ ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ -

হাদীস নং-২০৯

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ স্বপ্নদোষ ছাড়া (স্ত্রী সঙ্গমের কারণে) অপবিত্র অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভোর হয়ে যেত। অতঃপর তিনি রোযা পূর্ণ করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে একটি মাসয়ালা হলো এই যে, যদি অপবিত্র অবস্থায় রোযা পালনকারীর ভোর হয়ে যায়, তাহলে রোযা শুদ্ধ হবে কিনা ? উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, এ অবস্থায় রোযা সহীহ ও শুদ্ধ হবে।

٢١٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْرُجُ اِلٰى صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَرَأْسُه يَقْطُرُ مَاءً مِنْ غُسْلِ جَنَابَةٍ وَ جِمَاعٍ ثُمَّ يَظَلُّ صَائِمًا -

হাদীস নং-২১০

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজর নামাযের জন্য এ অবস্থায় গমন করতেন যে, স্ত্রী সহবাসের পর অপবিত্রতা হতে গোসল করার কারণে তাঁর পবিত্র মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়ত। অতঃপর তিনি সারা দিন রোযা রাখতেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের দ্বারাও একই মাসয়ালার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অপবিত্রতা রোযাকে ফাসেদ করে না। جماع শব্দের সংযোজন দ্বারা এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শয়তানের কুপ্রভাবের কারণে স্বপ্নদোষের দ্বারা মানুষ অপবিত্র হয়ে থাকে। কিন্তু হুযূর (সা)-এর পবিত্র সত্তা শয়তানের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিল। তাই স্বপ্নদোষের দ্বারা অপবিত্র হওয়া থেকে হুযূর (সা) পবিত্র ছিলেন।

بَابُ قُبْلَةِ الصَّائِمِ

রোযা অবস্থায় চুমো দেওয়া

٢١١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ سُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ اِلَى الْفَجْرِ وَ رَأْسُه يَقْطُرُ يَظَلُّ صَائِمًا-

وَ بِاِسْنَادِهِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ نِسَائَه فِى رَمَضَانِ –

হাদীস নং-২১১

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ অবস্থায় ফজর নামাযের জন্য গমন করতেন যে, তার পবিত্র মাথা থেকে (গোসলের পানির) ফোঁটা পড়ত। (অতঃপর) তিনি রোযা রাখতেন।

একই সনদে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) রমযান মাসে তাঁর স্ত্রীদের চুমো দিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রোযা অবস্থায় চুমো দেওয়াতে রোযা ভঙ্গ হয় না। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বুখারী শরীফে মরফূ' রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) রোযা অবস্থায় (স্বীয় স্ত্রীদের) চুমো দিতেন, মেলামেশা করতেন এবং তিনি স্বীয় কামনা ও আবেগের উপর তোমাদের থেকে অধিক নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। হাদীসের মূল কথা হলো এই যে, যেহেতু আঁ হযরত (সা)-এর আবেগের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল, সুতরাং প্রত্যেকের স্বীয় আবেগ ও কামনার উপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে। তাই ফিকহ্র কিতাবে قبلة -এর সাথে ان امن শব্দ বৃদ্ধি করেছে, যার অর্থ চুমো সঙ্গম পর্যন্ত সীমাতিক্রম না করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে।

ইমাম শাফিঈ (রা) চুমো জায়েয হওয়ার বিষয়টি কোন শর্তের সাথে যুক্ত করেন নি।

٢١٢ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ سُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيْبُ مِنْ وَجْهِهَا وَ هُوَ صَائِمٌ يَعْنِىْ الْقُبْلَةَ –

হাদীস নং-২১২

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রোযা অবস্থায় আমাদের চেহারা থেকে দূরে থাকতেন না। অর্থাৎ এ অবস্থায়ও চুমো দিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ তাহাবী শরীফে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সা) রোযা অবস্থায় আমাদের চেহারা ও মুখন্ডল থেকে দূরে থাকতেন না।

٢١٣ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ زِيَادٍ عَنْ عَمْرَو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَ هُوَ صَائِمٌ –

হাদীস নং-২১৩

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) রোযা অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীদের চুমো দিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসেও একই বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ رُخْصَةِ الاِفْطَارِ فِى السَّفْرِ

সফর বা ভ্রমণে রোযা না রাখার অনুমতি

٢١٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ ابْنِ حَبِيْبِ نِ الصَّيْرِ فِىْ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلى مَكَّةَ فَصَامَ حَتّٰى اَتى قُدَيْدًا فَشَكَا النَّاسُ اِلَيْهِ الْجُهْدَ فَافْطَرَ فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتّٰى اَتٰى مَكَّةَ -

হাদীস নং-২১৪

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র রমযান মাসের তিন তারিখে মদীনা থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা করেন এবং তিনি রোযা রাখেন। চলতে চলতে তিনি কুদাইদ (قديد) নামক স্থানে পৌছেন। তখন লোকজন তাঁকে সফরের কষ্টের কথা বলেন। তখন হুযূর (সা) ইফতার করে রোযা ভঙ্গ করেন। অতঃপর মক্কা পৌঁছা পর্যন্ত তিনি রোযা রাখেন নি।

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ (جمهور) উলামায়ে কিরামের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, মুসাফির সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখা এটা তার ইচ্ছা। যদি রোযা না রাখে, তাহলে পরে এই রোযার কাযা করতে হবে। তবে কোনটি উত্তম এটা নিয়ে কিছু মতানৈক্য রয়েছে। রোযা রাখা উত্তম, না রোযা না রাখা উত্তম ? কেউ কেউ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন। কেননা হাদীসে বর্ণিত আছে اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَ اِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ "যদি চাও রোযা রাখ, যদি চাও না রাখ"। কেউ রোযা রাখাকে না রাখার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আবার কেউ না রাখাকে রোযার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম শাফিঈ (র) রোযা রাখা উত্তম মনে করতেন। তবে শর্ত হলো মুসাফির রোযা রাখায় সক্ষম হতে হবে। কেননা হাদীসে বর্ণিত বাক্য এটাই প্রমাণ করে ঃ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَ مِنَّا الْمُفْطِرُ فَاِنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ يَرْجُحُهُ وَ اَخْتَارَهُ فَصَامَ وَ مَنْ لَا فَلَا অর্থাৎ "আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রোযা রাখে, আবার কেউ রোযা রাখে নি। যারা সক্ষম তারা রোযা রাখে, যারা সক্ষম ছিল না তারা রোযা রাখেনি।"

٢١٥- اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَن مُسْلِمٍ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ سَافَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَمَضَانَ يُرِيْدُ مَكَّةَ فَصَامَ وَ صَامَ النَّاسُ مَعَه -

وَفِىْ رِوَايَةٍ خَرَجَ مِنْ الْمَدِيْنَةِ اِلى مَكَّةَ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى بَعْضِ الطَّرِيْقِ فَشَكَا النَّاسُ اِلَيْهِ الْجُهْدَ فَافْطَرَ فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتّٰى اَتٰى مَكَّةَ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَمَضَانَ يُرِيْدُ مَكَّةَ فَصَامَ وَ صَامَ الْمُسْلِمُوْنَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ شَكَا بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجُهْدَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَافْطَرَ وَاَفْطَرَ الْمُسْلِمُوْنَ -

হাদীস নং-২১৫

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) রমযান মাসে মক্কা সফরে গমন করেন এবং রোযা রাখেন। তাঁর সাথে সাহাবায়ে কিরাম রোযা রাখেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) রমযান মাসে মদীনা থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা হন। এ সময় তিনি রোযা রাখেন। চলতে চলতে কোন এক রাস্তায় (স্থানে) পৌঁছেন। এ সময় লোকজন সফরের কষ্টের কথা উল্লেখ করেন। তখন তিনি রোযা ভঙ্গ করেন। এ অবস্থায় তিনি মক্কা পৌঁছেন।

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) রমযান মাসে মক্কা সফরের ইচ্ছা করেন। অতঃপর রোযা রাখেন এবং মুসলমানগণও রোযা রাখেন। এরপর যখন কোন রাস্তায় (স্থানে) পৌঁছেন তখন কোন কোন মুসলমান (সফরের) কষ্টের কথা উল্লেখ করেন। তখন তিনি পানি চেয়ে নেন এবং ইফতার করে রোযা ভঙ্গ করেন এবং মুসলমানগণও রোযা ভঙ্গ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

بَابُ النَّهِىِّ عَنْ صَوْمِ الصَّمْتِ وَ عَنْ صَوْمِ الوِصَالِ

চুপ থাকার রোযা এবং ক্রমাগত রোযা রাখা নিষেধ

٢١٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَن عَدِىٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ الشَّعْثَاءِ عَنْ

اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ صَـوْمِ الْوِصَالِ وَ صَوْمِ الصَّمْتِ -

হাদীস নং-২১৬

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) ক্রমাগতভাবে রোযা রাখা এবং চুপ থাকার রোযা রাখা থেকে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ صوم وصال হলো এই যে, মানুষের অব্যাহতভাবে রোযা রাখা এবং রাতেও কিছু না খাওয়া। صوم صمت হলো এই যে, রোযা রাখার পর সারাদিন কোন কথাবার্তা না বলা। আঁ হযরত (সা) সুস্পষ্টভাবে صوم وصال সম্পর্কে নিষেধ করেছেন। অন্য একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি একাধারে রোযা (صوم وصال) রাখেন, তবে কেন আপনি আমাদেরকে নিষেধ করেন ? তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে ? আমি এ অবস্থায় রাত অতিবাহিত করি যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। উলামায়ে কিরামের মধ্যে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে যে, صوم وصال জায়েয অথবা হারাম বা মাকরূহ। কেউ কেউ জায়েয বলেছেন, তাঁদের যুক্তি হলো এই যে, এ নিষেধাজ্ঞা শুধু উম্মতের উপর রহমত ও দয়ার কারণে করা হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ (جمهور) উলামায়ে কিরামের মতে এটা নাজায়েয এবং মাকরূহ। ইমাম আহমদ (র) ব্যতীত তিনজন ইমাম থেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

صوم صمت ইয়াহূদীদের ধর্মীয় রীতি। তাই ইসলামী শরীয়তে এই আমল থেকে বাঁচার জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কেননা ইয়াহূদীদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

٢١٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الصَّمْتِ وَ صَوْمِ الْوِصَالِ -

হাদীস নং-২১৭

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) صوم صمت এবং صوم وصال থেকে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ صِيَامِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

আইয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখা নিষেধ

٢١٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ)

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ صِيَامِ ثَلٰثَةَ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

وَ بِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ مِنْ رَمَضَانَ -

হাদীস নং -২১৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) আইয়ামে তাশরীকের দিন (অর্থাৎ যিলহজ্ব মাসের ১১,১২,ও ১৩ তারিখ) রোযা রাখার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন।

একই সনদে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ দিন রোযা রাখা থেকে নিষেধ করেছেন যেদিন রমযান হিসেবে সন্দেহ করা হয় (অর্থাৎ ২৯শে শাবান মেঘ ও ধূলিবালির কারণে চাঁদ না দেখার কারণে যদি সন্দেহ হয় যে, এই রাত কি ১লা রমযানের না শাবানের ৩০ তারিখের ? সুতরাং আগামীকাল যেহেতু সন্দেহের দিন, তাই রোযা রাখা নিষেধ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে يوم الشك বা সন্দেহের দিন রোযা রাখার ব্যাপারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এই দিন রোযা না রাখার ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। তিরমিযী, নাসাঈ ও অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এই দিন রোযা রাখে, সে যেন আবুল কাসিম অর্থাৎ হুযূর (সা)-এর সাথে নাফরমানী করল। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিষয় হলো এই যে, রমযানের এক অথবা দু'দিন পূর্বে রোযা রাখার ফলে রমযানের রোযার অতিরিক্ত বা সংযোজন মনে হয় এবং খ্রীস্টানদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়। কেননা তাদের উপর গ্রীষ্মকালে রোযা ফরয হয়েছিল এবং এটা তাদের জন্য অসহনীয় ছিল। এইজন্য তারা এই রোযাকে নির্ধারিত স্থান থেকে হটিয়ে এর উপর কয়েকটি অতিরিক্ত রোযা করে নিয়েছে। সুতরাং এই অবস্থা যদি চালু হয়ে যায়, তাহলে সাধারণ লোক এই ভুলের শিকার হয়ে পড়বে যে, এই রোযাও ফরয। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মতানৈক্য হলো এই যে, উক্ত নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীসের কারণে এই দিন রোযা রাখা মাকরূহ বলা হয়েছে। কিন্তু নফল রোযা মাকরূহ নয় ; বরং এটা মুস্তাহাব। কেননা অন্য হাদীসে এই নিষেধাজ্ঞার বিধান থেকে নফল রোযা পৃথক করার বিষয়ে রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। যেমন ঃ

قوله عليه السلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فيصومه .

"রমযানের এক অথবা দু'দিন পূর্বে রোযা রাখবে না। তবে ঐ ব্যক্তি, যে যে কোন দিন রোযা রাখায় অভ্যস্ত, সে যেন ঐ দিন রোযা রাখে।" অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি কোন দিন রোযা রাখার অভ্যাস করে ফেলে, যেমন সোমবার দিন, তা হলে ঐ ব্যক্তি তার অভ্যাস অনুযায়ী ঐ দিন রোযা

রাখবে। অথবা এটা বিশেষভাবে উলামায়ে কিরামের জন্য জায়েয যাঁরা এটা প্রচার করবেন না। সাধারণ লোকদের জন্য সন্দেহের দিন (يوم الشك) অর্ধ দিবস পর্যন্ত অপেক্ষা করা জায়েয। এরপর তারা ইফতার করবে। নতুবা সাধারণ লোকদের জন্য এই নফল রোযার অভ্যাস অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এই নফল রোযাও একটি বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ প্রত্যেক মাস ইবাদত অর্থাৎ রোযার উপর শেষ করা সুন্নত। সুতরাং এই সম্মান থেকে শা'বান কেন শূন্য থাকবে ? সাধারণের জন্য যেহেতু অন্য আশংকা রয়েছে, তাই তাদের জন্য এটা সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে।

بَابُ الاِعْتِكَافِ وَالاِيْفَاءِ بِنَذْرِه

ই'তিকাফ করা এবং মান্নত পূর্ণ করা

٢١٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَذَرْتُ اَنْ اعْتَكِفَ فِىْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا اَسْلَمْتُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ.

হাদীস নং -২১৯

অনুবাদ ঃ হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ আমি আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময় মসজিদুল হারামে ই'তিকাফের মান্নত করেছিলাম। যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি, তখন আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করি (আমি কি মান্নত পূর্ণ করব)। তিনি বললেন ঃ স্বীয় মান্নত পূর্ণ কর।

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী ও মুসলিম এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে شب শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে যে, আমি এক রাত ই'তিকাফ করার মান্নত করেছিলাম। অন্য রিওয়ায়েতে দিন শব্দ রয়েছে। আবু দাউদ, নাসাঈ এবং তিবরানী গ্রন্থে রোযার কথাও রয়েছে যে, তিনি রোযাও মান্নত করেছিলেন। সুতরাং এর জওয়াবে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) হযরত উমর (রা)-কে রোযা রাখারও অনুমতি দিয়েছিলেন।

كِتَابُ الْحَجِّ

হজ্জ অধ্যায়

بَابُ التَّعْجِيْلُ فِى الْحَجِّ

হজ্জে জলদি করা

٢٢٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ -

হাদীস নং-২২০

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ পালনের ইচ্ছা করবে, তার উচিত দ্রুত হজ্জ আদায় করা।

ব্যাখ্যা ঃ হজ্জ দ্রুত আদায় করার ব্যাপারে বায়হাকী শরীফে অতিরিক্ত বাক্য রয়েছে ঃ فان احدكم لا يدرى ما يعرض له من مرض او حاجة - অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে কেউ জানে না যে, তার কি রোগ হয়ে যেতে পারে অথবা কি প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে।" সুতরাং হজ্জ করার ইচ্ছা হলে প্রথম সুযোগে আদায় করার চেষ্টা করবে। তাই ইমাম আবূ ইউসূফ (র) فى الفور অর্থাৎ ফরয হওয়ার সাথে সাথে হজ্জ আদায় করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَغْفِرَةِ الْحَاجِّ

হজ্জ আদায়কারীর মাগফিরাত

٢٢١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاجُّ مَغْفُوْرٌ لَه وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَه اِلٰى اِنْسِلَاخِ الْمُحَرَّمِ -

হাদীস নং -২২১

অনুবাদ ঃ হযরত আলকামা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হজ্জ পালনকারীকে ক্ষমা করা হয় এবং হজ্জ পালনকারী যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাকেও ক্ষমা করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাররম (محرم) মাস থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মরফূ' রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হজ্জ ও উমরা আদায়কারী আল্লাহর প্রতিনিধি, যদি তিনি দু'আ করেন তবে তা কবূল হয়ে থাকে। যদি ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে তাকে ক্ষমা করা হয়। ইমাম আহমদ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে মরফূ' রিওয়ায়েত করেন যে, "যখন তোমরা হাজীদের সাথে সাক্ষাত কর তখন তাদেরকে সালাম কর, মুসাফাহা কর এবং তাদের নিকট এই অনুরোধ কর যে, তারা বাড়ি আসার পূর্বে যেন তোমাদের জন্য মাগফিরাত ও ক্ষমার জন্য দু'আ করে। কেননা তাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে।"

بَابُ الحَجِّ العَجِّ وَالثَّجِّ

জোরে লাব্বাইক বলা এবং কুরবানীর নাম হজ্জ

٢٢٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ قَيسٍ عَن طَارِقٍ عَن ابنِ مَسعُودٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَفضَلُ الحَجِّ العَجُّ وَالثَّجُّ فَاَمَّا العَجُّ فَالعَجِيجُ وَاَمَّا الثَّجُّ فَثَجُّ اَلْبَدَنِ قَالَ فَثَجُّ الدَّمِ -

وَفِى رِوايَةٍ فَاَمَّا الثَّجُّ فَنَحرُ الهَدىِ -

হাদীস নং -২২২

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ উত্তম হজ্জ হলো عج এবং ثج ; তালবীয়া (লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইক)-কে উচ্চস্বরে বলা হয় عج এবং পশু কুরবানী করে রক্ত প্রবাহিত করাকে বলা হয় ثج।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, ثج পশু কুরবানী অর্থাৎ যবেহ করাকে বলা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ ফযীলতের দিক দিয়ে হজ্জের আমলসমূহের মধ্যে তালবীয়া পাঠ এবং কুরবানী করা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। কেননা তালবীয়ার মধ্যে হজ্জ পালনকারী আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত বিনয়, আদব ও আবেগময় কথার দ্বারা স্বীয় উপস্থিতির কথা প্রকাশ করে থাকে যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুব পসন্দ করেন। কুরবানীর মাধ্যমে হজ্জ পালনকারী আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করে থাকে যা আল্লাহর দরবারে কবূল ও মনযূর হয়ে থাকে।

بَابُ مَوَاقِيتِ الحَجِّ

ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান

٢٢٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحيى اَنَّ نَافِعًا (رضـ) قَالَ سَمِعتُ عَبدَ اللّٰهِ بنِ عُمَرَ (رضـ) يَقُولُ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَينَ المُهَلُّ قَالَ يُهِلُّ اَهلُ المَدِينَةِ مِن ذِى الحُلَيفَةِ وَيَهِلُّ اَهلُ العِرَاقِ مِنَ العَقِيقِ وَيَهِلُّ اَهلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ وَيَهِلُّ اَهلُ نَجْدٍ مِن قَرنٍ -

হাদীস নং -২২৩

অনুবাদ ঃ হযরত নাফে' (রা) বলেন ঃ তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে শুনেছেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান কোথায় ? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ মদীনাবাসী যুল-হুলাইফা থেকে, ইরাকবাসী আকীক থেকে, শাম বা সিরিয়াবাসী জুহফা থেকে, নাজদবাসী কারন থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই সমস্ত স্থান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা ব্যতীত সামনে অগ্রসর হওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ। যদি ইহ্‌রাম ব্যতীত সামনে চলে যায়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। যদি মীকাতে ফিরে এসে সেখান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে দম দিতে হবে না।

٢٢٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَن اِبرَاهِيمَ عَنِ الاَسوَدِ بنِ يَزِيدَ اَنَّ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ مَن اَرَادَ مِنكُمُ الحَجَّ فَلاَ يُحْرِمَنَّ اِلاَّ مِنَ المِيقَاتِ وَالمَوَاقِيتُ الَّتِى وَقَّتَهَانَبِيُّكُم صَلَى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لاَهلِ المَدِينَةِ وَمَن مَرَّبِهَا مِن غَيرَ اَهلِهَا ذُوالحُلَيفَةِ وَلاَهلِ الشَّامِ وَمَن مَرَّبِهَا الجُحْفَةُ وَلاَهلِ نَجْدٍ وَمَن مَرَّبِهَا مِن غَيرِ اَهلِهَا قَرَنُ وَلاَهلِ اليَمَنِ وَمَن مَرَّبِهَا مِن غَيرَ اَهلِهَا، يَلَملَمُ وَلاَهْلِ العِرَاقِ وَلِسَائِرِ النَّاسِ ذَاتُ عِرقٍ -

হাদীস নং -২২৪

অনুবাদ ঃ হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) হতে বর্ণিত আছে, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) জনগণের সামনে খুতবা পেশ করে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জ পালনের ইচ্ছা করে সে যেন মীকাতে না পৌছে ইহ্‌রাম না বাঁধে, যে মীকাত তোমাদের নবী (সা) নির্ধারণ

করে দিয়েছেন। অর্থাৎ মদীনাবাসী এবং মদীনার উপর দিয়ে রাস্তা অতিক্রমকারী ভিন দেশীয় লোকদের জন্য যুল-হুলাইফা, শাম বা সিরিয়াবাসী এবং সিরিয়ার উপর দিয়ে রাস্তা অতিক্রমকারী ভিন দেশীয় লোকদের জুহফা, নজদবাসী এবং এর উপর দিয়ে রাস্তা অতিক্রমকারী ভিন দেশীয় লোকদের জন্য কারন (قرن) , ইয়েমেনবাসী এবং ইয়েমেনের উপর দিয়ে রাস্তায় অতিক্রমকারী লোকদের জন্য ইয়ালামলাম, ইরাকবাসী এবং অন্যান্য সমস্ত লোকদের জন্য যাতু ইরক।

ব্যাখ্যা ঃ ইরাকবাসীদের জন্য মীকাত হিসেবে যাতু ইরক-এর নির্ধারণ নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত কিংবা হযরত উমর (রা)-এর ইজতিহাদ, এটা নিয়ে শাফিঈ এবং হানাফী মাযহাবের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। শাফিঈ মাযহাবের মত হলো এই যে, এটা যদিও সাহাবায়ে কিরামের সকলের গ্রহণযোগ্য মাসয়ালা কিন্তু এটা হযরত উমর (রা)-এর ইজতিহাদ। নবী করীম (সা) থেকে এটা মীকাত হওয়ার ব্যাপারে কোন রিওয়ায়েত নেই। বুখারী শরীফে হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস এই মতের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করা হয়ে থাকে।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রা) বলেন ঃ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) এটা নির্ধারণ করেছেন, এটা হযরত উমর (রা)-এর ইজতিহাদ নয়। তিনি উপরোক্ত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এছাড়া এর পূর্ববর্তী হাদীসও হানাফী মাযহাবের দলীল হিসেবে পেশ করা যায়। দ্বিতীয়ত মুসলিম হযরত আবূ যুবায়র-এর সূত্রে তিনি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রিওয়ায়েতে ধারণায় বিধান যেহেতু বিশ্বাসের মত, তাই হয়ত এই বাক্য رفع حديث এর প্রমাণ করে।

তৃতীয়ত আবূ দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, স্বয়ং আঁ হযরত (সা) ইরাকবাসীর জন্য যাতু ইরক (ذات عرق) ইহরামের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। চতুর্থত ইবনে মাজাহ আবূ যুবায়রের সূত্রে হযরত জাবির (রা) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা এই হাদীসের সমর্থন করে। এছাড়া খুব সম্ভব বিষয়টি হযরত উমর (রা)-এর ইজতিহাদ এবং নবী করীম (সা)-এর মীকাত নির্ধারণের বিষয়টি তাঁর নিকট পৌছেনি। কিন্তু হযরত উমর (রা)-এর মতমত হুযূর (সা)-এর মীকাত নির্ধারণের সাথে পরস্পর মিলে গিয়েছে।

بَابُ مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ

মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন্ ধরনের পোশাক পরিধান করবে

٢٢٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبنِ عُمَرَ (رضـ)
اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لاَ
يَلْبِسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ الْقَبَاءَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرنُسَ

وَلاَ ثَوبَ مَسَّه وَرسٌ اَو زَعفَرَانٌ وَمَن لَم يَكُن لَّه نَعلاَنِ فَلْيَلبِسِ الخُفَّينِ وَلْيَقطَعْهُمَا اَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ -

হাদীস নং -২২৫

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! ইহ্‌রামকারী (محرم) কি পরিধান করবে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ কোর্তা, পাগড়ী, কাবা, পায়জামা, টুপী পরতে পারবে না এবং যে কাপড় কুসুম ও জাফরানী রঙ্গে রঙ্গিন হবে, তা পরিধান করতে পারবে না। যাদের কাছে চপ্পল থাকবে না, তারা মোজাকে টাখনু বা গোড়ালীর নিচে কেটে তা পরিধান করবে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। কেননা ঐ সমস্ত কাপড় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যা ইহ্‌রামের সময় পরিধান করা যাবে। কিন্তু হুযূর (সা) ঐ সমস্ত কাপড়ের কথা বলেন যা পরিধান করা যাবে না। মূলত এ অসামঞ্জস্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথার মধ্যে ভাষার অলংকার ও বাকপটুতায় গুণাবলীকে প্রমাণ করে। কেননা ইহ্‌রামের সময় পরিধান করার মত কাপড় দু'একটি নয় যে, তা গণনা করা যাবে; বরং পরিধান করা যাবে না এমন কাপড়ের সংখ্যা খুবই কম, যা আঁ হযরত (সা) গণনা করে বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করাই উচিত ছিল। তাই জওয়াবের মধ্যে মূলত প্রশ্নের সংশোধন করা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীর নিষিদ্ধ পোশাক সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত ছিল। যেহেতু ইহরামের সময় যে সমস্ত কাপড় পরিধান করা জায়েয, তা অসংখ্য; তাই এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা ঠিক হয়নি।

٢٢٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عُمَرَو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَن لَم يَكُنْ لَه اِزَارٌ فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ وَمَن لَمْ يَكُن لَّهُ نَعَالٌ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ -

হাদীস নং-২২৬

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যার কাছে লুঙ্গি নেই, সে পায়জামা পরিধান করবে এবং যার চপ্পল নেই, সে মোজা পরিধান করবে (মোজা এমনভাবে গোড়ালীর নিচ থেকে কেটে নিতে হবে যাতে গোড়ালী খোলা থাকে)।

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ পায়জামা ঐ ব্যক্তির জন্য যে লুঙ্গি পরিধান করতে পারে না এবং মোজা ঐ ব্যক্তির জন্য, যার চপ্পল নেই।

بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحرِمِ

মুহ্‌রিম ব্যক্তির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার

٢٢٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَن اِبرَاهِيمَ بنِ الْمُنْتَشِرِ عَن اَبِيهِ قَالَ سَأَلتُ ابنِ عُمَرَ اَيَتَطَيَّبُ الْمُحرِمُ قَالَ لاَت اَصبَحَ اَنفَحَ قَطِرَانًا اَحَبُّ اِلَىَّ مِن اَن اَصبَحَ اَنفَحَ طَيِّبًا فَاَتَيتُ عَائِشَةَ فَذَكَرتُ لَهَا فَقَالَت اَنَا طَيَّبتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ فِى اَزوَاجِهِ ثُمَّ اَصبَحَ تَعنِى مُحرِمًا -

হাদীস নং-২২৭

অনুবাদ ঃ হযরত মুনতাশির (র) বর্ণনা করেন, আমি হযরত ইবনে উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় (مُحرم) কি সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে? তিনি বললেন: যদি সে (مُحرم) এই অবস্থায় ভোর (صبح) করে যে, তার থেকে কাতরানের (قطران) গন্ধ আসছে, তাহলে এটা আমার নিকট এর চেয়ে উত্তম যে, তার থেকে সুগন্ধির সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট বিষয়টি বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে (রাতে) সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি। অতঃপর তিনি স্বীয় স্ত্রীদের নিকট গমন করেন। এরপর সকালবেলায় তিনি ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত বর্ণনায় হযরত ইবনে উমর (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কেননা হযরত ইবনে উমর (রা) ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং হযরত আয়েশা (রা) ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয বলেছেন, যার গন্ধ ইহরামের পরেও বিদ্যমান থাকে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোন অনৈক্য নেই। ইহ্‌রামের অবস্থায় উভয়ের মতে সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয নয়।

بَابُ التَّمَتُّعِ

তামাত্তুর বর্ণনা

٢٢٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَصحَابَه اَن يَحِلُّوا مِن اِحرَامِهِم بِالْحَجِّ وَيَجعَلُوا عُمْرَةً -

হাদীস নং-২২৮

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবাদের নির্দেশ প্রদান করেন যেন তারা হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যায় এবং হজ্জের পরিবর্তে উমরা আদায় করে।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) হজ্জের নিয়্যত করেছিলেন এবং হুযূর (সা) তাঁদেরকে উমরার মাধ্যমে হজ্জ থেকে হালাল করে দেন। অর্থাৎ তাঁরা তাওয়াফ ও সাঈ করার পর হালাল হয়ে যান।

٢٢٩ – اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ (رض) قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَمَرَ بِهِ فِى حَجَّةِ الوِدَاعِ قَالَ سُرَاقَةُ بنُ مَالِكٍ يَارَسُولَ اللّٰهِ اَخْبِرْنَا عَن عُمرَتِنَا اَلَنَا خَاصَّةً اَم لِلاَبَدَ قَالَ هِىَ لِلاَبَدِ –

হাদীস নং-২২৯

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ বিদায় হজ্জের সময় যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু নির্দেশ (হজ্জের পরিবর্তে হজ্জের মাসে উমরা করার নির্দেশ) প্রদান করেন তখন হযরত সুরাকা ইবনে মালিক (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের উমরা সম্পর্কে বলুন, এটা কি আমাদের সাহাবাদের জন্য নির্দিষ্ট (خاص) না সর্বকালের জন্য ? তখন হুযূর (সা) বলেন ঃ এটা সর্বকালের জন্য।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত সুরাকা (রা)-এর প্রশ্নের কারণ ছিল এই যে, আইয়ামে জাহিলিয়াতে হজ্জের মাসে উমরা আদায় করা নিষিদ্ধ ছিল। তাই আঁ হযরত (সা) এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন করেন এবং বাতিল ধারণাকে রহিত করেন।

٢٣٠ – اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ الهَيثَمِ عَن رَجُلٍ عَن عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا قَدِمَتْ وَهِىَ مُتَمَتِّعَةٌ وَهِىَ حَائِضٌ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرَفَضَت عُمرَتَهَا –

হাদীস নং- ২৩০

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তামাত্তুর নিয়্যত করে (কাবা ঘরে) আগমণ করেন, এ সময় তিনি ঋতুবতী হয়ে পড়েন। তখন নবী (সা) তাঁকে উমরা ভঙ্গ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা) তাওয়াফের পূর্বে ঋতুবতী হয়ে পড়েন। তখন হুযূর (সা)

তাঁকে উমরা ভঙ্গ করার নির্দেশ দেন এবং পরে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা)-এর সাথে উমরার কাযা ও দম আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

٢٣١- اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابرَاهِيمَ عَنِ الاَسوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا قَدِمَت مُتَمَتِّعَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَاَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرفَضَت عُمرَتَهَا -

হাদীস নং-২৩১

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি হজ্জে তামাত্তুর নিয়্যতে পবিত্র মক্কায় গমন করেন। এ অবস্থায় তিনি ঋতুবতী হয়ে পড়েন। তখন নবী করীম (সা) তাঁকে উমরা ভঙ্গ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা ঃ হজ্জ তিন প্রকার। যথা ঃ (১) ইফরাদ (افراد) , (২) তামাত্তু (تمتع) , (৩) কিরান (قران)। হজ্জ ইফরাদ হলো এই যে, মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বেধে মক্কা প্রবেশ করবে। অতঃপর তাওয়াফ সাঈ করে হালাল হয়ে যাবে। তারপর হজ্জের মৌসুমে মক্কাবাসীদের মত হজ্জের নিয়্যত করবে। হজ্জে তামাত্তু হলো এই যে, হজ্জ ও উমরার এক সাথে নিয়্যত করবে। হজ্জে কিরান ও তামাত্তু প্রায়ই একই ধরনের। তবে পার্থক্য হলো এই যে, হজ্জে তামাত্তুর মধ্যে উমরার আরকান পালন করার পর হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু সহবাস জায়েয হবে না। অতঃপর ৮ই যিলহজ্জ ইহ্‌রাম বাঁধতে হয় এবং হজ্জে কিরানে হজ্জ আদায় করা পর্যন্ত ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকতে হবে।

٢٣٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابرَاهِيمَ عَنِ الاَسوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا قَدِمَتْ مُتَمتِّعَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَاَمَرَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرَفَضَت عُمرَتَهَا وَاَستَانَفَتِ الحَجَّ حَتّٰى اِذَا فَرَغَت مِن حَجَّهَا اَمَرَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَن تَصدِرَ اِلَى التَّنعِيمِ مَعَ اَخِيهَا عَبدِ الرَّحمٰنِ -

হাদীস নং-২৩২

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি হজ্জে তামাত্তু'র নিয়্যত করেন এবং (তালবীয়া ও ইহরামের পর) ঋতুবতী হয়ে পড়েন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে উমরা ভঙ্গ করার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর হজ্জের সময় তিনি নতুন করে (হযরত আয়িশা) ইহরাম বাঁধেন। অতঃপর যখন তিনি হজ্জ থেকে অবসর হন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে নির্দেশ দেন যেন তিনি তাঁর ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা)-এর সাথে তানঈম গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসেন এবং উমরা আদায় করেন।

ব্যাখ্যা ঃ তানঈম মক্কা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। সেখান থেকে উমরার নিয়্যত করে ইহরাম বাঁধতে হয় এবং তাওয়াফ ও সাঈ করার পর হালাল হয়ে যেতে হয়। মহিলাদের জন্য হলকের বিধান নেই।

٢٣٣ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنِ الهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَن عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ لِرَفْضِهَا الْعُمْرَةَ بَقَرَةً -

হাদীস নং-২৩৩

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-এর উমরা ভঙ্গ করার কারণে গাভী যবেহ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ উমরা ভঙ্গ করার কারণে দম (دم) হিসেবে গাভী যবেহ করেন।

٢٣٤ - اَبُو حَنِيفَةَ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن رَبِعِيِّ بنِ حِرَاشٍ عَن عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِرِفضِهَا العُمرَةَ دَمًا -

হাদীস নং-২৩৪

অনবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন তিনি উমরা ভঙ্গ করেন তখন নবী করীম (সা) দম দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

٢٣٥ - اَبُو حَنِيفَةَ عَن حَمَّادٍ عَن اِبرَاهِيمَ عَنِ الاَسوَدِ عَن عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا قَالَت يَا نَبِيَّ اللّٰهِ يَصدِرُ النَّاسُ بِحَجَةٍ وَعُمرَةٍ وَاَصدُرُ بِحَجَّةٍ فَاَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَبدَ الرَّحمٰنِ بنِ اَبِى بَكرٍ فَقَالَ اِنطَلِق بِهَا اِلَى التَّنعِيمِ فَلتُهِلَّ ثُمَّ لِتَفرَغ مِنهَا ثُمَّ لِتَعجَلَ عَلَيَّ فَاِنِّى اَنتَظِرُهَا بِبَطنِ العَقَبَةِ -

হদীস নং-২৩৫

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত কাছে, তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহর নবী! লোকজন হজ্জ ও উমরা আদায় করে যাবে এবং আমি শুধু হজ্জ করব ? তখন নবী করীম (সা) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ তাকে তানঈম নিয়ে যাও। সেখানে গিয়ে সে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধবে এবং উমরা আদায় করার পর শীঘ্র আমার সাথে মিলিত হবে। আমি বাতনে আকাবায় তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

بَابُ اَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ الصَّيْدَ

মুহরিমের জন্য শিকারের গোশত খাওয়া

٢٣٦ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ تَذَاكَرْنَا لَحْمَ صَيْدٍ يَصِيْدُهُ الْحَلَالُ فَيَاكُلُهُ الْمُحْرِمُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ حَتّٰى ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُنَا فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِيْمَا يَتَنَازَعُوْنَ فَقُلْنَا فِىْ لَحْمِ صَيْدٍ يَصِيْدُهُ الْحَلَالُ فَيَاكُلُهُ الْمُحْرِمُ قَالَ فَاَمَرَنَا بِاَكْلِهِ -

হাদীস নং-২৩৬

অনুবাদ ঃ হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলূল্লাহ (সা) একবার নিদ্রিত ছিলেন এবং আমরা এই বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করতে ছিলাম যে, হালাল ব্যক্তির (যে ইহ্‌রাম অবস্থায় নয়) শিকার করা গোশত মুহ্‌রিম (ইহ্‌রামরত ব্যক্তি) খেতে পারবে কিনা। আমাদের কথাবার্তার আওয়ায এত উচ্চস্বরে হচ্ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) জেগে উঠেন এবং বলেন ঃ তোমরা কি বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছ ? তখন আমরা উক্ত ঘটনাটি বললাম। হযরত তালহা (রা) বলেন ঃ তখন আঁ হযরত (সা) আমাদেরকে তা খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি ইহ্‌রামবিহীন ব্যক্তি শিকার করে, তাহলে ইহ্‌রামরত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ঐ শিকারের গোশত খেতে পারবে। এটা তার জন্য হালাল। তবে হযরত আবী কাতাদা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী (যা পরে বর্ণনা করা হবে) শর্ত হলো এই যে, ইহ্‌রামরত ব্যক্তি শিকারের জন্য ইহ্‌রামবিহীন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত অথবা কোন প্রকার সাহায্য করতে পারবে না। নতুবা এই শিকার তার জন্য এরূপ হারাম হয়ে যাবে যেন সে নিজেই তা শিকার করেছে।

٢٣٧ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ خَرَجْتُ فِىْ رَهْطٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِى الْقَوْمِ حَلَالٌ غَيْرِىْ فَنَظَرْتُ نُعَامَةً فَسِرْتُ اِلٰى فَرَسِىْ

فَرَكِبْتُهَا وَعَجِلْتُ عَنْ سَوْطِي فَقُلْتُ لَهُم نَاوِلُوْنِيْهِ فَاَبَوا فَنَزَلْتُ عَنْهَا فَاَخَذْتُ سَوطِي فَطَلَبْتُ النُّعَامَةَ فَاَخَذْتُ مِنهَا حِمَارًا فَاَكَلْتُ وَاَكَلُوا-

হাদীস নং-২৩৭

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-এর একদল সাহাবার সাথে গমন করি এবং সমগ্র দলের মধ্যে আমি ছাড়া কোন ব্যক্তি ইহ্‌রামবিহীন ছিলেন না (অন্য সবাই ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন)। এরপর একদল বন্য গাধার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল। আমি সামনে এগিয়ে আমার ঘোড়ার উপর আরোহণ করি কিন্তু জলদি করার কারণে চাবুকের কথা ভুলে যাই। আমি আমার সাথীদেরকে বললাম, আমার চাবুকটি একটু উঠিয়ে দিন। কিন্তু তারা অস্বীকার করেন। তখন আমি নিজেই নেমে আমার চাবুক নিলাম। অতঃপর আমি গাধাগুলোর পিছনে অনুসরণ করতে লাগলাম, অবশেষে এগুলোর মধ্য থেকে একটি শিকার করলাম। এরপর ঐ শিকারের গোশত আমিও খেয়েছি এবং তারাও (সাহাবগণ) খেয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ কাতাদা (রা) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস অন্যান্য সহীহ হাদীসেও বর্ণিত আছে। হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি একটি বিতর্কিত মাসয়ালা, আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্যের বিষয় হলো এই যে, হালাল বা ইহ্‌রামবিহীন ব্যক্তি যদি কোন শিকার করে, তবে তা মুহ্‌রিম বা ইহ্‌রামরত ব্যক্তি খেতে পারবে কি না? হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে খেতে পারবে। তবে শর্ত হলো এই যে, ইহ্‌রামরত ব্যক্তি শিকারীকে কোন প্রকার সাহায্য যদি না করে থাকে এবং তার জন্য ঐ শিকার না করা হয়ে থাকে, তবেই খাওয়া জায়েয হবে। ইমাম শাফিঈ (র)এর মতে যদি ইহ্‌রামবিহীন ব্যক্তি মুহ্‌রিম (محرم) বা ইহ্‌রামরত ব্যক্তির জন্য শিকার করে থাকে, তা হলে এই শিকার তার জন্য হালাল হবে না। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের দলীল হলো হযরত জাবির (রা) বর্ণিত মরফূ' হাদীস যা আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ রিওয়ায়েত করেছেন ঃ صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه اويصادلكم ...الخ "স্থলজ শিকার তোমাদের জন্য হালাল যদি তোমরা শিকার না করে থাক অথবা তা তোমাদের জন্য শিকার করা হয়।"

ইমাম আবূ হানীফা (র) উপরে হাদীস দ্বারা তাঁর মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেছেন। সিহাহ্ সিত্তাহ বা ছয়টি সহীহ হাদীসেও এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, এক সফরে হযরত কাতাদা (রা) এবং কয়েকজন সাহাবা (রা) পিছনে ছিলেন। পথিমধ্যে হযরত কাতাদা (রা) একটি গাধা শিকার করেন। কোন কোন সাহাবা এটা খেয়েছেন আবার কেউ কেউ খাওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। যখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে এসে মিলিত হয়েছেন, তখন বিষয়টি তাঁর খেদমতে পেশ করেন। আঁ হযরত (সা) শুধু এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আবূ কাতাদাকে শিকারের কথা বলে দিয়েছিলে অথবা এর জন্য প্রেরণা বা উৎসাহ দিয়েছিলে ?

সবাই এটা অস্বীকার করলেন। তখন হুযূর (সা) বললেন ঃ তোমরা এর গোশত খেতে পার। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, গোশত হালাল না হওয়ার জন্য এ সমস্ত কারণই যথেষ্ট যা হুযূর (সা) বর্ণনা করেছেন। যদি অন্য কোন বিষয় হালাল হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধকতা হতো, যেমন ঃ শিকার তোমাদের জন্য করা হয়নি। তাহলে তিনি এটা খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞাসা করতেন। সুতরাং হযরত জাবির (রা) এবং হযরত কাতাদা (রা)-এর হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে। তবে এখানে হযরত কাতাদা (রা)-এর হাদীস অগ্রগণ্য হবে। কেননা এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমসহ অন্য হাদীস গ্রন্থেও রয়েছে।

পক্ষান্তরে বিরোধী পক্ষের হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফে নেই। অথবা এই হাদীসের ব্যাখ্যা করা হলে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ে হয়ে যাবে। যেমন او يصادلكم -এর অর্থ হলো এই যে, তোমাদের নির্দেশ ও প্রেরণায় এটা শিকার করা হয়েছে এবং অধিকাংশ সময় এরূপ হয়ে থাকে যে, ফরমায়েশের কারণেই কারো জন্য কিছু করা হয়।

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلمُحرِمِ قَتلُه

ইহরামরত ব্যক্তির জন্য কোন্ জীব হত্যা করা জায়েয

٢٣٨ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقتُلُ المُحرِمُ الفَارَةَ وَالحَيَّةَ وَالكَلبَ وَالحِدَاةَ وَالعَقرَبَ -

হাদীস নং-২৩৮

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ মুহ্‌রিম বা ইহ্‌রামরত ব্যক্তি ইঁদুর, সাপ, কুকুর, চিল এবং বিচ্ছু মারতে পারবে।

ব্যাখ্যা ঃ যে সমস্ত জন্তু ইহ্‌রাম অবস্থায় মারা জায়েয, হাদীসে এগুলোর বিভিন্ন সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন হাদীসে كَلبُ -এর সাথে عقور সংযুক্ত করা হয়েছে। আবার কোন হাদীসে سبع (জন্তু), কোন হাদীসে غراب অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে। এ সমস্ত জন্তু সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মধ্যে সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে এ সমস্ত জন্তু মারা জায়েয। সুতরাং ইমাম শাফিঈ (র)-এর মত হলো এই যে, যে সমস্ত জন্তু খাওয়া জায়েয নয় এবং যে জন্তু খাওয়া যায় না, এগুলো মারা মুহ্‌রিমের (ইহরামরত ব্যক্তির) জন্য জায়েয এবং এর উপর ফিদয়া নেই। ইমাম মালিক (র)-এর মত হলো এই যে, যে সমস্ত জন্তু ক্ষতিকর এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর জন্তু ইহ্‌রাম অবস্থায় মারা জায়েয। সুতরাং যে সমস্ত জন্তু ক্ষতিকর নয়, যেমন খেঁকশিয়াল, বিড়াল ইত্যাদি মারা ইহ্‌রাম অবস্থায় জায়েয নয়। যদি কেউ মেরে ফেলে, তাহলে তাকে ফিদয়া দিতে হবে। অতঃপর কুকুর সম্পর্কেও কিছু মতপার্থক্য

রয়েছে। কেউ কেউ এরদ্বারা কুকুর বুঝিয়ে থাকেন। সুতরাং ইমাম আওযাঈ ও ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে এটাই বর্ণিত আছে এবং এই বিধানের মধ্যে শিয়ালও রয়েছে। ইমাম যুফার (রা)-এর মতে এরদ্বারা শৃগাল বুঝানো হয়েছে।

بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

মুহ্‌রিমের বিবাহ করা

٢٣٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

হাদীস নং-২৩৯

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মায়মূনা বিনতে হারিস (রা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন তিনি ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের বিষয়বস্তু নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। মতপার্থক্যের বিষয় হলো এই যে, মুহ্‌রিম ও মুহ্‌রিমা (ইহরামরত পুরুষ ও মহিলা) ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে কিনা ? হানাফী মাযহাবমতে ইহ্‌রাম অবস্থায় উভয়ের বিবাহ জায়েয আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালিক (রা) এবং সাঈদ ইবনে জুবায়র, আতা, তাউস, মুজাহিদ, ইকরামা, জাবির, আমর ইবনে দীনার (র) ও ইরাকবাসীগণ এই মত পোষণ করেন। ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর মতে মুহরিম ও মুহ্‌রিমার বিবাহ জায়েয নয়। এটাই হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর ধারণা।

হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে কুরআন, সুন্নতে রাসূল ও কিয়াসের দ্বারা দলীল পেশ করা হয়েছে। যেমন ঃ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ فانكحو وانكحوا لايامى منكم অথবা ماطاب لكم من النساء الاية এই আয়াতদ্বয়ের বিধান হলো সাধারণ বা সামগ্রিক (مطلق)। এর মধ্যে মুহরিম ও ইহ্‌রামবিহীন সকলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হাদীস বা خبر واحد-এর দ্বারা ইহ্‌রামবিহীন-এর সংযুক্তি কুরআনের উপর সীমা লংঘন করার অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীস সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তাহাবী, মুজাহিদ, আতা, তাউস, সাঈদ ইবনে জুবায়র, ইকরামা, জাবির ইবনে যায়দ (র)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ইল্‌ম যা তিনি আঁ হযরত (সা)-এর দু'আর বরকতে হাসিল করেছিলেন, তাই তিনি পবিত্র কুরআনের বড় ব্যাখ্যাদাতা এবং হুযূর (সা)-এর বাণীর গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিলেন। যার ফলে বয়সে কম হওয়া

সত্ত্বেও তাঁর ইল্‌মের উপর কেউ কোন অভিযোগ করার সাহস পাননি। হযরত উমর (রা) বলতেন, ইবনে আব্বাস (রা) যদি আমাদের বয়স লাভ করেন, তাহলে আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারবে না। সুতরাং ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীস হানাফী মাযহাবের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। তবে উপরোক্ত হাদীসের সাথে এর স্বপক্ষে আরো সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন, ইমাম তাহাবী শরহে মাআনিল আসার (شرح معانى الاثار) নামক গ্রন্থে এবং বাযযায স্বীয় মুসনাদে হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা) ইহ্‌রাম অবস্থায় কোন কোন মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। সুহায়লী (র) বলেছেন, কোন কোন (بعض) দ্বারা হযরত মায়মূনাকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম তাহাবী (র) বলেছেন, এই হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। এই হাদীস দারে কুতনী এবং তাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। এর বিষয়বস্তু হলো এই যে, আঁ হযরত (সা) ইহ্‌রাম অবস্থায় হযরত মায়মূনা (রা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

বস্তুত কিয়াসও উপরোক্ত বিষয়ের সমর্থন করে থাকে। প্রথমত বিবাহ অন্যান্য ধর্মীয় বিধানের মত যা ইহ্‌রাম অবস্থায় জায়েয। সুতরাং বিবাহের মধ্যে হারামের কি আছে ? দ্বিতীয়ত যদি ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ জায়েয না হয়, তা হলে কিয়াস এটাই বলে যে, ইহ্‌রামের পূর্বে বিবাহ বাকী থাকবে না। কেননা যে বস্তু বিবাহের বিরোধী এবং এটা বাতিলকারী, সেটা বিবাহ হতেও দিবে না এবং তা বাকীও রাখবে না। এতে শুরু ও বাকী (ابتداء –بقاء) উভয়ই সমান। তৃতীয়ত বিবাহতো সহবাসের মত কোন বিষয় নয় যে, তা সহবাসের মত হারাম হবে। কাজেই এ অবস্থায় বিবাহ করা জায়েয। অবশ্য বিরত থাকা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমল ছিল শুধু জায়েয হিসেবে প্রচার করা বা প্রচলনের জন্য। যদি বলা হয় বিবাহ এইজন্য জায়েয নয় যে, এটা স্ত্রী সঙ্গমের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে ইহ্‌রাম অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীকে সাথে রাখাও জায়েয হতো না। কেননা এটা সঙ্গম বা সহবাসের কারণ হতে পারে। চতুর্থত হযরত মায়মূনা (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সম্পর্কে খালা ছিলেন, তাই খালার বিবাহ সম্পর্কে তাঁর যা কিছু জানা থাকার কথা, তা অন্যদের জানা কিভাবে সম্ভব ? মোট কথা হানাফী মাযহাবের দলীলসমূহ বাতিল করা সম্ভব নয়।

ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক এবং ইমাম হাম্বল (র)-এর মতে ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ জায়েয নয়। তাঁদের মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে তাঁরা কয়েকটি হাদীস পেশ করেছেন। প্রথমত স্বয়ং হযরত মায়মূনা (রা)-এর হাদীস, দ্বিতীয়ত ইয়াজিদ ইবনে আসাম্মের হাদীস, তৃতীয়ত নবী করীম (সা)-এর গোলাম আবূ রাফি' (রা)-এর হাদীস, এই তিনটি হলো فعلى حديث বা কর্মমূলক হাদীস। চতুর্থত হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত قولى حديث বা বর্ণনামূলক হাদীস। হযরত মায়মূনা (রা)-এর হাদীস আবূ দাউদ, তিরমিযী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, আমার সাথে নবী করীম (সা) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন যখন আমরা উভয়ের ইহ্‌রামবিহীন অবস্থায় ছিলাম। যেহেতু বিষয়টি তাঁদের নিজেদের, তাই তাঁদের কথাই গ্রহণযোগ্য। আমরা এর সাথে একমত। তবে এটা শুধু বিবাহের ব্যাপারে। কিন্তু মূল বিতর্ক আঁ হযরত (সা) -এর ইহরাম সম্পর্কে মায়মূনা (রা) এবং অন্যান্য সাহাবা (রা) একই মর্যাদা প্রাপ্য। বরং হযরত

ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা তাঁর ইলমের দূরদর্শিতা, হিফয ও অন্যান্য কারণে গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য। পক্ষান্তরে হুযূর (সা)-এর সাথে হযরত মায়মূনা (রা)-এর সরফ (مقام سرف) নামক স্থানে ইহরামবিহীন অবস্থায় প্রথম মিলন হয়। এটা ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিল না যে, তাঁর বর্ণনা অন্যান্যের উপর প্রাধান্য পাবে। এবার এই হাদীসের সনদের বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমত বুখারী শরীফে এই হাদীস নেই। অর্থাৎ ইমাম বুখারী এই হাদীস গ্রহণ না করায় এর দুর্বলতা প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত তিরমিযী এই হাদীসকে গরীব (غريب) বলেছেন। তৃতীয়ত এই হাদীসের সনদে জারীর ইবনে হাশিম ইবনে যায়দ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আযমী, যাঁর সম্পর্কে তাকরীবে (تقريب) বলা হয়েছে যে, যখন তিনি স্বীয় হিফ্‌য দ্বারা হাদীস রিওয়ায়েত করেন, তখন তাঁর সন্দেহ সৃষ্টি হয়। চতুর্থত এটাও বাস্তব সত্য যে, পুরুষ মহিলার চেয়ে হিফ্‌য, দূরদর্শিতা ও ফিকহের বিষয়ে অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। সুতরাং ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীসের মুকাবিলায় তাঁর [হযরত মায়মূনা (রা)]-এর হাদীস দলীল হতে পারে না।

তাঁদের দ্বিতীয় দলীল ইয়াযীদ ইবনে আসাম্ম (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে তাঁরা বলে থাকেন যে, যদি হযরত মায়মূনা (রা)-এর ভাগ্নে হওয়ার কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মর্যাদা লাভ হয়ে থাকে, তা হলে একইভাবে হযরত মায়মূনা (রা)-এর ভাগ্নে হওয়ার কারণে ইয়াযীদেরও সেই মর্যাদা লাভ হবে এবং তা হলে একইভাবে উভয়েই সমান মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। এছাড়া ইয়াযীদের হাদীস তাহাবী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা) হযরত মায়মূনা (রা)-এর সাথে ইহ্‌রামবিহীন অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে এর জওয়াব এভাবে দেওয়া যায় যে, যদি আত্মীয়তার কারণে অগ্রাধিকার নির্ধারিত হয়, তাহলেও ইবনে আব্বাস (রা)-এর অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা। কেননা তিনি একদিকে হযরত মায়মূনা (রা)-এর ভাগ্নে, অন্য দিকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাত ভাই। এই মর্যাদাসম্পন্ন আত্মীয়তার সম্পর্ক ইয়াযীদ কিভাবে লাভ করবেন ? তবে এখানে শুধু সম্পর্কে কারণেই নয়; বরং সাথে সাথে হযরত ইবন আব্বাসের প্রজ্ঞাপূর্ণ ইলমের যোগ্যতাও রয়েছে। এছাড়া ইয়াযীদের মুকাবিলায় শুধু ইবনে আব্বাসের হাদীসই নয়; বরং হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-ও রয়েছেন। এঁরা উভয়েই ইয়াযীদ থেকে অগ্রগণ্য। সুতরাং এখন একটি পথ বাকী আছে, ইয়াযীদ ও হযরত মায়মূনার হাদীসের ব্যাখ্যা করে তা ইবনে আব্বাসের হাদীসের সাথে সমন্বয় করে নেয়া এবং তা এভাবে করা যায় যে, (تزوج) -এর দ্বারা বাগদান উদ্দেশ্য হবে, আক্‌দ নয়। কেননা (تزوج) বাগদান বা মিলনের পূর্ব কারণ ও প্রস্তুতি পর্ব এবং এটা নিঃসন্দেহে ইহ্‌রামবিহীন অবস্থায় হয়েছে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা কিয়াসের নিকটবর্তী। এটা নয় যে, ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীসে ইহ্‌রামকে হেরেমে প্রবেশ অথবা হারামের মাস অর্থে নেয়া হয়েছে যাতে বিবাহ হওয়ার বিষয়টি ঐ সময় প্রকাশ হয়, যখন তিনি ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন। কেননা হানাফীদের পক্ষ থেকে একই ব্যাখ্যা ইয়াযীদের হাদীসেও করা যেতে পারে এবং এটা কিয়াসও হবে। অধিকাংশ রিওয়ায়েতে تزوج ميمونة وهى حلال -এর অর্থ এই যে, বিবাহ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ঐ সময় প্রকাশ পায় যখন তিনি ইহ্‌রামবিহীন অবস্থায় ছিলেন। অর্থাৎ বিবাহ ইহ্‌রাম অবস্থায়ই হয়েছিল এবং

ইহরামবিহীন অবস্থায় তা প্রকাশ পেয়েছে। শাফিঈ মাযহাবের পক্ষ থেকে দলীল হিসেবে পেশকৃত হাদীস হানাফী মাযহাবের দলীল হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা হযরত ইয়াযীদ ইবনে আসাম্ম (রা) এই বিবাহে ঘটক বা দূতের দায়িত্ব পালন করেছেন। দূত সাধারণত অতি নিকট থেকে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে থাকেন। এর জওয়াবে এ কথা বলা যায়, যা হযরত মায়মূনা (রা)-এর হাদীসের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, বিবাহের ব্যাপারে তাঁর যোগাযোগ তাঁর বর্ণনাকে শক্তিশালী করে, না কি আঁ হযরত (সা)-এর غير محرم ও محرم অর্থাৎ ইহরাম ও ইহ্‌রামবিহীন হওয়া সম্পর্কে? বস্তুত এটা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এতে তিনি ও অন্যান্য সাহাবা (রা)-একই সমান, বরং অন্যান্য সাহাবা, বিশেষ করে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সর্বদিক দিয়ে তাঁর উপর অগ্রগণ্য। এছাড়া সনদের দিক থেকেও এই হাদীসে বিভিন্ন প্রকার কথা রয়েছে। প্রথমত বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ হাদীস গ্রহণ করা হয়নি। তিরমিযী শরীফে এই হাদীস গৃহীত হয়েছে কিন্তু তিরমিযী এই হাদীসকে শুধু হাসান (حسن) বলেছেন। যেন তাঁর মতে এই হাদীস বিশুদ্ধতার (صحة) মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। দ্বিতীয়ত এই হাদীসের যোগসূত্রে (اتصال) ইবনে আবদুল বার-এর অভিযোগ রয়েছে। কেননা সুলায়মান ইবনে ইয়াসারের জন্মের তিন বৎসর পর আবূ রাফে' ইনতিকাল করেন। সুতরাং আবূ রাফে' থেকে সুলায়মানের শ্রবণ (سماع) কিভাবে প্রমাণিত হয়? তৃতীয়ত মাতার ওয়াররাক (مطروراق) এই সনদে দুর্বল (ضيف)। ইয়াহ্‌হিয়া ইবনে সাঈদ এবং ইমাম আহমদ উভয়ে তাঁকে দুর্বল বা ضيف বলেছেন।

এ যাবত فعلى বা কর্মমূলক হাদীস-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবার قولى বা বর্ণনামূলক হাদীস নিয়ে আলোচনা করা হবে। এখানে হযরত উসমান (রা)-এর বর্ণনামূলক হাদীস রয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে একটি নীতি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে, বর্ণনামূলক হাদীস বা قولى حديث কর্মমূলক বা فعلى حديث -এর উপর অগ্রগণ্য এবং এটা ঐ সময়, যখন সনদের দিক দিয়ে قولى حديث বা বর্ণনামূলক হাদীস فعلى حديث বা কর্মমূলক হাদীস-এর উপর অধিক শক্তিশালী বা নির্ভরযোগ্য হয়। কিন্তু এখানে তা নেই। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনাকারী ফকীহ, হাফিয ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রয়েছেন যাঁদের বিপরীত হযরত উসমান (রা)-এর হাদীসে একজনও এঁদের সমকক্ষ নেই। যেমন ঃ সাঈদ ইবনে যুবায়র, আতা, তাউস, মুজাহিদ, ইকরামা, জাবির ইবনে যায়দ (র)। পক্ষান্তরে হযরত উসমানের হাদীস নাবীয়াহ ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত হয়েছে, যিনি আমর ইবনে দীনারের মত মর্যাদাসম্পন্ন নন এবং জাবির ইবনে যায়দের সমকক্ষও নন। এমন কি মাসরূকের (مسروق) সমপর্যায়েরও নন– যিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

আল্লামা কাসতাল্লানী (علامه قسطلانى) ইরশাদে সারী নামক গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম বুখারী হযরত উসমান (রা)-এর হাদীসকে দুর্বল (ضيف) বলেছেন। কেননা এই সনদে নাবীয়াহ ইবনে ওয়াহাব রয়েছেন। তৃতীয়ত قولى حديث وفعلى حديث -এর মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, এটা نهى تنزهى যেমন বিবাহের পয়গাম, نهى تحريمى নয়। অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় এটা হাজীদের মর্যাদা ও পরিবেশের পরিপন্থী। কেননা এ ধরনের কাজে ব্যস্ত হওয়ার কারণে তাদের ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এ সময় পয়গাম প্রেরণ, বর-কনের

প্রশ্ন-উত্তর ও মেহমানদের আপ্যায়নসহ বিভিন্ন কাজে এমন ব্যস্ত হতে হয়, যার ফলে তার সমস্ত ইবাদতে বিঘ্ন ও একাগ্রতা দূরীভূত হয়ে পেরেশানীর সৃষ্টি হয়। তবে যেহেতু আঁ হযরত (সা)-এর সব কিছুর উপর পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ছিল, তাই তাঁর জন্য এগুলো জায়েয ছিল। অতঃপর শাফিঈদের ধারণা ও মতামত এই ব্যাখ্যার সমর্থন করে যে, তাঁরা وَلَا يَخْطُبُ -এর মধ্যে نهى تنزهى মেনে নিয়েছেন। সুতরাং لاينكح যেহেতু এর মতই, তাহলে এখানে কেন نهى تنزهى মেনে নেয়া হবে না? সুতরাং উপরের আলোচনা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন, সুন্নাহ ও কিয়াসের দৃষ্টিতে হানাফী মাযহাব সঠিক। والله اعلم بحقيقة الحال

بَابُ حَجَامَةِ الْمُحرِمِ

ইহরামরত ব্যক্তির শিংগা লাগানো

٢٤٠ – اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اِحتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ –

হাদীস নং-২৪০

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগানো জায়েয আছে। এই মাসয়ালার মূল ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ فمن كان منكم مريضا اوبه اذى من راسه ففدية অর্থাৎ যেন এটা ওজর বা অসুস্থতার কারণেই জায়েয হয়েছে কিন্তু এর উপর ফিদয়া দেওয়া ওয়াজিব।

بَابُ اِستِلَامِ الرُّكنَ وَالحَجرِ

রুকন এবং হাজরে আসওয়াদকে চুমো দেওয়া

٢٤١ – اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا قَالَ مَا تَرَكتُ اِستِلَامَ الحَجَرِ مُنذُ رَأَيتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُستَلِمَهُ –

হাদীস নং-২৪১

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন আমি কখনো হাজরে আসওয়াদকে চুমো দেওয়া পরিত্যাগ করিনি যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চুমো দিতে দেখেছি।

ব্যাখ্যা ঃ চারজন ইমামের মতে হাজরে আসওয়াদকে চুমো দেওয়া সুন্নত। এতে কোন মতপার্থক্য নেই।

٢٤٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا انْتَهَيْتُ اِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِى اِلاَّ لَقِيْتُ عِنْدَهُ جِبْرَائِيْلَ .

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُكْثِرُ مِنِ اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ الْيَمَانِى قَالَ مَااَتَيْتُ عَلَيْهِ قَطُّ اِلاَّ وَجِبْرَائِيْلُ قَائِمٌ عِنْدَهُ يَسْتَغْفِرُ لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ -

হাদীস নং-২৪২

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি যখনই রুকনে ইয়ামানীর নিকট গিয়েছি, তখন সেখানে আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে পেয়েছি।

আতা ইবনে আবী রাবাহ থেকে (مرسل) বর্ণিত আছে যে, আঁ হযরত (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি কি রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করেন, না চুমো দিয়ে থাকেন ? তখন নবী করীম (সা) বলেন ঃ আমি যখনই এর কাছে গিয়েছি, তখনই এর কাছে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং চুমোদানকারীদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে দেখেছি।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসের স্বপক্ষে আরো এক হাদীস রয়েছে যা আবূ শায়খ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা) বলেছেন ঃ আমি যখনই রুকনে ইয়ামানীর নিকট গমন করেছি, তখনই এর নিকট একজন ফিরিশতাকে দেখতে পেয়েছি যিনি উচ্চস্বরে 'আমিন' বলে থাকতেন। সুতরাং যখন তোমরা এর নিকট গমন কর, তখন এই দু'আ পাঠ কর ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল দান কর এবং দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কর।"

٢٤٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِى وَالْحَجَرِ الاَسْوَدِ اَللّٰهُمَّ انِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَالذُّلِّ وَمَوقِفِ الْخِزِى فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ -

হাদীস নং-২৪৩

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যে (দাঁড়িয়ে) এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ اَللّٰهُمَّ انِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَالذُّلِّ وَمَوقِفِ الْخِزِى فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ - "হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কুফরী, দরিদ্রতা, অসম্মান এবং ইহকাল ও পরকালের অপমানজনক স্থান থেকে।"

ব্যাখ্যা ঃ এ সমস্ত দু'আ সম্পর্কে যে হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে, এগুলো মধ্যে সনদের দিক থেকে যদিও কিছু হাদীস দুর্বল (ضعيف) কিন্তু পরস্পর মিলে শক্তিশালী হয়ে গেছে। এ ছাড়া কিছু কিছু সহীহ এবং হাসান হাদীসও রয়েছে। অধিকন্তু ফাযায়েলে আমলের ব্যাপারে দুর্বল (ضعيف) হাদীসও আমলের যোগ্য।

٢٤٤ - اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ طَافَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ شَاكٍ عَلٰى رَاحِلَتِهِ يَستَلِمُ الاَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ -

وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ طَافَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ شَاكٍ عَلٰى رَاحِلَتِهِ - .

হাদীস নং-২৪৪

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) অসুস্থ অবস্থায় তাঁর সওয়ারীর উপর আরোহণ করে বায়তুল্লাহ্ শরীফ তওয়াফ করেছেন। তিনি রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদকে স্বীয় বাঁকা লাঠি দিয়ে চুমো প্রদান করেছেন।

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তিনি [হযরত ইবনে আব্বাস (রা)] বলেন ঃ নবী করীম (সা) অসুস্থ অবস্থায় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে স্বীয় সওয়ারীর উপর সাঈ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অসুস্থতার কারণে সওয়ারীর উপর আরোহণ করে সাঈ করা জায়েয। আরকান (ارکان) -এর দ্বারা রুকনে ইয়ামানী বুঝানো হয়েছে। কেননা রুকনে শামীকে চুমো দেওয়া হয় না। অবশ্য পূর্ববর্তী কেউ কেউ এটাকেও মুস্তাহাব বলেছেন।

তবে প্রথমোক্ত বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে। কাযী আবূ তাইয়্যেব ইমাম নববী বলেছেন যে, এর উপর ইমামদের ইজমা রয়েছে।

٢٤٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ اِلَى الحَجَرِ-

হাদীস নং-২৪৫

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রাম্‌ল করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ রাম্‌ল বলা হয় সীনা টান করে কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে দ্রুতগতিতে চলা। যেভাবে সেনাবাহিনীর জওয়ানগণ চলে থাকে। আঁ হযরত (সা) তিন চক্করে রাম্‌ল করেছেন এবং চতুর্থবারে স্বাভাবিকভাবে চলেছেন। হযরত জাবির (রা) থেকে এই পদ্ধতির কথা বর্ণিত আছে। সুতরাং বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে শুধু চলার যে হাদীস বর্ণিত আছে, তা হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা রহিত করা হয়েছে। ইমাম নববী এবং ইমাম কাসতাল্লানী (র)-এর ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীসে উমরাতুল কাযার (عمرة القضاء) ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা ৭ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে আদায় করা হয়। অতঃপর যখন তিনি বিদায় হজ্জ (حجة الوداع) আদায় করেন, তখন রাম্‌ল করেন। সুতরাং হযরত জাবির (রা)-এর হাদীসে যেহেতু পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এই হাদীস আমলযোগ্য।

بَابُ الْجَمْعِ بِعَرَفَةِ

আরাফাতে দু'নামায একত্রে আদায় করা

٢٤٦ – اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى حَيَّةَ اَبِى جَنَابٍ عَنْ هَانِئِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ اَفَضْنَا مَعَه مِن عَرَفَاتٍ فَلَمَّا نَزَلْنَا جَمْعًا اَقَامَ فَصَلَّينَا المَغْرِبَ مَعَه ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَينِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّ عَلَيهِ ثُمَّ اوٰى اِلٰى فِرَاشِه فَقَعَدْنَا نَنتَظِرُ الصَّلٰوةَ طَوِيلاً ثُمَّ قُلنَا يَااَبَا عَبدِ الرَّحمٰنِ الصَّلٰوةُ فَقَالَ اَىُّ الصَّلٰوةِ فَقُلنَا العِشَاءَ الاٰخِرَةَ فَقَالَ اَمَّا كَمَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ صَلَّيْتُ –

وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ -

হাদীস নং-২৪৬

অনুবাদ ঃ হযরত হানী ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন ঃ আমরা হযরত ইবন উমর (রা)-এর সাথী হয়ে আরাফাত থেকে ফিরে মুজদালিফায় আগমণ করি। এরপর তিনি ইকামত বলেন এবং তাঁর সাথে মাগরিব আদায় করি। অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হন এবং (ইশার) দু'রাকাত নামায আদায় করেন। এরপর পানি চেয়ে গোসল করেন এবং বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েন। আমরা নামাযের জন্য দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকি। অবশেষে আমরা বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান! নামায (অর্থাৎ নামাযের জন্য আগমণ করুন)। তিনি বলেন ঃ কোন্ নামায ? আমরা বললাম, ইশার নামায। তিনি বললেন ঃ যেভাবে নবী করীম (সা) নামায পড়েছেন, আমিও সেভাবে নামায পড়েছি, (অর্থাৎ দু'নামাযকে একত্রে করে)।

অন্য এক রিওয়ায়েতে হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে হানাফী ও শাফিঈ মাযহাবের মধ্যে এই বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে যে, উভয় নামায কি এক আযান ও ইকামতে আদায় করা যাবে, না প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক আযান ও ইকামত বলতে হবে। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী উভয় নামাযের জন্য এক আযান ও ইকামত যথেষ্ঠ। শাফিঈ মাযহাব অনুযায়ী আযান একবার দিতে হবে কিন্তু ইকামত পৃথক পৃথক দিতে হবে। সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস হানাফী মাযহাবের দলীল হিসেবে উল্লেখ করা যায়। কোন রিওয়ায়েতে হযরত জাবির (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং হযরত আবূ আইউব (রা) বর্ণিত হাদীসও এই মাযহাবের দলীল হিসেবে পেশ করা যায়। যেমন ঃ আবূ শায়খ ইসফাহানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ صلى المغرب وَالعشَاء باقامة واحدة "নবী করীম (সা) মাগরিব ও ইশা একই ইকামতে আদায় করেছেন।" এমনিভাবে মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় হযরত আবূ আইউব (রা) বর্ণিত হাদীস উপরোক্ত বিষয়ে দলীল হিসেবে পেশ করা যায়।

শাফিঈ মাযহাবের দলীল হিসেবে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বর্ণিত হাদীস রয়েছে। এতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে ঃ فصلى بها المغرب وَالعشَاء باذان واحد واقامتين "হুযূর (সা) মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা এক আযান এবং দু' ইকামতে আদায় করেছেন।" মোট কথা, উভয় রিওয়ায়েতে কঠোর অনৈক্য রয়েছে। যার ফলে আলোচ্য বিষয়ে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং নীতি অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত কম আমল অর্থাৎ এক ইকামতে নামায আদায় করা কিয়াসের দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত।

٢٤٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَدِىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ

(رض) قَالَ صَلَّيتُ مَعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ المَغرِبَ وَالعِشَاءِ فِى حَجَّةِ الوِدَاعِ بِالمُزدَلِفَةِ -

হাদীস নং-২৪৭

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ আউইব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিদায় হজ্জে মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা (একত্রে) পড়েছি।

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মুয়াত্তা নামক গ্রন্থে এই হাদীস একই সনদে বর্ণিত আছে। তিবরানী নামক গ্রন্থে জাবির জু'ফী এবং মুহাম্মদ ইবনে আবী লায়লা (র)-এর সূত্রে এই হাদীস একই সনদে বর্ণিত আছে। তবে এতে باقامة واحدة শব্দ অতিরিক্ত রয়েছে যা হানাফী মাযহাবের পক্ষ সমর্থন করে। কেননা নির্ভরযোগ্য (ثقه) বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত (زيادتى) বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। জাবির জু'ফীর মধ্যে যদিও দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে আবী লায়লা (র)-এর সাথে সংযুক্ত হওয়ায় তাঁর দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে গিয়েছে।

٢٤٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَن اَبِى اِسحٰقَ عَن عَبدِ اللّٰهِ بنِ يَزِيدَ الخَطَمِىِّ عَن اَبِى اَيُّوبَ (رض) اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى المَغرِبَ وَالعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ -

হাদীস নং-২৪৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ আউইব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুযদালিফায় এক আযান এবং ইকামতে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসও তিবরানী বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী হানাফী মাযহাবের পক্ষে দলীল হিসেবে গণ্য হয়েছে।

بَابُ رَمِى الجِمَارِ

কংকর নিক্ষেপ করা

٢٤٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَن سَلَمَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن ابنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَنَّه عَجَّلَ ضَعَفَةَ اَهلِه وَقَالَ لَهُم لَاتَرمُوا جَمْرَةَ العَقَبَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمسُ -

হাদীস নং-২৪৯

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) স্বীয় পরিবারের দুর্বলদেরকে (মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থ) দ্রুত রওয়ানা করিয়ে দেন এবং তাঁদেরকে বলে দেন যে, সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন জামরায় আকাবায় রামী বা কংকর নিক্ষেপ না করে।

ব্যাখ্যা ঃ এই আমলের মধ্যে ফায়দা হলো এই যে, ভিড়ের পূর্বেই রামী বা কংকর নিক্ষেপ থেকে অবসর হতে পারা। এরশাদুস-সারী গ্রন্থে এটা বর্ণিত আছে।

٢٥٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَن حَمَّادٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَن اِبنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ضَعَفَةَ اَهلِه وَقَالَ لَهُم لاَتَرْمُوا جَمرَةَ العَقَبَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ -

হাদীস নং-২৫০

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় পরিবারবর্গের দুর্বল লোকদেরকে আগে প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে বলেন ঃ সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করবে না।

ব্যাখ্যা ঃ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী রাতে কংকর নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। এমনিভাবে তাওয়াফে ইফাযা (افاضه) সুবহে সাদিকের পূর্বে জায়েয নয়। ইমাম মালিক (র) এই মত পোষণ করেছেন। কিন্তু শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবে অর্ধরাতের পর কংকর নিক্ষেপ জায়েয। উপরোক্ত দু'টি হাদীস হানাফী ও মালিকী মাযহাবের দলীল হিসেবে প্রমাণ করে।

٢٥١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَن عَطَاءٍ عَن اِبنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَبّٰى حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ العَقَبَةِ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَردَفَ الفَضلَ بنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ غُلاَمًا حَسَنًا فَجَعَلَ يُلاَحِظُ النِّسَاءَ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصرِفُ وَجهَهُ فَلَبّٰى حَتّٰى رَمٰى جَمرَةَ العَقَبَةِ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَن اِبنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ الفَضلِ اَخِيهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَم يَزَل يَلَبّٰى حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ العَقَبَةِ -

হাদীস নং-২৫১

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত তালবীয়াহ পাঠ করতেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, ফযল ইবনে আব্বাস (রা)-কে নবী করীম (সা) তাঁর পিছনে সওয়ারীর উপর বসালেন। তিনি একজন সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান যুবক ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি মহিলাদের দিকে তাকাতে থাকেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর চেহারা ফিরিয়ে দেন। অতঃপর জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত তালবীয়াহ পাঠ করেন।

অপর এক রিওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) স্বীয় ভাই হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) জামরায়ে আকাবায়ে কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত তালবীয়াহ পাঠ করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ হাজীগণ কতক্ষণ পর্যন্ত তালবীয়াহ পাঠ করবেন এটা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম সুফীয়ান সওরী, জমহুর সাহাবা ও তাবিঈ এবং মিসরের ফকীহদের মত হলো এই যে,নহরের দিন (১০ই যিলহজ্জ) সকালে জামরায় কংকর নিক্ষেপ শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত তালবীয়াহ্ পাঠ করতে হবে। কংকর নিক্ষেপ শুরু করার সাথে সাথে তা বন্ধ করতে হবে। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আরাফাতের দিন ফজর নামায পর্যন্ত তালবীয়াহ পাঠ করার পর তা বন্ধ করতে হবে। হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে উমর (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত ইমাম মালিক (র) এবং মদীনার ফকীহগণের মাযহাব হলো এই যে, আরাফাতের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তালবীয়াহ্ পাঠ করতে হবে। ওকূফ শুরু হওয়ার পর তালবীয়াহ্ পাঠ করা যাবে না। আহমদ, ইসহাক এবং পূর্ববর্তী কোন কোন আলিমের মত হলো এই যে, জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ থেকে অবসর না হওয়া পর্যন্ত তালবীয়াহ্ পাঠ করতে হবে। উপরোক্ত হাদীস হানাফী, শাফিঈ এবং জমহুর উলামা দলীল হিসেবে পেশ করেন। কিন্তু বিরোধী পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন দলীল নেই। উপরোক্ত হাদীসের শেষে বর্ণিত শব্দ لم يزل থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এরদ্বারা ইমাম আহমদ ও ইসহাকের মাযহাবের প্রমাণ বহন করে। কিন্তু নাসাঈ শরীফের বর্ণনা فاذ رمى قطع التلبية "অর্থাৎ প্রথম কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবীয়াহ পাঠ বন্ধ করতে হবে।" দ্বারা উপরোক্ত সন্দেহ দূরীভূত করেছে।

بَابُ الرُّكُوْبِ عَلى بدنَتِهِ

কুরবানীর জন্তুর উপর সওয়ার হওয়া

٢٥٢ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَن عَبدِ الكَرِيمِ عَن اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَاَى رَجُلاً يَسُوقُ بُدَنَةً فَقَالَ اِركَبْهَا –

হাদীস নং-২৫২

অনুবাদ ঃ আবদুল করীম হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) দেখেন যে, এক ব্যক্তি স্বীয় কুরবানীর জন্তু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি তাকে বললেন ঃ এর উপর সওয়ার হয়ে যাও।

ব্যাখ্যা ঃ কুরবানীর জন্তুর উপর হাজীদের আরোহণ করা জায়েয কিনা, এটা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ এর সাধারণ (مطلق) ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে মতামত পেশ করেছেন, কেউ কেউ সাধারণ নিষেধ এবং কেউ কেউ সাধারণ জায়েয হওয়ার পক্ষে মতামত পেশ করেছেন। মোল্লা আলী ক্বারী এবং কাসতাল্লানীর উক্তির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শাফিঈ ও হানাফী ইমামদ্বয় এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিন্তু তিরমিযী, কিরমানী ও ইমাম নববীর উক্তির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ বিষয়ে শাফিঈ ও হানাফী ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে সামান্য প্রয়োজনেও আরোহণ করা জায়েয। হানাফী মাযহাবমতে শুধু জরুরী প্রয়োজনের সময় কুরবানীর জন্তুর উপর আরোহণ জায়েয। যেমন, পদব্রজে চলা খুবই কষ্টকর হওয়ার কারণে কোন বাহনে আরোহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। হযরত জাবির, হযরত আবূ হুরায়রা এবং হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসের দ্বারা এটাই প্রকাশ পেয়েছে। ইমাম বুখারী (র) আঁ হযরত (সা)-এর পক্ষ থেকে সওয়ারীর জন্য তিনবার পুনঃ উচ্চারণ করার কথা বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ويلك শব্দ রয়েছে। মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা)-এর হাদীসে اذا الجئت اليها (যখন তুমি এর জন্য বাধ্য হবে) শব্দ রয়েছে। কোথাও وَيْلَكَ -এর স্থলে وَيْحَكَ শব্দও রয়েছে। সুতরাং এগুলোর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, কঠোর অপারগতার সময় কুরবানীর জন্তুর উপর সওয়ার হওয়া জায়েয। অন্যথায় এটা জায়েয নয়।

بَابُ التَّمَتُّعِ وَالقِرَانِ

তামাত্তু এবং কিরান

٢٥٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبرَاهِيمَ عَنِ الصُّبَيِّ بنِ مَعبَدٍ قَالَ اَقبَلتُ مِنَ الجَزِيرَةِ حَاجًّا فَمَرَرتُ بِسَلْمَانَ ابنِ رَبِيعَةَ وَزَيدِ بنِ صُوحَانَ وَهُمَا شَيخَانِ بِالْعَذِيبَةِ قَالَ فَسَمِعَانِى اَقُولُ لَبَيكَ بِعُمرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ اَحَدُ هُمَا هٰذَا الشَّخصُ اَضَلُّ مِنَ بَعِيرِه وَقَالَ الاٰخَرُ هٰذَا اَضَلُّ مِن كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَضَيتُ حَتّٰى اِذَا قَضَيتُ نُسُكِى مَرَرتُ بِاَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ (رض) فَاَخبَرتُه كُنتُ رَجُلاً بَعِيدَ الشُّقَّةِ

قَاصِيَ الدَّارِ اَذِنَ اللّٰهُ لِى فِىَ هٰذَا الوَجْهِ فَاَحبَبْتُ اَنَ اَجْمَعَ عُمرَةَ اِلٰى حَجَّةٍ فَاَهلَلتُ بِهِمَا جَمَيْعًا وَلَم اَنْسَ فَمَرَرتُ بِسَلْمَانَ بنِ رَبَيعَةَ وَزَيدِ بنِ صُوحَانَ فَسَمِعَانِى اَقُولُ لَبَّيكَ بِعُمَرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا فَقَالَ الاٰخَرُ هٰذَا اَضَلُّ مِنَ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ فَصَنَعتَ مَاذَا قَالَ مَضَيتُ فَطُفْتُ طَوَافًا لِعُمْرَتِى وَسَعَيتُ سَعْيًا لِعُمَرَتِى ثُمَّ عُدتُ فَفَعَلتُ مِثلَ ذَلِكَ ثُمَّ بَقِيْتُ حَرَامًا اَصنَعُ كَمَا يَصنَعُ الحَاجُّ حَتّٰى اِذَا قَضَيْتُ اخِرَ نُسُكِى قَالَ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيكَ مُحَمَّدٍ صلّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنَ الصَّبِىِّ بنِ مَعْبَدٍ (رضـ) قَالاَ كُنتُ حَدِيثَ عَهدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَقَدِمْتُ الكُوفَةَ اُرِيدُ الَحَجَّ فِى زَمَانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ (رضـ) فَاَهَلَّ سَلَمَانُ وَزَيدُ بنِ صَوحَانَ بِالحَجِّ وَحْدَهَ وَاَهَلَّ الصَّبِىُّ بِالحَجِّ وَالعُمَرَةِ فَقَالَ وَيحَكَ تَمَتَّعْتَ وَقَد نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُتْعَةِ قَالاَ لَه وَاللّٰهِ لاَنتَ اَضَلُّ مِن بَعِيرِكَ قَالَ نَقدِمُ عَلى عُمَرَ وَ تَقدَمُونَ فَلَمَّا قَدِمَ الْصَبِىُّ مَكَّةَ طَافَ بَالبَيتِ وَسَعٰى بَينَ الصَّفَا وَالمَرَوَةَ لِعُمرَتِه ثُمَّ رَجَعَ حَرَامًا لَم يَحِلَ مِن شَئٍ ثُمَّ طَافَ بِالبَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ لِحَجَّتِهِ ثُمَّ اَقَامَ حَرَامًا لَم يَحْلِلْ مِنهُ حتّى اَتَى عَرَفَاتٍ وَفَرَغَ مِن حَجَّتِه فَلَمَّا كَانَ يَومُ النَّحرِ حَلَّ فَاَهرَقَ دَمًا لِمُتْعَتِه فَلَمَّا صَدَرُوا مِنَ حَجِّهِمَ مَرُّوا بِعُمَرِ بنِ الْخَطَّابِ (رضـ) فَقَالَ لَهَ زَيدُ بنَ صَوحَانَ يَا اَمِيرَ المُؤمِنِينَ اِنَّكَ نَهَيتَ عَنِ المُتَعَةِ وَاِنَّ الصَّبِىَّ بنَ مَعبَدٍ قَدَ تَمَتَّعَ قَالَ صَنَعتَ مَاذَا يَاصَبِىُّ قَالَ اَهلَلْتُ يَا اَمِيرَ المُؤمِنِينَ بِالحَجِّ وَالعُمَرَةِ فَلَمَّا قَدِمتُ مَكَّةَ طُفْتُ بِالبَيتِ وَطُفْتُ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةَ لِعُمْرَتِى ثُمَّ رَجَعْتُ حَرَامًا وَلَمْ اَحِلَّ مِن شَئٍ ثُمَّ طُفْتُ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ لِحَجَّتِى ثُمَّ اَقَمْتُ حَرَامًا

يَومَ النَّحْرِ فَاَهرَقْتُ دَمًا لِمُتْعَتِى ثُمَّ اَحلَلتُ قَالَ فَضَرَبَ عُمَرَ عَلٰى ظَهْرِهِ وَقَالَ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ الصَّبِىِّ قَالَ خَرَجَ هُوَ وَسَلْمَانُ بنُ رَبِيعَةَ وَزَيدُ بنُ صُوحَانَ يُرِيدُونَ الحَجَّ قَالَ فَاَمَّا الصَّبِىُّ فَقَرَنَ الحَجَّ وَالعَمرَةَ جَمِيعًا وَاَمَّا سَلمَانُ وَزَيدُ فَاَفْرَدُوْا الحَجَّ ثُمَّ اَقبَلاَ عَلَى الصَّبِىِّ يَلُومَانِه فِيمَا صَنَعَ ثُمَّ قَالاَ له اَنتَ اَضَلُّ مِنَ بَعِيرِكَ تَقرَنُ بَينَ الحَجِّ وَالعُمْرَةَ وَقَد نَهى اَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عَنِ العُمْرَةِ وَالحَجِّ قَالَ تَقدَمُونَ عَلى عُمَرَ وَاَقدَمُ قَالَ فَمَضَّوا حَتَّى دَخَلُوا مَكَّةَ فَطَافَ بِالبَيتِ لِعُمْرَتِه وَسَعى بَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ ثُمَّ عَادَ فَطَافَ بِالبَيتِ لَحَجَّتِه ثُمَّ سَعٰى بَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ ثُمَّ اَقَامَ حَرَامًا كَمَا هُوَ لَم يَحِلَّ لَهُ شَئٌ حُرِّمَ عَلَيهِ حَتَّى اِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحرِ ذَبَحَ مَا اَستَيسَرَ مِنَ الهَدْى شَاةً فَلَمَّا قَضَوا نُسُكَهُمَ مَرُّوا بِالْمَدِينَةِ فَدَخَلُوا عَلى عُمَرَ (رضـ) فَقَالَ لَه سَلْمَانُ وَزَيدٌ يَااَمِيرَ المُؤمِنِينَ اِنَّ الصَّبِىَّ قَرَنَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ قَالَ صَنَعْتَ مَاذَا قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ طُفْتُ طَوَافًا لِعُمْرَتِى ثُمَّ سَعَيْتُ بَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ لِعُمْرَتِى ثُمَّ عُدْتُ فَطُفْتُ بِالبَيتِ لِحَجَّتِى ثُمَّ سَعَيْتُ بَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ لَحَجَّتِى قَالَ ثُمَّ صَنَعْتَ مَاذَا قَالَ اَقَمْتُ حَرَامًا لَم يَحِلَّ لِى شَئٌ حُرِّمَ عَلَىَّ حَتَّى اِذَا كَانَ يَومُ النَّحْرِ ذَبَحْتُ مَا اَستَيسَرَ مِنَ الهَدْىِ شَاةً قَالَ فَضَرَبَ عُمَرَ عَلٰى كَتِفِه ثُمَّ قَالَ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -

হাদীস নং-২৫৩

অনুবাদ ঃ হযরত সুবাঈ ইবনে মা'বাদ (র) বলেন ঃ আমি জাযিরা থেকে হজ্জের নিয়্যতে আগমণ করি এবং সালমান ইবনে রাবী'আ ও যায়দ ইবনে সুহান নামক আযিবার দু'জন শায়খ-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। যখন তাঁরা আমাকে لبيك بعمرة وحجة বলতে শুনেন তখন

তাঁদের একজন বলেন ঃ এই ব্যক্তি (আমি) তার উট থেকেও অধিক গুমরাহ (হজ্জের আহকাম থেকে অজ্ঞ)। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন ঃ এই লোকটি (আমি) অমুক অমুক বস্তু থেকেও অধিক গুমরাহ্ (অজ্ঞ ও মূর্খ)। কিন্তু আমি আমার নিজের কাজে নিয়োজিত থাকি (অর্থাৎ তাদের কথায় কর্ণপাত করিনি) এবং হজ্জের আরকান সমাপ্ত করি। অতঃপর আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করি, আমি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করি। আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য হজ্জের এই পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করা আমার নিকট অধিক পসন্দনীয় হয়েছে। আমি উভয়ের নিয়্যত করে ইহ্রাম বেঁধেছি। এটা আমি ইচ্ছাকৃত করেছি। অতঃপর যখন সালমান ইবনে রাবী'আ এবং যায়দ ইবনে সুহানের নিকট দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম এবং তাঁরা আমাকে لبيك بعمرة وحجة বলতে শুনেন তখন তাঁদের মধ্যে একজন বলেন ঃ এই ব্যক্তি তার উট থেকে অধিক (হজ্জের মাসয়ালা সম্পর্কে) অজ্ঞ। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন ঃ এই ব্যক্তি অমুক অমুক থেকে (হজ্জের মাসয়ালা সম্পর্কে) অজ্ঞ। তখন হযরত উমর (রা) বলেন ঃ অতঃপর তুমি কি করলে? আমি বললাম, আমি যথাযথভাবে হজ্জের আরকানসমূহ আদায় করি। আমি উমরার জন্য তাওয়াফ করি এবং উমরার জন্য সাঈ আদায় করি। এরপর দ্বিতীয়বার এরূপ করি। অতঃপর আমি (হজ্জের জন্য) ইহরাম অবস্থায় থাকি এই নিয়্যতে যে, আমি ঐ কাজ করব যা একজন হাজী করে থাকেন (আরকানে হজ্জ আদায় করব)। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার নবী (সা)-এর সুন্নত ও পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করেছ।

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত সুবাঈ ইবনে মা'বাদ (রা) বলেন ঃ মাত্র কিছুদিন পূর্বে খ্রীস্ট ধর্ম ত্যাগ করার পর আমি হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে হজ্জের নিয়্যতে কূফায় গমন করি। সালমান এবং যায়দ ইবনে সুহান শুধু হজ্জের নিয়্যতে ইহরাম বাঁধেন (অর্থাৎ শুধু কিরানের নিয়্যত করেন)। সুবাঈ একত্রে হজ্জ ও উমরার নিয়্যত করেন। তখন উভয়ে বলেন ঃ তোমার ধ্বংস হোক, তুমি তামাত্তুর নিয়্যত করেছ অথচ হুযূর (সা) এর থেকে নিষেধ করেছেন। তাঁরা উভয়ে তাঁকে (সুবাঈকে) বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ। তুমি তোমার উটের চেয়েও অধিক গুমরাহ্। সুবাঈ উত্তরে বলেন ঃ আমরা হযরত উমর (রা)-এর নিকট যাচ্ছি। অতঃপর যখন সুবাঈ মক্কা আগমণ করেন তখন বাইতুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ করেন এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করেন। এরপর হালাল না হয়ে ইহরাম অবস্থায় থাকেন। (হজ্জের দিন পুনরায়) বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করেন এবং হজ্জের জন্য সাফা ও মারওয়া সাঈ করেন। অতঃপর হালাল না হয়ে ইহরাম অবস্থায় থাকেন এবং আরাফাতে আগমণ করেন ও হজ্জের আরকান সমাপ্ত করেন। এরপর যখন নহরের দিন উপস্থিত হয়, তখন মতুআর (কিরান হজ্জের) জন্য কুরবানী করেন। এরপর লোকজন যখন হজ্জ থেকে ফিরে যায়, তখন তিনি (মদীনায়) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট গমন করেন। তখন যায়দ ইবনে সুহান বলেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি মুতআ (অর্থাৎ কিরান ও তামাত্তু) থেকে নিষেধ করেছেন কিন্তু সুবাঈ ইবনে মা'বাদ তামাত্তু আদায় করেছেন। হযরত উমর (রা) সুবাঈকে জিজ্ঞাসা করেন, হে সুবাঈ! তুমি কি কি করেছ? তিনি তখন বলেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আমি হজ্জ ও উমরার নিয়্যতে ইহরাম বাঁধি। এরপর যখন আমি মক্কায় আগমণ করি, তখন উমরার জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করি এবং সাফা ও মারওয়া সাঈ করি। অতঃপর হালাল না

হয়ে ইহরাম অবস্থায় থাকি। এরপর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ (طواف قدوم) করি এবং হজ্জের জন্য সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করি। এরপর নহরের দিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকি এবং মুতআর জন্য কুরবানী করি। অতঃপর ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাই। (সুবাঈ) বলেন ঃ তখন হযরত উমর (রা) আমার পিঠ চাপড়ান এবং বলেন ঃ নিশ্চয়ই তুমি তোমার নবী (সা)-এর সুন্নত অনুযায়ী আমল করেছ।

সুবাঈ ইবনে মা'বাদ থেকে অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ তিনি এবং সালমান ইবনে রাবী'আ ও যায়দ ইবনে সুহান হজ্জের উদ্দেশ্য বের হন। সুবাঈ ইহরামের সময় কিরানের নিয়্যত করেন। সালমান এবং যায়দ শুধু হজ্জের নিয়্যত করেন। তখন তাঁরা উভয়ে সুবাঈকে গালমন্দ করেন এবং বলেন ঃ তুমি তোমার উট থেকেও অজ্ঞ। তুমি হজ্জ ও উমরা একত্র করছ, অথচ হযরত উমর (রা) হজ্জ ও উমরা একত্রে করা থেকে নিষেধ করেছেন। তখন সুবাঈ বলেন ঃ আমরা হযরত উমর (রা)-এর নিকট যাচ্ছি। তাঁর নিকট এটা জিজ্ঞাসা করব। অতঃপর তাঁরা চলতে থাকেন এবং মক্কা গমন করেন। তখন সুবাঈ উমরার জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়া সাঈ করেন। অতঃপর হজ্জের জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করেন। অতঃপর হালাল না হয়ে ইহরাম অবস্থায় থাকেন যাতে তাঁর জন্য হারাম বস্তু হালাল হয়ে না যায়। এরপর যখন কুরবানীর দিন উপস্থিত হয়, তখন সামর্থ্য অনুযায়ী একটি বকরী যবেহ করে কুরবানী আদায় করেন। যখন কুরবানীর যাবতীয় আহকাম সমাপ্ত করেন তখন মদীনা গমন করে হযরত উমর (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। তখন সালমান এবং যায়দ তাঁকে বলেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন? সুবাঈ হজ্জ ও উমরা একত্র করে আদায় করেছেন। অথচ আপনি এটা নিষেধ করেছেন। তখন উমর (রা) সুবাঈকে বললেন ঃ তুমি কি কি করেছ? তখন তিনি বলেন ঃ যখন আমি মক্কায় আগমণ করি তখন উমরার জন্য তাওয়াফ করি এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে উমরার জন্য সাঈ করি। এরপর দ্বিতীয়বার হজ্জের জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করি এবং হজ্জের জন্য সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করি। তখন তিনি [উমর (রা)] জিজ্ঞাসা করেন, এরপর তুমি কি করেছ ? তখন তিনি (সুবাঈ) বলেন ঃ এরপর আমি ইহরাম অবস্থায় থাকি। আমার উপর হারাম বা নিষিদ্ধ কোন কিছু হালাল করিনি। যখন কুরবানীর দিন উপস্থিত হল, তখন আমার ক্ষমতা অনুযায়ী আমি একটি বকরী যবেহ করি। সুবাঈ বলেন ঃ তখন হযরত উমর (রা) আমার কাঁধে হাত চাপড়িয়ে আমাকে ধন্যবাদ ও বাহ্‌বা দেন। অতঃপর বলেন ঃ তুমি তোমার নবী (সা)-এর সুন্নত পালন করেছ।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীস দু'টি মাসয়ালা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাই এগুলো ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত তিন প্রকার হজ্জ যথা ঃ ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু, এর মধ্যে কোন্‌টি উত্তম ? দ্বিতীয়ত কিরান হজ্জের নিয়্যতকারী দু' তাওয়াফ এবং দু'সাঈ করবে, না এক তাওয়াফ ও এক সাঈ করবে ?

প্রথমত তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে হযরত আবূ হানীফা (র) কিরান হজ্জকে সর্বোত্তম মনে করেন, এরপর তামাত্তু' এবং এরপর ইফরাদ। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ (র) ইফরাদ হজ্জকে উত্তম মনে করেন। ইমাম মালিক (র) তামাত্তু' হজ্জকে উত্তম মনে করেন। ইমাম

সুফিয়ান সওরী, ইমাম ইসহাক এবং অনেক হাদীস বিশারদ ইমাম আবূ হানীফার মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। হযরত উমর (রা), হযরত আলী (র), হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবূ তালহা (রা), হযরত ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা), হযরত সুরাকা ইবনে মালিক (রা), হযরত ইবনে উমর (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত বারা ইবনে আযিব (রা), উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা) থেকে এ ধরনের রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। সমস্ত ইমামের মতপার্থক্যের মূল বিষয়বস্তু হলো বিদায় হজ্জের ঘটনা। তাই বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা) যে আমল করেছেন, ঐ আমলই উত্তম হবে।

ইমাম শাফিঈ (র) স্বীয় মাযহাবের স্বপক্ষের রিওয়ায়েত এবং কিয়াসের দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। রিওয়ায়েতের মধ্যে হযরত জাবির (রা), হযরত ইবনে উমর (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস রয়েছে। ইমাম নববী বিষয়টি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট প্রয়াস চালিয়েছেন এবং বর্ণনাকারী প্রত্যেক সাহাবীর ফযীলত প্রমাণ করেছেন। এছাড়া খলীফাদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা) এবং উসমান (রা) সর্বদা হজ্জে ইফরাদের উপর আমল করেছেন। অতঃপর উক্ত মতামতকে কিয়াসের মাধ্যমে আরো শক্তিশালী করেছেন। তা হলো এই যে, হজ্জে ইফরাদে দম নেই। পক্ষান্তরে কিরান ও তামাত্তু-এর মধ্যে দম রয়েছে যা এর ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার পরিচয় বহন করে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বর্ণিত হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন ঃ হযরত উমর (রা) সুবাঈ (রা)-কে হজ্জে কিরান আদায়ের দরুন তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং এটা সুন্নতে নববী বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দ্বিতীয় শক্তিশালী দলীল হলো মুসলিম শরীফে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হজ্জ এবং উমরা একত্রে আদায় করেছেন। ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি এটা অব্যাহত রেখেছেন। এটা হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন নাযিল হয়নি। তৃতীয়ত হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছেন এবং হজ্জের জন্যও ইহরাম বেঁধেছেন। চতুর্থত হযরত আয়েশা (রা) থেকে একই ধরনের রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। পঞ্চমত তাহাবী, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহয় উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) জীবনে চার উমরা আদায় করেন। এক উমরা হুদায়বিয়ায়, দ্বিতীয় উমরাতুল-কাযা যিলকাদ মাসে, তৃতীয় জি-'রানা (جعرانه) থেকে এবং চতুর্থ উমরা বিদায় হজ্জে। সুতরাং এই সমস্ত দলীল সুন্নতে নববীর দৃষ্টিকোণ থেকে হানাফী মাযহাবকে সঠিক প্রমাণিত করে। ষষ্ঠত পবিত্র কুরআনের আয়াত وَاَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلّٰه (আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ এবং উমরা আদায় কর)। হাকেম স্বীয় মুসতাদরাক (مستدرك) নামক গ্রন্থে বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী বর্ণনা করেন যে, কোন এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-এর নিকট এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন ঃ اتمام-এর পদ্ধতি বা নিয়ম হলো এই যে, হজ্জ ও উমরার জন্য ঘর থেকে ইহরাম বাঁধবে। অর্থাৎ কিরান হজ্জের নিয়্যত করবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। সুতরাং এটাই উত্তম যদি মানুষ এর উপর আমল করতে সক্ষম হয়। কেননা এতে অধিক কষ্ট এবং বায়তুল্লাহর মর্যাদাও রয়েছে। সুতরাং যখন পবিত্র কুরআনে কিরান হজ্জের উল্লেখ করা হয়েছে, তখন এটা অন্যান্য প্রকার হজ্জের থেকে কেন উত্তম হবে না ?

এরপর কিয়াসও এ মতের সমর্থন করে থাকে। কেননা কিরান হজ্জের অবস্থায় একত্রে দু'টি ইবাদত হয়ে থাকে যা সর্বদা এক ইবাদতের চেয়ে উত্তম। যেমন কেউ রোযা পালন করার সাথে সাথে ই'তিকাফ আদায় করেন অথবা কেউ আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছেন এবং তাহাজ্জুদও আদায় করেছেন।

এবার শাফিঈ মাযহাবের যুক্তি ও দলীল পেশ করা যায়। শাফিঈ মাযহাবের পক্ষে যে সাহাবায়ে কিরামের রিওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের রিওয়ায়েত শাফিঈ মাযহাবের বিপরীত তথা হানাফী মাযহাবের পক্ষেই রয়েছে। অথচ এই সমস্ত হাদীসকে তাঁরা স্বীয় মাযহাবের পক্ষে শক্তিশালী দলীল মনে করেন। হযরত উমর (রা) এবং হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষ থেকে তামাত্তু' না করার জন্য কঠোর নিষেধ রয়েছে। এর হাকীকত বা রহস্য হলো, স্বয়ং ইমাম মুসলিম আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তামাত্তু' হজ্জের জন্য ফতওয়া দিতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে হযরত উমর (রা)-এর উদ্ধৃতি দেন এবং এই ফতওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। অধিকন্তু তিনি যখন নিজে হযরত উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বলেন ঃ আমি নিজে জানি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তামাত্তু' আদায় করেছেন এবং তাঁর সাহাবাগণও করেছেন। কিন্তু আমি এটা এজন্য ভাল মনে করি না যে, মানুষ ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে এবং আরাফাতের দিকে গমন করার পূর্বে পর্যন্ত স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে; সেখানে গমনের সময় পানির ফোঁটা পড়তে থাকবে। তিরমিযী শরীফে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং দাহহাক ইবনে কায়েস (রা)-এর মধ্যে হজ্জে তামাত্তু' নিয়ে বির্তক সৃষ্টি হয়। দাহহাক ইবনে কায়েস বলেন ঃ এটা কোন জাহিল করতে পারে। সাআদ বলেন ঃ ভাই, এটা তুমি কি বল ? দাহহাক বলেন ঃ হযরত উমর (রা) এটা থেকে নিষেধ করেছেন। হযরত সাআদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করেছেন এবং আমরাও এরূপ করেছি।

এক ব্যক্তি হযরত ইবন উমর (রা)-এর নিকট তামাত্তু' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তরে বলেন ঃ তামাত্তু হজ্জ জায়েয আছে। প্রশ্নকারী বললেন ঃ আপনার পিতা এটা থেকে নিষেধ করেছেন। তখন হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ যদি আমার পিতা এর থেকে নিষেধ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তামাত্তু' হজ্জ করে থাকেন, তাহলে কার কথা অনুসরণযোগ্য হবে ? প্রশ্নকারী বললেন ঃ নবী করীম (সা)-এর কথা ও আমল অনুসরণযোগ্য হবে। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান ও সহীহ বলেছেন। হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রা) হযরত উসমান (রা)-কে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তামাত্তু' আদায় করেছেন এবং হযরত উসমান (রা) এটা অস্বীকার করেননি। এরপর হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে তিরমিযী তাউস থেকে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তামাত্তু' হজ্জ করেছেন এবং হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা) তামাত্তু করেছেন। তবে সর্বপ্রথম হযরত মুআবিয়া (রা) এর বিরোধিতা করেছেন।

এবার তাঁদের কিয়াসের জওয়াব হলো এই যে, তামাত্তু' ও কিরানের দম কিন্তু বাধ্যতামূলক নয় যে, এটা অপূর্ণতার জন্য আদায় করা হয়। দ্বিতীয়ত শাফিঈ মাযহাবও এটা স্বীকার করে যে, আঁ হযরত (সা) প্রথমত ইফরাদ করেছেন এরপর উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছেন। এতে বুঝা যায়, তিনি হজ্জে কিরান আদায় করেছেন, এরদ্বারা রিওয়ায়েতের বিরোধিতার মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছে যে, যারা ইফরাদ বলেছেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রথম আমলের বর্ণনা করেছেন। যাঁরা কিরানের রিওয়ায়েত করেছেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বশেষ আমলের বর্ণনা দিয়েছেন। নীতি অনুযায়ী সর্বশেষ আমলই স্বীকৃত হয়ে থাকে। কেননা যে প্রকার ইফরাদ এরা প্রমাণ করতে চায় যা তামাত্তু' এবং কিরানের বিপরীত; এটা কিভাবে হতে পারে যা হুযূর (সা) বলেছেন, অবশ্য এটা কিরানে পরিণত হয়েছে। কেননা হজ্জের ইহরাম বাঁধা, এরপর উমরার ইহরাম বাঁধা, এগুলোর বিভিন্ন আহকাম পালনের পূর্বে অথবা পরে উভয়ই কিরান হিসেবে গণ্য। সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে কিরান উত্তম বলে বিবেক অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কেননা তামাত্তু'র সময় হজ্জ মক্কী হয়ে থাকে। ইফরাদের সময় উমরা মক্কী হয়ে থাকে। কিরানের সময় হজ্জ ও উমরা উভয়ই মক্কী হয়ে থাকে। সুতরাং কিরান তামাত্তু' ও ইফরাদ থেকে উত্তম। এছাড়া কোন রিওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে اَفردتُ বা تَمَتَّعتُ শব্দ বর্ণিত নেই ; বরং قَرَنْتُ শব্দ বর্ণিত আছে। সুতরাং এটা মেনে নিতে হবে যে, কুরআনের আয়াতে কিরানের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে এবং সুন্নতে নববী ও সাহাবাদের বর্ণনা এর স্বপক্ষে রয়েছে।

দ্বিতীয় পার্থক্য হলো এই যে, শাফিঈ মাযহাব অনুযায়ী কিরানে তাওয়াফ ও সাঈ উভয়ই এক। হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে তাওয়াফ দু'টি এবং সাঈ একটি। ইবনে সিরীন, হাসান, তাউস, যুহরী, মালিক এবং আহমদ (র) থেকে শাফিঈ মাযহাবের সমর্থনে রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। মুজাহিদ, জাবির, ইবনে যায়দ, শুরায়হ, আলী ইবনে হুসাইন, যায়নুল আবেদীন, ইবরাহীম নখঈ এবং সুফিয়ান সওরী (র) থেকে হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

শাফিঈ মাযহাবের দলীল ঃ (১) মুসলিম শরীফে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাহাবাগণ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে একটি সাঈ করেছেন। (২) তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে মরফূ' হাদীস বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে, তার জন্য এক তাওয়াফ ও একটি সাঈ যথেষ্ট যতক্ষণ পর্যন্ত না উভয় থেকে হালাল হবে।

হানাফী মাযহাবের দলীল ঃ (১) হানাফী মাযহাবের প্রথম দলীল হযরত সুবাঈ ইবনে মা'বাদ (রা)-এর আমল থেকে দু'তাওয়াফ এবং দু' সাঈর প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া এর স্বপক্ষে হযরত উমর (রা)-এর সাক্ষ্য রয়েছে যে, এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নত। (২) নাসাঈ সুনানে কুবরা (سنن كبرى) নামক গ্রন্থে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়্যা থেকে রিওয়ায়েত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমি আমার পিতার সাথে তাওয়াফ করেছি, এ সময় তিনি হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করেছেন। তিনি দু' তাওয়াফ ও দু' সাঈর কথা বলেছেন এবং আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) এরূপ করেছেন। হযরত আলী (রা) তাঁদের নিকট

হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দু' তাওয়াফ ও দু' সাঈ আদায় করেছেন। (৩) আবূ বকর ইবনে শায়বা যিয়াদা ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) দু' তাওয়াফ এবং দু' সাঈ আদায় করেছেন। (৪) হযরত আলী (রা) এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন যে, হজ্জে কিরানে দু' তাওয়াফ ও দু' সাঈ রয়েছে।

بَابُ فَضِيْلَةِ الْعُمْرَةِ فِى رَمَضَانَ

রমযানে উমরার ফযীলত

٢٥٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَةٌ فِى رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً –

হাদীস নং-২৫৪

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ পবিত্র মাহে রমযানে উমরা আদায় করা হজ্জের সমান (সওয়াব পাওয়া যায়)।

ব্যাখ্যা ঃ উমরার ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। কোন হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما (এক উমরা থেকে দ্বিতীয় উমরা পর্যন্ত যে গুনাহ হয়ে থাকে, উমরা এই গুনাহর জন্য কাফফারা হয়ে যায়)। মুয়াত্তা ইমাম মালিক নামক হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে, একজন মহিলা আঁ হযরত (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল, আমি হজ্জের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি কিন্তু আমার উপর এমন এক অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে হজ্জ আদায়ের ব্যাপারে অক্ষম হয়ে পড়েছি। তখন হুযূর (সা) বললেন ঃ রমযান মাসে উমরা আদায় কর। কেননা রমযান মাসের উমরায় এক হজ্জের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। এই ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য হলো এই যে, উমরা যদিও হজ্জ থেকে কম মর্যাদাসম্পন্ন মনে করা হয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটা একটা বরকতপূর্ণ ও নেক আমল। যদি পবিত্র মাহে রমযানে উমরা আদায় করা হয়, তা হলে উমরার ফযীলত এই পবিত্র মাসের ফযীলতের সাথে যুক্ত হয়ে আল্লাহর নিকট হজ্জের সমান সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। বস্তুত এই হাদীসে উমরা আদায়ের প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

٢٥٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلٰى بَعِيْرَةٍ اَزْرَقَ اِلٰى سَوَادٍ وَهُوَ النَّاقَةُ الْقَصْوٰى مُتَقَلِّدًا بِقَوْسٍ مُتَعَمِّمًا بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ مِنْ وَبَرٍ –

হাদীস নং-২৫৫

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা) একটি উটের উপর আরোহণ করেছিলেন যা আল-কাসওয়া নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি কামান এবং উলের কাল পাগড়ী পরিহিত ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ মক্কা নগরীতে ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবূওয়াতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

بَابُ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নবী (সা)-এর রওযা শরীফের যিয়ারতের বর্ণনা

٢٥٦ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ تَاْتِيَ قَبْرَالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَتَجْعَلَ ظَهْرَكَ اِلَى الْقِبْلَةِ وَتَسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه –

হাদীস নং-২৫৬

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ সুন্নত তরীকা হলো এই যে, কিবলার দিক থেকে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র রওযায় আগমণ করবে। কিবলাহ্র দিকে পিঠ এবং রওযার দিকে মুখ থাকবে। এরপর বলবে ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه -

"হে নবী (সা) ! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত ও বরকত (বর্ষিত হোক)।"

ব্যাখ্যা ঃ মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে উমর (রা) যখন সফরে গমনের ইচ্ছা করতেন অথবা সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন নবী করীম (সা)-এর রওযায় আগমণ করতেন। তাঁর উপর দরূদ পাঠ করতেন, দু'আ করতেন। অতঃপর ফিরে যেতেন।

كِتَابُ النِّكَاحِ
বিবাহ অধ্যায়

بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ
বিবাহের খুতবা

٢٥٧ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ يَعْنِى النِّكَاحِ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ *

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ - وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا - يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا - يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا *

হাদীস নং- ২৫৭

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে হাজতের খুতবা অর্থাৎ বিবাহের খুতবা এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ ... অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং আমরা তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট গুনাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকট হিদায়াত কামনা করি। আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দান করতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ বা উপাস্য নেই এবং আমরা এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা এবং তার রসূল। অতঃপর পবিত্র কুরআনের এ আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ-(٣:١٠٢) وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْنَ تَسَأَلُوْنَ بِهٖ وَالاَرْحَامَ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا - (٤:١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُو اللّٰهَ وَقُوْلُوا قَوْلاً سَدِيْدًا - يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا (٣٣:٧٠-١٧)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত حاجت শব্দের অর্থ বিবাহ। কেননা বিবাহ মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, বিশেষ করে যুবকদের জন্য। বিবাহ ব্যতীত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন স্বাদ ও আনন্দহীন হয়ে যায়। যৌবনের চাহিদা পূরণের জন্য এ ছাড়া অন্য কোন যুক্তিসম্মত ও উপযুক্ত পদ্ধতি নেই। সংসার পরিচালনা এবং সংসারকে সুখী ও সুন্দর করার জন্য বিবাহ মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজন। এছাড়া বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য মানবতার গন্ডির মধ্যে বিবাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

খুতবায় উল্লেখিত শাহাদাত বা তাশাহ্হুদ হলো বিবাহের জন্য। অপর এক তাশাহ্হুদে সালাত যা নামাযে আত্তাহিয়্যাতু হিসেবে পাঠ করা হয়।

ইমাম সুফয়ান সওরী (র) ও অন্যান্যদের মতে খুতবা ব্যতীত বিবাহ জায়েয। দলীল হিসেবে তাঁরা আবূ দাউদ শরীফের এক হাদীস পেশ করে থাকেন। কিন্তু খুতবা হলো বিবাহের জন্য সুন্নাত ও মুস্তাহাব। তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجذ ماء "যে খুতবায় তাশাহহুদ না থাকে, তা ঐ হাতের মত যা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত অথবা তা কর্তনকৃত হাতের মত, যেন এর মধ্যে কোন উপকারিতা নেই।

মূলত বিবাহের প্রচারের জন্যই খুতবার প্রচলন করা হয়েছে। কেননা বিবাহের প্রচারের জন্য নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ اعلنوا النكاح অথবা اظهروا النكاح "বিবাহের প্রচার কর।"

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে সমস্ত লেনদেন অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় ও বিবাহ ইত্যাদির মধ্যে খুতবা প্রদান করা সুন্নাত।

بَابُ الاَمْرِ بِالنِّكَاحِ

বিবাহের নির্দেশ

٢٥٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ

مُوْسى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجُوْا فَاِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ *

হাদীস নং- ২৫৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ তোমরা বিবাহ কর। কেননা আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা অন্যান্য উম্মতের সম্মুখে গৌরব করব।

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণনা ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্যসহ অন্যান্য হাদীসেও এই একই বিষয় উল্লেখ রয়েছে। আবূ দাউদ শরীফে ঃ تَزَوَّجُوْا এর সাথে المولود الودود বাক্যটি বর্ণিত হয়েছে। মূলত এরদ্বারা সম্পূর্ণ হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং تزوجوا -এর নির্দেশকে হাদীসে বর্ণিত বাক্য فانى مكاثر بكم الامم -এর কারণের সাথে সংযুক্ত করে বলা হয়েছে تزوجوا الودود المولود অর্থাৎ সঠিক সন্তান জন্মদানকারিণী এবং প্রেমময় ও মায়াবী মহিলাকে বিবাহ কর। ولود শব্দ ঐ রহস্যের উন্মোচন করে যে, নারী যদি অধিক সন্তান জন্মদান করে, তা হলে অনিবার্যভাবে উম্মতে মুহাম্মদীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং এরদ্বারা কিয়ামতের দিন নবী করীম (সা) গৌরব করবেন। কেননা তিনি হলেন উম্মতকে সৎপথে প্রদর্শনকারী এবং শরীয়ত ও সুন্নাতের পথ প্রচলন ও বাস্তবায়নকারী।

অধিকন্তু হাদীস الدال على الخير كفاعله "সৎপথ প্রদর্শনকারী ঐ পূণ্য লাভ করবে যা সৎপথের অনুসরণকারী লাভ করে থাকে।" অথবা مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَايَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا "যে ব্যক্তি কোন নেককাজের প্রচলন করেন, তার জন্য তিনি ঐ কাজের পূণ্যলাভ করবেন এবং ঐ ব্যক্তির পূণ্যও তিনি হাসিল করবেন যে ব্যক্তি এর উপর আমল করবে।"

সুতরাং নবী করীম (সা)-ও তাঁর প্রচলিত আদর্শের অনুসরণকারী সমস্ত উম্মতের পুণ্য লাভ করবেন এবং তিনি অধিক সওয়াব ও পুণ্যের জন্য গৌরব করবেন। তাই নির্দেশ হয়েছে, অধিক সন্তান জন্মদানকারী মহিলাকে বিবাহ কর, যাতে উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় হিকমত এই যে, বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু যৌন উত্তেজনা প্রশমিত করা নয়, বরং এর মূল উদ্দেশ্য হলো মানব বংশ বৃদ্ধি করা।

بَابُ الْحَثِّ عَلى نِكَاحِ الاَبْكَارِ

কুমারী মেয়েদের বিবাহের ব্যাপারে উৎসাহ দান

٢٥٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكِحُوا الْجَوَارِىَ الشَّوَابَّ

৪১ —

فَاِنَّهُنَّ اَنْتَجُ اَرْحَامًا وَاَطْيَبُ اَفْوَاهًا وَاَعَزُّ اَخْلَاقًا *

হাদীস নং- ২৫৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ তোমরা কুমারী মেয়েদেরকে বিবাহ কর। কেননা তারা দ্রুত গর্ভধারণ করতে সক্ষম এবং তাদের মুখ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও তারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

ব্যাখ্যা ঃ বিবাহের জন্য নির্বাচনযোগ্য নারীদের বিভিন্ন গুণাবলীর মধ্যে কুমারী হওয়ার উদ্দেশ্য হলো এই যে, যৌবনের কারণে তাদের জরায়ুতে উত্তেজনা বিদ্যমান থাকে। যার ফলে বীর্য খুব দ্রুত স্থীতিশীল হয় এবং কোন অস্থিরতা বা বিপদ ছাড়াই গর্ভকালীন সমস্ত স্তর সহজেই অতিক্রম করে। মূলত এটাই বংশবৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ কুমারী নারীর মুখের সৌন্দর্যের দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের সুস্থতা ও সংযত চিত্তের কারণে তাদের শ্লেষ্মা মিষ্টি হয়ে থাকে। অথবা তাদের শিষ্টাচার, লাজলজ্জা ও আদবের কারণে তাদের কথাবার্তা মিষ্টি হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বিধবা নারী অনেকেই পর্দাহীন হয়ে থাকে।

তৃতীয়তঃ কুমারী নারীদের উত্তম চরিত্রের দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের আকর্ষণীয় চরিত্র, উত্তম ব্যবহার ও চালচলন সবার নিকট পসন্দনীয় হয়ে থাকে, যার ফলে দাম্পত্য জীবন সুখী ও স্থায়ী হয়ে থাকে।

এ সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীস রয়েছে, এগুলোর বাক্যে পরস্পরের সাথে মিল রয়েছে। কোথাও হয়ত সামান্য পার্থক্য রয়েছে। ইবন মাজাহ ও বায়হাকীর বর্ণনায় اَرْضٰى بِالْيَسِيْرْ বাক্য রয়েছে যার অর্থ তারা সামান্য বস্তুর উপর সন্তুষ্ট থাকে। কেননা অতীতের কোন উদাহরণ বা অভিজ্ঞতা তাদের নেই, তাই তারা অধৈর্য হয় না। এক বর্ণনায় اَقَلُّ خبأً উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ তাদের মধ্যে ধোকাবাজির স্বভাব কম হয়ে থাকে।

মুসান্নেফে আবদুর রাজ্জাক গ্রন্থে এই বাক্য রয়েছে। অতঃপর এই বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে ঃ اَلَمْ تَعْلَمُوا اَنِّى مُكَاثِرٌبِكُمْ "তোমরা কি এটা জান না যে, আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গৌরব করব।"

একবার উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করলেন, আপনি বলুন!যদি আপনি এরূপ গাছপালার কাছ দিয়ে অতিক্রম করেন যার উপর জীবজন্তু চড়ে বেড়িয়েছে এবং এরূপ গাছপালা যেগুলোর উপর জীবজন্তু চড়ে বেড়ায়নি, তাহলে আপনি আপনার উট কোন্ গাছপালার নিকট চড়াবেন? নবী করীম (সা) বললেন ঃ ঐ সমস্ত গাছপালা যেখানে কোন জীবজন্তু বিচরণ করেনি। এরদ্বারা এ বিষয়টি বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন কুমারী নারীকে যাতে বিবাহ করেন। কেননা পবিত্র কুরআনে হূরদের প্রশংসায় ইরশাদ হয়েছে ঃ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانٌّ "তাদেরকে এরপূর্বে কোন মানুষ অথবা কোন জিন্ন স্পর্শ করেনি।" (৫৫ ঃ ৭৪) মোট কথা তাদেরকে স্পর্শ না করাই তাদের সবচেয়ে বড় প্রশংসা।

بَابُ تَنْزِيْهِ نِكَاحِ الْعَجَائِزِ وَالشُّيْبِ ذَاتِ الْوَلَدِ

বৃদ্ধা, বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তা সন্তানের মাকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা

٢٦٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ شَيْخٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رضـ) اَنَّهُ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَزَوَّجْتَ قَالَ لاَ قَالَ تَزَوَّجْ تَسْعٍ مَعَ عَفْتِكَ وَلاَ تَزَوَّجْنَ خَمْسًا قَالَ مَاهُنَّ قَالَ لاَ تَزَوَّجْنَ شَهْبَرَةً وَلاَنَهْبَرَةً وَلاَنَهْبَرَةً وَلاَ هَبْدُرَةً وَلاَ لَغُوْتًا قَالَ زَيْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ اَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا قُلْتَ قَالَ بَلٰى اَمَّا الشَّهْبَرَةُ فَالزَّرْقَاءِ الْبَدَيْنَةِ وَاَمَّا النَّهْبَرَةُ فَالطَّوِيْلَةِ الْمُهْزُوْلَةِ وَاَمَّا اللَّهْبَرَةُ فَالْعَجُوْزُ الْمَدْبِرَةُ وَاَمَّا الْهَبْدَرَةُ فَالْقَصِيْرَةِ الذَّمِيْمَةِ وَاَمَّا الْفَرْتُ فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ -

قَالَ الشَّيْبَانِىُّ ضَحِكَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ طَوِيْلاً *

হাদীস নং-২৬০

অনুবাদ ঃ একদা হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হলেন। তখন তিনি হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি বিবাহ করেছ ? তিনি আরয করলেন, জী না। তখন তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তোমার মত সৎ, পূণ্যশীল রমণীকে বিবাহ কর। কিন্তু পাঁচ প্রকার মহিলাকে বিবাহ করবে না। হযরত যায়দ (রা) আরয করলেন, ঐ পাঁচজন কে কে ? তিনি বললেন ঃ শাহ্বারাহ্, নাহ্বারাহ, লারাবাহ, হাবদারাহ এবং লাগওয়াত মহিলাদেরকে বিবাহ করবে না। তখন হযরত যায়দ (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যা বললেন ঃ তা আমি কিছুই বুঝিনি। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ (তা হলে শোন) শাহ্বারাহ্ হলো বিড়ালের মত চোখের অধিকারী মোটা মহিলা, নাহ্বারাহ্ হলো হালকা পাতলা লম্বা মহিলা, লাহ্বারাহ হলো কামভাব হারানো বৃদ্ধা মহিলা, হাবদারাহ হলো কুৎসিত আকারের মহিলা, লাগওয়াত হলো, যে নারী পূর্ব স্বামী কর্তৃক সন্তান লাভ করেছে।

শায়বানী বলেন ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) এই হাদীস বর্ণনা করে অনেক্ষণ হাসেন।

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীসে যে পাঁচ প্রকার নারীকে বিবাহ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে,

তা হারাম নয়; বরং নাহী তান্‌যীহ্ (نهى تنزئى) হিসেবে। যেভাবে কুমারী মেয়েদেরকে বিবাহ করার اَمْر বা নির্দেশ মুস্তাহাব কিন্তু ওয়াজিব নয়। কেননা নবী করীম (সা)-এর সম্মানিত স্ত্রীদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা) ব্যতীত সবাই প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা ছিলেন। হযরত সওদা (রা) স্থূলদেহী ও লম্বা ছিলেন এবং হযরত খাদীজা (রা) বৃদ্ধা ছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি আঁ হযরত (সা)-এর সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। ষাট বছরের চেয়ে কিছু বেশি দিন জীবিত ছিলেন এবং নবী করীম (সা)-এর সাথে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। অধিকন্তু হযরত খাদীজা (রা) এবং হযরত উম্মে সালমা (রা) উভয়ই পূর্ববর্তী স্বামীর সন্তান সাথে নিয়ে এসেছিলেন।

بَابُ اِجْتِنَابِ عَنْ نِكَاحِ الْعَقِيْمِ

বন্ধ্যা মহিলাদেরকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা

٢٦١ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَجُلٍ شَامِىٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَنَهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ اَتَاهُ اَيْضًا فَنَهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ اَتَاهُ فَنَهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ قَالَ سَوْدَاءُ وَلُوْدٌ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ حَسْنَاءَ عَاقِرٍ *

হাদীস নং- ২৬১

অনুবাদ ঃ শামদেশের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে এসে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি অমুক মহিলাকে বিবাহ করতে পারি? তিনি তাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেন। এরপর দ্বিতীয়বার লোকটি আসলে তিনি পূর্বের ন্যায় তাকে নিষেধ করেন। অতঃপর তৃতীয়বার লোকটি এসে রাসূলুল্লাহ্‌কে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তিনি এবারও তাকে নিষেধ করেন। এরপর তিনি বললেন ঃ কালো সন্তান জন্মদানকারী মহিলা আমার নিকট সুন্দরী বন্ধ্যা মহিলার থেকে উত্তম ও পসন্দনীয়।

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা) ঐ মহিলা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন যার সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। যদিও সে সুন্দরী ছিল কিন্তু বন্ধ্যা ছিল। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি নিষেধাজ্ঞার কারণ প্রকাশ করে বলেন ঃ আমি কালো সন্তান জন্মদানকারী মহিলাকে সুন্দরী বন্ধ্যা মহিলার উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। এটা ঐ দর্শনের উপর ভিত্তি করে যে, বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হলো বংশধরের স্থায়িত্ব, শুধু কামভাব চরিতার্থ করা নয়। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য দৈহিক সৌন্দর্যের চেয়ে সন্তান জন্মদান করার গুণ অধিক প্রয়োজন।

بَابُ شُوْمِ الْمَرْأَةِ

মহিলাদের অশুভ হওয়া

٢٦٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ تَذَاكَرُ الشُّؤْمِ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الشُّؤْمُ فِىْ الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ فَشُؤْمُ الدَّارِ اَنْ تَكُوْنَ اَضِيْقَةً لَهَا جِيْرَانُ سَوْءٍ وَشُؤْمُ الْفَرَسِ اَنْ تَكُوْنَ جَمُوْحًا وَشُؤْمِ الْمَرْأَةِ اَنْ تَكُوْنَ عَاقِرًا زَادَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانِ سَيِّئَةَ الْخَلْقِ عَاقِرًا -

وَفِىْ رِوَايَةِ اَنْ يَّكُنُ الشُّؤْمُ فِىْ شَىْءٍ فَفِى الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ فَاَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضَيْقُهَا وَاَمَّا الْمَرْأَةِ فَشُؤْمُهَا سُوْءِ خُلْقِهَا وَعَقْرِ رِحْمِهَا وَاِمَّا شُؤْمِ الْفَرَسِ فَاِنَّ تَكُوْنَ جَمُوْحًا *

হাদীস নং- ২৬২

অনুবাদ ঃ হযরত ইবন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে কোন বস্তুর অশুভ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তখন তিনি ইরশাদ করেন ঃ অশুভ হওয়া বিষয়টি ঘর, ঘোড়া এবং নারীর সাথে সম্পৃক্ত। ঘরের অশুভ হলো সংকীর্ণ হওয়া এবং প্রতিবেশী খারাপ বা দুষ্ট প্রকৃতির হওয়া। ঘোড়ার অশুভ হলো তা অবাধ্য হওয়া। নারীর অশুভ হলো সে বন্ধ্যা হওয়া।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, যদি কোন বস্তুর মধ্যে অশুভ থাকে, তবে তা ঘর, নারী এবং ঘোড়ার মধ্যে আছে। ঘরের অশুভ হলো এর সংকীর্ণ হওয়া। নারীর অশুভ হলো সে দুশ্চরিত্রা ও বন্ধ্যা হওয়া। ঘোড়ার অশুভ হলো এর অবাধ্যতা ও মুখে জোর হওয়া।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস দু'টি সিহাহ্ সিত্তাহর (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ) বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত রয়েছে। এরদ্বারা অশুভ বা অমঙ্গলের বিষয়টি ব্যাখ্যার অবকাশ ও সুযোগ রয়েছে। কেননা এ সম্পর্কে বাক্যের পার্থক্যসহ কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে এবং উলামায়ে কিরামেরও এ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ঘর, ঘোড়া ও নারী এ তিন বস্তুর মধ্যে অশুভ ও অমঙ্গল রয়েছে। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র) বর্ণিত প্রথম হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন হাদীসে তা শর্তের সাথে যুক্ত। যেমন দ্বিতীয় হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায়ও উলামায়ে কিরামের মতপার্থক্য রয়েছে।

এ হাদীসে نحو ست বা অমঙ্গলের প্রমাণ রয়েছে। যেমন কোন বস্তুর মধ্যে অমঙ্গল বা অশুভ নেই কিন্তু এই তিনিটির মধ্যে ছাড়া। আবার কারো মতে এ হাদীসের অমঙ্গলের

(نحوست) প্রমাণ নেই। তাদের মত হলো এটা ধারণা বা অনুমানের সাথে যুক্ত। যদি অমঙ্গল হতো, তা হলে এ তিন বস্তুর মধ্যেই হতো। সেহেতু অশুভ বা অমঙ্গল বলতে কিছু নেই। তাই এগুলোর মধ্যে অমঙ্গল ও অশুভতা নেই। এটা সম্পর্কে যেমন বলা হয়েছে ঃ لَوْكَانَ شَئْىٌ سَابِقَ الْقَدْرِ لَسَبَقَه الْعَيْنُ "যদি কোন বস্তু তকদীর ও ভাগ্য থেকে অগ্রগামী হতো, তা হলে বদনজর এর উপর অগ্রগামী হতো।" (কিন্তু যেহেতু কোন বস্তু তাকদীর থেকে অগ্রগামী হতে পারে না, তাই বদনজর ও অগ্রগামী হতে পারবে না)।

ইমাম আরাবী (র) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যদি আল্লাহ তাআ'লা কোন বস্তুর মধ্যে অশুভ বা অমঙ্গল সৃষ্টি করতেন তা হলে এ সমস্ত বস্তুর মধ্যে করতেন। ইমাম মাযেরী (র) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি অশুভ বা অমঙ্গল যথার্থ হতো, তাহলে এ সমস্ত বস্তু এবং এগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে এর অধিকতর দাবিদার বা অধিকারী ছিল। কেননা এগুলো সম্পর্কে অন্তরে অমঙ্গলের ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ অর্থবোধক দুটি বর্ণনার ব্যাখ্যা ঐ হাদীসের দ্বারা হতে পারে যাতে نحوست বা অমঙ্গলের প্রমাণ রয়েছে। যেমন উপর বর্ণিত প্রথম হাদীসে অথবা মুসলিম শরীফে বর্ণিত اِنَّمَا الشُّؤْمُ فِى الثَّلاَثَة (তিনটি বস্তুর মধ্যে অমঙ্গল বিদ্যমান) এবং বুখারী শরীফের বিবাহ অধ্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত اَلشُّؤْمُ فِى الدَّارِ وَالْمَرْأَة وَالْفَرَسِ (গৃহ, নারী ও ঘোড়ার মধ্যে অমঙ্গল রয়েছে) হাদীসের দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

অতঃপর نحوست বা অমঙ্গলের অর্থ কি, এ বিষয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। এর প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থ হলো এই যে, এ তিনটি বস্তু বরকতহীন এবং ধ্বংসের কারণ। অথবা এ তিনটি বস্তু দুঃখ-কষ্ট, দুঃশ্চিন্তা সৃষ্টি এবং পরিনাম খারাপ হওয়ার কারণ। প্রথম ধারণাটি হযরত ইমাম মালিক (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে। আবূ দাউদ শরীফে ইবন কাসিম (র)-এর সূত্রে হযরত ইমাম মালিক (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এমন অনেক ঘর রয়েছে যেখানে মানুষ বসবাস করেছে এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অতঃপর অন্য লোক আগমণ করেছে এবং তারাও ধ্বংস হয়েছে। এরপর বলেছেন, আমাদের নিকট এর ব্যাখ্যা এটাই। তবে তিনি এটাও বলেছেন যে, نحوست বা অমঙ্গল তকদীর বা ভাগ্য দ্বারা তৈরি হয়। এটা নয় যে, তা এর বিপরীত হবে।

পক্ষান্তরে যারা বিপরীত ধারণা পোষণ করেন। তাদের সামনে অন্য বর্ণনাসমূহ রয়েছে যা অমঙ্গলের ব্যাখ্যা করে। এ ব্যাখ্যার মধ্যেও বিভিন্ন বাক্য রয়েছে। এ হাদীসে شؤم -এর যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কারো কারো মতে তা হলো এই যে, ঘোড়ার অমঙ্গলের অর্থ এর উপর জিহাদ করা যাবে না। নারীদের অশুভ ও অমঙ্গল হলো তাদের মাহর অনেক বেশী সাব্যস্ত করা। তিবরানী নামক গ্রন্থে উম্মুল মুমিনীন হযরত আসমা (রা)-এর হাদীস বর্ণিত আছে ঃ اِنَّ مِنْ شَقَاءِ الْمَرْءِ فِى الدُّنْيَا سُوْءُ الدَّارِ وَالْمَرْأَة وَالدَّابَّة "পৃথিবীতে মানুষের দুর্ভাগ্য ঘর, নারী এবং সওয়ারী (আরোহণের জন্তু) মন্দ হওয়া।" এরদ্বারা شؤم -এর আরো অধিক স্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো।

হযরত ইমাম আহমদ (র) হযরত সাদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে মরফূ রেওয়ায়েত করেন ঃ مِنْ سَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحِ وَمِنْ شَقَاءِ ابْنِ اٰدَمَ ثَلٰثَةُ الْمَرْأَةُ السُّوْءِ وَالْمَسْكَنُ السُّوْءِ وَالْمَرْكَبُ السُّوْءِ -

"আদম সন্তান তথা মানুষের সৌভাগ্য তিনটি বস্তুর দ্বারা প্রকাশ হয়ে থাকে। সচ্চরিত্র নারী, আরামদায়ক উপযুক্ত ঘর এবং আরামদায়ক সওয়ারী। আবার মানুষের দুর্ভাগ্য তিনটি বস্তুর মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে থাকে। অসচ্চরিত্র নারী, অশান্তিময় ঘর বা বাড়ি এবং অশান্ত বা অবাধ্য সওয়ারী।"

বলা চলে দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য এ সমস্ত বস্তুর ভালমন্দের মধ্যে নিহিত। যদি এ সব কিছু ভাল হয়, তবে তার ভাগ্য ভাল। সওয়ারী সর্বদা কাজে ব্যবহৃত হয়, যদি তা অক্ষম ও অবাধ্য হয় তবে তা সওয়ারী নয়, বরং এটা হয় তখন বিপদ। মোট কথা সমস্ত তাফসীরের দৃষ্টিকোণ থেকে شؤم -এর প্রয়োগ এমন সব বস্তুর উপর করা হয়েছে, যা মানুষ অপসন্দ করে থাকে এবং তা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ। পরবর্তীতে এটা তাদের জন্য দুশ্চিন্তারও কারণ হয়ে থাকে।

ইরশাদে সারী নামক গ্রন্থে শায়খ তকীউদ্দীন আস-সুব্কী (র) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ এ সমস্ত বস্তুর সাথে نحوست বা অশুভ ও অমঙ্গলকে এভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, এগুলোর পক্ষ থেকে শত্রুতা ও বিশৃংখলার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এজন্য নয় যে, এগুলোর মধ্যে কিছু প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া রয়েছে যা কেউ কেউ মনে করে অথবা তকদীর ও ভাগ্যে এগুলোর অধিকার রয়েছে। কোন আলিমই এর প্রবক্তা নন, বরং এ ধরনের উক্তি শুধু মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা শরীয়ত এরূপ ব্যক্তিকে– যে ভাগ্য তারকা থেকে পানি বর্ষণের বর্ণনাকারী হয়, তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মহিলাদের প্রতি মন্দ বা অনিষ্টতার আরোপ করে, সে ব্যক্তিও ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। অবশ্য এরূপ হতে পারে যে, কোন ঘটনা তকদীর ও ভাগ্যের অনুকূল হয় এবং মানুষ স্বাভাবিকভাবে এর থেকে বিমুখ হয়ে থাকে। তখন মানুষ এটা পরিত্যগ করে থাকে। তবে এ ধারণা করে না যে, এ অনিষ্টতা এগুলো থেকে ছড়িয়ে থাকে।

بَابُ اِسْتِيْذَانِ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ

কুমারী ও প্রাপ্ত বয়স্কা নারীদের বিবাহে তাদের অনুমতি গ্রহণ করা

٢٦٣ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لِفَاطِمَةَ (رض) اَنَّ عَلِيًّا (رض) يَذْكُرُكِ *

হাদীস নং- ২৬৩

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) হযরত

ফাতিমা (রা)-কে বলেন ঃ (হযরত) আলী তোমার কথা আলোচনা করছেন। অর্থাৎ তোমার জন্য বিবাহের পয়গাম পেশ করছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এটা অনুমতি গ্রহণের অত্যন্ত আদব ও ভদ্রজনোচিত পদ্ধতি, যা বিবাহের সংবাদ পৌছানোর সময় অতীব প্রয়োজন। স্পষ্ট ও খোলামেলা বাক্যের দ্বারা জিজ্ঞাসা করা লজ্জা ও পর্দার প্রতিকূল ও বিরোধী ।

٢٦٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ شُيَبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنِ الْمُهَاجِرُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّزَوِّجَ اِحْدٰى بَنَاتِهِ يَقُوْلُ اَنَّ فُلَانَا يَذْكُرُ فَلَانَةً ثُمَّ يُزَوِّجَهَا .

وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا زَوَّجَ اِحْدٰى بَنَاتِهِ اَتَى خِدْرِهَا فَيَقُوْلُ اِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً ثُمَّ يَزَوَّجَهَا .

وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خُطِبَ اِلَيْهِ اِبْنَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ اَتَى خِدْرِهَا فَقَالَ اِنْ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً ثُمَّ ذَهَبَ فَانْكَحَ *

হাদীস নং- ২৬৪

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নিজের কোন কন্যাকে কারো সাথে বিবাহ দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ অমুক ব্যক্তি (নাম উচ্চারণ করে) অমুকের (স্বীয় কন্যার) কথা আলোচনা করছেন। অতঃপর (কন্যার পক্ষ থেকে নীরবতা বা অনুমতি পাওয়ার পর) তার বিবাহ ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পন্ন করতেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) যখন কোন কন্যাকে কারো সাথে বিবাহ প্রদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেন, তখন তাদের পর্দার বা হুজরার নিকট গমন করে বলতেন, অমুক ব্যক্তি অমুকের (স্বীয় কন্যার) নাম স্মরণ করছে। অতঃপর তার বিবাহ ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পন্ন করতেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, যখন নবী করীম (সা)-এর নিকট তাঁর কোন কন্যার ব্যাপারে পয়গাম বা প্রস্তাব আসত, তখন তিনি তাদের হুজরার নিকট গমন করে বলতেন, অমুক ব্যক্তি অমুকের (আমার কন্যার) কথা বলছেন। অতঃপর স্বীয় কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এমনিভাবে স্বীয় কন্যাদের বিবাহ সম্পন্ন করতেন।

٢٦٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَائِشَةَ" زَوَّجَتْ يَتِيْمَةً كَانَتْ عِنْدَهَا فَجَهَّزَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

হাদীস নং- ২৬৫

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত আয়েশা (রা) তাঁর নিকট পালিত এক ইয়াতীম মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তাকে উপহার প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এটা ছিল বিশ্বনবী (সা)-এর করুণা ও দয়ার প্রমাণ। তিনি একজন ইয়াতীম মেয়ের বিবাহের যাবতীয় ব্যয় নিজেই বহন করেন।

بَابُ اِسْتِيْمَارِ الْبِكْرِ وَاِسْتِيْذَانِ الثَّيِّبِ

কুমারী মেয়ের সন্তুষ্টি এবং প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার অনুমতি গ্রহণ

٢٦٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ بِكْرٌ . حَتّٰى تُسْتَأْمَرَ رِضَاهَا سُكُوْتُهَا وَلاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتّٰى تُسْتَأْذَنَ .

وَفِىْ رِوَايَةٍ لاَ تُزَوَّجُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَأْمَرَ رِضَاهَا سُكُوْتُهَا وَلاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتّٰى تُسْتَأْذَنَ .

وَفِىْ رِوَايَةٍ لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَأْذَنَ - وَاِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ اِذْنُهَا وَلاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتّٰى تُسْتَأْذَنَ *

হাদীস নং- ২৬৬

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ কুমারী বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের সম্মতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাকে বিবাহ করা যাবে না এবং তার চুপ বা নীরব থাকাই হলো সম্মতির লক্ষণ। আর প্রাপ্তবয়স্কা নারীকে তার অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত বিবাহ করা যাবে না।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছ, কিশোরীর সম্মতি ব্যতীত বিবাহ করবে না, তার নীরবতাই হলো সম্মতি এবং প্রাপ্ত বয়স্কা নারীকে বিবাহ করবে না যতক্ষণ তার অনুমতি গ্রহণ করা না হয়।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, কিশোরী মেয়ের সম্মতি ব্যতীত তাকে বিবাহ করবে না এবং তার নীরবতাই হলো সম্মতি। প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাকে তার অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত বিবাহ করবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত আছে। একটি বিষয়ে এখানে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরবর্তী হাদীসে বর্ণনা করা হবে।

بَابُ عَدْمِ جَوَازِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ رَضَا الْمَرْأَةِ

সম্মতি ব্যতীত মহিলাদের বিবাহ বৈধ নয়

٢٦٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ امْرَأَةً تُوْفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ جَاءَ عَمُّ وَلَدِهَا فَخَطَبَهَا فَاَبى الاَبُ اَنْ يَزَوِّجَهَا وَزَوَّجَهَا مِنَ الاخَرِ فَاَتَتِ الْمَرْاَةُ النَّبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَبَعَثَ اِلٰى اَبِيْهَا فَحَضَرَ فَقَالَ مَا تَقُوْلُ هٰذَ قَالَ صَدَّقَتْ وَلٰكِنِّى زَوَّجْتُهَا مِمَّنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَزَوَّجَهَا عَمَّ وَلَدِهَا ـ

وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ اَسْمَاءَ خَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا وَرَجُلٌ اٰخَرُ اِلٰى اَبِيْهَا فَزَوَّجَهَا مِنَ الرَّجُلِ فَاَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَتْ ذٰلِكَ اِلَيْهِ فَنَزَعَهَا مِنَ الرَّجُلِ وَزَوَّجَهَا عَمَّ وَلَدِهَا ـ

وَفِى رِوَايَةٍ اَنَّ امْرَأَةً تُوْفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَخَطَبَهَا وَلَدُهَا فَزَوَّجَهَا اَبُوْهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا مِنْ رَجُلٍ اٰخَرَ فَاَتَتِ النَّبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَدَعَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَزَوَّجْتَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا قَالَ زَوَّجْتُهَا مِمَّنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ فَفَرَّقَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهَا وَبَيْنِ زَوْجِهَا وَزَوَّجَهَا مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا ـ

وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ امْرَأَةً تُوْفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَخَطَبَهَا

عَمُّ وَلَدِهَا اِلٰى اَبِيْهَا فَقَالَتْ زَوَّجْنِيْهِ فَاَبٰى وَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِضٰى مِنْهَا۔ فَاَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَه فَسَاَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ ۔ فَقَالَ نَعَمْ زَوَّجْتُهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْ عَمِّ وَلَدِهَا۔ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَزَوَّجَهَا مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا *

হাদীস নং- ২৬৭

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলার স্বামী ইনতিকাল করার পর তার দেবর তার জন্য বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করে। কিন্তু মহিলার পিতা এ বিবাহে সম্মত না হয়ে অপর এক ব্যক্তির সাথে মেয়ের বিবাহ দান করেন। সুতরাং ঐ মহিলা নবী করীম (সা)-এর খেদমত হাযির হয়ে সমস্ত খুলে বলেন। তিনি মহিলার পিতাকে ডেকে পাঠালেন। লোকটি আগমণ করলে তিনি বললেন ঃ এ মহিলা কি বলছে ? তিনি জওয়াবে বললেন, সে সত্য বলছে। কিন্তু আমি তাকে এরূপ ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়েছি যে তার দেবর থেকে উত্তম। তখন হুযূর (সা) ঐ (সদ্য বিবাহিত) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেন এবং ঐ মহিলাকে তার চাচাত ভাই (দেবরের) সাথে বিবাহের (যার সাথে বিবাহে তার অভিপ্রায় ছিল) ব্যবস্থা করেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আসমা নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহের জন্য তার চাচাত ভাই (দেবর) এবং অন্য এক ব্যক্তি তার পিতার নিকট প্রস্তাব করেন। পিতা তার দেবরের পরিবর্তে অপর ব্যক্তির সাথে তাকে বিবাহ দিয়ে দেন। তখন ঐ মহিলা নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। তিনি (সমস্ত কিছু অবগত হয়ে) অপর ব্যক্তির সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করে তাকে তার দেবরের সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, এক মহিলার স্বামী ইনতিকাল করেন। তখন তার দেবর তার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু তার পিতা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপর এক ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ দেন। অতঃপর মহিলা নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমণ করে ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন তিনি মহিলার পিতাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি তোমার মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিয়েছ ? সে বলল, আমি তাকে এমন এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়েছি যে তার দেবরের চেয়েও উত্তম। অতঃপর হুযূর (সা) ঐ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে তার দেবরের সাথে তাকে বিবাহ দিয়ে দেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, এক মহিলার স্বামী ইনতিকাল করে। এই স্বামীর একটি ছেলে সন্তান ছিল। তখন মহিলার দেবর তাকে বিবাহের জন্য মহিলার পিতার নিকট প্রস্তাব পেশ করে। মহিলা এ লোকটির সাথে তাকে বিবাহ দেয়ার জন্য তার পিতাকে বললেন। কিন্তু পিতা এতে সম্মত হলেন না, বরং সে মহিলার (কন্যার) ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য এক ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ দেন। তখন ঐ মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে এসে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি

তার পিতাকে এ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। লোকটি বলল, জ্বি হাঁ, আমি তাকে তার দেবরের চেয়ে উত্তম এক ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিয়েছি। (সব কিছু অবগত হয়ে) হুযূর (সা) ঐ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করে মহিলার (ইচ্ছা অনুযায়ী) তার দেবরের সাথে বিবাহ সম্পন্ন করে দেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে বর্ণিত মাসয়ালা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। হাদীসের মূল বিষয় হলো এই যে, যদি কোন প্রাপ্তবয়স্কা ও বিজ্ঞ মহিলা নিজেই নিজের বিবাহ (পসন্দ অনুযায়ী) করে, তা হলে এটা জায়েয হবে কিনা। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে তা জায়েয হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জায়েয হবে। তবে তাঁর মতে غير كفو বা সমমর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে না হলে অভিভাবকদের ঐ বিবাহে হস্তক্ষেপের অধিকার রয়েছে।

ইমামত্রয়ের সকলেই পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন এবং যুক্তি-তর্ক ও রেওয়ায়েত দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন। কুরআন মজীদের দলীল হলো এই যে, অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে ঃ "فَلاَ تَعْضُلُوْ هُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ

"নারীদেরকে তাদের স্বামীদের সাথে বিবাহের ব্যাপারে বাধা দেবে না।" (২ ঃ ২৩২)

এতে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহের ব্যাপারে অভিভাবকদের অধিকার রয়েছে। যদি তাদের অধিকার বা ক্ষমতা না থাকত, তা হলে বাধা দেয়ার কি অর্থ হতে পারে।

হাদীস দ্বারাও এ বিষয়ে দলীল পেশ করেছেন। এগুলোর মধ্যে আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন মাজাহ এবং তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের মূল বক্তব্য হলো এই যে, যে মহিলা স্বীয় অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত নিজের বিবাহ সম্পন্ন করে, তার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। তিনবার হুযূর (সা) এ বিষয়টি পুনরাবৃত্তি করেছেন। জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি হলো এই যে, বিবাহের কয়েকটি উদ্দেশ্য সামনে রাখা হয়েছে। যেমন একটি হলো, বিবাহের দ্বারা বংশের ক্রমধারা অব্যাহত রাখা। নারী যেহেতু অনেকেই জ্ঞানে অপরিপক্ক এবং পরিণাম ফল সম্পর্কে সাধারণত পরিপক্ক নয়, তাই এ সমস্ত বিষয় ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্বামী-নির্বাচনের বিষয়টি তাদের উপর ছেড়ে দেয়া সঠিক নয়। এটা হলো ইমামত্রয়ের দলীল।

হযরত ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবেও পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং যুক্তি-তর্ক দ্বারা দলীল পেশ করা হয়েছে। যেমন কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য স্বামী গ্রহণ না করে।" (২ ঃ ২৩০)

এ আয়াতে সুস্পষ্ট বাক্যের দ্বারা বিবাহের বিষয়টি নারীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেন নারী এ ব্যাপারে স্বাধীন ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বস্তুত এখানে নারীকে বিবাহ কার্যক্রমের (فعل نكاح) কর্ত্রী নির্ধারণ করা হয়েছে। অথবা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وَاَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ অথবা বলা হয়েছে ঃ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ "তোমাদের উপর এ বিষয়ে কোন গুনাহ্ নেই যা তারা (নারীরা) নিজেদের জন্য করে।" (২ ঃ ২৩৪)।

এ সমস্ত আয়াতে বিবাহের বিষয়টি নারীদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এতে তাদের অধিকারের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে। বর্ণিত হাদীসে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, হুযূর (সা) বিবাহ বাতিল করেছেন এবং উভয়কে পৃথক করে দিয়েছেন।

মোল্লা আলী ক্বারী (র) এ হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন, ইবন কাত্তান বলেছেন যে, হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত এ হাদীস সহীহ এবং ঐ মহিলা ছিল খানসা বিনত খিযাম (রা)। বুখারী শরীফে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কেননা এ মহিলা (খানসা) প্রাপ্তবয়স্কা (ثيبه) ছিল, বরং কেউ কেউ খানসাকে কুমারী বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা বলেও উল্লেখ করেছেন। নাসাঈ শরীফের হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অথবা বুখারী শরীফের হাদীস স্বীয় স্থানে সহীহ ও সঠিক এবং ঘটনা ছিল বিভিন্ন। সুতরাং দারে কুতনী (دار قطنى) হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্ত বয়স্কার (باكره وثيبه) বিবাহ বাতিল করেছেন। মোট কথা এ সমস্ত রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার হাতেই তার বিবাহের পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

দ্বিতীয়ত হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে হযরত ইবন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত মরফূ হাদীস রয়েছে। একই বাক্যে মুসলিম শরীফে ও অন্যান্য গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণিত আছে যে, اَلاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِىْ نَفْسِهَا "অবিবাহিতা মহিলা নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে বেশি অধিকার রাখে এবং একজন অপ্রাপ্ত বয়স্কা তার নিজের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করবে।" এ হাদীসে ايم শব্দটি অভিধানের দৃষ্টিতে প্রত্যেক ঐ মহিলার ব্যাপারে প্রয়োগ হয়ে থাকে, যার স্বামী নেই। সে অপ্রাপ্ত হোক কিংবা প্রাপ্তবয়স্কা, সে তালাকপ্রাপ্তা হোক অথবা বিধবা। যখন এর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই, তাহলে অপ্রাপ্ত বা (باكره) বাকেরার বিপরীতে এর রূপক অর্থ (ثيبه) (প্রাপ্তবয়স্কা) কেন গ্রহণ করা হবে? যেমন হযরত ইমাম শাফিঈ (র) এমত পেশ করেছেন।

মোট কথা অভিভাকের বিবাহ পড়ানোর যে অধিকার রয়েছে, এতে এটাও সংযুক্ত রয়েছে। একটি অকাট্য দলীল স্বয়ং হযরত (সা)-এর বাস্তব জীবনে রয়েছে। যখন হযরত উম্মে সালমা (রা) বিবাহের সময় বললেন, হুযূর ! আমার কোন অভিভাবক নেই। তখন নবী করীম (সা) বললেন, উপস্থিত বা অনুপস্থিত তোমার এমন কোন অভিভাবক নেই যিনি তোমার এ কাজ অপসন্দ করবে। এটা বলে তিনি উমর ইবন আবি সালমা (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, যিনি ঐ সময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন এবং অভিভাবক হওয়ার যোগ্য ছিলেন না। কিন্তু তিনিই বিবাহের কাজ সম্পন্ন করেন। যদি বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য অভিভাবকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হতো, তা হলে হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর বিবাহ কিভাবে সঠিক হলো ? সুতরাং এ সমস্ত যথার্থ ও যুক্তিসম্মত দলীলের দৃষ্টিকোণ থেকে হানাফী মাযহাব অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

এবার অন্যান্য মাযহাবের জওয়াব পেশ করা হলো। পবিত্র কুরআনের আয়াতে তাদের উপলব্ধির কিছু ত্রুটি রয়েছে। কেননা এত অভিভাবকের (اولياء) প্রতি নির্দেশ নয়, বরং স্বামীর প্রতি নির্দেশ রয়েছে। কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেছেন, وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ "যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দত পূরণ করতে দাও।" (২ ঃ ২৩২) সুতরাং এখানে اَوْلِيَاء অর্থ গ্রহণ করা কুরআনের স্পষ্ট বিরোধিতা করা হয়। হাদীসের ব্যাপারেও এটা বলা যায় যে, উভয় হাদীস সনদের দৃষ্টিতে সংশয়পূর্ণ। হযরত ইমাম যুহরীর সূত্রে স্বয়ং ইমাম তিরমিযী হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দুর্বল

(ضعيف) বলে ইঙ্গিত করেছেন। এ হাদীসে সুলায়মান ইবন মূসা নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যাকে ইমাম বুখারী (র) ضعف (দুর্বল) বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম নাসাঈ (র) বলেছেন, এ হাদীসে দুর্বলতা রয়েছে। এমনিভাবে আবূ মূসা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম সমালোচনা করেছেন। এ সমস্ত হাদীসের বিপরীতে হানাফী ইমামগণের পেশকৃত হাদীস নির্ভরশীল ও সহীহ।

এবার তাদের কিয়াস বা যুক্তির জওয়াব হলো এই যে, ভোগ-দখল ও ব্যবহারের মধ্যে অধিকারের ক্ষমতা বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার উপর নির্ভরশীল। কেননা বালেগ হওয়ার পর মানুষ তার যাবতীয় কার্যক্রম ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে। তবে সমগোত্র (غير كفو) না হলে সেখানে নারীদের অপকৌশলের আশংকা থাকে, তাই এখানে অভিভাবকের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রয়েছে।

بَابُ امْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا

কোন মহিলাকে তার ফুফু বা খালার সাথে এক সাথে বিবাহ করা নিষেধ

٢٦٨ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِى عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا.*

হাদীস নং- ২৬৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ কোন মহিলাকে তার ফুফু বা খালার সাথে (একত্রে) বিবাহ করবে না।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার এ আদেশের মধ্যে মূল উদ্দেশ্য ও কল্যাণকর দিক হলো এই যে, ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা (قطع رحم) সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং এর উপর কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যদি একজন মহিলাকে তার ফুফু অথবা খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা হয়, তা হলে এটা হবে সব সময়ের জন্য তাদের আত্মীয়তাকে ছিন্ন করা এবং চিরদিনের জন্য শত্রুতার বীজ বপন করে দেয়া। কেননা সতীন হওয়ার কারণে পরস্পর আত্মীয়তার মূল বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, এটাই স্বাভাবিক।

তাবারীর রেওয়ায়েতে এ হাদীসের সাথে আরো কিছু অতিরিক্ত বাক্য রয়েছে যাতে এ নির্দেশের কারণ আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ فَاِنَّكُمْ اِذَا فَعَلْتُمْ ذَالِكَ فَقَدْ قَطَعْتُمْ اَرْحَامَكُمْ "কেননা যখন তোমরা এরূপ করবে, তখন তোমরা যেন তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলে।" পিতামহ ও প্রপিতামহের বোন এবং পিতামহী ও

প্রপিতামহীর বোনও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত। উলামায়ে কিরাম এজন্য একটি সূত্র বের করেছেন যে, এরূপ দু'জন মহিলাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম যাদের একজনকে যদি পুরুষ মনে করা হয় তাহলে উভয়ের বিবাহ হারাম হবে। দুধ-মাতার সম্পর্কে ফুফু ও খালাও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

٢٦٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الشَّعْبِىْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلٰى خَالَتِهَا وَلاَتُنْكَحُ الْكُبْرٰى عَلَى الصُّغْرٰى وَلاَ الصُّغْرٰى عَلَى الْكُبْرٰى *

হাদীস নং- ২৬৯

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ কোন মহিলাকে তার ফুফু ও খালার সাথে একত্রে বিবাহ করো না এবং অধিক বয়স্কার সাথে অল্প বয়স্কা ও অল্প বয়স্কার সাথে অধিক বয়স্কাকে বিবাহ করো না।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস সাহাবা, তাবেঈন এবং তাবে-তাবেঈনের মাধ্যমে প্রচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে। উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন (جليل القدر) সাহাবা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এরদ্বারা কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন মজীদের উপর পরিবর্ধন করা জায়েয। যেমন ঃ واحل لكم ماوراء ذلكم (তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এগুলোর ব্যতিক্রম যা কিছু আছে)। (৪ ঃ ২৪) এর সার্বজনীনতার মধ্যে এ হাদীস দ্বারা সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া যায়। সর্বোপরি উপরোক্ত আয়াতের সার্বজনীনতা মুশরিক, মজূসী বা অগ্নি উপাসক ও অন্যান্য থেকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু এটা হলো ظنى বা ধারণা ও অনুমাননির্ভর হাদীস। সুতরাং এ হাদীস যদি خبر واحد হতো, তবুও এরদ্বারা নির্দিষ্ট করা যেত। তবে এ হাদীস হলো مشهور বা অধিক শক্তিশালী।

بَابُ حُرْمَةُ الْمُتْعَةِ

মুত'আ বিবাহ হারাম

٢٧٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ *

হাদীস নং- ২৭০

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) মুত'আ (বিবাহ) থেকে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ মুত'আর (متعه) অর্থ হলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু অর্থের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করা। এ জন্য একে মুত'আ বলা হয় যে, এতে শুধু উপভোগ ও সময়মত ফায়দা হাসিল করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু বিবাহের জন্য উদ্দেশ্য, যেমন বংশ বিস্তার ও পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি উদ্দেশ্য থাকে না– যা প্রচলিত বৈধ বিবাহে হয়ে থাকে।

٢٧١ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ *

হাদীস নং- ২৭১

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বর যুদ্ধের দিন মুত'আ (বিবাহ) নিষেধ করে দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসেও এরূপ (নিষেধাজ্ঞার কথা) উল্লেখ রয়েছে। আবূ দাউদ শরীফ ব্যতীত বাকী পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এতে (মুত'আর নিষেধাজ্ঞার সাথে) গাধার গোশত খাওয়ার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে।

٢٧٢ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ *

হাদীস নং- ২৭২

অনুবাদ ঃ হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) নারীদের সাথে মুত'আ বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ মুত'আ কখন হালাল হয়েছে এবং কখন হারাম হয়েছে এ ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হবে।

٢٧٣ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اٰلِ سَبْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ – وَفِى رِوَايَةٍ عَامَ الْفَتْحِ *

হাদীস নং- ২৭৩

অনুবাদ ঃ সায়রার অধিবাসী এক ব্যক্তি (আবূ দাউদের বর্ণনামতে এ ব্যক্তি হলো রবী ইব্ন মাবরা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) মক্কা বিজয়ের দিন নারীদের সাথে মুত'আ বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, মক্কা বিজয়ের বছর।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে মুত'আতুন নিসা (متعة نساء) বলে মুত'আয়ে হজ্জ বা হজ্জে তামাত্তু থেকে পৃথক করা হয়েছে। কেননা এর উপর متعه শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

٢٧٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ سَبُرَةَ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْحَجِّ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ *

হাদীস নং- ২৭৪

অনুবাদ ঃ হযরত সাবুরা জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন নারীদের সাথে মুত'আ বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, হজ্জের বছর তিনি মুত'আ বিবাহ নিষেধ করে দিয়েছেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন মুত'আ বিবাহ নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন যুদ্ধে মুজাহিদগণ (জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য) হুযূর (সা)-এর নিকট খাসী হয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন তিনি তাদেরকে এ কাজ থেকে বাধা প্রদান করেন এবং মুত'আ বিবাহের জন্য অনুমতি প্রদান করেন। অবশ্য পরবর্তীতে চিরদিনের জন্য মুত'আ বিবাহ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এখনও মুসলিম উম্মাহ এর উপর একমত রয়েছে। কিন্তু এতে শীআ সম্প্রদায়ের মতানৈক্য রয়েছে, তারা এখনো মুত'আ বিবাহকে বৈধ মনে করে থাকে।

সাহাবাদের মধ্যে কিছুদিন এটা নিয়ে মতানৈক্য ছিল। তবে অধিকাংশই এটা হারাম হওয়ার পক্ষেই মত পোষণ করেন। অতঃপর হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম মুত'আ বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। এরপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কারো এ বিষয়ে কোন কথা বলার আর সুযোগ নেই। নবী করীম (সা)-এর যুগে মুত'আ বিবাহ হালাল ও হারাম হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে। কারো কারো মতে এটা দু'থেকে অধিকবার হালাল ও হারাম হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাত্র দু'বার হালাল হয়েছিল এবং দু'বারই হারাম হয়েছে। অতঃপর যখন শেষবারে হারাম হয়, তখন অনন্তকালের জন্য হারাম হয়ে যায়। অর্থাৎ খায়বার যুদ্ধের পূর্বে এটা হালাল ছিল এবং খায়বারের দিনই এটা হারাম হয়। মক্কা বিজয়ের দিন হালাল হয় এবং এর তিন দিন পর চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যায়। বিদায় হজ্জের দিন পূর্ববর্তী বিষয়টিই পুনরায় ঘোষণা করা হয়েছে। এটা নয় যে, সে দিন এ বিষয়টিকে নতুনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বরং পূর্বের সাব্যস্তকৃত হারাম হওয়ার কথাটিকে সাধারণ জনতার সামনে চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত ইবন আব্বাস (রা), হযরত জাবির (রা) সহ আরো কয়জনের এ ব্যাপারে কিছুদিন মতানৈক্য ছিল। কিন্তু পরে হযরত ইবন্ আব্বাস (রা) তাঁর মত পরিবর্তন করেন। সুতরাং তিরমিযীর এক বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নিজেই বলেছেন, ইসলামের প্রথমদিকে মানুষ এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। কেউ হয়তো একটি নতুন শহরে আগমণ করতো। সেখানে তার কেউ পরিচিত থাকত না। তখন সে ঐ জায়গায় কিছুদিনের জন্য এক মহিলাকে বিবাহ করতো। অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতো, ঐ মহিলা তার আসবাবপত্র সংরক্ষণ করতো। কিন্তু যখন পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ (তবে তাদের স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত) (২৩ ঃ ৬) নাযিল হয়, তখন হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এখন থেকে এদেরকে ব্যতীত অন্য সমস্ত মহিলা হারাম হয়ে যায়। জাবির ইবন যায়দ আবুশ শাসা (রা) বর্ণনা করেন, যে হযরত ইবন আব্বাস (রা) মৃত্যুর পূর্বে দুটি বিষয় থেকে স্বীয় মত পরিবর্তন করেন। এক হল بيع صرف বা মুদ্রার বিনিময় আর দ্বিতীয়টি হল نكاح متعة বা মুত'আ বিবাহ।

হযরত জাবির (রা)-এর ঘটনা হলো এই যে, ইবন আবদুল বার (রা) বর্ণনা করেন, হযরত জাবির (রা) বলেছেন, আমরা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত মুত'আ বিবাহ করেছি। অতঃপর তিনি লোকদেরকে এটা থেকে নিষেধ করেছেন। মনে হয়, কোন কোন সাহাবার কাছে হারাম হওয়ার হাদীস না পৌছার কারণে তখনো কিছু সন্দেহ বাকী থেকে যায়। কিন্তু হযরত উমর (রা)-এর ঘোষণার পর হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আর বাকী থাকে নি। এটা নয় যে, হযরত উমর (রা) স্বীয় খিলাফতকালে এটা নিজের মত অনুযায়ী হারাম করেছেন। বস্তুত যে সমস্ত সহীহ হাদীস মুতাওয়াতির-এর সীমা পর্যন্ত পৌছেছে, এগুলো সবই মুত'আ হারাম হওয়ার দলীল ও প্রমাণ এবং এটা হালাল না হওয়াকেই প্রমাণ করে। যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীস বিভিন্ন সাহাবা থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে অথবা সাবুরা ইবন মা'বাদুল জুহানী (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যা মুসলিম শরীফ সহ অন্যান্য সুনান গ্রন্থে একই বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো ঃ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ اَلاَ اِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "নবী করীম (সা) মুত'আ বিবাহ থেকে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ সাবধান! এটা আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য হারাম করা হয়েছে।"

এটা ছিল মক্কা বিজয়ের দিনের সর্বশেষ কোন বিষয়ের হারাম হওয়ার নির্দেশ। অথবা তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীস, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বরের সময় নারীদের সাথে মুত'আ বিবাহ এবং গাধার গোশত খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এটা প্রমাণিত হলো যে, কিয়ামত পর্যন্ত মুত'আ বিবাহ হারাম হওয়ার নির্দেশ জারী থাকবে। এটা বিশেষ ওজর ও অবস্থার প্রেক্ষিতে হালাল করা হয়েছিল। যেমন একদিকে মুজাহিদগণের পরিবার থেকে নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা, প্রাকৃতিক চাহিদা, অন্যদিকে সফরের আসবাবপত্রবিহীন ও জিহাদের নিমগ্নতা ইত্যাদি কারণে এ সুযোগ দেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। সুতরাং হুযূর (সা) এ অবস্থার প্রেক্ষিতে একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য এ সুযোগ প্রদান করেছেন। এটা নয় যে, এখনো স্বীয় দেশে বাস করে উক্ত নির্দেশের প্রেক্ষাপটে কামভাব চরিতার্থ করার জন্য একটি অবৈধ কাজের পথ উন্মুক্ত

করা যাবে এবং শরীয়তের আড়ালে এর স্বাধীনতা দেয়া যাবে। সুতরাং হাযেমী একই বিষয় সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন যে, নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে স্বীয় ঘর ও দেশে বসবাসের সময় এর অনুমতি দান করেননি, বরং অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুযায়ী অনুমতি দিয়েছিলেন। অতঃপর বিদায় হজ্জের সময় তা অনন্তকালের জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। এখন শুধু শীআ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কারো নিকট এটা হারাম হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এখন মুত'আ সম্পূর্ণ হারাম এবং এটা যে হালাল মনে করবে, সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের নাফরমান ও অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে।

٢٧٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزْوَةِ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ *

হাদীস নং- ২৭৫

অনুবাদ ঃ হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বরের যুদ্ধের বছর পালিত গাধার গোশত খাওয়া এবং নারীদের সাথে মুত'আ বিবাহ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

بَابُ الْعَزْلِ

আযলের বর্ণনা

٢٧٦ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ (رضـ) سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اَنَّ شَيْئًا اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَهُ اِسْتَوْدَعَ صَخْرَةً لَخَرَجَ *

হাদীস নং- ২৭৬

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা)-এর নিকট আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন বস্তুর প্রকাশের অঙ্গীকার করেন যা পাথরের মধ্যে লুক্কায়িত আছে, তা হলে নিশ্চয়ই এটাও বের হয়ে পড়বে বা প্রকাশ হবে (অর্থাৎ আযল দ্বারা কোন ফায়দা হবে না বা প্রতিরোধ করা যাবে না)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আহমদ হযরত আনাস (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যদি তোমরা ঐ পানি যা দ্বারা শিশুর জন্ম হয়, তা কোন কংকরময় স্থানে রেখে দাও, তা হলেও আল্লাহ্ তা'আলা এর থেকে মানব শিশু জন্মের ব্যবস্থা করবেন।

আযল বলা হয় নারীদের সাথে মিলনের সময় বীর্য নির্গত হওয়ার প্রাক্কালে পুরুষাঙ্গ যোনী থেকে বের করে বীর্য বাইরে ফেলে দেয়া বা বের করা।

আযলের মাসয়ালা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক (র) ও ইমাম শাফিঈ (র)-এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে আযাদ ও স্বাধীন নারীর অনুমতি ব্যতীত আযল করা মাকরূহ। বিবাহিত বাঁদীর মনিবের অনুমতি ব্যতীত ও নিজ বাঁদীর অনুমতি ব্যতীত আযল জায়েয মনে করেন।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে মাকরূহ ছাড়াই সব কটি ক্ষেত্রে আযল জায়েয। তবে সন্তান থেকে পরিত্রাণলাভের উদ্দেশ্যে হলে তাঁর মতেও আযল করা মাকরূহ। তিনি বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত জাবির (রা)-এর হাদীস দ্বারা তাঁর যুক্তি পেশ করেছেন। كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ ("আমরা আযল করতাম এবং তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল)।" অর্থাৎ কুরআন নাযিল হওয়ার যুগেও আমরা আযল করেছি।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র) কয়েকটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। ইবন আবি শায়বা (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ تُسْتَاْمَرُ الْحُرَّةُ وَتُعْزَلُ عَنِ الاَمَةِ ("আযাদ মহিলা থেকে অনুমতি নিতে হবে এবং বাঁদীর সাথে আযল করা যাবে)।" আবদুর রাযযাক এবং ইমাম বায়হাকী (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ نَهٰى عَنْ عَزْلِ الْحُرَّةِ الاَّ بِاِذْنِهَا [রাসূলুল্লাহ (সা) আযাদ মহিলার অনুমতি ব্যতীত আযল করা থেকে নিষেধ করেছেন]। "ইমাম বায়হাকী হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি স্বীয় বাঁদীর সাথে আযল করতেন এবং আযাদ মহিলা থেকে অনুমতি গ্রহণ করতেন।

ইমাম ইবন্ মাজাহ হযরত আবদুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَعْزِلَ عَنِ الْحُرَّةِ الاَّ بِاِذْنِهَا "রাসূলুল্লাহ (সা) আযাদ মহিলার অনুমতি ব্যতীত আযল থেকে নিষেধ করেছেন।"

এখানে হানাফী মাযহাবের যুক্তি হলো এই যে, যৌন সংসর্গ মূলত নারীদের অধিকার এবং বাহ্যত যৌন সংসর্গে এটাকেই মান্য করা হয় যাতে আযল করা না হয়। সুতরাং যদি আযলের প্রয়োজন হয়, তা হলে নারীর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। মুসলিম শরীফে জুযামার হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আযল وأد خفى বা সূক্ষ্মভাবে জীবিতকে দাফন করা। সুতরাং এ আযল মহিলাদের ব্যাপারে (অনুমতি সাপেক্ষে) প্রযোজ্য হবে। কেননা যৌন সংসর্গের প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর উপর হয়ে থাকে।

بَابُ اِتْيَانِ النِّسَاءِ بِاَيِّ جِهَةٍ كَانَ

যে দিক থেকে ইচ্ছা নারীদের সাথে সহবাস করা জায়েয

٢٧٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ يُوْسُفَ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ

حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتْهَا فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجِيْ يَأْتِنِيْ مُجْنِيَةً وَمُسْتَقْبِلَةً فَكَرِهْتُهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَابَأْسَ اِذَا كَانَ فِيْ صِمَامٍ وَاحِدٍ *

হাদীস নং- ২৭৭

অনুবাদ ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা তাঁর নিকট আগমণ করে বলল, আমার স্বামী আমার সম্মুখে ও পিছন দিক থেকে (সহবাসের সময়) মিলিত হয়ে থাকে, কিন্তু এটা আমি অপসন্দ করি। এ ঘটনা নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ এতে কোন অসুবিধা নেই যদি স্থান একটিই হয়।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে নারীদের সাথে সব দিক থেকে মিলনের (সহবাসের) অনুমতি প্রদান করা হয়েছে যদি সহবাসের স্থান একটি হয়, তবে পিছন দিক যাতে না হয় (অর্থাৎ মলত্যাগের স্থান যাতে না হয়)। তিবরানীতে উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমণ করে বসবাস করতে থাকেন, তখন তাঁরা ইচ্ছা পোষণ করলেন যে, তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের সাথে পিছন দিক থেকে তাদের যোনিপথে সঙ্গম করবেন। কিন্তু তাদের স্ত্রীগণ এতে সম্মত হননি এবং হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর নিকট এসে এ বিষয়ে সমাধান দানের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি হযরত (সা)-এর নিকট বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি পবিত্র কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্রের মত, সুতরাং যেদিক থেকে ইচ্ছা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন কর।" (২ ঃ ২২৩) বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, ইয়াহূদীগণ বলে থাকে যে, যারা স্বীয় স্ত্রীদের পিছন দিক থেকে সঙ্গম করে, তাদের সন্তান টেরা চক্ষুবিশিষ্ট হয়ে থাকে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ الاية ।

بَابُ حُرْمَةِ الْوَطِيِّ الْمَرْأَةَ فِيْ دُبُرِهَا

মহিলাদের মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম

٢٧٨ – حَمَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيْتَانُ النِّسَاءِ نَحْوَ الْحَاشِ حَرَامٌ *

হাদীস নং- ২৭৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ যর (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ মহিলাদের মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের দ্বারা মহিলাদের মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম করা হয়েছে। পরবর্তী হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ব্যবহারিক ও যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকেও এ কাজ অত্যন্ত অশ্লীল ও অপসন্দনীয়। প্রত্যেক সুস্থ ও বিবেকবান মানুষ এটাকে ঘৃণা করে থাকে এবং কদর্যপূর্ণ ও স্বাদহীন মনে করে থাকে। আল্লামা ইবন কায়্যিম (র) এর অনিষ্টকর দিকগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে কিছু এখানে উল্লেখ করা হলো। এরদ্বারা প্রতীয়মান হবে যে, এটা কিরূপ গর্হিত কাজ।

প্রথমতঃ এটা ময়লা ও দূর্গন্ধময় বস্তু বের হওয়ার স্থান। সঙ্গমের স্বাদ আস্বাদনের সাথে এ ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুর সম্পর্ক তো দূরের কথা, এ অবস্থা থেকে মানুষ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাই তালাশ করে থাকে। শরীয়তের নির্দেশ ছাড়াও প্রত্যেক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র ব্যক্তি স্বভাবগতভাবেই এর থেকে মুক্ত থাকতে চায়। এ কারণেই ঋতুবতী মহিলার সাথে সঙ্গম করা হারাম করা হয়েছে। কেননা কদর্য ও ময়লা বস্তু বের হওয়া কে পসন্দ করবে ?

দ্বিতীয়তঃ সঙ্গম পুরুষের উপর নারীর একটি অধিকার, যা আদায় করা ওয়াজিব। এ অবস্থায় ঐ অধিকার বিনষ্ট হয়ে থাকে।

তৃতীয়তঃ প্রকৃতি এ স্থান ঐ কাজের জন্য তৈরি করেনি। সুতরাং এ কাজে অগ্রগামী বা উদ্বুদ্ধ হওয়া স্রষ্টার সৃষ্টির সাথে বিরুদ্ধাচরণ করারই নামান্তর।

চতুর্থতঃ চিকিৎসকদের মতামত হলো এই যে, মলদ্বারে সঙ্গম করা পুরুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কেননা যোনীর মধ্যে এক আকর্ষণ রয়েছে যা পুরুষাঙ্গ থেকে বীর্য শোষণ করে নেয়, এটা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক ও শান্তির কারণ হয়ে থাকে। অপরপক্ষে মলদ্বারের এ বৈশিষ্ট্য নেই। এতে কিছু বের করার ক্ষমতা আছে কিন্তু আকর্ষণ ও শোষণের ক্ষমতা নেই। তাই এ অবস্থায় বীর্যের কিছু অংশ পুরুষাঙ্গের ভিতর থেকে যায়– যা অনেক রোগের কারণ হয়ে থাকে এবং স্বভাব ও চরিত্রের অনিষ্টের কারণ হয়ে থাকে।

পঞ্চমতঃ এ অবস্থায় শিরার উপর অস্বাভাবিক জোর পড়ে থাকে যা শিরার জন্য ক্ষতিকর।

এ ছাড়াও আরো অনেক অনিষ্টতা রয়েছে। সুতরাং এ সমস্ত অনিষ্টের দিকে লক্ষ্য রেখেই শরীয়ত এ কুকর্মের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

٢٧٩ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَعْنٍ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ اَبِىْ اَعْرِفُهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ نُهِيْنَا اَنْ نَأْتِىَ فِىْ مُحَاشِهِنَّ *

হাদীস নং- ২৭৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন, মহিলাদের মলদ্বারে সঙ্গম করার ব্যাপারে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

ব্যাখা ঃ সহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম। এর উপর শরীয়তের কঠোর হুশিয়ারী ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে। কখনো এটাকে ছোট ধরনের লাওয়াতাত বলা হয়েছে। সুতরাং সুনানে আহমদ ও তাহাভীতে আমর ইব্ন শুআয়ব (রা) সূত্রে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা)-এর নিকট এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে মহিলাদের মলদ্বারে সঙ্গম করে থাকে। তখন তিনি বলেন ঃ এটা এক প্রকার মৈথুন। ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ ও

নাসাঈ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন ঃ مَلْعُوْنٌ مَنْ اَتٰى امْرَأَةً فِىْ دُبُرِهَا (যে মহিলাদের মলদ্বারে সঙ্গম করে, সে অভিশপ্ত)। যে মহিলাদের মলদ্বারে সঙ্গম করেছে অথবা যে গণকের কাছে গমন করে এবং এর সত্যতা প্রমাণ করে, তবে সে ঐ বস্তুর সাথে কুফরী করে যা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে (অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের উপর)। সিহাহ-সিত্তাহ গ্রন্থে এ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে ঃ لَايَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى رَجُلٍ اَتٰى امْرَأَةً فِىْ دُبُرِهَا (আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না, যে তার স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করেছে)।

এ সমস্ত হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রায় সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম এ কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

সাহাবীগণের মধ্যে হযরত ইবন উমর (রা) অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। সুতরাং বুখারী শরীফে কুরআন মজীদের আয়াত فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ -এর তাফসীরে হযরত ইবন উমর (রা) থেকে তাফসীরে বর্ণিত আছে ঃ يَأْتِهَا فِىْ دُبُرِهَا এবং তিবরানীতেও এর ব্যাখ্যা রয়েছে। ইমামগণের মধ্যে ইমাম মালিক-এর মাযহাবও এটা এবং তিনি এটা জায়েয মনে করেন। কিন্তু চূড়ান্ত নীরিক্ষায় দেখা যায় যে, হযরত ইবন উমর (রা)-ও এটা হারাম জানতেন। তাই ইমাম বুখারী (র)-এর রচিত ইতিহাস গ্রন্থ কিতাবুল কুনায় এবং ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবন উমর (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ قبلا ودبرا فى المأتى وحده لاغير "আগে-পিছে যেদিক থেকে ইচ্ছা হোক না কেন, কিন্তু স্থান একটি (যোনী) হতে হবে, অন্য কোন স্থান হবে না।"

সুতরাং এটা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর সঠিক মাযহাব হলো এই যে, মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম। ইমাম মালিক (র) সম্পর্কেও পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, অবশেষে তিনিও বিষয়টি হারাম হওয়ার ব্যাপারে তাঁর মতামত পেশ করেছেন। খতীব বাগদাদী ইসরাঈল ইবন রূহ (র)-এর সূত্রে এক রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আমি ইমাম মালিক (র)-এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন حَرْثٌ হলে কৃষির জায়গা, সুতরাং জননেন্দ্রীয় (যোনী) থেকে বাইরে না যাওয়া। এবার তিনি বলেন, হে আবূ আবদুল্লাহ (ইমাম মালিক)! লোকজন বলে থাকে যে, আপনি এটা জায়েয বলে মত পোষণ করেন। তখন ইমাম মালিক (র) বলেন, তারা আমার উপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে থাকে। সুতরাং এটা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত রেওয়ায়েতের উপর নির্ভর করে তাঁর পুরাতন ছাত্রগণ এটা হারাম হওয়ার পক্ষে তাঁর মাযহাব নির্ধারণ করেন। তাই আল্লামা ইবন কায়্যিম অত্যন্ত নির্ভরতার সাথে বলেছেন, এখন وطى فى الدبر -এর পক্ষে মত পোষণকারী কেউ নেই এবং যারা পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম থেকে এ রেওয়ায়েত করেছেন, তারা ধোকার মধ্যে রয়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনায় এটাও উল্লেখ্য যে, নারী তার স্বামীর এবং স্বামী তার স্ত্রীর গোপন অঙ্গ দেখতে পারবে কি না ? এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো এই যে, এটা বৈধ, হারাম নয়। কেননা ইবন সাদ তাবাকাতে, তিবারানী কবীরে সাদ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ اِنَّ اللّٰهِ تَعَالٰى جَعَلَهَا لَكَ لِبَاسًا وَجَعَلَكَ لَهَا لِبَاسًا

وَاَهْلِىْ يَرَوْنَ عَوْرَتِىْ وَاَنَا اَرٰى ذٰلِكَ مِنْهُنَّ (নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমার স্ত্রীকে তোমার জন্য পোশাক স্বরূপ বানিয়েছেন এবং তোমাকেও তার জন্য পোশাক স্বরূপ বানিয়েছেন। আমার স্ত্রীগণ আমার গোপন অঙ্গ প্রত্যক্ষ করে এবং আমিও তাদের গোপন অঙ্গ প্রত্যক্ষ করি)। এতে পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাক স্বরূপ)। এমনিভাবে সুনানে আরবাআর মধ্যে বাহ্য ইব্ন হাকীম (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, মুআবিয়া ইবন হায়দা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ احْفَظْ عَوْرَتِكَ الاَّمِنْ زَوْجَتِكَ اَوْمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ (স্বীয় গোপন অঙ্গ তোমার স্ত্রী ও তোমার দাসী ছাড়া অন্য সবার থেকে হিফাযত কর)।

অবশ্য উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে এর বিপরীত প্রমাণও রয়েছে। তিনি বলেছেন, তিনি আঁ হযরত (সা)-এর গোপন অঙ্গ দেখেননি। তাই সঙ্গমের সময় স্ত্রীর গোপন অঙ্গ প্রত্যক্ষ করা সঙ্গমের আদব বিরোধী বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। ইবন আদী হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন তার স্ত্রী বা দাসীর সাথে সঙ্গম করবে, তখন যেন তার গোপন অঙ্গ প্রত্যক্ষ না করে। কেননা এতে চোখের জ্যোতি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। মোট কথা শরীয়তে সাধারণভাবে এটা জায়েয আছে এবং কুরআনের আয়াতেও এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। তবে আদব এটাই, যা উপরে বলা হয়েছে।

٢٨٠ - حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنْ اَبِى الْقَعْقَاعِ الْخُشَنِىِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ حَرَامٌ اَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِى الْمُحَاشِ.

হাদীস নং- ২৮০

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নারীদের মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম।

ব্যাখা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

بَابُ النَّسْبِ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ

বংশ (সন্তান) বিছানায় অবস্থানকারীর জন্য

٢٨١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ *

হাদীস নং- ২৮১

অনুবাদ ঃ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ নবজাত সন্তান বিছানার মালিকের অর্থাৎ স্বামীর এবং যিনাকারীর জন্য পাথর।

ব্যাখ্যা ঃ ফিরাশ (فراش) বিবাহিত স্ত্রী অথবা ক্রীতদাসী। এদেরকে এজন্য فراش বলা হয় যে, যৌন সম্ভোগের জন্য তাদেরকে শোয়ানো হয়ে থাকে। এখানে فراش -এর অর্থ এ দুটো নয় যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়, বরং এখানে صاحب فراش -এর অর্থ স্বামী অথবা প্রভু এবং হাদীসে যে বলা হয়েছে, যিনাকারীর জন্য পাথর কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যিনাকারীর জন্য পাথর নিক্ষেপের শাস্তি। অবশ্য প্রকাশ্য-বাক্য দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়। কেননা শুধু পাথর নিক্ষেপ বংশ থেকে বঞ্চিত করে না। এখানে পাথরের অর্থ হলো অকৃতকার্য ও বঞ্চিত হওয়া। আরবের বাক-পদ্ধতিতে (محاوره) অকৃতকার্যতাকে পাথর এবং চপেটাঘাত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। উর্দূ ভাষার বাক-পদ্ধতিতেও বলা হয়, তার ভাগ্যে আছে মাটি অর্থাৎ তার ভাগ্যে আছে শুধু অকৃতকার্যতা। হাদীসের অর্থ হলো এই যে, বংশের সমস্ত কিছু, যেমন উত্তরাধিকার ও অন্যান্য বিষয় স্বামী এবং মুনিবই পাবে, কিন্তু যিনাকারী এগুলো থেকে বঞ্চিত হবে।

এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক (র) ও ইমাম শাফিঈ (র)-এর মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, বংশ প্রমাণের জন্য যৌন সম্ভোগের সম্ভাবনা শর্ত নয়, শুধু বিবাহ হওয়াই বংশ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে যে শিশু জন্ম গ্রহণ করবে, সে ঐ স্বামীর ঔরসজাত বলে গণ্য হবে। বংশের সমস্ত অধিকারের হকদার তাকেই মানতে হবে, যিনাকারীকে নয়। মধ্যবর্তী সময়ে সঙ্গমের সম্ভাবনা থাকুক বা না থাকুক।

ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম মালিক (র) বলেন, আকদের পর যৌন সম্ভোগও শর্ত। নতুবা এরদ্বারা বংশ প্রমাণিত হবে না। কিন্তু বিবেক, যুক্তি, ক্বিয়াস ও অবস্থার প্রেক্ষিতে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতামত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। কেননা আকদ যেহেতু যৌন সম্ভোগের প্রমাণ বহন করে এবং এরদিকে আকর্ষণ করে, তাই এটা যৌন সম্ভোগের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে স্থির করা হয়– যা যৌন সম্ভোগের হুকুম বহন করে। যেমন ভ্রমণের কষ্টের কারণে ভ্রমণের কষ্টের সুযোগ হিসেবে কসর ইত্যাদিকে শরীয়তের স্থলাভিষিক্ত মনে করা হয়েছে। এতে কষ্ট হোক বা না হোক। এমনিভাবে এখানে দ্বিতীয় হাদীসের বাক্য مطلق বা শর্তহীন। এতে সম্ভোগের সম্ভাবনার সম্পর্ক কোথায় ?

তৃতীয়ত শরীয়তে এর শুধু একটি উদাহরণ নয়, বরং একাধিক উদাহরণ রয়েছে। যেমন একজন বিবাহিতা নারী, যার স্বামী দীর্ঘ দিন থেকে সফরে রয়েছে, এর মধ্যে সে কয়বার ঋতুবতী হয়েছে। এরদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তার গর্ভাশয় (رحم) বীর্য থেকে শূন্য আছে কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি এ স্বামী তাকে তালাক দেয়, তাহলে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। ইদ্দত গর্ভাশয়ের পরীক্ষার জন্য করা হয় যে, এটা বীর্য থেকে শূন্য কিনা। অথচ এ অবস্থায় ইদ্দত পালনের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখানে শরীয়ত ইদ্দত পালনকে বাধ্যতামূলক করেছে। কেননা শুধু বিবাহকে যৌন সম্ভোগের স্থলাভিষিক্ত মনে করা হয়।

كِتَابُ الاِسْتِبْرَاءِ

গর্ভাশয় পরিচ্ছন্ন ও শূন্য করা সম্পর্কে

بَابُ الاِسْتِبْرَاءِ

গর্ভাশয় পরিচ্ছন্ন ও শূন্য করা

٢٨٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُوْطَا الْحُبَالٰى حَتّٰى يَضَعْنَ مَا فِىْ بُطُوْنِهِنَّ *

হাদীস নং- ২৮২

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে যৌন সম্ভোগ থেকে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার পেটের সন্তানকে জন্ম না দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত গর্ভবতী নারীদের অর্থ গ্রেফতারকৃত দাসী। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে অন্য এক রেওয়ায়েতে حبالى এর সাথে من السبى যুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ গ্রেফতারকৃত গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে এ আদেশ প্রযোজ্য হবে। ইমাম আহমদ আবূ দাউদ ও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে আওতাস (اوطاس) -এর কয়েদীদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেন যে, গর্ভবতী নারীর সাথে সঙ্গম করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে গর্ভজাত সন্তানকে জন্ম না দেয় এবং গর্ভবিহীন নারীর সাথে সঙ্গম করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রথমবারের মত ঋতুবতী না হয়। এ নির্দেশ হলো গর্ভাশয় পরিচ্ছন্ন করার জন্য। অথবা ঐ গর্ভবতী নারীও এর অন্তর্ভুক্ত যাকে ক্রয় করা যায় অথবা ঐ নারী, যিনার মাধ্যমে যার গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। অথবা ঐ মহিলা যার বিবাহ ইসলামের বা হিজরতের কারণে তার যুদ্ধরত স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের দেশে চলে এসেছে। এ হুকুমের মধ্যে স্বীয় বিবাহিত গর্ভবতী স্ত্রী অন্তর্ভূক্ত নয় এবং ঐ নারীও অন্তর্ভুক্ত নয় যে যিনা দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে, যার স্বামী নিজেই ব্যাভিচারী, সে বিবাহের পূর্বেই তার সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছে এবং যার দরুন সে গর্ভবতী হয়েছে। কিন্ত এ হুকুমে ঐ নারী অন্তর্ভুক্ত নয়, যে মুসলিম, মুহাজির এবং গর্ভবতী। কেননা তার সাথে বিবাহ জায়েয নয়, তাই সঙ্গম জায়েয হবে কিভাবে ? তার ইদ্দত সন্তান জন্মদান পর্যন্ত এবং ইদ্দত পূর্ণ করার পূর্বে বিবাহ কিভাবে জায়েয হবে ?

كِتَابُ الرِّضَاعِ
দুধপান করানোর বিধান

بَابُ مُسَاوَاةِ الرِّضَاعِ وَالنَّسَبِ فِى التَّحْرِيْمِ
দুধপান এবং বংশ সম্পর্কের কারণে হুরমত সাব্যস্ত হওয়া একই পর্যায়ের

٢٨٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عَلِيٍّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَايَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ قَلِيْلَهُ وَكَثِيْرُهُ *

হাদীস নং- ২৮৩

অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ নসব (বংশ) সূত্রে যারা হারাম, দুধপান সূত্রেও তারা হারাম। দুধ সামান্য পান করুক বা অধিক।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের বিষয়বস্তু নিয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে শিশুর একবার দুধপান এবং তা পেটে প্রবেশই হারাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট। হযরত আলী (রা) হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা), হযরত ইব্ন উমর (রা), হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত হাসান বসরী, হযরত সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব, হযরত তাউস, হযরত আতা, হযরত মাকহুল, হযরত যুহরী, হযরত কাতাদা ও অন্যান্যগণ (র) একই মত পোষণ করেন। হযরত ইব্ন মুনযির (র) বলেন, অধিকাংশ ফকীহ্ এতে ঐকমত্য পোষণ করেন।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে এক অথবা দুই অথবা পাঁচবারের চেয়ে কমে হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় না। তিনি হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ لا تحرم المصة ولا المصتان (এক অথবা দু'বার দুধপান করার ফলে হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় না)। হযরত আয়েশা (রা)-এর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেন, কুরআন মজীদে দশবার চোষার কথা ছিল। এতে পাঁচবার চোষা রহিত হয়ে গিয়েছে এবং পাঁচ বাকী রয়েছে যা আঁ– হযরত (সা)-এর ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল।

হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসের দলীল রয়েছে। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ وَاُمَّهَاتُكُمُ الّٰتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ (তোমাদের মাতাগণ যারা তোমাদেরকে

দুধপান করিয়েছেন)। (৪ ঃ ২৩) এতে সাধারণ দুধপান করানোকে হারাম হওয়ার কারণ স্থির করা হয়েছে। এখানে এক বা দু'বার পানের শর্ত নেই। এ অবস্থায় خبر واحد দ্বারা কিভাবে কুরআন মজীদের উপর শর্ত আরোপ করা যায় ? হাদীসসমূহের মধ্যে এ হাদীসও একটি শক্তিশালী দলীল। এতে হারাম হওয়ার জন্য কমবেশির প্রশ্ন উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। মুয়াত্তা গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব, হযরত উরওয়া ইব্ন যুবায়র এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে হাদীস সংকলন করেছেন যাতে একবার দুধপান করাকে হারাম হওয়ার কারণ নির্ধারণ করা হয়েছে। বিবেক ও জ্ঞান এটাই বলে যে, যে একবারও দুধপান করে, সে যেন (পুরোপুরি) দুধপান করল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, দুধ কম হোক বা বেশি, হারাম হওয়াকে প্রমাণিত করে, যেমন কম হোক অথবা বেশি খেয়ে ফেলা রোযা ভঙ্গের কারণ হয়ে থাকে। হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস হলো مضطرب যার দ্বারা ইমাম শাফিঈ (র) দলীল পেশ করেছেন। সুতরাং হানাফী মাযহাবই সঠিক।

٢٨٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ جَاءَ اَفْلَحُ بْنِ اَبِى الْقُعَيْسِ لِيَسْتَأْذِنَ عَلَى عَائِشَةَ فَاَحْتَجَبَتْ مِنْهُ فَقَالَ تَحْتَجِبِيْنَ مِنِّىْ وَاَنَا عَمُّكِ فَقَالَتْ فَكَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ اَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ اَخِىْ بِلَبَنِ اَخِىْ قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِبَتْ يَدَاكِ اَمَا تَعْلَمِيْنَ اَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَايَحْرِمُ مِنَ النَّسَبِ *

হাদীস নং- ২৮৪

অনুবাদ ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদা আফলাহ্ ইব্ন আবূল কুআইস (রা) তাঁর নিকট আগমণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন (পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর)। তখন তিনি তার থেকে পর্দা করলেন। ফলে সে (আফলাহ) বলল, তুমি আমার নিকট পর্দা করছ অথচ আমি তোমার رضاعى চাচা। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এটা কিভাবে ? তখন সে বলল, আমার ভাবী তোমাকে আমার ভাই-এর দুধ পান করিয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বললাম। তিনি বললেন ঃ তোমার হাত ধূলা মিশ্রিত হোক। তুমি কি এতটুকু জান না যে, বংশ সূত্রে যারা হারাম, দুধ সূত্রেও তারা হারাম।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসেও সাধারণ رضاعت (দুগ্ধপান) প্রমাণিত।

كِتَابُ الطَّلَاقِ
তালাকের বর্ণনা

بَابُ الْهَزْلِ فِى الطَّلَاقِ
কৌতুকার্থে তালাক উচ্চারণ করা

٢٨٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثَةٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌ - اَلطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ *

হাদীস নং-২৮৫

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ তিনটি বিষয় এমন যেগুলোর যথার্থ তো যথার্থই, এমনকি সেগুলোর কৌতুকের ব্যবহারও যথার্থই। সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) বিবাহ, (২) তালাক ও (৩) রাজ'আত।

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তি যদি ব্যঙ্গ ও কৌতুক করে স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দেয় অথবা বিবাহ করে অথবা স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে, তাহলে তিনটিই বাস্তবায়ন ও কার্যকর হবে। অর্থাৎ তালাক হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হবে। বিবাহ হয়ে যাবে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা মেনে নেয়া হবে। যদিও স্বামী এ ব্যাপারে যতই আপত্তি করুক না কেন যে, আমি এ সমস্ত কিছুই ব্যঙ্গ ও কৌতুক হিসেবে করেছি। আমার দৃষ্টি এ সমস্ত বাক্যের অর্থ ও ফলাফলের উপর ছিল না, তবুও শরীয়তে এ আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। চুক্তি ও ব্যবহারিক বিষয়েরও একই হুকুম বা বিধান। যেমন ক্রয়-বিক্রয়, হেবা ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে উপরোক্ত তিনটি বিষয়কে বর্ণনার মধ্যে এজন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, এগুলোর গুরুত্ব অন্যান্য গুলোর চেয়ে অধিক। এ সমস্ত বিষয় কখনো ব্যঙ্গ-কৌতুক করা উচিত নয়।

بَابُ الْعِدَّةِ
ইদ্দতের বর্ণনা

٢٨٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَوْدَةَ حِيْنَ طَلَّقَهَا اِعْتَدِّىْ *

হাদীস নং- ২৮৬

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) যখন হযরত সওদা (রা)-কে তালাক দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে বললেন ঃ তুমি ইদ্দত পালন করবে।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত বিষয়ে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে যে, আঁ হযরত (সা) হযরত সওদা (রা)-কে তালাক প্রদান করেছিলেন, অতঃপর হযরত সওদার অনুরোধের ভিত্তিতে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। অথবা তালাক প্রদান করেননি, বরং শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু হযরত সওদা নবী করীম (সা)-এর বিবাহ বন্ধনে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, ফলে তিনি তালাকের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। সর্বশেষ কথাটিই সঠিক। কেননা সিহাহ সিত্তায় উল্লেখ আছে لَمَّا اَرَادَهُ طَلَاقَهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ [যখন হুযূর (সা) হযরত সাওদা (রা)-কে তালাক দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন,তখন সওদা নিজের ধার্যের দিন হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রদান করেন]।

মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকে বর্ণিত আছে, হযরত সওদা (রা) তালাকের কথায় খুব ভয় পেয়ে যান এবং তিনি তাঁর জন্য নির্ধারিত দিন হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রদান করেন। তিবরানীতে বর্ণিত আছে ঃ اراد ان يفارقها (নবী করীম (সা) মূলত বিচ্ছিন্ন হওয়ারই ইচ্ছা করেছিলেন)। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তালাক প্রদান করেননি, বরং হযরত সওদা (রা) হুযূর (সা)-এর ইচ্ছার কথা অবগত হয়ে স্বীয় নির্ধারিত দিন হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রদান করেন এবং তালাকের ইচ্ছাকে পরিহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ কারণে মোল্লা আলী ক্বারী (র) হাদীসে উল্লেখিত طلقها -এর অর্থ اراد طلاقها (তালাকের ইচ্ছা পোষণ করেছেন) গ্রহণ করেছেন, হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ইমাম বায়হাকী (র) হযরত উরওয়াহ (রা) থেকে মুরসাল হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা) হযরত সওদা (রা)-কে তালাক প্রদান করেছেন। অতঃপর যখন তিনি নামায আদায়ের জন্য যাচ্ছিলেন, তখন হযরত সওদা (রা) হুযূর (সা)-এর জামার প্রান্ত ধরে অনুরোধ করেন যে, আমার পুরুষের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ প্রাকৃতিক চাহিদা নেই কিন্তু আমার বিশেষ ইচ্ছা হলো এই যে, হাশরের দিন আমি আপনার স্ত্রীদের দলভুক্ত হয়ে উঠতে চাই। ফলে তিনি তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। ইব্ন সাআদও অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন। এতে এটাও রয়েছে যে, হযরত সওদা (রা) তাঁর জন্য নির্ধারিত দিনরাত সমস্ত হযরত আয়েশা (রা)-এর জন্য প্রদান করেন।

٢٨٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَوْدَةَ حِيْنَ طَلَّقَهَا اِعْتَدِّىْ *

হাদীস নং- ২৮৭

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত সওদা (রা)-কে তালাক প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন হযরত সওদা (রা)-কে বলেন ঃ তুমি ইদ্দত পালন করবে।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের দ্বারা এ মাসয়ালাও প্রমাণিত হয় যে, তালাকপ্রাপ্তা আযাদ নারীর জন্য ইদ্দত পালন বাধ্যতামূলক, বাঁদী বা দাসীর জন্য নয়। পবিত্র কুরআনেও এ দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ "তাদের (বাঁদী বা দাসীর) জন্য ইদ্দত পালন করা জরুরী নয়।" (৩৩ ঃ ৪৯)।

بَابُ الطَّلاَقِ فِى الْحَيْضِ

ঋতু অবস্থায় তালাক প্রদান

٢٨٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَعِيْبَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ فَرَاجَعَهَا فَلَمَّا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا وَاحْتُسِبَ بِالتَّطْلِيْقَةِ الَّتِىْ كَانَ اَوْقَعَ عَلَيْهَا وَهِىَ حَائِضٌ *

হাদীস নং- ২৮৮

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে (আমিনা বিনতে গাফফার) ঋতু অবস্থায় তালাক প্রদান করেন। এ কারণে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। ফলে তিনি তাকে ফিরিয়ে নেন। অতঃপর যখন তার স্ত্রী ঋতু থেকে পবিত্র হয়, তখন তিনি তাকে তালাক প্রদান করেন এবং ঐ তালাকও গণনা করা হয় যা তিনি ঋতু অবস্থায় প্রদান করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ঋতুর সময় প্রদানকৃত তালাক বাতিল হয়নি, বরং তা গণনা করেই পরবর্তী তালাক পূর্ণ করা হয়েছে। এতে জাহিরিয়্যা, খারিজী ও রাফি'যী সম্প্রদায় ভিন্নমত পোষণ করে থাকে। রিওয়ায়েত এবং কিয়াসের দ্বারা তারা দলীল পেশ করে থাকে। রিওয়ায়েতের ক্রমধারায় আবূ যুবায়রের রিওয়ায়েত যা তিনি হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন এবং যা আবূ দাউদে বর্ণিত আছে, এতে কিছু শব্দ অতিরিক্ত রয়েছে – لَمْ يَرَهَا شَيْئًا (এতে কিছু জানা বা মানা হয়নি) এবং এই তালাককে গণনার মধ্যে নেয়া হয়নি। এ ছাড়া এটা কিয়াস করে থাকে যে, ঋতুর সময় প্রদানকৃত তালাক যেহেতু হারাম ও অবৈধ, সুতরাং তা কেন গণনা করা হবে ?

উপরোক্ত বক্তব্যের জওয়াব হলো এই যে, আবূ যুবায়রের বর্ণনায় لَمْ يَرَهَا شَيْئًا

বাক্যাংশ غير محفوظ বা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত হাদীস বিশারদ ও রিওয়ায়েত-কারিগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কেননা হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর অন্যান্য শাগরিদ বা বর্ণনাকারী যারা আবূ যুবায়র থেকে নির্ভরযোগ্য, তাদের থেকে এটা বর্ণিত হয়নি, বরং এর বিপরীত হাদীসই বর্ণিত আছে। যেমন উপরে বর্ণিত হাদীস। অতঃপর সমস্ত রিওয়ায়েতে, এমন কি আবূ যুবায়রের রিওয়ায়েতে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ রয়েছে এবং ফিরিয়ে নেয়া তালাক দেয়ার পরই হয়ে থাকে। যদি তালাক নাই হয়ে থাকে, তা হলে ফিরিয়ে নেয়া কিভাবে সম্ভব ? لَمْ يَرَهَا شَيْئًا -এর অর্থ হলো এই যে, এ তালাককে সঠিক কাজ এবং একটি যথার্থ কাজ মনে করা হয়নি। এমনকি এটা তালাকই হয়নি।

দ্বিতীয়ত তাদের ক্বিয়াসও ঠিক হয়নি। কেননা এটাতো জরুরী নয় যে, যে বস্তু হারাম ও অবৈধ হবে তা সহীহ ও সঠিক হবে না এবং এর উপর আহকাম প্রয়োগ হবে না। যেমন জবরদখলকৃত জমির উপর নামায অবৈধ কিন্তু এতদসত্ত্বেও নামায সহীহ হবে।

بَابُ حُرْمَةِ اللَّعَبِ بِالطَّلَاقِ

তালাককে খেলার বস্তুর বানানো হারাম

٢٨٩ – اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى اِسْحٰق عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ قَوْمٍ يَلْعَبُوْنَ بِحُدُوْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُوْنَ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ *

হাদীস নং- ২৮৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের কি হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার বিধানকে নিয়ে খেল-তামাশা করছে ! তারা (এইমাত্র) বলে, আমি তোমাকে (স্বীয় স্ত্রীকে) তালাক দিলাম। পরক্ষণেই বলে, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম।

ব্যাখ্যা ঃ নারীদেরকে হেয় বা বিপদগ্রস্থ করার একটি পদ্ধতি এই ছিল যে, পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর ইদ্দতের মধ্যেই ফিরিয়ে নিত। অতঃপর তালাক দিয়ে পুনঃ ফিরিয়ে নিত। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অসহায় নারীদের উপর এভাবে নির্যাতন করত। সুতরাং এ ব্যাপারে শরীয়ত নিষেধাজ্ঞা জারী করে এবং اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (তালাক দু'বার) বলে তালাকের নীতিমালা ঘোষণা করে এ অপকর্ম থেকে বাধা প্রদান করে। চূড়ান্তভাবে এ ঘোষণা করা হয়েছে যে, تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ (এটা আল্লাহ্র বিধানই) কাজেই فَلَا تَعْتَدُوْهَا (সীমাতিক্রম করো না)।

بَابُ عَدَمِ وُقُوْعِ طَلاَقِ الْمَعْتُوْهِ

পাগলের তালাক কার্যকর হবে না

٢٩٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِىْ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجُوْزُ لِلْمَعْتُوْهِ طَلاَقٌ وَلاَ بَيْعٌ وَلاَ شِرَاءٌ *

হাদীস নং- ২৯০

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ পাগলের তালাক বৈধ হবে না এবং তার ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ শরীফে এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা) থেকে এক মরফূ হাদীস বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ তিন বিষয় থেকে কলম উত্তোলন করা হয়েছে অর্থাৎ তারা আহ্কামে শরী'আ পালন থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গিয়েছে।

এক, নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত জাগ্রত না হবে।

দুই, শিশু যতক্ষণ পর্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হবে।

তিন, পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞান ফিরে না আসে, সুস্থ না হয়।

তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রা) থেকে একই ধরনের হাদীস বর্ণিত আছে। সুতরাং এ সমস্ত হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, পাগলের দেয়া তালাক কার্যকর হবে না।

অবশ্য পাগলের ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত থাকে বা মাতাল বা নেশাগ্রস্থ ও নিরুপায় ব্যক্তির তালাক হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কার্যকর হবে। বর্ণিত হাদীস ঃ رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ (ضَعِيْف) বহির্ভুত নয়। কেননা প্রথমত এটা দুর্বল সুতরাং ইব্ন হাজার আসকালানী বুলুগুল মারাম গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা করেছেন। অতঃপর এর অর্থ সম্ভবত এটাও হতে পারে যে, পরকালের যিম্মাদারী উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এটা নয় যে, কাজ তার স্বীয় নির্দেশের সাথে বাতিল হবে। যেমন কাউকে যদি সঙ্গমের জন্য বাধ্য করা হয়, তা হলে পরকালের যিম্মাদারী থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে, তার হজ্জ ও রোযা ফাসেদ হয়ে যাবে। শরীয়তে এ ধরনের অনেক উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে।

بَابُ عَدَمِ الطَّلاَقِ بِمُجَرَّدِ التَّخْيِيْرِ

শুধু ক্ষমতা প্রদান করার কারণে নারীর তালাক কার্যকর হবে না

٢٩١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ

خَيَّرْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يُعَدَّ ذٰلِكَ طَلَاقًا *

হাদীস নং- ২৯১

অনুবাদ ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে (তালাক নেয়ার) ক্ষমতা প্রদান করেন। কিন্তু আমি তাঁকেই গ্রহণ করি (অর্থাৎ এতে তালাক হয়নি)। এ পদ্ধতি তালাকের মধ্যে গণ্য হয়নি।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক নেয়ার জন্য ক্ষমতা প্রদান করে এবং স্ত্রী নিজেকে তালাক প্রদান করে, তাহলে তালাক কার্যকর হবে। আর যদি তালাকের পরিবর্তে স্বামীকে পসন্দ করে, তাহলে কিছুই হবে না। স্বামীর পক্ষ থেকে শুধু এরূপ ক্ষমতা পাওয়া তালাকের বিধানের মধ্যে গণ্য হয় না।

بَابُ خِيَارِ الْعِتْقِ

বিবাহিত দাসীর আযাদীলাভের পর পূর্ব স্বামীর সাথে থাকা বা না থাকার ব্যাপারে অধিকার রয়েছে

٢٩٢ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَعْتَقَتْ بَرِيْرَةَ وَلَهَا زَوْجٌ مَوْلًى لِاٰلِ اَبِىْ اَحْمَدَ فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا *

হাদীস নং- ২৯২

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বারীরাহ নামক এক দাসীকে আযাদ করে দেন। তার স্বামী ছিল আবূ আহমদের পরিবারের আযাদকৃত দাস। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে এ ক্ষমতা প্রদান করেন যে, সে তার স্বামীর বিবাহ বন্ধনে থাকবে অথবা পৃথক হয়ে যাবে। সুতরাং সে পৃথক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেন। অথচ তার স্বামী আযাদ ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস হলো একটি বিতর্কিত বিষয়ে শাফিঈ ও মালিকী মাযহাবের বিরুদ্ধে হানাফী মাযহাবের দলীল। বিষয়টি হলো এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আযাদকৃত দাসীর স্বামীর আযাদ হোক অথবা গোলাম হোক, স্বামীর সাথে থাকা বা না থাকার ব্যাপারে তার অধিকার রয়েছে। ইমাম শাফিঈ ও মালিক (র)-এর মতে, স্বামী গোলাম হলে আযাদকৃত দাসীর

এ অধিকার থাকবে। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, বারীরাহ্-এর স্বামী গোলাম ছিল, না আযাদ ? উক্ত হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তার স্বামী আযাদ ছিল। তাই এ হাদীস হলো হানাফীদের দলীল। বস্তুত হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ ব্যক্তি আযাদ ছিল। হযরত আয়েশা (রা) থেকে দু'টি সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত আছে। এক আসওয়াদ থেকে, দ্বিতীয়টি উরওয়াতুল কাসিম থেকে। আসওয়াদের রিওয়ায়েতে তার আযাদ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। উরওয়া থেকে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। একটি থেকে আযাদ হওয়া প্রতীয়মান হয়, আর দ্বিতীয়টিতে সন্দেহের আশংকা রয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় আযাদ হওয়াই প্রমাণিত হয়েছে এবং উরওয়ার রিওয়ায়েতে যে সামান্য সন্দেহ রয়েছে, তা বাতিল হয়েছে।

بَابُ طَلاَقِ الْاَمَةِ

দাসীর তালাকের বর্ণনা

٢٩٣ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلاَقُ الْاَمَةِ اِثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ *

হাদীস নং- ২৯৩

অনুবাদ ঃ হযরত ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দাসীর তালাক হলো দু'টি এবং তার ইদ্দত হলো দুই ঋতু পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দু'টি বিষয়ে শাফিঈ ও মালিকী মাযহাবের বিরুদ্ধে হানাফী মাযহাবের দলীল। প্রথমত তালাকের সংখ্যা কার্যকর হওয়ার জন্য নারীদের উপর নির্ভর করে, না পুরুষের উপর। দ্বিতীয়ত ইদ্দত হায়যের সাথে (ঋতু) সম্পর্কিত, না পবিত্রতার সাথে। হানাফীগণ বলেন, দু'টি বিষয়ই প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ তালাকের কার্যকর হওয়ার বিষয়টি নারীদের উপর নির্ভর করবে এবং ইদ্দত হায়েযের সাথে সম্পর্কিত হবে।

ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালিক (র) দ্বিতীয় পদ্ধতির পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ তালাকের ক্ষেত্রে যদি স্বামী গোলাম হয় এবং স্ত্রী আযাদ হয়, তা হলে হানাফীদের মতে ঐ স্ত্রী তিন তালাকের পর স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাবে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে দু' তালাকে হারাম হবে। আর যদি স্বামী আযাদ হয় এবং স্ত্রী দাসী হয়, তা হলে এর বিপরীত। হানাফীদের মতে দু' তালাকের পর ঐ স্ত্রী স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাবে এবং ইমাম শাফিঈ ও মালিক (র)-এর মতে তিন তালাকের পর ঐ স্ত্রী স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাবে। তালাকের বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র)-এর দলীল হলো ঃ اَلطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ (তালাক পুরুষের সাথে এবং ইদ্দত নারীদের সাথে সম্পর্কিত)।

হানাফীদের শক্তিশালী দলীল হলো বর্ণিত মরফূ হাদীস, যাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তালাকের সংখ্যা কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে এটা নারীদের উপর নির্ভর করে, পুরুষের উপর নয়।

এবার দ্বিতীয় দলের দলীল পর্যালোচনা করা যায়। তাদের পেশকৃত হাদীস সহীহ অথবা হাসান সূত্রের মাধ্যমে মরফূ'ভাবে বর্ণিত নয়, বরং তা হলো মওকুফ। হাফিয আবূল ফারায ইব্ন জওযী (র)-এর বর্ণনানুযায়ী এ হাদীস হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উপর মওকুফ। কারো কারো মতে এটা হযরত যায়দ ইব্ন সাবিতের বর্ণনা। হানাফীদের নিকট বর্ণিত মরফূ হাদীস রয়েছে, যা আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, ইব্ন মাজাহ, ইব্ন জুরাইজ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছে এবং মুজাহির ইব্ন আসলাম থেকে, তিনি কাসিম থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং শুধু সাহাবীর সূত্রে বর্ণনার বিপরীতে সহীহ মরফূ হাদীস অগ্রগণ্য হবে। যদি কোথাও হানাফীদের নিকট শুধু সাহাবীর বর্ণনা হতো এবং তাদের নিকট মরফূ হাদীস হতো, তা হলে তাদের শক্তিশালী দলীলের কারণে বিরোধী পক্ষ লাপাত্তা হয়ে যেত। তবে তাঁদের মতের জয়লাভের জন্য তাদের কৌশল রয়েছে। যদি কারো কাছে মরফূ হাদীস থাকে, তা হলে ঐ হাদীসের কোন বর্ণনাকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা এবং বিরোধী পক্ষকে ঘায়েল করে দেয়া। সুতরাং এখানেও মুজাহিরের উপর অভিযোগ আনা হয়েছে, যা দাউদ (র) বলেছেন যে, এ হাদীস মজহুল। তিরমিযী এক দিক থেকে বলেছেন ইলম-এর মধ্যে মুজাহির থেকে এই হাদীস হলো মা'রূফ। আল্লামা যাহবী (র) আবূ আসিম আন-নুবাইল, ইয়াহইয়া ইব্ন মুঈন, আবূ হাতিম আর-রাযী এবং ইমাম বুখারী (র)-ও এ হাদীসকে যঈফ বা দুর্বল বলেছেন। কিন্তু সাথে সাথে এটাও বলেছেন যে, ইব্ন হিব্বান (র) এ হাদীসকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

হানাফীগণ এর জওয়াবে বলেন, ইব্ন হিব্বানের মতামত তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা এবং হাকিম ইব্ন আব্বাস থেকে এ হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদীস যদিও সহীহ কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তা বর্ণনা করেননি। অতঃপর হযরত আয়েশা (র)-এর হাদীস বর্ণনা করে বলেন, মুজাহির ইব্ন আসলাম বসরার একজন শায়খ। আমাদের বর্তমান মাশায়েখদের মধ্যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করেননি এবং বাস্তবে কেউ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেননি। হিফয ও সংরক্ষণ এবং তাঁর ন্যায়নীতির ব্যাপারে কেউ সমালোচনা করেননি। জাহালতের ব্যাপারে আবূ দাউদে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন, এ অভিযোগ এভাবে দূর করা যায় যে, বর্ণনাকারীর জাহালত হলো এই যে, একাধিক ব্যক্তি তাঁর থেকে রিওয়ায়েতকারী না হওয়া। কিন্তু এখানে তা হয়নি। মুজাহির থেকে ইব্ন জুরাইজ, ইমাম সওরী এবং আবূ আসিম রিওয়ায়েত করেছেন। ইব্ন আদী (র) তাঁর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রিওয়ায়েত করেছেন যে, আঁ হযরত (সা) প্রতি রাতে সূরা আল-ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। সুতরাং জাহালত কিভাবে থাকে ? বিনা কারণে মাযহাবকে দূর্বল আখ্যায়িত করার জন্য মুবহাম, জরাহ (সন্দেহ, অনির্দিষ্ট অভিযোগ) গ্রহণযোগ্য নয়।

কোন কোন পদ্ধতি ও নীতিতে শাফিঈ মাযহাবও অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেমন একবার ঈসা ইব্ন আবান ইমাম শাফিঈ (র)-কে এক বিশেষ পরিবেশে প্রশ্ন করে এমন বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেন যে, তিনি এর কোন উত্তর দিতে পারেননি। ঈসা ইব্ন আবান তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি স্বামী আযাদ হয় এবং দাসী স্ত্রীকে (যার সাথে সঙ্গম করা হয়েছে) সুন্নাত তালাক দেয়ার ইচ্ছা

পোষণ করে, তা হলে কি করবে ? ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, পবিত্র অবস্থায় তালাক প্রদান করবে। অতঃপর হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে দ্বিতীয় তুহরে (পবিত্র অবস্থায়) এবং তিনি এটাই বলতে চেয়েছেন যে, হায়য থেকে পবিত্র হয়ে তৃতীয় তুহরে তালাক দান করবে। ঈসা ইব্ন আবান বলেন, তা হলে তালাক কিভাবে হবে, ইদ্দত তো শেষ হয়ে গিয়েছে। কেননা তাদের মতেও ইদ্দত মহিলাদের অবস্থার প্রেক্ষিতেই পালন করা হয়ে থাকে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) এখানে পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা একটি সূক্ষ্ম দলীল পেশ করেছেন। আল্লাহ্পাক বলেছেন ঃ فَطَلِّقُوْهُنَّ بِعِدَّتِهِنَّ [তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) তালাক প্রদান কর তাদের ইদ্দতের মধ্যে] (৬৫ ঃ ১) অর্থাৎ ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক প্রদান কর। যেমন যদি স্বামী গোলাম হয় এবং তার স্ত্রী আযাদ হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার ইদ্দত তিন قُرُوْء (কুরু বা হায়য) হবে এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে তালাকও তিনটি হবে। অথবা যেমন– স্বামী আযাদ কিন্তু তার স্ত্রী হলো দাসী, তাহলে তার ইদ্দত হতে দুই قُرُوْء (কুরু বা হায়য) হবে। সুতরাং ইদ্দতের দৃষ্টিকোণ থেকে তার তালাকও দুটিই হবে। তালাকের মাসয়ালার উপর এ সমস্ত আলোচনা হলো।

উপরোক্ত বিষয়ে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালিক (র) হযরত আয়েশা (রা), হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) এবং হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর বর্ণনা পেশ করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখা যায়, তাঁদের নিকট শুধু হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনাই বাকী থাকে। কেননা হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) ও ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট বিপরীত রিওয়ায়েতের প্রমাণ রয়েছে।

পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবের পক্ষে রয়েছে খুলাফায়ে আরবাআ, উবাই ইব্ন কা'ব, মু'আয ইব্ন জাবাল, আবূ দারদা, উবাদা ইব্ন সামিত, আবূ মূসা আশআরী ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা)। এ ছাড়া তাউস, আতা, ইবনুল মুসায়্যিব, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, মুজাহিদ, হাসান বসরী, সুফয়ান সওরী, আওযাঈ (র) ও অন্যান্যগণ একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম আহমদ (র)-ও একই মত পোষণ করেছেন। হানাফী মাযহাবের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ রয়েছে। যুক্তিও এ মতকেই সমর্থন করে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ "[যে (নারী) হায়য থেকে নিরাশ বা মুক্ত হয়ে যায়]।" (৬৫ ঃ ৪) এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, قُرُوْء শব্দের অর্থ হলো হায়য। অতঃপর ইদ্দতের জন্য ثَلَاثَةَ قُرُوْء বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। বহুবচনের (جمع) অবস্থায়। অর্থাৎ কমপক্ষে পূর্ণাঙ্গ তিন তুহর এবং جَمْع -এর এ পদ্ধতি সম্ভব নয় যখন পবিত্র (طهر) অবস্থায় তালাক প্রদান করে এবং সেটা সুন্নতও বটে। কেননা অবশিষ্ট দুই তুহুরে ইদ্দত শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং প্রথম طهر তো অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, সম্পূর্ণ طهر কখন গণনা হবে ? এবং বাস্তবে দু'টি পূর্ণাঙ্গ طهر গণনা করা হবে। قروء শব্দ দ্বারা হায়য অর্থ গ্রহণ করায় কোন বাধা নেই যে, এ অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ তিনটি হায়য হবে। হাদীসসমূহের মধ্যে এ হাদীস হলো সবচেয়ে শক্তিশালী। যুক্তি ও জ্ঞান এটাই বলে যে, রেহেমের (رحم) পবিত্রতার লক্ষণ প্রকৃতপক্ষে হায়যের দ্বারা

উপলব্ধি করা যায়, (তুহুর বা পবিত্রতা) দ্বারা নয়। সুতরাং ইদ্দতও এরদ্বারা নির্ধারিত হওয়া কিয়াসের কথা।

بَابُ النَّفْقَةِ وَالسُّكْنٰى لِلْمَبْتُوْتَةِ

তিন তালাক প্রদত্ত নারীর জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ

٢٩٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ قَالَ قَالَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ (رض) لاَ نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ اِمْرَأَةٍ لاَ نَدْرِىْ صَدَقَتْ اَمْ كَذَبَتْ اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلٰثًا لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةَ *

হাদীস নং- ২৯৪

অনুবাদ ঃ হযরত উমর (রা) বলেন, একজন মহিলার বর্ণনার কারণে আমরা আমাদের প্রতিপালকের কিতাব (কুরআন) এবং আমাদের নবী হযরত হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সুন্নাত ত্যাগ করব না। কেননা আমরা জানি না যে, এ মহিলা সত্য বলছে, না মিথ্যা বলছে। তিন তালাক প্রদত্ত মহিলার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের ব্যবস্থা থাকবে।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত মহিলা ছিলেন ফাতিমা বিনতে কায়েস ইব্ন খালিদ আল-ফিহরী, তিনি যাহহাক (র)-এর বোন ছিলেন এবং মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাদীসে এ আলোচনা রয়েছে যে, তিন তালাক প্রদত্ত নারীর জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ দিতে হবে কিনা।

ইমাম আবূ হানীফা (রা) বাসস্থান ও খোরপোষ প্রদানের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহমদ (র) এ মহিলার জন্য দুটিই না দেয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম শাফিঈ ও মালিক (র) তিন তালাক প্রদত্ত মহিলার জন্য বাসস্থান দেয়া এবং খোরপোষ না দেয়ার পক্ষে মত পেশ করেছেন।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের দলীল হলো ফাতিমা বিনতে কায়েসের হাদীস যা সিহাহ্ সিত্তায় বর্ণনা করা হয়েছে এবং উক্ত হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে তিন তালাক প্রদত্ত নারীর জন্য বাসস্থানও নেই, খোরপোষও নেই। কেননা উক্ত মহিলা বলেন, আমার স্বামী আমাকে তালাক দেয়ার পর আমি বিষয়টি নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ কোনটি নির্ধারণ করেননি।

ইমাম শাফিঈ ও মালিক (র) এ নারীর জন্য শুধু বাসস্থানের ব্যাপারে মত পেশ করেছেন। কেননা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ "তোমরা যেখানে

বাস কর সেখানে তাদেরকেও (তিন তালাক প্রদত্ত নারীকে) রাখ।" এবং ফাতিমা বিনতে কায়েস বর্ণিত হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে তার জন্য খোরপোষ না দেয়ার পক্ষে মত পোষণ করেছেন।

হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে পবিত্র কুরআনের আয়াত দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। বাসস্থানের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَلَاتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ (তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না)। (৬৫ ঃ ১) অথবা ইরশাদ হয়েছে ঃ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ (তোমরা যেখানে থাক, তাদেরকেও সেখানে রাখ)। (৬৫ ঃ ৬) খোরপোষের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ (তিন তালাক প্রদত্ত নারীদেরকে উত্তমভাবে খোরপোষ প্রদান কর)। (২ ঃ ২৪১) অথবা বলা হয়েছে ঃ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ (ক্ষমতাবানদের উচিত তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যয় করা)। (৬৫ ঃ ৭) অথবা একই প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে ঃ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ (যার (শিশু) সন্তান রয়েছে তার জন্য আহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করতে হবে)। (২ ঃ ২৩৩)

রিওয়ায়েতের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের শক্তিশালী দলীল হলো হযরত উমর (রা) বর্ণিত হাদীস যা অন্যান্য সহীহ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এ হাদীসে তিনি কঠোরভাবে ফাতিমা বর্ণিত হাদীসের খন্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, একজন মহিলা যার সততা বা মিথ্যার ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই, আমরা তার উক্তির দ্বারা আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ কিভাবে ত্যাগ করব ? প্রকৃতপক্ষে হযরত উমর (রা)-এর সম্মান ও মর্যাদা এবং ইলমের মাহাত্ম্য লক্ষ্য করে ফাতিমার বর্ণিত হাদীস দুর্বল (ضَعِيف) প্রমাণ করার জন্য হযরত উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসই যথেষ্ট। হযরত উমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীস মরফূ হাদীসের সমার্থক। হয়ত তিনি এ হাদীস মরফূ রিওয়ায়েত করেছেন। কেননা হাদীসের নীতিমালায় এ সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, সাহাবী যদি বলেন যে, এটা আমাদের নবীর সুন্নাত, তা হলে এ হাদীস মরফূ বলেই প্রমাণিত হয়। এছাড়া তাঁদের থেকে ইবরাহীম (রা)-এর সূত্রে এ হাদীস মরফূ রিওয়ায়েত রয়েছে। তাহাভী ও দারে কুতনীর বর্ণনার দ্বারা অতিরিক্ত এটাও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি আঁ হযরত (সা)-কে এটা বলতে শুনেছি যে, তিন তালাক প্রদত্ত নারীর জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়ই প্রযোজ্য। এমনিভাবে হযরত ইব্ন মাসউদ, হযরত উসামা এবং হযরত আয়েশা (রা) থেকে ফাতিমার হাদীসের বিপরীত হাদীস বর্ণিত আছে। বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, ফাতিমা আল্লাহ্কে ভয় করে না, তাই এরূপ বর্ণনা করেছে।

হযরত সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রা) বলেন, এ মহিলা মানুষকে ফিত্নার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তিনি হলেন হযরত আয়েশা (রা)-এর সমকালীন একজন তাবিঈ। তিনি ফাতিমার হাদীসের বিপরীতে সাহাবাদের ঐকমত্য পেয়েছেন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, মারওয়ান বলেছেন, আমরা এ মহিলার বর্ণনার দ্বারা জনগণের মধ্যে গৃহীত শক্তিশালী দলীলকে পরিত্যাগ করতে পারি না। সুতরাং এটা হলো সাহাবাদের ইজমা। দ্বিতীয় রিওয়ায়েত এটাই প্রমাণ করে যে, তিন তালাক প্রদত্ত নারীর জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ প্রদান করতে হবে। তিবরানী নামক গ্রন্থে ইবরাহীম (রা)-এর সূত্রে ইব্ন মাসউদ (রা) হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উভয় সাহাবা তিন

তালাক প্রদত্ত নারীর জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়ই সমর্থন করেছেন। দারে কুতনীতে হযরত জাবির (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে। মুসলিম ও আবূ দাউদ শরীফে হাজ্জাতুল বিদা প্রসঙ্গে হযরত জাবির (রা) থেকে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ وَاَنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ نَفْقَتُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ (তাদের (তালাক প্রদত্ত নারীর) জন্য খোরপোষ ও পোশাক প্রদান করা তোমাদের উপর কর্তব্য)। কাজেই আরো সহীহ হাদীস ফাতিমার হাদীসের বিপরীতে বিদ্যমান পাওয়া যায়।

ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসে اضطراب (দুর্বলতা) রয়েছে। কেননা হাদীসে ইযতিরাব থাকা এতে দুর্বলতার প্রমাণ বহন করে। কেউ কেউ বলেছেন ঃ তার স্বামী তাকে অদৃশ্যভাবে তালাক দিয়েছে, আবার কেউ বলেছেন, তাকে তালাক দিয়ে স্বামী সফরে চলে গিয়েছে। একটি বর্ণনায় আছে, তিনি নিজেই আঁ হযরত (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, কয়েকজন লোক গিয়েছিল। কারো মতে তার স্বামী ছিল আবূ আমর ইবন হাফস্, আবার কারো মতে তার স্বামী ছিল আবূ হাফ্স ইব্ন মুগীরা। এছাড়া কিছুক্ষণের জন্য যদি এটা গ্রহণ করা হয়, তা হলে মেনে নিতে হবে যে, নবী করীম (সা)-এর এ আদেশ কোন বিশেষ ওজরের কারণে ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, এ মহিলা বেশি কথা বলত। তাই তাকে বাসস্থান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কেননা তার এ দোষ শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে বের করা থেকেও অধিক কঠোর ছিল। কারো কারো মতে, তার অসচ্চরিত্রতার কারণে এটা করা হয়েছে। খোরপোষের ব্যাপারে ঘটনা হলো, তার স্বামী অনুপস্থিত ছিল। সে মহিলা তার স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের নিকট খোরপোষ দাবি করে। তারা উত্তর প্রদান করে যে, তোমাকে খোরপোষ দেয়া আমাদের দায়িত্ব নয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও এ ফয়সালা প্রদান করেছেন। যেহেতু তার স্বামী কোন সম্পদ রেখে যায়নি, তাই তাকে রাসস্থান ও খোরপোষ দেয়া তার স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের উপর ওয়াজিব নয়। ফাতিমা এ বিশেষ অবস্থার উপর দৃষ্টি দেননি। সুতরাং তার স্বামীর পক্ষ থেকে বাসস্থান ও খোরপোষ না দেয়ার ব্যাপারে নবী করীম (সা) সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। মানুষ এ সামগ্রিক নিষেধের উপরই আমল করে যাচ্ছে। সুতরাং এটা মেনে নিতে হবে যে, ফাতিমা বিনতে কায়েসের হাদীস এ সমস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যতীত গ্রহণযোগ্য নয়। অধিকন্তু এ হাদীস পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করে। শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরাম এ হাদীসকে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করেন। সহীহ রিওয়ায়েতসমূহ এর বিরোধী। এতে ইযতিরাব বা দুর্বলতা বিদ্যমান। সুতরাং যারা স্বীয় মাযহাবের ভিত্তি ফাতিমার হাদীসের উপর করে থাকেন, তাদের উপলব্ধি করা উচিত তাদের মাযহাবের মর্যাদা কোথায়।

بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا

মৃত স্বামীর স্ত্রীর ইদ্দত

٢٩٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنْ سُبَيْعَةَ

بِنْتَ الْحَارِثِ الاَسْلَمِيَّةَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِىَ حَامِلٌ فَمَكَثَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَوَضَعَتْ فَمَرَّ بِهَا اَبُوْ السَّنَابِلِ بْنُ بَعْلَكٍ فَقَالَ تَشَوَّفْتِ تُرِيْدِيْنَ الْبَاءَةَ كَلاَّ وَاللّٰهِ اِنَّهُ لاَبْعَدِ الاَجْلَيْنِ - فَاَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ كَذَبَ اِذَا حَضَرَ فَاْذِنِيْنِى.

হাদীস নং- ২৯৫

অনুবাদ ঃ আসওয়াদ থেকে বর্ণিত, হারিস আসলামিয়্যার কন্যা সুবায়'আ (রা)-এর স্বামী মৃত্যুবরণ করেন। পঁচিশ দিন পর তিনি এক সন্তান প্রসব করেন। ঘটনাক্রমে আবূ সানাবিল ইব্ন বা'কাক তার নিকট আগমণ করেন এবং অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বিবাহের সংকল্প করেছ ? না, তা কখনো হবে না। আল্লাহ্র শপথ! তোমার ইদ্দত অনেক দীর্ঘ (অর্থাৎ ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে। যদি গর্ভবতীর স্বামী মৃত্যুবরণ করে এবং চার মাস দশ দিনের পূর্বে সে সন্তান প্রসব করে, তাহলে তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন পূর্ণ করতে হবে। যদি এ সময় অতিবাহিত হওয়ার মধ্যে সন্তান প্রসব না করে, তাহলে তার ইদ্দত সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত পালন করতে হবে)।

সুবায়'আ এটা শুনে নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমণ করে তাঁর নিকট বিষয়টি খুলে বললেন। তিনি শুনে বললেন ; ঐ ব্যক্তি ভুল করেছে। যখন সে পুনরায় আগমণ করে তখন আমাকে সংবাদ দিবে (যাতে আমি তাকে এ ব্যাপারে সঠিক বিধানটি অবহিত করতে পারি)।

ব্যাখ্যা ঃ কোন গর্ভবতী নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তার ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। এ মাসআলার ব্যাপারে চার ইমামের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু হযরত আলী (রা) থেকে একটি মুনকাতি (مُنْقَطِعٌ) বর্ণনা এর বিপরীতে রয়েছে এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে সহীহ হাদীস রয়েছে। কিন্তু তাঁরা তাঁদের ধারণা ও নীতি থেকে মত পরিবর্তন করেছেন। যেমন ইবন আবদুল বার (র) এ বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য আলিমদের মধ্যে এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে যে, একজন নারী নিফাস বন্ধ হওয়ার পূর্বে বিবাহ করতে পারবে কিনা ? মুসলিম ও নাসাঈ শরীফের রিওয়ায়েতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, জমহুর (সম্মিলিত) উলামায়ে কিরামের মতে সে বিবাহ করতে পারবে। তবে নিফাস বন্ধ হওয়ার আগে দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকবে।

بَابُ نَسْخِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِى الْبَقَرَةِ

সূরা বাকারায় উল্লেখিত মৃত্যুর ইদ্দতের সময় রহিত

٢٩٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

قَالَ مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُه اَنْ سُوْرَةَ النِّسَاءِ الْقَصْرٰى نَزَلَتْ بَعْدَ الْطُوْلٰى.
وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَسَخَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقَصْرٰى كُلَّ عَدَّةٍ اَوْلَاتِ اَحْمَالٍ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *

হাদীস নং- ২৯৬

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমি তার সাথে এ বিষয়ে মুবাহালা করতে প্রস্তুত যে, ছোট সূরাতুন নিসা (সূরা তালাক) দীর্ঘ সূরার (সূরা বাকারার) পরে নাযিল হয়েছে।

অপর এক রিওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ ছোট সূরা নিসা গর্ভবতীর সমস্ত ইদ্দত রহিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ গর্ভবতীর ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা ঃ কোন নারীর স্বামীর মারা গেলে কত দিন তার ইদ্দত পালন করতে হবে এ মাসআলার ব্যাখ্যা হলো এই যে, সূরা বাকারার আয়াত ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ـ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে এবং বিধবা স্ত্রী রেখে যায়, তাহলে তার বিধবা স্ত্রী অপেক্ষা করবে চার মাস দশ দিন।" (২ ঃ ২৩৪)

এ আয়াতের সামগ্রিকতার কারণে এ ধরনের সমস্ত মহিলার ইদ্দত চার মাস দশ দিন স্থির হয়েছে, যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে। ঐ মহিলা গর্ভবতী হোক বা না হোক। অতঃপর সূরা তালাকে বর্ণিত আছে ঃ وَاُولَاتُ الاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতের সময় হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত)। সুতরাং এ আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে গর্ভবতী নারীর যদিও তার স্বামী মৃত্যুবরণ করে থাকে, সন্তান প্রসব দ্বারা ইদ্দত নির্ধারিত হয়ে থাকে। যদিও সবচেয়ে কম সময়ে সন্তান প্রসব করে। সুতরাং হযরত আলী (রা) থেকে দু'টি আয়াতকে একত্র করার জন্য সতর্কতার নীতি বা পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। যদি চার মাস দশ দিন পর সন্তান প্রসব করে, তা হলে সন্তান প্রসবের সাথে সাথে ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। আর যদি চার মাস দশ দিনের পূর্বে সন্তান প্রসব করে, তাহলে চার মাস দশ দিনের পর ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

শাফিঈগণ এ ব্যাপারে দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে যে, সূরা বাকারার আয়াতকে সুবায়য়ার হাদীস দ্বারা সুনির্দিষ্ট হিসেবে মেনে নিবেন অথবা রহিত করবেন, কিন্তু হানাফীদের মতে সুবায়য়ার হাদীস দ্বারা সূরা বাকারার আয়াত সুনির্দিষ্টও হয় না, আবার রহিতও হয় না। কেননা خبر واحد (একক

ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস) কুরআনের আয়াতের জন্য নির্দিষ্টকারী নয়, আবার রহিতকারীও নয়। অবশ্য সূরা তালাকের আয়াত وَاُولَاتُ الاَحْمَال দ্বারা সূরা বাকারার আয়াত রহিত হয়ে যায়। কেননা হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর হাদীস হলো এ বিষয়ে স্পষ্ট দলীল এবং এটা প্রমাণ করে যে, সূরা তালাকের আয়াত হলো পরে নাযিলকৃত আয়াত, কাজেই এর রহিতকারী হয়েছে। তবে خبر واحد দ্বারা ইতিহাসের খোঁজ নেয়া যায়, কিন্তু সূরা বাকারার আয়াত সূরা তালাকের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে।

মুজামে তিবরানীতে হযরত উবাই (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আঁ হযরত (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, اولات الاحمال আয়াত তিন তালাক প্রদত্ত নারীর জন্য, না ঐ নারীর জন্য, যার স্বামী ইনতিকাল করেছে ? তিনি বলেছেন ঃ উভয়ের জন্য। সারকথা হলো এই যে, গর্ভবতী নারীর ইদ্দত সূরা তালাকের আয়াত দ্বারা সন্তান প্রসব পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে। চাই স্বামীর মৃত্যুর এক ঘন্টা পরই সন্তান প্রসব হোক না কেন। ইমাম মালিকের মুসনাদে হযরত উমর (রা)-এর একটি বর্ণনা আছে, গর্ভবতী নারী যদি এমন সময় সন্তান প্রসব করে যে, তার স্বামীর মৃতদেহ এখনও কাঠের উপর রয়েছে, দাফন করা হয়নি, তবুও তার ইদ্দত শেষ হয়ে গিয়েছে।

بَابُ فِى الْمَرْأَةِ تُوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

যে নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু তার মাহর নির্ধারণ করা হয়নি এবং তার সাথে সহবাসও করা হয়নি

٢٩٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) فِى الْمَرْأَةِ تُوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرُضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا صَدَقَةُ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيْرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الاَشْجَعِىُّ اَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى فِى بَرْدَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ *

হাদীস নং- ২৯৭

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, যে নারীর স্বামী মৃত্যুরবরণ করেছে কিন্তু তার মাহর নির্ধারণ করা হয়নি এবং তার সাথে সহবাসও করা হয়নি, এমন নারীর জন্য হলো মাহরে মিসাল (مهر مثل)। সে স্বামীর সম্পদের অংশীদার হবে এবং স্বামীর মৃত্যুর কারণে তার উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব হবে। এ বিষয়ে মা'কিল ইব্ন সিনান আশজাঈ

(রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বারদা বিনতে ওয়াশিকের জন্য তোমার মতই ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের বর্ণিত মাসয়ালার ব্যাপারে হযরত আলী (রা)-এর মতপার্থক্য রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। তিনি এরূপ নারীর জন্য মাহর প্রদান করতে হবে বলে মনে করেন না। কেননা তার সাথে স্বামীর সহবাস হয়নি। কিন্তু তাঁর এ মত সহীহ রিওয়ায়েতের দ্বারা বর্ণিত হয়নি। পক্ষান্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর হাদীস সঠিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান সহীহ (حسن صحيح) বলেছেন। এ ছাড়া হযরত মা'কিল (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মতামতের উপর মরফূ হাদীস দ্বারা সাক্ষ্য পেশ করেছেন। এমনকি মাকিল আশজাঈ (রা) ছাড়াও অনেকে এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে জাররাহ এবং আবূ সিনানাও রয়েছেন। কাতাদার সূত্রে বর্ণিত আবূ দাউদের রিওয়ায়েত দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মতামত নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে দলীল ও প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। বরং আবূ দাউদ ও তিরমিযীর রিওয়ায়েতে এটাও আছে যে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) যখন এ সাক্ষ্যের কথা শ্রবণ করেন, তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। কেননা তাঁর মতামত আঁ হযরত (সা)-এর ফয়সালার সাথে মিলে গিয়েছে। কাজেই এ হাদীসের ব্যাপারে কোন সন্দেহ বাকী নেই। ইমাম শাফিঈ (র) থেকে এ বিষয়ে দুটি রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। একটি হলো হযরত আলী (রা)-এর মতামতের স্বপক্ষের অপরটি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর অনুসরণে। বরং এটাও বর্ণিত আছে যে, ইমাম শাফিঈ (র) মিসরে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর পক্ষে স্বীয় মতামত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ فِى الاِيْلَاءِ بِالْكَلَامِ

কথার মাধ্যমে ঈলা

٢٩٨- حَمَّادٌ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ فِى الْمُوْلِى فَيْئُه الْجِمَاعُ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ عُذْرٌ فَفَيْئُه بِاللِّسَانِ *

হাদীস নং- ২৯৮

অনুবাদ ঃ হযরত আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত, মু'লীর (ঈলাকারী) প্রত্যাবর্তন বা ফিরিয়ে নেয়ার পদ্ধতি হলো সহবাস করা। কিন্তু তার এমন কোন ওযর বা অক্ষমতা যা তাকে সহবাস থেকে বিরত রাখে। (যেমন পুরুষ অথবা নারীর কোন রোগে আক্রান্ত হওয়া, নারীর অবস্থান পুরুষের অবগত না হওয়া। তাদের মধ্যে চার মাসের দূরত্ব হতে হবে। স্বামীর পুরুষাঙ্গ কর্তন হওয়া অথবা স্ত্রীর দৈহিক এমন কোন রোগ হওয়া যার ফলে সে সহবাস করার ব্যাপারে অযোগ্য হয়ে পড়ে)। এমন অবস্থায় তার প্রত্যাবর্তন হবে কথার মাধ্যমে।

ব্যাখ্যা ঃ ঈলার (ايلاء) পদ্ধতি হলো এই যে, এক ব্যক্তি শপথ করল, আমি চার মাস বা এর চেয়ে অধিক সময়ের জন্য আমার স্ত্রীর নিকট গমন করব না। তা হলে এ ব্যক্তি হবে মূ'লী (مولى) এবং তার এ কাজটি হবে ঈলা (ايلاء)। ঈলা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ الاَيْة (ঐ সমস্ত লোক, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে.....)। (২ ঃ ২২৬)

ঈলার বিধান হলো এই যে, যদি ঈলাকারী ব্যক্তি উক্ত সময়ের মধ্যে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তা হলে ঈলা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার উপর কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে এবং ঈলা শেষ হয়ে যাবে। যদি নির্ধারিত সময়ে সে স্ত্রীর নিকট গমন না করে এবং ইত্যবসরে সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তা হলে এর বিধান সম্পর্কে শাফিঈ, মালিকী, হাম্বলী এবং হানাফীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। উপরোক্ত মাযহাবসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাকে বিচারকের সামনে হাযির করতে হবে এবং বাধ্য করতে হবে যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিবে অথবা ফিরিয়ে নেবে। সুতরাং এটা বলা যায় যে, ঈলার সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের মতে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার স্বামীর রয়েছে।

হানাফীদের মতে সময় অতিবাহিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই এক তালাকে বাইন কার্যকর হয়ে যাবে এবং এরপর তাকে ফিরিয়ে নেয়ার কোন অধিকার স্বামীর থাকবে না। সময়ের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারবে, কিন্তু সময়ের পরে নয়। এটাই হলো জমহুর সাহাবায়ে কিরামের মত। এঁদের মধ্যে হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত ইব্ন উমর, হযরত ইব্ন মাসঊদ, হযরত ইব্ন আব্বাস, হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) অন্যতম। শীর্ষস্থানীয় তাবেঈগণ, যেমন হযরত আতা, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব, আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান, মাকহুল, ইবনুল হানাফিয়্যা, শা'বী, নাখঈ, মাসরুক (র) ও অন্যান্য বুযর্গ হানাফীদের সাথে ঐকমত্যে রয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা যে, জমহুর সাহাবায়ে কিরাম হানাফীদের বিরোধী। বরং সবচেয়ে সহীহ রিওয়ায়েত হানাফী মাযহাবের পক্ষ ও সমর্থনে রয়েছে। যেমন আবদুর রাযযাক স্বীয় মুসান্নাফের রিওয়ায়েতে বলেন, উসমান ও যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) ঈলার ব্যাপারে বলতেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন এক তালাক হবে এবং একজন নারী তার নিজ সত্তার ব্যাপারে অধিক ইখতিয়ারের অধিকারী। সে তালাকপ্রাপ্তার মত ইদ্দত পালন করবে। অতঃপর কাতাদা (র)-এর সূত্রে হযরত আলী (রা), হযরত ইব্ন মাসঊদ এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুদ্দত (সময়) অতিবাহিত হওয়ার পর এক তালাকে বাইন কার্যকর হয়ে যাবে। এ সমস্ত রিওয়ায়েতের বর্ণনাকারী বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসেরও বর্ণনাকারী অথবা এ দু'হাদীসের শর্তের অনুরূপ। এমনিভাবে কুরআন মজীদের একটি আয়াতও হানাফী মাযহাবের পক্ষে রয়েছে। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র) ফতহুল কাদীরে অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন।

بَابُ الْخُلْعِ

খুলার বর্ণনা

٢٩٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيِّ اِنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اَتَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لاَ اَنَا وَلاَ ثَابِتٌ فَقَالَ اَتَخْتَلِعِيْنَ مِنْهُ بِحَدِيْقَتِهِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَاَزِيْدُ قَالَ اَمَّا الزِّيَادَةُ فَلاَ *

হাদীস নং- ২৯৯

অনুবাদ ঃ হযরত আইয়ূব সাখতিয়ানী (র) থেকে বর্ণিত, সাবিত ইব্ন কায়েস-এর স্ত্রী রাসূলূল্লাহ (সা)-এর নিকট গমন করে আরয করল, না আমি সাবিতের সাথে অবস্থান করতে পারছি এবং না সাবিত আমার সাথে জীবন অতিবাহিত করতে পারছে (বরং এটা আমাদের মধ্যে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে)। তিনি বললেন ঃ তুমি কি তোমার স্বামী থেকে খুলার (তালাক) কামনা করছ। তাহলে (মাহর হিসেবে প্রাপ্ত) বাগান তাকে ফিরিয়ে দিতে সম্মত আছ ? তখন ঐ মহিলা বলল, হাঁ! আমি আরো বেশি দেব। নবী করীম (সা) বললেন ঃ না, অতিরিক্ত দেবার প্রয়োজন নেই।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খুলার (তালাক) মধ্যে মাহরের উপর অতিরিক্ত কিছু দেয়ার প্রয়োজন নেই। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। আতা (র) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ খুলা তালাকে ইচ্ছুক স্ত্রী থেকে যা সে মাহর হিসেবে প্রদান করেছে, এর অতিরিক্ত কিছু স্বামী গ্রহণ করবে না। আবদুর রায্যাক (র) হযরত আলী (রা) থেকে এক রিওয়ায়েত বর্ণনা করেন ঃ لاَ تَأْخُذْ مِنْهَا فَوْقَ مَا اَعْطَيْتَهَا [তুমি তোমার স্ত্রীকে প্রদত্ত মাহর থেকে অতিরিক্ত কিছু (খুলা তালাকের সময়) গ্রহণ কর না]। তাউস (র) থেকেও এমনি একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

كِتَابُ النَّفَقَاتِ

খোরপোষের বিবরণ

٣٠٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَاتَ اَحَدُكُمْ مَغْمُوْمًا مَهْمُوْمًا مِنْ سَبَبِ الْعِيَالِ كَانَ اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ اَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ *

হাদীস নং- ৩০০

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে কেউ স্বীয় পরিবার-পরিজনের কারণে দুঃশ্চিন্তা ও হয়রান-পেরেশানির মধ্যে রাত অতিবাহিত করে, তা হলে এটা আল্লাহ্র রাস্তায় এক হাযার তলোয়ার মারা থেকেও আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম।

ব্যাখ্যা ঃ এ বিষয়ে আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে যে, স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করা মুসলমানের অত্যন্ত পূণ্যের কাজ। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যখন কোন মুসলমান স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে, তখন এটা সদকা হিসেবে গণ্য হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, তুমি যা কিছুই খরচ করবে, যদি এতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটা তোমার জন্য সওয়াবের কারণ হবে। এমন কি ঐ লোকমা যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে দিয়ে থাক।

٣٠١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى اللُّقْمَةُ تَرْفَعُهَا اِلٰى فِىْ اِمْرَأَتِكَ *

হাদীস নং- ৩০১

অনুবাদ ঃ হযরত সাআদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

তুমি যা কিছুই খরচ কর না কেন, যদি এতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে এতে তোমাকে পুরস্কার ও সওয়াব দেয়া হবে। এমনকি ঐ লোকমার জন্যও, যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে দিয়ে থাক।

ব্যাখ্যা ঃ এটা বান্দার উপর আল্লাহর অত্যন্ত মেহেরবানী যে, নিয়্যতের বিশুদ্ধতার কারণে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত কাজেও আল্লাহ্ সওয়াব ও পূণ্য দান করে থাকেন। যেমন সন্তান-সন্ততির লালন-পালন এবং তাদের জন্য উপার্জন করতে গিয়ে কষ্ট করা আমাদের স্বভাব ও প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত, এতে আমাদেরই উপকার রয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা এর জন্য সওয়াব ও পুরস্কার দিয়ে থাকেন। নিয়্যত শুদ্ধ করে নিলেই ইহকাল ও পরকালের শান্তি লাভ করা যায়। এতে আল্লাহ্‌র মেহেরবানী ও রহমত রয়েছে, যা তিনি তাঁর নেক বান্দাদের উপর বর্ষণ করে থাকেন।

كِتَابُ التَّدْبِيْرِ
মুদাব্বার করার বর্ণনা

بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
মুদাব্বার-এর বিক্রয়ের বর্ণনা

٣٠٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) اَنَّ عَبْدًا كَانَ لِاِبْرَاهِيْمَ بْنِ نُعَيْمِ النَّحَّامِ فَدَبَّرَهُ ثُمَّ احْتَاجَ اِلٰى ثَمَنِهِ فَبَاعَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِ مِائَةَ دِرْهَمٍ - وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ *

হাদীস নং- ৩০২

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, ইবরাহীম ইব্ন নুআয়ম নাহ্হামের একজন গোলাম ছিল। তিনি তাকে মুদাব্বার (مدبر) করে দেন। এরপর গোলামের মূল্য (অর্থ) তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং নবী করীম (সা) আট'শ দিরহামের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করেন।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, তিনি এক মুদাব্বার গোলামকে খরিদ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ مدبر হলো ঐ গোলাম যাকে তার মুনিব এটা বলে দিয়েছে যে, আমি যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে তুমি আযাদ বা স্বাধীন। এ হাদীসে একটি বিতর্কিত মাসয়ালা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। মতপার্থক্যের কারণ হলো এই যে, مدبر গোলাম ক্রয় করা জায়েয কিনা।

ইমাম শাফিঈ-এর মতে জায়েয আছে। তিনি বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার গোলামকে مدبر করার পর তার কাছে আর কোন মাল ছিল না। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌছার পর তিনি বললেন ঃ এ গোলামটি কে আমার থেকে ক্রয় করবে ? নুআয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ আট'শ দিরহাম দিয়ে তাকে খরিদ করেন। নবী করীম (সা) এ টাকা তাকে প্রদান করেন।

নাসাঈ শরীফে বর্ণিত আছে, ঐ ব্যক্তি দেনাদার ছিল। হুযূর (সা) এ গোলামকে বিক্রি করে উক্ত টাকা তাকে দিয়ে বললেন ঃ এরদ্বারা করয আদায় কর। বর্ণিত হাদীস এর সমর্থন করে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে مدبر গোলাম বিক্রয় করা জায়েয নয়। তিনি দারে কুতনীতে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত মরফূ' হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন ঃ اَلْمُدَبَّرُ لاَيُبَاعُ وَلاَيُوْهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ (মুদাব্বার গোলাম বিক্রয় বা হেবা করা জায়েয নয় এবং সে এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা আযাদ হবে)।

এ হাদীসের মরফূ হওয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ সমালোচনা করে থাকেন। তবে মওকুফ হাদীস তো নিঃসন্দেহে সহীহ। দারে কুতনী ও এ হাদীসকে মওকুফ সহীহ বলেছেন। সুতরাং এটা সাহাবীর বর্ণনা এবং যেখানে কিয়াসের কোন অধিকার নেই, সেখানে সাহাবীর বর্ণনাকে মরফূ হাদীসের মর্যাদায় স্থান দেয়া হয়ে থাকে। তাই এ বর্ণনা মরফূ হাদীসের মধ্যে গণ্য হবে।

এবার হযরত জাবির (রা)-এর হাদীসের জওয়াব হলো এই যে, এ হাদীস বিশেষ কোন ঘটনা বর্ণনা করেছে যা হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর হাদীসের ব্যাপকতাকে খন্ডন করে না। হাঁ, তবে প্রতিবন্ধকতা ঐ সময় সৃষ্টি হয় যখন একই বাক্যে ও বিষয়ে অন্য কোন হাদীস পাওয়া যায়। মুদাব্বার গোলাম বিক্রয় করা যায়। অতঃপর ঐ হাদীস যা আবূ জা'ফর থেকে দারে কুতনী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, তা হলো দারে কুতনী আবদুল মালিক ইব্ন আবূ সুলায়মান সূত্রে এবং বায়হাকী হাকিম সূত্রে হযরত জাবির (রা)-এর এই فعلي حديث -এর ব্যাখ্যা। ঐ বাহ্যিক অন্তরায় এভাবে দূরীভূত করে ঃ لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ (মুদাব্বার গোলামের খেদমত ও সেবা বিক্রয় করা কোন দুষণীয় নয়)। ইব্ন কাতান এটাকে وصلا وارسالا উভয় পদ্ধতিতে সহীহ বলেছেন। কাজেই এ হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত জাবির (রা)-এর হাদীসের এ ব্যাখ্যা দেয়া যায় যে, এ বিক্রি হলো উক্ত গোলামের খেদমত বিক্রি যা বৈধ ও জায়েয। গোলামের বিক্রি নয়। مدبر তার মনিবের অঙ্গীকার অনুযায়ী তার মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে যাবে।

بَابُ الْوَلاَءِ

ওয়ালার বর্ণনা

٣٠٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ لِتُعْتِقَهَا فَقَالَتْ مَوَالِيْهَا لاَ نَبِيْعُهَا اِلاَّ اَنْ نَشْتَرِطَ الْوَلاَءَ لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ *

হাদীস নং- ৩০৩

অনুবাদ ঃ হযরত আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা) হযরত বারীরা (রা)-কে

ক্রয় করে আযাদ করে দেয়ার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তার মুনিব বললো, আমি তাকে বিক্রয় করব না। তবে এ শর্তে যে, তার ওয়ালার অধিকার আমার থাকবে (তাহলে বিক্রয়ে সম্মত আছি)। হযরত আয়েশা (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করলেন। তিনি (সা) বললেন ঃ ওয়ালার অধিকার তারই উপর বর্তাবে, যে তাকে আযাদ করবে।

ব্যাখ্যা ঃ আযাদকৃত গোলামের মৃত্যুর পর যদি তার নিকট-আত্মীয় ও আসাবা থেকে কেউ না থাকে, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে আযাদকারী মুনিব। এই অধিকারকে (ওয়ালা) বলা হয়। কেননা শরীয়তে আযাদকারীকে আসাবার মধ্যে গণ্য করা হয়। তবে বংশগত আসাবা থেকে এর স্তর হল নীচে।

بَابُ النَّهِى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِه

ওয়ালা বিক্রি বা হেবা করা নিষিদ্ধ

٣٠٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِه *

হাদীস নং- ৩০৪

অনুবাদ ঃ হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ওয়ালা (وَلَاء) বিক্রয় ও হেবা করা থেকে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ বিধান পূববর্তী হাদীসের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ আযাদকৃত গোলামের যদি নিকট-আত্মীয় কেউ না থাকে, তা হলে আযাদকারী মুনিব তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে। সুতরাং যেখানে এটা আযাদকারীর জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে, তা হলে এর বিক্রয় বা হেবা কিভাবে জায়েয হবে এবং তিনি কিভাবে স্বীয় অধিকারকে স্থানান্তর করবেন ? কোন বদলা নিয়ে এরূপ করা যাবে না, আবার বিনামূল্যেও করা যাবে না। পূববর্তী উলামায়ে কিরাম এতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইমাম নববী (র) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা এ বিষয়ে মতানৈক্য করে এটাকে জায়েয বলেছেন, সম্ভবত তাদের নিকট এ হাদীস পৌছেনি।

كِتَابُ الْاِيْمَانِ
শপথ করার বর্ণনা

بَابُ النَّهِى عَنْ يَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ
মিথ্যা শপথ করা নিষিদ্ধ

٣٠٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَاصِحِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَيُقَالُ ابْنُ عَجْلَانَ يَحْيَى بْنِ يَعْلٰى وَاِسْحٰقُ بْنَ السَّلُوْلِىُّ وَاَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنَ عَلِىٍّ بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِمَّا يُعْصَى اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِ شَئْىٌ هُوَ اَعْجَلُ عِقَابًا مِنَ الْبَغْىِ وَمَا مِنْ شَئْىٍ اُطِيْعَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِ اَسْرَعُ ثَوْابًا مِنْ الصِّلَةِ وَالْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ تَدْعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ -

وَفِى رِوَايَةٍ لَيْسَ شَئْىٌ اَعْجَلَ ثَوْابًا مِنْ صِلَةَ الرَّحِمِ وَلَيْسَ شَئْىٌ اَعْجَلَ عُقُوْبَةً مِنَ الْبَغْىِ وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمِ وَالْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ تَدْعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ -

وَفِى رِوَايَةٍ مَامِنْ عَمَلٍ اَطِيْعُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ بِاَعْجَلِ ثَوْابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِيْمِ وَمَامِنْ عَمَلٍ عُصِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِ بِاَعْجَلَ عَقُوْبَةً مِّنَ الْبَغْىِ وَالْيَمِيْنَ الْفَاجِرَةُ تَدْعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ *

হাদীস নং- ৩০৫

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানীর মধ্যে এমন কিছুই নেই যা বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা থেকে অধিক দ্রুত শাস্তির

যোগ্য করে দেয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের যাবতীয় নীতি ও পদ্ধতির মধ্যে এমন কিছু নেই যা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কাজ থেকে অধিক সওয়াব ও পুরস্কার পাওয়া যায়। মিথ্যা অঙ্গীকার শহরসমূহ ধ্বংস করে দেয়।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, কোন বস্তুই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা থেকে দ্রুত সওয়াবের অধিকারী করে না এবং কোন বস্তুই অবাধ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে দ্রুত আযাব ও শাস্তির সম্মুখীন করে না। মিথ্যা অঙ্গীকার বা শপথ শহরসমূহ ধ্বংস করে দেয়।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের জন্য যে সমস্ত আমল করা হয়, এর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা থেকে অধিক দ্রুত সওয়াব ও পূণ্যের আর কোন কিছু নেই এবং আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানীর মধ্যে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা থেকে দ্রুত শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার মত আর কিছু নেই। মিথ্যা শপথ বা অঙ্গীকার শহরসমূহ ধ্বংস করে দেয়।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানীর মধ্যে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা থেকে দ্রুত শাস্তির কারণ হওয়ার জন্য আর কিছু নেই।

ব্যাখ্যা ঃ এটা হলো কসম গামুসের প্রতিক্রিয়া যা অতীত কথা বা কাজের উপর কসম করা হয়। এটাকে এজন্য 'গামুস' বলা হয় যে, এটা শপথকারীকে ইহকালে পাপী এবং পরকালে দোযখের অধিবাসী করে থাকে।

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, আহমদ, আওযাঈ, সুফয়ান সাওরী, ইসহাক ও অন্যান্যদের মতে হাদীসে কসম বা অঙ্গীকারের জন্য কোন কাফফারা নেই। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-ও একই মত পোষণ করেছেন। কুরআন ও হাদীসে এর স্বপক্ষে দলীল রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে এতে কাফফারা প্রদান করতে হবে। কিন্তু তাঁর মতের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে কোন হাদীস পাওয়া যায় না।

এ হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মিথ্যা কসম, নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ। হাদীসে বিদ্রোহকারীর কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে এবং এগুলো মুতাওয়াতির পর্যায় পর্যন্ত পৌছেছে। তিবরানী তারিখে কবীরে, বুখারী তাঁর তারিখ গ্রন্থে আবূ বাকরা (রা) থেকে এ মরফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বিদ্রোহ ও পিতামাতার অবাধ্যতা দু'টো এরূপ বস্তু যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে খুব দ্রুত শাস্তি প্রদান করে থাকেন। ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে, ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদে, ইবন হিব্বান এবং হাকিম (র) নিজ নিজ সহীহ গ্রন্থে আবূ বাকরা (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বড় এমন কোন পাপ নেই যার কারণে পরকালের শাস্তি ছাড়াও ইহকালেই আল্লাহ্ তা'আলা দ্রুত শাস্তি প্রদান করে থাকেন।

মোট কথা পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা এগুলোর মারাত্মক পাপ হওয়া প্রমাণিত হয়েছে এবং উলামায়ে উম্মত এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অবশ্য পূর্ববর্তীকালে সংঘটিত বিদ্রোহ সম্পর্কে উলামা কিরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। যেমন সিফ্ফীনের যুদ্ধে কেউ কেউ এই ভেবে বিরোধিতা করেছেন যে, এটা খিলাফতের প্রতি বিদ্রোহ ছিল না। কিন্তু ঐ সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তি

যেহেতু যুদ্ধরত ছিলেন এবং মুজতাহিদ ছিলেন, তাই তাঁরা ইজতিহাদের জন্য পাপী হওয়ার (নাউযুবিল্লাহ) পরিবর্তে আল্লাহ্‌র নিকট পূণ্যের অধিকারী হবেন। কারণ ইজতিহাদের এটাই হলো বিধান। এক দল এর বিপরীত ধারণাও করেছেন যে, হয়ত এটা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ ছিল কিন্তু ঐ সময় পর্যন্ত প্রচার না হওয়ার কারণে ঐ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের নিকট এ হাদীস পৌছেনি। কাজেই এ ক্ষেত্রে তাঁরা মাযূর বা ক্ষমার যোগ্য হবেন। কিন্তু এ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এরূপ প্রসিদ্ধ মুতাওয়াতির হাদীস কিভাবে ঐ সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তির নিকট গোপন থাকতে পারে! কাজেই অধিকাংশ এটাকে বিদ্রোহ বলেছেন। কিন্তু এটা হলো ইজতিহাদী বিষয় যা পাপের পরিবর্তের পূণ্য ও সওয়াবের বিষয়। অন্যথায় এটা হবে কবীরা গুনাহ্ (নাউযুবিল্লাহ)। এরপর এরূপ ধারণা কিভাবে হতে পারে যেখানে হযরত আলী (রা) থেকে ইব্‌ন আদী স্বীয় কামিল গ্রন্থে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন, 'বিদ্রোহ থেকে' ভয় কর। কেননা বিদ্রোহ থেকে অন্য কিছুর শাস্তি এত দ্রুত পৌছে না, এবার রইল জঙ্গে জামালের (উষ্ট্রের যুদ্ধ) ঘটনা। তবে এটা ইচ্ছাকৃত সংঘটিত হয়নি এবং এতে খিলাফতের বিরোধিতা করাও উদ্দেশ্য ছিল না বলে এটা বিদ্রোহের মধ্যে গণ্য হয়নি। সুতরাং এটা মতানৈক্যের বিষয়বস্তু হতে পারে না। এ মর্মে তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ এক মরফূ হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, ঐ উত্তম কাজ, যাতে সওয়াব দ্রুত লাভ করা যায়. তাহলো মানুষের কল্যাণ করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং ঐ অন্যায় কাজ, যা দ্রুত শাস্তির অধিকারী করে, তা হলো বিদ্রোহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

بَابُ نَذْرِمَعْصِيَةٍ وَفِيْهِ الْكَفَّارَةُ وَعَدْمِ الْوَفَاءِ

পাপের কাজে মান্নত করা এবং এতে যে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় তা পূর্ণ না করার বর্ণনা

٣٠٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِيَهِ فَلَا يَعْصِهِ *

হাদীস নং- ৩০৬

অনুবাদ ঃ হযরত ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ মান্নত করে যে, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে (অর্থাৎ কোন জায়েয ও নেককাজ করবে), তা হলে তার উচিৎ আনুগত্য করা এবং নেককাজ পূর্ণ করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার মান্নত করবে, তার উচিৎ আল্লাহ্‌র নাফরমানী না করা। ক্রোধের অবস্থায় মান্নত করা হলে তা কার্যকর বা গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীসের শেষ বাক্যের ব্যাখ্যা হলো এই যে, ক্রোধের অবস্থায় মান্নত করা

হলে তা কার্যকর বা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা ক্রোধ ও উত্তেজনার সময় বিবেক লোপ পায় এবং এ অবস্থায় তার কাজ অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। ইচ্ছাকৃত হয় না বলেই এ মান্নতের উপর বিধি আরোপ হবে না। অথবা এরূপ বিষয়ে মান্নত হবে না, যা আল্লাহ্‌র গযব, শাস্তি এবং অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। প্রথম অবস্থা তো হযরত আলী (রা)-এর মতামতের সমর্থক এবং لغوقسم (বেহুদা অঙ্গীকার) সম্পর্কে হযরত আলী (রা) থেকে একটি বর্ণনা আছে اللغوهو اليمين فى الغضب (ক্রোধ অবস্থায় অঙ্গীকার বা শপথ করা বাতিল বলে গণ্য হবে)। তাউসও এ মতপোষণ করেছেন।

٣٠٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَكَفَارَتُهُ كَفَارَةُ يَمِيْنٍ *

হাদীস নং- ৩০৭

অনুবাদ ঃ হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানীর কাজে মান্নত করা হলে তা পূরণ করতে হবে না এবং এর কাফফারা অঙ্গীকার বা কসমের কাফফারার অনুরূপ।

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীসের কাফফারা সংক্রান্ত বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে পাপের কাজে মান্নত করা হলে কোন কাফফারা দিতে হবে না। কেননা পাপের কাজে মান্নত নিরর্থক ও বাতিল। সুতরাং এতে কাফফারার কোন প্রয়োজন নেই। হাদীসের অধ্যায়ে তাঁরা ঐ সমস্ত হাদীস উল্লেখ করে থাকেন যেগুলোতে কাফফারার কথা নেই। অথবা শুধু এ বাক্য উল্লেখ করেন ঃ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِىْ مَعْصِيَةٍ (পাপের কাজে মান্নত পূর্ণ করার প্রয়োজন নেই)। অথবা لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজে মান্নত পূর্ণ করতে হবে না)।

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক (র)-এর মতে নাফরমানীর কাজে মান্নতের কাফফারা শপথ বা কসমের কাফফারার মত আদায় করতে হবে। তাঁদের দলীল হলো হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা)-এর বর্ণিত হাদীস, যাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, এতে কসমের কাফফারার মত কাফফারা দিতে হবে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসের সমালোচনার কোন অবকাশ নেই। তিরমিযী ও অন্যান্য হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণিত আছে, মান্নতের কাফফারা কসমের কাফফারার মত। ইমাম নববী (র) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে কাফফারার পক্ষে মতামত প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন ঃ اَمَا حَدِيْثُ كفادية كَفَا رِيَتُهُ كَفَارة اليَمين فَضَعِيف بِاتفَاق الْمُحَدِّثِيْن অর্থাৎ হাদীস كفارة اليمين মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মতিক্রমে মতে দুর্বল (ضعيف)। অবশেষে বলেছেন, এ হাদীসকে ইমাম তাহাভী ও ইবনুল মিসকীন (র) সহীহ বলেছেন। সুতরাং এ হাদীসের দুর্বল

হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য অটুট থাকেনি। এ ছাড়া কিয়াসও এ মাযহাবের সমর্থন করে। কেননা জরুরী কসম মান্নতের সাথে সম্পর্কিত। উভয় অবস্থায় মান্নত পূর্ণ হয়ে থাকে মুবাহ বা হালালের স্বীকৃতির সাথে। অর্থাৎ একটি মুবাহ্ বস্তুকে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয়া এবং এটা হালালকে হারাম করে নেয়াকে অপরিহার্য করে তোলে যা অঙ্গীকার বা কসমের মূল উৎস। সুতরাং আল্লাহ তাআলা আঁ হযরত (সা)-এর বাণীর প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করেন ঃ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ (কেন আপনি হারাম করে নিয়েছেন ঐ বস্তু, যা আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য হালাল করেছেন)। (৬৬ ঃ ১)

بَابُ يَمِيْنِ اللَّغْوِ

অর্থহীন কসমের বর্ণনা

٣٠٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَيُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لاَ وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ *

হাদীস নং- ৩০৮

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ (আল্লাহ্ তোমাদেরকে অর্থহীন কসমের জন্য দায়ী করবেন না) এর ব্যাখ্যায় শুনেছি, يمين اللغو বা নিরর্থক কসমের অর্থ মানুষের এ কথা যেমন لاَ وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ অর্থাৎ না, আল্লাহর কসম এবং হাঁ, আল্লাহ্র কসম।

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীসে মূলত لغوقسم বা নিরর্থক কসম ও শপথের মাসয়ালা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত কসমও তিন প্রকার ঃ

প্রথম হলো ইয়ামীন গমুস (يمين غموس) ঃ ইয়ামীনে গামূস হলো এই যে, অতীতের কোন বিষয়ের উপর শপথ (قسم) করা। এরদ্বারা মানুষ পাপী হয়ে থাকে এবং শরীয়তে এরজন্য কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আঁ হয়রত (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করবে, আল্লাহ তাকে দোযখে প্রবেশ করাবেন। এর প্রতিকার বা সংশোধনের উপায় হলো তওবা ও ইসতিগফার। হানাফী মাযহাবমতে এতে কাফফারা নেই। শাফিঈ মাযহাব অনুযায়ী এতে কাফফারা রয়েছে।

দ্বিতীয় হলো ইয়ামীনে মুনআকিদা (يمين منعقده) ঃ ইয়ামীনে মুনআকিদা হলো এই যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করবে বা করবে না, এ বিষয়ে কোন ব্যক্তির শপথ করা। এতে শপথ

ভঙ্গ করা হলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَ (কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, সে সবের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন)। (৫ ঃ ৮৯)

তৃতীয় হলো ইয়ামীনে লাগব (يمين لغو) ঃ এর ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কিরাম ও এর পরবর্তীগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে يمين لغو হলো এই যে, মানুষ না বুঝে কোন চিন্তা ছাড়াই মুখে কসমের বাক্য উচ্চারণ করে। কথায় কথায় এরূপ শপথ বাক্য উচ্চারণ করা অনেকের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে يمين لغو হলো এই যে, কোন অতীত কাজ বা কথার উপর কসম করা, যেন সে তার ভুল বুঝতে সক্ষম হয়েছে। মোট কথা সে তার জ্ঞান অনুযায়ী সঠিকভাবে কসম করেছে। যেমন কোন একটি কথার ব্যাপারে তার বিশ্বাস রয়েছে যে, আমি বলেছি এবং সে তার বলার উপরই কসম করে। কিন্তু পরে চিন্তা করে যে, সে এটা বলেনি বা করেনি অথবা এর বিপরীত করেছে। অথবা যেমন দূর থেকে এক ব্যক্তিকে দেখে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, এ ব্যক্তি হলো যায়দ, কিন্তু পরে দেখা গেল সে যায়দ নয়, বরং উমর। এতে কোন কাফ্‌ফারা নেই। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, হাসান, ইবরাহীম, নাসাঈ, কাতাদা, মাকহুল (র) ও অন্যান্যগণ لغو কসমের এ ব্যাখ্যা করেছেন।

হযরত আলী (রা)-এর মতে لغو হলো ঐ কসম যা ক্রোধের সময় বলা হয়। সাঈদ ইবন যুবায়র (রা)-এর মতে ঐ কসমকে বলা হয় যা বিপদের সময় করা হয়। উপরে মাসয়ালা সম্পর্কে একটি সাধারণ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এবার বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে মীমাংসা হলো এই যে, এ হাদীস বাহ্যিক দৃষ্টিতে শাফিঈ মাযহাবের সমর্থন করে থাকে, হানাফী মাযহাবের নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র) স্বীয় হাদীস গ্রন্থ মুয়াত্তায় এ সমস্যাকে হাদীসের বাহ্যিক দৃষ্টিতে শাফিঈ মাযহাবের স্বপক্ষে মানা সত্ত্বেও বলেছেন, যদি মানুষ মুখে এ বাক্য (কসম) বলে থাকে এবং দৃঢ়ভাবে এটা তার বিশ্বাস হয় যে, আমিই সঠিক কিন্তু এরপর ঘটনা বিপরীত প্রমাণিত হয় এবং তার বিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হয় (তবে এতে কাফফারা হবে না)। কেননা হানাফী মাযহাব মতে ইচ্ছা (قصد) لغو يمن -এর মধ্যে গণ্য, কিন্তু শাফিঈ মাযহাবে গণ্য নয়। অতঃপর এটাও লক্ষণীয় বিষয় যে, ইমাম আবূ হানীফা থেকে দুর্বল (ضعيف) সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত। মোট কথা ইমাম আবূ হানীফার প্রসিদ্ধ মাযহাব স্বীয় স্থানে সহীহ মানতে হবে।

٣٠٩ - حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) فِى قَوْلِ اللّٰهُ عِزَّ وَجَلَّ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِى اَيْمَانِكُمْ قَالَتْ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لاَ واللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ مِمَّا يَصِلَ بِهِ كَلاَمَهُ مِمَّا لاَ يَعْقِدُ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حَدِيْثًا *

হাদীস নং- ৩০৯

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) আল্লাহ্‌র তাআলার বাণী لاَيُؤَاخِذُكُمُ اللّه بِاللَّغْوِ فِى اَيْمَانِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, لغوقسم হলো, মানুষ যদি বলে لاَ وَاللّه وَبَلَى وَاللّه (না, আল্লাহ্‌র শপথ বা হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ) অর্থাৎ এরূপ কথা যাতে তার অন্তরে কোন কথার উপর কসম করার ইচ্ছা না করে। (এরূপ কথা যা অভ্যাসের কারণে কোন চিন্তা ছাড়াই মুখ থেকে বের হয়ে থাকে)।

بَابُ الاِسْتِثْنَاءِ فِى الْيَمِيْنِ يُبْطِلُهَا

কসমের মধ্যে ব্যতিক্রম বা প্রভেদ করা হলে কসম বাতিল হয়ে যাবে

٣١٠ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَاسْتَثْنَى فَلَه ثُنْيَاهُ *

হাদীস নং- ১১০

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কথার উপর কসম করবে এবং এতে কিছু ব্যতিক্রম করবে, তা হলে ঐ কসমে তার জন্য ব্যতিক্রম হবে। অর্থাৎ استثناء মান্য করা হবে এবং কসম কার্যকর হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ استثناء এর অর্থ হলো ইনশাআল্লাহ (انشاء اللّه) বলা। যদি কসমের শব্দের সাথে সাথে এটা বলা হয়, তাহলে এটা কসমকে বাতিল এবং অর্থহীন করে দেবে। আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং হাকিম হযরত ইবন উমর (রা) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَقَالَ اِنْشَاءَ اللّه فَقَد اسْتَثْنى - [যে ব্যক্তি কোন কিছুর উপর কসম করে বলল ইনশাল্লাহ, তাহলে তার اِسْتِثْنى (ব্যতিক্রম বা প্রভেদ) সহীহ বলে গণ্য হবে এবং কসম কার্যকর হবে না]।

٣١١ - حَمَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَقَالَ اِنْشَاءَ اللّهِ فَقَدِ اسْتَثْنى *

হাদীস নং- ৩১১

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কিছুর উপর কসম করে বলল, ইনশাআল্লাহ, তাহলে তার এ استثنى সহীহ হবে। অর্থাৎ কসম ওয়াজিব হবে না।

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

হুদূদ অধ্যায়

بَابُ حُرْمَةِ الْخَمْرِ وَالْقِمَارِ وَغَيْرِهُمَا

মদ, জুয়া এবং এরূপ অন্যান্য হারাম বস্তুর বর্ণনা

٣١٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسَرَ وَالْمِزْمَارَ وَالْكُوْبَةَ *

হাদীস নং- ৩১২

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর মদ, জুয়া, বাঁশী এবং তবলা হারাম করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের কুবাতা (كوبة) শব্দের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ নারদ ও শতরঞ্জ কেউ কেউ বলেছেন, ছোট তবলা এবং বরবত। মোট কথা এ সমস্ত বাদ্যযন্ত্র হলো হারাম। এভাবে মিযমার (مزمار) ঐ সমস্ত যন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে যা গান-বাজনার মধ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন বীণা ও তাম্বুরা ইত্যাদি। মদ ও গানের বাদ্যযন্ত্রের হারাম হওয়া সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। মুসলিম শরীফে হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুয়া বা দাবা খেলে, সে যেন স্বীয় হাত শূকরের মাংস ও রক্ত দ্বারা অপবিত্র করল। ইমাম আহমদ হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে একটি মরফূ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত স্বরূপ এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তিনি আমাকে এ নির্দেশ প্রদান করেছেন, যেন আমি পৃথিবী থেকে বাদ্যযন্ত্র, মূর্তিপূজা, ক্রুশপূজা এবং মূর্খতাকে ধ্বংস ও রহিত করি। এবং আমার প্রতিপালক স্বীয় ইয্যতের কসম করে বলেছেন, আমার যে বান্দা মদের এক ঢোক পান করবে, আমি তাকে সমপরিমাণ পুঁজ পান করাবো। আর যে ব্যক্তি আমার ভয়ে মদ্যপান ত্যাগ করবে, আমি তাকে পবিত্র নহর বা ঝর্ণাধারা থেকে তৃষ্ণা মিটাবো।

ফকীহ্‌গণ এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে, বাদ্যযন্ত্র ছাড়া যে গান গীত হয় এবং অন্যান্য হারাম বস্তু থেকে মুক্ত ও পবিত্র যেমন নারী বা পুরুষের আওয়ায না থাকে এবং কোন

মুসলিমের দুর্নাম অথবা ধর্মের অবমাননা থেকে মুক্ত হয়, তা হলে এরূপ গান জায়েয কিনা। কেউ কেউ এরূপ গানকে জায়েয বলেছেন আবার কেউ কেউ নাজায়েয বলেছেন। মদ ও জুয়ার হারাম হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু আয়াত রয়েছে। যেমন يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (২ ঃ ২১৯) শেষ আয়াত অথবা اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ وَالاَزْلاَمُ الاٰيَةَ (৫ ঃ ৯০)

بَابُ حَدُّالشُّرْبِ وَحَدُّ السِّرْقَةِ

মদ্যপান এবং চুরির শাস্তির বর্ণনা

٣١٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ اَتَاهُ رَجُلٌ بِابْنِ اَخٍ لَهُ نَشْوَانِ قَدْ ذَهَبَ عَقْلَهُ فَاَمَرَبِهِ فَحُبِسَ حَتّٰى اِذَا صَحَّ وَاَفَاقَ عَنِ السُّكْرِ دَعَا بِالسَّوْطِ فَقَطَعَ ثَمَرَتَهُ ثُمَّ رَقَّهُ وَدَعَا جَلاَّدًا فَقَالَ اِجْلِدْهُ عَلٰى جِلْدِهِ وَاَرْفَعْ يَدَكَ فِى جَلْدِكَ وَلاَ تُبْدِأ ضَبْعَيْكَ - قَالَ وَاَنْشَأَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعُدُّ حَتّٰى اَكْمَلَ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً خَلّٰى سَبِيْلَه فَقَالَ الشَّيْخُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاللّٰهُ اِنَّهُ لاَبْنُ اَخِىْ وَمَالِى وَلَدٌ غَيْرُهُ فَقَالَ شَرُّ الْعَمِّ وَالِى الْيَتِيْمِ اَنْتَ كُنْتَ وَاللّٰهِ مَااَحْسَنْتَ اَدَبَهُ صَغِيْرًا وَلاَ سَتَرْتَهُ كَبِيْرًا -

قَالَ ثُمَّ اَنْشَاءَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ حَدٍّ اُقِيْمَ فِى الاِسْلاَمِ لِسَارِقٍ اُتِىَ بِهِ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ قَالَ انْطَلِقُوْ بِهِ فَاقْطَعُوْهُ فَلَمَّا انْطَلَقَ بِهِ نَظَرَ اِلٰى وَجْهِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاَنَّمَا سُفَّ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ الرَّمَادُ فَقَالَ بَعْضُ جُلَسَائِهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَكَاَنْ هٰذَا قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْكَ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعِى اَنْ يَشْتَدَّ عَلٰى اَنْ تَكُوْنُوا اَعْوَانَ الشَّيَاطِيْنَ عَلَى اَخِيْكُمْ قَالُوْ فَلَوْلاَ خَلَّيْتَ سَبِيْلَه قَالَ اَفَلاَ كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تَاْتُوْنِىْ بِهِ فَاِنَّ الاِمَامُ اِذَا

اِنْتَهٰى اِلَيْهِ حَدٌّ فَلَيْسَ يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يُّعَطِّلَهُ قَالَ ثُمَّ تَلاَ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا .....۔

وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلاً اُتِىَ بِابْنِ اَخٍ لَهُ سَكْرَانَ فَقَالَ تَرْتَرُوْهُ وَمَزْمَزُوْهُ وَاسْتَنْكِهُوْهُ فَوَجَدُوا مِنْه رِيْحَ شَرَابٍ، فَاَمَرَ بِحَبْسِه فَلَمَّا صَحَّ دَعَا بِه وَدَعَا بِسَوْطٍ فَاَمَرَ بِه فَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيْثُ ۔

وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ اَوَّلَ حَدٍّ اُقِيْمَ فِى الاِسْلاَمِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِىَ بِسَارِقٍ فَاَمَرَ بِه فَقُطِعَتْ يَدَهُ فَلَمَّا انْطَلَقَ بِه نُظِرَ اِلٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاَنَّمَا يُسَفُّ فِى وَجْهِه الرِمَّادُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰه كَاَنَّهُ شَقَّ عَلَيْكَ فَقَالَ اَلاَّ يَشِقَّ عَلَىَّ اَنْ تَكُوْنُوْا اَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلٰى اَخِيْكُمْ قَالُوا فَلاَ نَدَعُهُ قَالَ اَفَلاَ كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ يُؤْتٰى بِه وَاِنَّ الاِمَامُ اِذَا رُفِعَ اِلَيْهِ الْحَدُّ فَلَيْسَ يَنْبَغِىْ لَه اَنْ يَدَعَهُ حَتّٰى يُمْضِيَهِ ثُمَّ تَلاَوَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا – الاية *

হাদীস নং- ৩১৩

অনুবাদ ঃ হযরত ইয়াহইয়া (র) থেকে বর্ণিত, হযরত ইবন্ মাসঊদ (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি তার নেশাগ্রস্থ ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে আগমণ করেন। তখন সে নেশার কারণে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। তাঁর নির্দেশে নেশাগ্রস্থ ব্যক্তিকে জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হলো। অতঃপর হযরত ইবন্ মাসঊদ (রা) চাবুক আনতে বললেন এবং তার ফলের থোকা কেটে ফেললেন, এরপর এগুলো নরম করলেন। এবার জল্লাদকে ডেকে তার চামড়ার উপর চাবুক মারার নির্দেশ করেন এবং বললেন, মারার সময় নিজের হাত এতটুকু উঠাবে যাতে তোমার বগল দেখা না যায়। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, স্বয়ং আবদুল্লাহ (রা) চাবুক গণনার জন্য বসেন এবং আশিটি চাবুক মারার পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। তখন ঐ বৃদ্ধ লোকটি (মদ্যপানকারীর চাচা) বলল, হে আবূ আবদুর রহমান, আল্লাহ্র কসম! সে হলো আমার ভাতিজা, তাকে ছাড়া আমার কোন সন্তান নেই। হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বললেন, তুমি চাচা হিসেবে অত্যন্ত খারাপ, তুমি ইয়াতীমের অভিভাবক হয়েছ। আল্লাহ্র কসম ! তুমি তাকে বাল্যকালে না আদব শিক্ষা দিয়েছ, না প্রাপ্ত বয়সে তার দোষত্রুটি গোপন রেখেছ।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, অতঃপর হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম এক চোরের উপর শাস্তির বিধান প্রয়োগ করা হয়। ঐ চোরকে নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত করা হয়। সাক্ষ্য-প্রমাণে যখন ঐ চোর দোষী প্রমাণিত হয়, তখন আঁ হযরত (সা) বলেন, তাকে নিয়ে যাও এবং চুরির অপরাধে তার হাত কেটে দাও। যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন হুযূর (সা)-এর চেহারা মুবারকের রংয়ে পরিবর্তন দেখা দেয়। উপস্থিত কোন একজন আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! মনে হয় এ কাজটি আপনার উপর অত্যন্ত কঠিন হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ কেন কঠিন হবে না, তোমরা নিজের ভাই-এর ব্যাপারে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ে যাও ? লোকজন আরয করলো, তাকে কি ছেড়ে দেয়া যায় না ? তিনি বললেন ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে আসার পূর্বে কি তোমরা এটা করতে পারলে না? কেননা ইমাম বা নেতার কাছে যখন কোন অপরাধী শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়, তখন তাকে মুক্তি দেয়া তার জন্য জায়েয ও বৈধ নয়। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوا "তোমাদের উচিৎ ক্ষমা করে দেয়া এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়া।"

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার নেশাগ্রস্থ ভাতিজাকে নিয়ে তাঁর নিকট আগমণ করে। তখন তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাকে জোরে নাড়া দাও; এবং দেখ তার থেকে মদের গন্ধ পাওয়া যায় কিনা। তিনি তাকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। যখন তার নেশা দূরীভূত হয়, তখন তিনি তাকে ডাকলেন এবং একটি চাবুক আনার জন্য বললেন এবং তাঁর নির্দেশে থোকা কেটে ফেলা হলো।.. হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, ইসলামের প্রারম্ভে অপরাধের কারণে যে শাস্তির প্রদান করা হয়, তাহলো এই যে, নবী করীম (সা)-এর খিদমতে একজন চোরকে উপস্থিত করা হয়। (সাক্ষ্য-প্রমাণে অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ায়) তাঁর নির্দেশে চোরের হাত কর্তন করা হয়। যখন চোরকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সাহাবায়ে কিরাম আঁ হযরত (সা)-এর পবিত্র চেহারার দিকে লক্ষ্য করে দেখতে পান যে, তাঁর চেহারা মুবারক কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। কোন একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এ নির্দেশ কি আপনার উপর কঠিন কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে ? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এটা কি আমার উপর কষ্টদায়ক নয় যে, তোমরা স্বীয় ভাই-এর বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ে যাও ? সবাই আরয করল, আমরা কি তাকে শাস্তি দেব না ? হুযূর (সা) বললেন, আমার নিকট নিয়ে আসার পূর্বে তোমরা কি এটা করতে পারলে না ? কেননা ইমাম বা নেতার সামনে যখন শাস্তিযোগ্য কোন বিষয় উত্থাপন করা হয়, তখন এটা বাস্তবায়ন না করে মুক্তি দেয়া কখনো উচিৎ নয়। অতঃপর এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا....الاية

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসে আঁ হযরত (সা)-এর বাস্তব কার্যক্রমে (আমল) বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় এবং দীনি ফায়দা লুক্কায়িত আছে। যেমন হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর হাদীস দ্বারা শরীয়তের এ মাসয়ালা জানা যায় যে, নেশাগ্রস্থ ব্যক্তিকে জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করা যাবে না। তাকে বন্দী করে নেশার ভাব সম্পূর্ণ দূর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কেননা নেশা অবস্থায় শাস্তি প্রদান করা হলে নেশাগ্রস্থ ব্যক্তি ব্যথা অনুভব করবে না।

আর ব্যথা অনুভব না হলে এর শিক্ষা লাভ করবে কিভাবে ? ভবিষ্যতে অন্যায় ও অপরাধ থেকে বিরত রাখাই হলো শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত নেশার এ পরিমাণ দ্বারা শাস্তি ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণও ধারণা করা যায় এবং তা হলো এই যে, নেশাগ্রস্থ এ অবস্থায় পৌছবে যাতে তার জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনা সমস্ত কিছু লোপ পায়।

তৃতীয়ত নেশাগ্রস্থকে কোড়া বা চাবুক দ্বারা মারতে হবে এবং এর অগ্রভাগ কেটে দিতে হবে যাতে এটা আরো সরু হয়ে যায়, দোর্রার আকৃতি ধারণ করে। খেজুরের ডাল অথবা জুতার দ্বারা এ শাস্তি প্রদান করা যাবে না। অবশ্য মদ হারাম হওয়ার সূচনালগ্নে এভাবে শাস্তি প্রদান করা হতো কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে যায় এবং শাস্তির জন্য চাবুকের ব্যবহার প্রচলিত হয়। এমনিভাবে প্রথমত চাবুক দ্বারা চল্লিশটি বেত মারা হতো, পরে এটাও রহিত হয়ে যায়। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে চাবুকের আশিটি আঘাত নির্ধারণ করা হয়।

চতুর্থত খালি শরীরের উপর শাস্তি প্রদান করতে হবে, কাপড়ের উপর নয়।

পঞ্চম হলো, চাবুক মারার সময় জল্লাদ উপরের দিকে হাত উঠিয়ে মারবে, হাত নীচু করে মারবে না। কেননা এতে আঘাত হালকাভাবে লাগে।

ষষ্ঠ হলো, হাত এতটুকু উঠাবে না, যাতে বগল দৃষ্ট হয়।

সপ্তমত অভিভাবক ও মুরুব্বীদের কর্তব্য হলো ছোটদের লালন পালন করা এবং তাদেরকে চারিত্রিক ও দীনি শিক্ষা প্রদান করা। যদি তারা তাদের এ দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে আল্লাহ্র নিকট তারা অভিযুক্ত ও শাস্তির যোগ্য হবে।

অষ্টমত যদি নেশাগ্রস্থের মুখ থেকে মদের গন্ধ আসে, তাহলে শাস্তি প্রদানের জন্য এ প্রমাণই যথেষ্ট।

নবম, বিচারকের শাস্তির দ্বারা অপরাধীর ব্যথা অনুভব করতে হবে, শাস্তি প্রদানে প্রশ্রয় বা পক্ষপাতিত্ব করা উচিৎ হবে না।

দশম, নেতা বা বিচারকের সামনে অপরাধীকে উপস্থাপন করার পূর্বে জনগণের উচিৎ যতটুকু সম্ভব ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা।

একাদশ, যখন অপরাধীর বিষয়টি নেতা বা বিচারকের সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত হয় কিন্তু সহানুভূতির কোন উপায় না থাকে, তা হলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া অথবা বিচারে অনীহা প্রকাশ করা বিচারকের কোনমতেই উচিৎ হবে না।

بَابُ فِيْمَا يُقْطَعُ فِيْهِ الْيَدِ

যে পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কর্তন করা যায়

٣١٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ كَانَ يُقْطَعُ الْيَدُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ -

وَفِى رِوَايَةٍ اِنَّمَا كَانَ الْقَطْعُ فِى عَشَرَةِ دَرَاهِمْ *

হাদীস নং- ৩১৪

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে দশ দিরহাম পরিমাণ মালামাল চুরি করার অপরাধে হাত কর্তন করা হতো।

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, দশ দিরহামের মাল চুরিতে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যায়।

ব্যাখ্যা ঃ ন্যূনতম কি পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কর্তন করা যাবে, এটা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে এক-চতুর্থাংশ দীনারের সমমূল্য পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কর্তন করা যাবে। তা তিন দিরহাম মূল্যের হোক বা এর চেয়ে কম অথবা এর চেয়ে বেশি। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র)-এর মতে এক-চতুর্থাংশ দীনার অথবা তিন দিরহাম মূল্যে মালের জন্য হাত কর্তন করা যাবে, এর চেয়ে কমের জন্য নয়। এঁদের দলীল হলো বুখারী শরীফে হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীস ঃ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِى مُجَنٍّ قِيْمَةَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمٍ (তিন দিরহামের মূল্যের একটি ঢাল চুরির অপরাধে রাসূলুল্লাহ (সা) এক চোরের হাত কর্তন করেছেন)। অথবা বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস ঃ لاَيَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلاَّ فِى رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (এক-চতুর্থাংশ দীনার অথবা এর চেয়ে বেশি না হলে চোরের হাত কর্তন করা যাবে না)।

ইমাম শাফিঈ (রা)-এর মতে নবী করীম (সা)-এর আমলে এক দীনারের মূল্য ছিল বার দিরহাম। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কমপক্ষে দশ দিরহাম মূল্যের মাল হলে চোরের হাত কাটা যাবে। হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে বেশ কিছু সহীহ মরফূ ও মওকুফ হাদীস রয়েছে। হাদীসসমূহের মধ্যে এ হাদীসই দলীল ও প্রমাণ হিসেবে শক্তিশালী যে, দশ দিরহাম মূল্যের মালে হাত কাটা যাবে। মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত ঃ لاَيَقْطَعُ الْيَدُ اِلاَّ فِى دِيْنَارٍ اَوْعَشَرَةَ دَرَاهِمٍ (এক দীনার বা দশ দিরহামের কম হলে হাত কর্তন করা যাবে না)। সমস্ত ইমামের মতে, ঢাল চুরির অপরাধে আঁ হযরত (সা)-এর নির্দেশে হাত কর্তনের প্রমাণ রয়েছে। মতপার্থক্য শুধু এ বিষয়ে যে, ঐ সময়ে ঢালের মূল্য কত ছিল।এর মূল্য দশ দিরহাম থেকে কম ছিল বলে যারা মত প্রকাশ করেন, তারা হযরত ইবন্ উমর (রা) অথবা একই ধরনের হাদীস পেশ করে থাকেন এবং এর উপর স্বীয় মাযহাবের ভিত্তি নির্ধারণ করেছেন।

হানাফী মাযহাবের দলীলসমূহ সিহাহ্ সিত্তায় বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। যেমন আবূ দাউদ শরীফে আতার সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِى مُجَنٍّ قِيْمَةُ دِيْنَارٍ اَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمٍ (রাসূলুল্লাহ (সা) এক দীনার অথবা দশ দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরির অপরাধে এক চোরের হাত কর্তন করেছেন)। হাকিম মুসতাদরাকে এ হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, এ হাদীস মুসলিম শরীফের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। ইমাম তাহাভীও এ হাদীস বর্ণনা

করেছেন। ইব্ন আবদুল বারও এ হাদীস ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। মোটকথা এ হাদীস অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণেই সহীহ। এছাড়া নাসাঈ শরীফে হযরত আয়মান থেকে আতা এবং মুজাহিদ দুটি সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّارِقَ اِلاَّ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارٍ (নবী করীম (সা) একটি ঢাল চুরির অপরাধে এক চোরের হাত কর্তন করেছেন, ঐ সময় এর মূল্য ছিল এক দীনার)।

আয়মান বর্ণিত হাদীসে একটু সমালোচনা রয়েছে এবং মতপার্থক্য রয়েছে যে, তিনি কি সাহাবী ছিলেন, না তাবিঈ। সাহাবী হলে তিনি কি হুনায়নের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন অথবা আঁ হযরত (সা)-এর ইনতিকালের পরও জীবিত ছিলেন ? এখানে বেশি আলোচনা না করে শুধু এটুকু বলা যায় যে, যদি তাঁকে সাহাবী হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তাহলে এ হাদীস মরফূ হিসেবে প্রমাণিত হয়। আর যদি তাবিঈ বলা হয়, তা হলে এ হাদীস মুরসাল হিসেবে গণ্য হয় যা হানাফী ও অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে নিঃসন্দেহে গ্রহণীয় এবং নির্ভরযোগ্য। কেননা তিনি তো অবশ্যই সিকাহ (ثقه) বা নির্ভরযোগ্য। যেমন, আবূ যুরআর মত সম্মানিত ইমাম এবং ইব্ন হিব্বান ও অন্যান্যগণ এ হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন। এ ছাড়া হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হাদীস আয়মানের হাদীসের সমর্থন করে থাকে যা এ হাদীসের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে আরো শক্তিশালী দলীল হিসেবে গণ্য করা যায়। অধিকন্তু ইব্ন আবী শায়বা স্বীয় মুসান্নাফে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবন্ আস (রা) থেকে রিওয়ায়েত করেন ঃ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةً دَرَاهِمَ (ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম)। সুতরাং এ সমস্ত রিওয়ায়েতের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অবশ্যই মানতে হবে যে, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক-চতুর্থাংশ দীনার সম্পর্কিত হাদীস রহিত (منسوخ) করা হয়েছে।

শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী হানাফী মাযহাবের বাস্তবতার প্রকাশ হয়ে যায় যে, এ বিষয়টি মূলত শাস্তির সাথে যুক্ত। যদি কেউ পক্ষপাতিত্ব করে এ সমস্ত রিওয়ায়েতের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সমালোচনা করে, তা হলে কমপক্ষে এ সমস্ত রিওয়ায়েত তাদের মতে শাস্তির ব্যাপারে কমবেশি সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, চুরির নিসাব দশ দিরহামের মধ্যে তিন দিরহাম অথবা এক-চতুর্থাংশ দীনার হবে। আসার ও আখবার থেকে এ নীতিমালা প্রমাণিত আছে যে, সন্দেহের দ্বারা শাস্তি (حدود) রহিত হয়ে যায় এবং এতে সতর্কতামূলক দিকটি বিবেচনায় রাখা হয়। এখানেও সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে এবং সতর্কতামূলক দিকটি অধিক অর্থাৎ দশ দিরহাম হওয়ার বাঞ্ছনীয়, এক-চতুর্থাংশ দীনার অথবা তিন দিরহাম নয়। সুতরাং দশ দিরহামের মাযহাবই সঠিক। এক-চতুর্থাংশ দীনারের সমর্থনকারীগণও ক্বিয়াসের দ্বারা তাঁদের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং একটি সাধারণ নীতিমালাকে সামনে রেখে থাকেন যার এখানে মূলত কোন সুযোগ বা স্থান নেই। কেননা তাঁদের মাযহাবের অধিকতর নির্ভরতা ঢালের মূল্যের উপর। এর মূল্য আঁ হযরত (সা)-এর যুগে কত ছিল ? তাঁদের মতে তিন দিরহাম এবং এটাই হলো তাঁদের মাযহাব। অথবা হানাফী মাযহাব মতে দশ দিরহাম। বলা হয়েছে যে, মতানৈক্যের সময় সর্বনিম্ন সংখ্যার উপর আমল করা বাধ্যতামূলক নীতি। এখানে সর্ব নিম্ন সংখ্যা বা পরিমাণ হলো তিন দিরহাম কিন্তু শাস্তির মধ্যে এ নীতি বা বিধান পালিত হয় না। যদি শাস্তির মধ্যে এ বিধান পালিত হয়, তাহলে এতে নির্যাতন বৃদ্ধি পাবে।

অপরাধীর মুক্তি ও নিষ্কৃতির পথ বন্ধ হয়ে যাবে যা শরীয়তের বিধানের পরিপন্থী। বরং শাস্তির ব্যাপারে বিষয়টি এর বিপরীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে ক্ষমা প্রদর্শন এবং যতটুকু সম্ভব শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার বিষয়টি দায়িত্বের মধ্যে এসে যায়। এমন কি সন্দেহের দ্বারা শাস্তি বাতিল হয়ে যায়। তিন থেকে দশ দিরহাম পর্যন্ত সন্দেহ থেকে যায় এবং ক্ষমা ও শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকার কারণ দশ দিরহামের উপর সীমাবদ্ধ। এরপর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

بَابُ دَرْءِ الْحُدُوْدِ

শাস্তি দূরীভূত করার বর্ণনা

٣١٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِدْرَؤُا الْحُدُوْدَ بِالشُّبْهَاتِ *

হাদীস নং- ৩১৫

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ সন্দেহ হলে শাস্তি দূর কর, তথা রহিত করে দাও।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস বিভিন্ন বাক্যে সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত হয়েছে। মোট কথা ঐক্যবদ্ধ মাসয়ালা হলো এই যে, সন্দেহ দ্বারা শাস্তি বাতিল হয়ে যায়। ইব্ন আবী শায়বা, তিরমিযী, হাকিম ও বায়হাকী হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, যতটুকু সম্ভব মুসলমান থেকে শাস্তি রহিত কর। যদি মুসলমানের জন্য মুক্তির কোন উপায় প্রত্যক্ষ কর, তাহলে তাকে মুক্তি দাও। কেননা ইমামের ক্ষমার মধ্যে অপরাধ করা শাস্তি প্রদানের মধ্যে অপরাধ করা থেকে উত্তম। দারে কুতনী, বায়হাকী হযরত আলী (রা) থেকে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেন যে, শাস্তি বাতিল বা রহিত কর কিন্তু অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর ইমাম বা নেতার জন্য শাস্তি না দেয়া বা রহিত করা জায়েয নেই। ইব্ন মাজাহ শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, শাস্তি রহিত কর, যতটুকু সম্ভব।

بَابُ الرَّجْمِ لِلزَّانِى الْمُحْصَنَ

বিবাহিত ব্যাভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা

٣١٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ مَاعِزَ ابْنَ مَالِكٍ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ الْاٰخَرَ قَدْزَنَى

فَاَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَرَدَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اِنَّ الْاٰخِرَ قَدْزَنٰى فَاَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَسَأَلَهُ عِنْدَ اَصْحَابِهِ هَلْ تَنْكَرُوْنَ مِنْ عَقْلِهِ ـ فَالُوْالاَ قَالَ انْطَلِقُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ قَالَ فَانْطُلِقَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا اَبْطَاَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ انْصَرَفَ اِلٰى مَكَانٍ كَثِيْرِ الْحِجَارَةِ فَقَامَ فِيْهِ فَاَتَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرَجَمُوْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتّٰى قَتَلُوْهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلاَّ خَلَّيْتُمْ سَبِيْلَه فَاَخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْهِ فَقَالَ قَائِلُ هٰذَا مَاعِزٌ اَهْلَكَ نَفْسَهُ وَقَالَ قَائِلُ اِنَّا اَرْجُوْ انَ يَكُوْنَ تُوْبَةً فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْتَابَهَا فِأمٌ مِنَ النَّاسِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ـ

فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ قَوْمًا طَمَعُوْا فِيْهِ فَسَأَلُوْهُ مَايُصْنَعُ بِجَسَدِهِ قَالَ اِصْنَعُوْابِهِ مَا تَصْنَعُوْنَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْكَفْنِ وَالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَالدَّفْنِ قَالَ فَانْطَلَقَ بِهِ اَصْحَابُه فَصَلُّوا ـ

وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ اَتٰى مَا عِزُّ بْنُ مَالِكٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَقَرَّ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ ثُمَّ عَادَ فَاَقَرَّ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ ثُمَّ عَادَ فَاَقَرَّ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ ثُمَّ عَادَ فَاقَرَّ بِالزِّنَا الرَّابِعَةِ فَسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَكُوْنَ مِنْ عَقْلِه شَيْئًا قَالُوا لاَ قَالَ فَاَمَرَ بِه اَنْ يُرْجَمَ فِى مَوْضِعٍ قَلِيْلِ الْحِجَارَةِ قَالَ فَابْطَأَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ فَانْطَلَقَ يَسْعٰى اِلٰى مَوْضِعٍ كَثِيْرِ الْحِجَارَةِ وَاتْبَعُوْهُ النَّاسُ فَرَجَمُوْه حَتّٰى قَتَلُوْهُ ثُمَّ ذَكَرُوْا شَانَه لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلاَ خَلَّيْتُمْ سَبِيْلَه قَالَ فَاسْتَاْذَنَ قَوْمُه رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى

دَفْنِه وَالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَقَدْتَابَ تَوْبَةً لَوْتَابَهَا فِأمٌ مِنَ النَّاسِ قُبِلَ مِنْهُمْ ـ

وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ لَمَّا اَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكَ اَنْ يُرْجَمَ قَامَ فِىْ مَوْضِعِ قَلِيْلِ الْحِجَارَةِ فَابْطَأَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَذُهَبَ بِهِ مَكَانًا كَثِيْرَ الْحِجَارَةِ وَاتْبَعَهُ النَّاسُ حَتّٰى رَجَمُوْهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَّ خَلَّيْتُمْ سَبِيْلَه ـ

وَفِىْ رَوَايَةٍ لَمَّا هَلَكَ مَاعِزُ بْنِ مَالِكٍ بِالرَّجْمِ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْهِ فَقَالَ قَائِلُ مَاعِزٌ اَهْلَكَ نَفْسَهُ وَقَالَ قَائِلُ تَابَ ـ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْتَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُبِلَ مِنْهُ اَوْ تَابَهَا فِأمٌ مِنْ النَّاسِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ـ

وَفِى رِوَايَةٍ جَاءَ مَا عِزُ بْنُ مَالِكٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰه اِنِّى زَنَيْتُ فَاَقِمِ الْحَدَّ عَلَىَّ فَاَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَعَدَّ ذٰلِكَ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ يَرُدُّهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعْرِضُ عَنْهُ فَقَالَ فِى الرَّابِعَةِ اَنْكَرَتُمْ مِنْ عَقْلِ هٰذَا شَيْئًا قَالُوا مَا نَعْلَمُ اِلاَّ عَاقِلاً وَمَا نَعْلَمُ اِلاَّ خَيْرًا قَالَ فَاذْهَبُوْابِه فَارْجُمُوْهُ قَالَ فَذَهَبُوْا بِهِ فِى مَكَانٍ قَلِيْلِ الْحِجَارَةِ فَلَمَّا اَصَابَتْهُ الْحِجَارَةِ جَزَعَ قَالَ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ حَتّٰى اَتَى الْحَرَّةَ فَثَبَتَ لَهُمْ قَالَ فَرَمُوْهُ بِجَلاَ مِيْدِهَا حَتّٰى سَكَتَ قَالَ فَقَالُوْآ يَارَسُوْلَ اللّٰه مَاعِزٌ حِيْنَ اَصَابَتْهُ الْجَارَةُ جَزَعِ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ خَلَّيْتُمْ سَبِيْلَه قَالَ فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِى اَمْرِه فَقَالَتْ طَائِفَةٌ هَلَكَ مَاعِزٌ وَاَهْلَكَ نَفْسَهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ بَلْ تَابَ اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً لَوْتَابَهَا فِأمٌ مِنَ النَّاسِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ

قَالَوْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ اَصْنَعُوْا بِهِ كَمَا تَصْنَعُوْنَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْغُسْلِ وَالْكَفْنِ وَالْحَنُوْطِ وَالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَالدَّفْنِ - وَقَدْ رُوِىَ الْحَدِيْثُ بِرِوَايَتٍ مُخْتَلِفَةٍ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ *

হাদীস নং- ৩১৬

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার মায়েয ইবন মালিক (রা) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আগমণ করেন এবং বলেন, কল্যাণ থেকে দূরে পতিত ব্যক্তি ব্যাভিচার করেছে। আপনি তার উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয়বার আগমণ করে একই কথা পুনরায় বলেন। হুযূর (সা) এবারও তাকে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর তৃতীয়বার আগমণ করে তার অপরাধের কথা স্বীকার করেন এবং শাস্তির আবেদন করেন। এবার তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন। চতুর্থবার লোকটি এসে আরয করেন, কল্যাণ ও মঙ্গল থেকে দূরে পতিত বা অবস্থানকারী ব্যাক্তি ব্যাভিচার করেছে। আপনি তার উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। তখন তিনি তাঁর সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ লোকটি কি পাগল? সাহাবাগণ বললেন, জ্বি না। নবী করীম (সা) বললেন ঃ লোকটিকে নিয়ে যাও এবং তার উপর পাথর নিক্ষেপ করে তাকে শাস্তি প্রদান কর (কেননা এ লোকটি বিবাহিত ছিল)।

বুরায়দা (রা) বলেন, তাকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং পাথর মেরে শাস্তি দেয়া শুরু হলো কিন্তু তার মৃত্যু বিলম্ব হতে লাগল। ফলে সে অধিক কংকরময় স্থানে গিয়ে দাঁড়াল যাতে দ্রুত মৃত্যু হয়। মুসলমানগণ পিছনে গমন করে এবং তাকে এভাবে পাথর নিক্ষেপ করে যার ফলে সে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর এ সংবাদ নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌছে, তখন তিনি বললেন ঃ কেন তোমরা তার পিছু ত্যাগ করনি (যখন সে তার স্থান ত্যাগ করে) ? লোকজন মায়েয ইব্ন মালিক সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি করতে থাকে। কেউ বলেন, মায়েয আত্মহত্যা করেছে। আবার কেউ বলেন, এটা তার জন্য তওবা হবে। এ সংবাদ নবী করীম (সা) পর্যন্ত পৌছলে তিনি বললেন ঃ মায়েয যে তওবা করেছে, যদি দলবদ্ধ হয়ে লোকজন এরূপ তওবা করে, তা হলে তা কবূল হবে। এ সংবাদ যখন লোকজনের নিকট পৌছে, তখন মায়েয-এর ক্ষমার ব্যাপারে তারা আশা পোষণ করে। এরপর হুযূর (সা)-এর নিকট মায়েয-এর মৃতদেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তির জন্য যা কর, তার জন্যও এ সমস্ত কর অর্থাৎ দাফন-কাফন কর, তার জন্য জানাযার নামায আদায় কর। বুরায়দা (রা) বলেন, অতঃপর লোকজন তাকে নিয়ে যায় এবং তার জানাযার নামায আদায় করে (দাফনের ব্যবস্থা করে)।

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, মায়েয ইব্ন মালিক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আগমণ করে এবং ব্যভিচারের স্বীকার করে। তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন। সে দ্বিতীয়বার এসে ব্যভিচারের স্বীকার করে। এবারও তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন। সে তৃতীয়বারও এসে ব্যভিচারের স্বীকার করে। এবারও তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন। পুনরায় সে আসে এবং চতুর্থবারের মত ব্যভিচারের স্বীকার করে। তখন নবী করীম (সা) বলেন ঃ তার বিবেক কি লোপ পেয়েছে অথবা

সে কি পাগল হয়ে গিয়েছে ? লোকজন বলল, জ্বি না। বুরায়দা (রা) বলেন, তখন হুযূর (সা) নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাকে অপেক্ষাকৃত কম কংকরময় স্থানে পাথর নিক্ষেপ কর যেন তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। বুরায়দা বলেন, (পাথর নিক্ষেপের পর) যখন তার মৃত্যুর বিলম্ব হচ্ছে, তখন সে অধিক কংকরময় স্থানের দিকে দৌড়িয়ে যায়। লোকজনও তার পিছনে সেখানে গমন করে এবং এমনিভাবে পাথর নিক্ষেপ করে যে, সে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর লোকজন এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বর্ণনা করল। তিনি বললেন ঃ তোমরা কেন তার পিছু ছাড়লে না ? বুরায়দা (রা) বলেন, তার গোত্রের লোকেরা আঁ হযরত (সা)-এর নিকট তার দাফন ও জানাযার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাদেরকে দাফন-কাফনের অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন ঃ সে এমন তওবা করেছে যে, দলবদ্ধ হয়ে যদি মানুষ এরূপ তওবা করে, তা হলে তাদের তওবাও কবূল হতো।

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, যখন নবী করীম (সা) মায়েয ইব্ন মালিককে (অপরাধ স্বীকারোক্তির কারণে) পাথর মেরে শাস্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন, তখন সে অপেক্ষাকৃত কম কংকরময় স্থানে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যখন মৃত্যু বিলম্ব হতে লাগল, তখন সে অধিক কংকরময় স্থানে গমন করে এবং মানুষও তার পিছনে সেখানে গমন করে, এরপর পাথর নিক্ষেপ করে। যার ফলে সে মৃত্যুবরণ করে। এ ঘটনা নবী করীম (সা)-এর পৌছলো। তখন তিনি বললেন, তোমরা তার পথ কেন ছেড়ে দিলে না ? (অর্থাৎ তাকে যেতে দেয়া উচিৎ ছিল)।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, মায়েয যখন পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করে, তখন মানুষ তার সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনা করতে থাকে। কোন এক ব্যক্তি বললেন, মায়েয আত্মহত্যা করেছে। আবার কেউ বলেন, মায়েয এভাবে তওবা করেছে। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌছে। তখন তিনি বলেন ঃ মায়েয এরূপ তওবা করেছে যদি এ তওবা কোন কর আদায়কারী করে, তাহলে তার তওবা কবূল করা হবে। অথবা লোকজন সম্মিলিতভাবে এ তওবা করলে তাদের তওবা কবূল হবে।

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন। এ সময় মায়েয ইব্ন মালিক তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমি ব্যভিচার করেছি, আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। নবী করীম (সা) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, অতঃপর সে তিনবার এরূপ করে। আঁ হযরত (সা) প্রত্যেকবার তাকে ফিরিয়ে দেন এবং নিজে মুখ ফিরিয়ে নেন। চতুর্থবারে তিনি লোকজনের নিকট জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কি তার জ্ঞানে কোন ত্রুটি দেখতে পেয়েছ ? লোকজন বলল, আমরা তাকে একজন বুদ্ধিমান ও কল্যাণমূলক কাজ করে বলেই জানি। হুযূর (সা) বললেন ঃ তাকে নিয়ে যাও এবং রজম কর বা পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তি প্রদান কর। বুরায়দা (রা) বলেন, তাকে কম কংকরময় স্থানে নেয়া হলো। যখন তাকে পাথর মারা শুরু হলো, তখন সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল এবং সেখান থেকে দৌড়িয়ে অধিক কংকরময় স্থানে গিয়ে পৌছলো। সেখানে তার উপর পাথর নিক্ষেপ করা হলে সে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর লোকজন এ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, হে

আল্লাহ্‌র রাসূল! যখন মায়েযের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হলো, তখন সে ভয় পেয়ে যায় এবং পলায়ন করতে থাকে। তিনি এটা শুনে বললেন ঃ তাকে কেন যেতে দিলে না ? এরপর লোকজন তার সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনা করতে লাগল। একদল বলল, মায়েয ধ্বংস হয়েছে এবং সে আত্মহত্যা করেছে। অপর একদল বলে, সে আল্লাহ্‌র দরবারে এমন মকবূল তওবা করেছে যে, যদি কোন একদল এরূপ করত, তাহলে তাদের তওবা কবূল হতো। লোকজন জিজ্ঞাসা করলো হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তার মৃতদেহ কি করব ? তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃতব্যক্তির জন্য যা কর, তা এর জন্য কর। যেমন গোসল, কাফন, খুশবু, নামায এবং দাফন।

এ হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমত পবিত্র কুরআনে আয়াত اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِد مِّنْهَا مِائَةَ جَلْدَةً (ব্যভিচারকারী নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ' চাবুক মার)। (২৪ ঃ ২) বিবাহিত-অবিবাহিত সবার জন্য চাবুক নির্ধারণ করেছে। কিন্তু আয়াত ঃ اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ (বিবাহিত পুরুষ ও নারী যখন ব্যভিচার করে তখন অবশ্যই তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তি প্রদান কর)। উম্মতের ইজমা দ্বারা তিলাওয়াত রহিত হয়েছে কিন্তু এর বিধান এখনো বিদ্যামান রয়েছে এবং বিবাহিতদের রজম (رجم) বা পাথর নিক্ষেপ করা নির্ধারণ করে। রহিত আয়াত বিবাহিতদের জন্য এবং চাবুক বা বেত্রাঘাত অবিবাহিতদের জন্য। এ ছাড়া মুতাওয়াতির ও মশহুর হাদীসসমূহ রহিত আয়াতের জোর সমর্থন করে। বরং রজমের (পাথর নিক্ষেপ সংক্রান্ত) হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির ও প্রসিদ্ধির কারণে অলংঘনীয় নির্দেশমূলক (قطعى الدلالة) আয়াতের উপরও অধিক ক্ষমতা রাখে। যেমন বর্ণিত হাদীস প্রসিদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছিয়েছে এবং হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ, বুরায়দা, হুসাইব আসলামী, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-এর মত সম্মানিত সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে এবং এরদ্বারা কুরআনের উপর অতিরিক্ত বিধান জারী করা জায়েয। সিহাহ সিত্তায় হযরত উমর (রা)-এর খুতবায় বর্ণিত আছে ঃ তিনি শপথ করে বলেছেন, যদি মানুষের এটা বলার ভয় না হতো যে, উমর কুরআনের উপর হস্তক্ষেপ করেছে, তাহলে অবশ্যই আমি اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا الاٰية আয়াতকে কুরআনের মধ্যে লিপিবদ্ধ করতাম।

দ্বিতীয় মাসয়ালা হলো ব্যভিচারীকে শাস্তি প্রদানের জন্য চারবার স্বীকারোক্তি জরুরী, না একবারই যথেষ্ট ? ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র) শাস্তি প্রদানের জন্য একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট মনে করেন। তাঁদের মাযহাবের স্বপক্ষে দু'টি হাদীসকে ভিত্তি ও দলীল হিসেবে পেশ করেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলো দ্বারা স্বীকারোক্তির কোন সংখ্যা নির্ধারণ করা যায় না। এক, গামেদীয়ার হাদীস। মায়েয ইবন্ মালিক (রা)-এর মত তিনিও আঁ হযরত (সা)-এর সামনে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করেছিলেন। তার একবার স্বীকারের ফলেই তাকে নবী করীম (সা)-এর নির্দেশে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় হলো ঐ হাদীস, যা আসীফ-এর হাদীস নামে খ্যাত। এতে বর্ণিত আছে, এক অবিবাহিত ব্যভিচারকারী যুবকের উপর হুযূর (সা)

একশ' চাবুক বা বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরের শাস্তি প্রদান করেন। মহিলার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি গ্রহণের জন্য হযরত উনাইস (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, যদি সে স্বীকার করে, তা হলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তি প্রদান কর। সুতরাং এখানে চারবার স্বীকারোক্তি গ্রহণের জন্য হুযূর (সা) শর্ত আরোপ করেননি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, চারবার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই। নতুবা তিনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতেন।

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমদ এবং কূফাবাসী সমস্ত আলিম এ ব্যাপারে মত পোষণ করেন যে, শাস্তি প্রদানের জন্য ব্যভিচারকারীর চারবার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন রয়েছে। তাদের শক্তিশালী দলীল হলো মায়েয ইবন্ মালিকের হাদীস– যা সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। এতে বর্ণিত আছে, তিনি অপরাধীর কাছ থেকে চারবার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছেন। অতঃপর শাস্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে একটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষণীয় যে, অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করা কি নবী করীম (সা)-এর জন্য সম্ভব ? অপরাধ প্রমাণের পর সাথে সাথে শাস্তি প্রদান ওয়াজিব, এতে বিলম্ব করার কোন অবকাশ নেই। সুতরাং এটা অনিবার্যভাবে বলতে হবে যে, এক, দু' অথবা তিনবার স্বীকার করার পরও আঁ হযরত (সা)-এর নিকট অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ার কারণে চতুর্থবার স্বীকারোক্তির পর যখন অপরাধ প্রমাণিত হয়, তখন সাথে সাথে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের নির্দেশ জারী করেন। তবে শুধু এটাই নয়, বরং এ হাদীসের কোন কোন রিওয়ায়েতের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, একই মজলিসে চারবার স্বীকারোক্তি করার পরও তিনি তা বাতিল করে দিয়েছেন। অতঃপর দ্বিতীয় দিন আগমণ করে স্বীকারোক্তি প্রদান করে। নবী করীম (সা) তার গোত্রের নিকট বিষয়টির সত্যতা নিরূপণের জন্য জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ লোকটি তো পাগল নয় ? এরপর তৃতীয়বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানো। এরপর চতুর্থবার যখন এসে সে স্বীকারোক্তি প্রদান করলো, তখন তাকে পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তি প্রদান করা হয়।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) স্বীয় মুসনাদে এবং ইব্ন আবী শায়বা (র) স্বীয় মুসনাদের আবূ বকর (রা) থেকে এ হাদীস গ্রহণ করেছেন, যাতে প্রত্যেকবার "جَاءَ" শব্দ রয়েছে। যেমন বর্ণিত হাদীসে "اتى" শব্দ ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং مجئيت واتيان (গমনাগমন) মজলিসের সংখ্যা প্রমাণ করে যে, সে যাতায়াত করেছে। ইব্ন হুমাম (র) এর ব্যাখ্যাও করেছেন। এজন্য হানাফীগণ বলেন, চারবার স্বীকারোক্তি চারটি মজলিসে হতে হবে। সুতরাং যখন এটাই বাস্তবতা, তা হলে কিভাবে গ্রহণ করা যায় যে, আঁ হযরত (সা) চারটি বিভিন্ন মজলিস পর্যন্ত শাস্তি প্রদানকে বিলম্বিত করেন ? এবার রইল হাদীসে বর্ণিত আসীফের ঘটনা। তবে এটা ছিল ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা। বায়হাকীও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় মাসয়ালা হলো এই যে, অপরাধীর জন্য শাস্তি কি তওবা হিসেবে গণ্য হয় এবং এর দ্বারা গুনাহর কাফফারা হয়ে যায় ? পরকালের জবাবদিহি থেকে মুক্তি পেয়ে যায় অথবা পরকালের জবাবদিহির দায়িত্ব তার উপর বাকী থাকে এবং শাস্তি তার গুনাহ্র কাফফারা হয় না ? হানাফীগণ এ দুটোর মধ্যে দ্বিতীয়টির পক্ষে অর্থাৎ তাদের মতে পরকালের জবাবদিহির দায়িত্ব অপরাধীর বাকী থাকে এবং শাস্তি তার গুনাহ্র কাফফারা হয় না। এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি হলো, শাস্তির মূল উদ্দেশ্য

অপরাধীকে ধমক দেয়া, সতর্ক করা এবং অন্যকে উপদেশ দেয়া, এরদ্বারা পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা সৃষ্টি করা। যাতে শাস্তির ভয়ে মানুষ পরস্পরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকে এবং নিরাপদে শান্তি ও সুখে জীবন অতিবাহিত করে। পরকালের জবাবদিহি ও বিচারকার্য তার উপর বাকী থাকবে। এর থেকে মুক্ত থাকা তার খাঁটি তওবার দ্বারা হাসিল হতে পারে।

হানাফীগণের মতামতের ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত যাতে বলা হয়েছে যে, অপরাধের শাস্তি গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা নয়। যেমন محدود فى القذف (কারো উপর দূর্নাম রটানোর পর যে শাস্তি প্রদান করা হয়) সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ أُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ الاَّ الَّذِيْنَ تَابُوا (তারা হলো ফাসিক, তবে যারা তওবা করেছে তারা নয়)। অথবা قَطَاعَ الطَرِيْقَ (ডাকাতী) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ أُوْلٰئِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ الاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا (তাদের জন্য পৃথিবীর রয়েছে লাঞ্ছনা এবং পরকালে রয়েছে কঠোর শাস্তি, কিন্তু যারা তওবা করেছে)। এখানে ফলাফল তওবার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ পাকের কালামের যেহেতু এটাই উদ্দেশ্য, তাই ঐ হাদীস ব্যাখ্যার যোগ্য হবে যা শাস্তিকে (حد) তওবার সমার্থক হিসেবে স্থির করে যাতে قطع الدلالة (অকাট্যভাবে প্রমাণ করে) আয়াত স্বীয় অর্থের উপর অটল থাকে। যেমন বর্ণিত হাদীসে এ সন্দেহ হয় যে, ব্যভিচারের শাস্তিই হলো তওবা, সুতরাং আমরা এটাকে এর উপর ধারণা করব যে, শাস্তির সময় অপরাধী তওবা করেছে এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটাই প্রমাণিত হয়। কেননা অপরাধী এখানে একটি অপবাদ বা তিরস্কারের বস্তু হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে, যার আপাদমস্তকে তওবা দৃশ্যমান হচ্ছে। এটা কি আশ্চর্য বরং এটা খুবই সম্ভব যে, শাস্তির সময় সে তওবা করেছে। হুযূর (সা) যে তওবার ব্যাখ্যা অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে পেশ করেছেন। যেমন এ মতের শক্তিশালী দলীল হিসেবে মুসলিম শরীফে হযরত বুরায়দা (রা) থেকে এক হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসে বর্ণিত ঘটনা হলো এই যে, সাহাবাগণ উপবিষ্ট অবস্থায় একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আগমণ করেন এবং সালাম জানিয়ে তিনি উপবেশ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ মায়েয ইবন্ মালিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। যখন শাস্তির পর ক্ষমা প্রার্থনার কোন সুযোগই না থাকে, তখন শাস্তি গুনাহ মাফের কারণ কিভাবে হতে পারে ?

এছাড়া চুরি সম্পর্কে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে, চোরের হাত কর্তনের জন্য তিনি চোরকে ডাকালেন এবং বললেন ঃ তওবা ও ইসতিগফার কর। সে তওবা করলো। এরপর হুযূর (সা) তার তওবা কবূলের জন্য দু'আ করেন। এছাড়া বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, ফাতিমাতুল মাখযূমিয়া চুরি করেছিল, তার পর সে তওবা করেছে। যদি শাস্তিই তওবা হতো, তা হলে এরপর নতুন তওবার কি প্রয়োজন হতো ? এখানে একটি বিষয় মনে হচ্ছে যে, শাস্তিযোগ্য অপরাধী যখন নিজেই তার অপরাধের স্বীকার করে এবং শাস্তির জন্য প্রার্থনা করে, তখন এটা তার জন্য তওবা হিসেবে গণ্য হয় এবং যাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তির যোগ্য বলে প্রমাণ করা হয়, তখন তার জন্য তওবা করা প্রয়োজন।

بَابُ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ قِصَاصًا

যিম্মী হত্যার কারণে মুসলমান থেকে কিসাস নেয়া হবে

٣١٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ قَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ فَقَالَ اَنَا اَحَقُّ مِنْ اَدْنٰى بِذِمَّتِهِ *

হাদীস নং- ৩১৭

অনুবাদ ঃ ইবনুল বায়লামানী থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) একজন মুসলমানকে জনৈক কাফির যিম্মীর (معاهد) পরিবর্তে হত্যা করেছেন এবং বলেছেন ঃ যিম্মাদারী পূরণকারীদের মধ্যে আমি যিম্মা পূরণের ব্যাপারে অধিক হকদার।

ব্যাখ্যা ঃ যিম্মীদের জানমালের নিরাপত্তা এবং তাদের দেখাশোনা করা মুসলমানদের উপর কর্তব্য। এটা শরীয়তের একটি স্পষ্ট বিধান। সুতরাং এ বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মাল চুরির অপরাধে চোরের হাত কর্তন করা হয়। তাদের নারীদের সাথে ব্যাভিচারকারীর উপর ব্যাভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ রটানোর কারণে শাস্তি দেয়া হয়। মূলত এ কিসাসও এ বিশেষ এক ঘটনার কারণে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এটাই হলো হানাফী মাযহাবের মত।

كِتَابُ الْجِهَادِ
জিহাদের বর্ণনা

بَابُ حُرْمَةِ خِيَانَةِ الْقَاعِدِيْنَ عَلى نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنِ
মুজাহিদগণের স্ত্রীদের সাথে জিহাদ থেকে বিরত থাকা লোকদের খিয়ানত করা হারাম

٣١٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى حُرْمَةَ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخُوْنُ اَحَدًا مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِى اَهْلِهِ اِلاَّ قِيْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِقْتَصَّ فَمَا ظَنَّكُمْ *

হাদীস নং- ৩১৮

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যারা জিহাদ থেকে বিরত থাকে, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদগণের নারীদেরকে এমনিভাবে হারাম করেছেন, যেমনি তাদের মাদেরকে হারাম করেছেন। যদি কোন ব্যক্তি জিহাদে গমন না করে মুজাহিদের পরিবারবর্গের সাথে খিয়ানত করে, কিয়ামতের দিন মুজাহিদগণকে বলা হবে যে, তার থেকে তুমি কিসাস গ্রহণ কর। অতঃপর তোমার কি ধারণা ?

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মুজাহিদগণের সম্মান ও মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মর্যাদা সংরক্ষণ করেছেন। তাদের নারীদের সম্মান হিফাযত যারা জিহাদের গমন করেনি, তাদের মায়েদের সমান স্থির ও নির্ধারণ করেছেন। যদি কেউ খিয়ানত করে, তা হলে পরকালে মুজাহিদগণকে কিসাস নেয়ার পূর্ণ অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করা হবে। সমাজে এ ধরনের খিয়ানত অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। এটা থেকে মুক্ত থাকা অত্যন্ত জরুরী।

بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْبَعْثِ بِالْمُهِمَّاتِ

সেনাবাহিনী প্রেরণের সময় যে ওসীয়ত করা হয়, এর বর্ণনা

٣١٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَعَثَ جَيْشًا اَوْسَرِيَّةً اَوْصٰى اَمِيْرُهُمْ فِىْ خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَاَوْصٰى فِيْمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اُغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ لاَ تَغُلُّوْا وَلاَ تَغْدُرُوْا وَلاَ تَمْثُلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَلاَ شَيْخًا كَبِيْرًا فَاِذَا لَقِيْتُمْ عَدُوَّكُمْ فَادْعُوْهُمْ اِلَى الْاِسْلاَمِ فَاِنْ اَبَوْا فَادْعُوْهُمْ اِلَى اِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ فَاِنْ اَبَوْا فَقَاتِلُوْهُمْ فَاِذَا حَصَرْتُمْ اَهْلَ حِصْنٍ فَاَرَادُوْكُمْ اَنْ تُنْزِلُوْاهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلاَ تَفْعَلُوْا فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ مَاحُكْمُ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَنْزِلُوْهُمْ بِمَا بَدَا لَكُمْ فَاِنْ اَرَدُوْكُمْ اَنْ تُعْطُوْهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ فَاَعْطُوْهُمْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ اٰبَائِكُمْ فَاِنَّكُمْ اَنْ تَخْفِرُوْا بِهِ ذِمَمَكُمْ اَهْوَنُ مِنْ اَنْ تَخْفِرُوا بِذِمَّةِ اللّٰهِ فِى رَقَبَتِكُمْ *

وَفِى رِوَايَةٍ فَاِنْ اَرَادُوْكُمْ اَنْ تُعْطُوْهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهِ فَلاَ تُعْطُوْهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَلاَ ذِمَّةَ رَسُوْلِهِ وَلٰكِنْ اَعْطُوْهُمْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ اٰبَائِكُمْ فَاِنَّكُمْ اَنْ تَخْفِرُوْا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ اٰبَائِكُمْ اَيْسَرُ *

হাদীস নং- ৩১৯

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন বিরাট সেনাবাহিনী অথবা ক্ষুদ্র বাহিনী কোথাও যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করতেন, তখন ঐ বাহিনীর (সেনাপতিকে) বিশেষ করে স্বীয় অন্তরে আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য ওসীয়ত করতেন এবং মুসলিম বাহিনীকে (অন্যের প্রতি) কল্যাণ ও দয়া প্রদর্শনের জন্য ওসীয়ত করতেন। অতঃপর বলতেন ঃ আল্লাহ্‌র নামে তাঁর সাহায্য কামনা করে এবং তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জিহাদ কর। যারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে, তাদের সাথে যুদ্ধ কর। গনীমতের মালে খিয়ানত করো না। কোন নিহত ব্যক্তির নাক ও কান

কর্তন কর না। কোন শিশু বা অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা কর না। যখন তোমরা তোমাদের শত্রুর সম্মুখীন হও, তখন তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করে, তবে তাদেরকে জিযিয়া প্রদানে উদ্বুদ্ধ করবে। যদি এটাও অস্বীকার করে, তাহলে তাদের সাথে জিহাদ কর। যখন তোমরা কোন দূর্গ অবরোধ করবে এবং তারা তোমাদের নিকট ইচ্ছা পোষণ করে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশে অবতরণ কর, তাহলে এরূপ করবে না। কেননা তোমরা জান না আল্লাহ্‌র নির্দেশ কি। বরং তোমরা তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে তাদের নিকট নেমে আসবে। যদি তারা তোমাদের নিকট এটা ইচ্ছা পোষণ করে যে, তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা দান করবে এবং তাঁর অঙ্গীকার ও যিম্মায় নিয়ে নেবে, তা হলে তোমরা তাদেরকে তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপূরুষদের যিম্মায় নিয়ে নাও। কেননা তোমাদের স্বীয় যিম্মা ত্যাগ বা ভঙ্গ করা তোমাদের উপর অনেক বেশি সহজ, বিপরীতে আল্লাহ্‌র যিম্মা ত্যাগ করা থেকে।

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, যদি তারা তোমাদের নিকট এটা চায় যে, তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যিম্মায় ছেড়ে দেবে, তাহলে তোমরা তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মায় ছেড়ে দেবে না। কেননা তোমাদের নিজ পূর্ব পুরুষদের যিম্মা ত্যাগ করা অধিকতর সহজ।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস যুদ্ধের মূলনীতি ও আইন-কানুনের উৎস। এতে সর্বাগ্রে আল্লাহ্‌র ভয়কে প্রাধান্য দেয়ার জন্য সেনাপতির প্রতি দিক-নির্দেশনা রয়েছে। কেননা এরদ্বারা সমস্ত কর্মকান্ডের মূল শক্ত, অটল ও বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। আল্লাহভীতি মানুষকে সমস্ত পাপ ও অন্যায় পথ থেকে বিরত রাখে।

দ্বিতীয়ত সৈন্যবাহিনীর সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ এবং তাদের প্রতি কল্যাণ প্রদর্শনের জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কেননা সেনাপতির উত্তম ও সুন্দর আচরণ সেনাবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার নির্দেশ পালনকে নিজের জন্য গৌরবজনক মনে করে।

তৃতীয়ত, নির্দেশ এই যে, আল্লাহ্‌র নামে যুদ্ধ শুরু কর, এতে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনকে অগ্রাধিকার প্রদান কর এবং লোক দেখানো ও আত্মপ্রচারের বিন্দুমাত্র কামনা করো না। কেননা আমল যতবেশি হোক না কেন, আল্লাহ্‌র দরবারে নিয়্যতের পবিত্রতা ও আন্তরিকতা ব্যতীত তা অকার্যকর হবে। বরং শাস্তির কারণ ও নিন্দনীয় হবে।

চতুর্থত, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের জন্য এ উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, গনীমতের মাল চুরি করো না। কেননা এটা অত্যন্ত বড় পাপ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। কদর্য ও নোংরা কাজের অঙ্গীকার পূরণ করো না, কেননা এটা হীনমন্যতা ও দুশ্চরিত্রের লক্ষণ। নিহত ব্যক্তির নাক-কান কর্তন করো না। কেননা এটা অত্যন্ত হিংস্রতা ও বর্বরতার কাজ। শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করো না। কেননা এটা খোদদ্রোহী, অন্যায় ও অত্যন্ত নিষ্ঠুর কাজ।

পঞ্চমত, এতে ওসীয়ত করা হয়েছে যে, যখন শত্রুর সম্মুখীন হবে, তখন প্রথম তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা এটা গ্রহণ না করে, তা হলে তাদেরকে জিযিয়া প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। যেন তারা ইসলামের আওতায় যিম্মী হিসেবে থাকে। যদি এতেও তারা সম্মত না হয়, তা হলে যুদ্ধ করবে।

ষষ্ঠত, এ নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, যদি শত্রু দূর্বল হয়ে পড়ে এবং তোমাদের কাছে

নিরাপত্তা কামনা করে, তা হলে তাদেরকে তোমাদের যিম্মাদারীর মধ্যে নিয়ে নাও; আল্লাহ্ ও রাসূলের যিম্মাদারীতে নয়।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

নাক-কান কর্তন করা নিষিদ্ধ

٣٢٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُثْلَةِ *

হাদীস নং- ৩২০

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) مثله বা যুদ্ধে নিহত শত্রুদের নাক-কান কর্তন করতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ مثله -এর অর্থ নিহত ব্যক্তির নাক-কান-জিহবা ইত্যাদি কর্তন করা। ইসলামে এর উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং আঁ হযরত (সা) এ কাজে কঠোরভাবে বাধা প্রদান করেছেন। কেননা এটি অত্যন্ত হিংস্র পশুত্বের কাজ এবং ইসলামের শান ও মান-মর্যাদা বিরোধী। ইসলাম হলো শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম।

٣٢١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ حَمَّادٍ وَاَبِيْهِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ عَرَضَنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ قَامَ فَاَمَرَ بِقَتْلِ كِبَارِهِمْ وَسَبْيِ صِغَارِهِمْ فَمَنْ اَنْبَتَتْ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ اِسْتَحْيٰ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اُنْظُرُوْا فَاِنْ كَانَ اَنْبَتَ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ فَوَجَدَنِيْ لَمْ اُنْبِتْ فَخَلّٰى سَبِيْلِيْ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبِيِّ قُرَيْظَةَ فَعُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرُوْا فِيْ عَانَتِيْ فَوَجَدُوْنِيْ لَمْ اُنْبِتْ فَاَلْحَقُوْنِيْ بِالسَّبِيِ *

হাদীস নং- ৩২১

অনুবাদ ঃ হযরত আতিয়া কুরযী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরায়যার যুদ্ধে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) খেদমতে পেশ করা হয়। তখন তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যে,

বড়দেরকে হত্যা কর এবং ছোটদেরকে গোলাম (দাস) হিসেবে রাখা হোক। তাই যার নাভীর নিচে লোম গজিয়েছে, তাকে হত্যা করা হয় এবং যার গজায়নি, তাকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হয়।

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত আতিয়া (রা) বলেন, আমাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট পেশ করা হয়। তখন তিনি বলেন ঃ দেখ! যদি তার লোম গজিয়ে থাকে, তা হলে তাকে হত্যা কর। সুতরাং (আমার বয়স কম হওয়ায়) অবশেষে আমাকে ছেড়ে দেয়।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, বনূ কুরায়যার যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। যখন আমাকে নবী করীম (সা)-এর সামনে পেশ করা হয়, তখন লোকজন আমার নাভীর নিচে লোম দেখতে পায়নি। কাজেই বন্দীদের মধ্য থেকে আমাকে মুক্তি দেয়া হয়।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়সের পরিচয়ের একটি সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা অপ্রাপ্ত বয়স্ক যুদ্ধের যোগ্যতা রাখে না। কাজেই তাদেরকে হত্যা করা যুলমের নামান্তর। সুতরাং তাদেরকে জীবিত রেখে বন্দী হিসেবে রাখা হয়েছে।

٣٢٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَابْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنِ الحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قُتِلَ فِى الْخَنْدَقِ فَاَعْطَى الْمُشْرِكُوْنَ يَجِيْفَتِهِ مَالاً فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ *

হাদীস নং- ৩২২

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, খন্দকের যুদ্ধের দিন খন্দকের মধ্যে একজন মুশরিককে হত্যা করা হয়। তখন মুশরিকগণ তার লাশের পরিবর্তে অনেক ধন-সম্পদ দিতে সম্মত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এটা থেকে নিষেধ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ মালের পরিবর্তে মৃত লাশ বিক্রি করা অত্যন্ত দূষণীয় কাজ। তাই আঁ হযরত (সা) এর থেকে বিরত রাখেন এবং এটা তিনি পসন্দ করেননি।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ اَنْ يُّبَاعُ الْخُمُسُ حَتّٰى يُقْسَمَ

এক-পঞ্চমাংশ বন্টন করার পূর্বে বিক্রি করা নিষিদ্ধ

٣٢٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ اَنْ يُّبَاعَ الْخُمُسُ حَتّٰى يُقْسَمَ *

হাদীস নং- ৩২৩

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, খায়বরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বে এক-পঞ্চমাংশ বিক্রি করা থেকে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ গনী মতের মাল বন্টনের পূর্বে কোন অংশ ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। কেননা বন্টনের পূর্বে কেউ মালিক হয় না এবং যখন মালিকানা প্রমাণিত হয়নি, তখন বিক্রিও জায়েয নয়।

٣٢٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقْسِمْ شَيْئًا مِنْ غَنَائِمِ بَدْرٍ اِلاَّ بَعْدَ مَقْدَمِهِ بِالْمَدِيْنَةِ *

হাদীস নং- ৩২৪

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের কোন মাল বন্টন করেননি, তবে মদীনা গমনের পর (বন্টন করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর মতে গনীমতের মালের বন্টন কোন প্রয়োজন ছাড়া দারুল হরবের মধ্যে করা জায়েয নয়। ইমাম শাফিঈ ও মালিক (র)-এর মতে জায়েয আছে। উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য এ কারণে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে গনীমতের মালের মধ্যে অংশগ্রহণকারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। যতক্ষণ তিনি দারুণ ইসলামে নিরাপদে না পৌছবেন, আর এ দু'জন ইমামের মত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এ নীতির ফলেই এ সমস্ত বুযর্গের মধ্যে অনেক মাসয়ালায় মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

كِتَابُ الْبُيُوْعِ
ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

بَابُ التَّقْوٰى عَنِ الْمُشْبِهَاتِ
সন্দেহজনক বস্তু থেকে বেঁচে থাকা

٣٢٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَمُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذٰلِكَ مُشْتَبِهَاتٌ لَايَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اَتَّقَى الشُّبْهَاتِ اِسْتَبْرَاَ لَه دِيْنَه وَعِرْضَه *

হাদীস নং- ৩২৫

অনুবাদ ঃ হযরত শা'বী (র) বলেন, আমি নু'মানকে মিম্বরের উপর এটা বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। এ দু'টোর মধ্যে অনেক সন্দেহজনক বস্তু রয়েছে, যেগুলো সম্বন্ধে অনেক লোক জানে না। সুতরাং যারা সন্দেহজনক বস্তু থেকে বেঁচে থাকে, তারা তাদের দীন ও মর্যাদা রক্ষা করল।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস সম্পূর্ণ দীন ইসলামের একটি সংক্ষিপ্তসার এবং তাকওয়ার একটি উচ্চতম মাপকাঠি প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ হালাল এমন প্রকাশ্য বস্তু, যে গুলো হালাল হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বাক্য দ্বারা ইসলামে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, পানাহার-পরিধান এবং অন্যান্য ব্যবহৃত বস্তু যা মুসলিমগণ সাধারণভাবে কোন সন্দেহ ছাড়াই ব্যবহার করে থাকে। এমনিভাবে ঐ সমস্ত বস্তু হলো হারাম, যেগুলোর হারাম হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পবিত্র কুরআনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন মদ, সুদ, মৃত জন্তু ইত্যাদি। এবার সন্দেহপূর্ণ বস্তু হলো হারাম ও হালালের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ, যাতে হারাম ও হালাল উভয়ের আশংকা রয়েছে। অর্থাৎ এটা হালাল ও হারামের মধ্যে গড়ে উঠেছে এবং উভয়ের সম্ভাবনাই রয়েছে। যেমন এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে বিবাহ করে। এরপর কেউ এ সন্দেহ ছড়িয়ে দেয় যে, এ মহিলা ঐ ব্যক্তির দুধ বোন। এ অবস্থায় উক্ত বিবাহিত নারী ঐ ব্যক্তির জন্য সন্দেহজনক হয়ে পড়ল। সুতরাং তার জন্য হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তাকওয়া হলো এই যে, মুসলমান সন্দেহজনক বস্তু থেকেও বেঁচে থাকবে। পাপের দ্বারা অপবিত্র হওয়ার আশংকা যেন না থাকে এবং দীনের বিধানসমূহ যাতে যে কোন সমালোচনা থেকে পবিত্র থাকে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সন্দেহজনক বস্তুর গণনা বা হিসাব হারাম বস্তুসমূহের মধ্যে রয়েছে। এগুলো থেকে মানুষকে এমনিভাবে মুক্ত থাকতে হবে, যেমনিভাবে সুনির্দিষ্ট হারাম থেকে মুক্ত থাকে। কেউ কেউ বলেন, এটা মুবাহ, কেননা মূল বস্তুর মধ্যে বৈধতা রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ هُوَالَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا (তিনি ঐ পবিত্র সত্তা যিনি তোমাদের জন্য ভূমন্ডলের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন) (২ ঃ ২৯)। সুতরাং হানাফী ও শাফিঈ মাযহাবের জমহুর উলামায়ে কিরামের মত হলো এটা এবং এ মতামত থেকে অনেক মাসয়লা বের হয়ে থাকে। কেউ কেউ এ মত পোষণ করেন যে, তাদের ব্যাপারে কোন অকাট্য সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না যে, এ সমস্ত হারাম অথবা মুবাহ্।

بَابُ اللَّعْنُ عَلَى الْخَمْرِ وَمُتَعَلِّقِيْهَا

মদ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপর লা'নত

٣٢٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ لُعِنَتِ الْخَمْرُ وَعَاصِرُهَا وَسَاقِيْهَا وَشَارِبُهَا وَبَائِعُهَا وَمُشْتَرِيْهَا *

হাদীস নং- ৩২৬

অনুবাদ ঃ হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, লা'নত করা হয়েছে মদের উপর, এর প্রস্তুতকারীর উপর, মদ যে পান করায় তার উপর এবং পানকারীর উপর এবং এর বিক্রয়কারী ও ক্রয়কারীর উপর।

ব্যাখ্যা ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) এ সমস্ত বস্তুর উপর লা'নত করেছেন, মদ প্রস্তুতকারীর, পানকারী, বহনকারী, যার দিকে বহন করে নেয়া হয়, বিক্রয়কারী, বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণকারী, যার জন্য ক্রয় করা হয় ও ক্রেতা। মোট কথা মদ যেহেতু সম্পূর্ণ ও নিশ্চিতভাবে হারাম, তাই এর সাথে যে কোন প্রকার সম্পর্ক রক্ষাকারী বা ব্যবহারকারী অভিযুক্ত হবে এবং আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে লা'নতের উপযুক্ত হবে।

٣٢٧ - حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ (رضـ) اَوْسَأَلَهُ اَبُوْ كَثِيْرٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ فَقَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَحَرَّمُوْا اَكْلَهَا وَاسْتَحَلُّوا بَيْعَهَا وَاَكَلُوْا اَثْمَانَهَا وَاِنَّ الَّذِى حَرَّمَ الْخَمْرَ حَرَّمَ بَيْعَهَا وَاَكْلَ ثَمَنِهَا *

হাদীস নং- ৩২৭

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র) বলেন, আমি হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করি অথবা আবূ কাসীর (র) তার নিকট মদ বিক্রির মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদেরকে ধ্বংস করে দেন। কেননা যখন চর্বি তাদের উপর হারাম করা হয়, তখন তারা তা খাওয়া হারাম মনে করে কিন্তু তা বিক্রি করাকে হালাল গণ্য করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণ করে। অথচ যিনি মদকে হারাম করেছেন, তিনি তা বিক্রি এবং এর মূল্যও হারাম করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন। কেননা আল্লাহ্ যখন তাদের চর্বি ব্যবহার হারাম করেন, তখন তারা এটা গালিয়ে বিক্রি করে এর মূল্য গ্রহণ করে। মূলত এটা একটা প্রতারণা বা কৌশল। চর্বিকে গলিয়ে এর আকৃতি পরিবর্তন করে তারা মনে করে যে, এখন এর বিধানও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ), এটা কত বড় অসততা ও প্রতারণা এবং আল্লাহ্র বিধানের অমর্যাদা ! আবূ দাউদ শরীফে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন জাতির উপর কোন বস্তু হারাম করেন, তখন এর মূল্যও হারাম করেন। হারামের এ মূলনীতি সর্বত্র জারী রয়েছে। সুতরাং এরূপ মিথ্যা ও জঘন্য প্রতারণার মাধ্যমে আল্লাহ্র বিধান অমান্য করা হলো সুস্পষ্ট গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা।

بَابُ اللَّعْنُ عَلٰى اكْلِ الرِّبٰوا

সুদখোরের উপর লা'নত

٣٢٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ (رض) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْلَ الرِّبٰوا وَمُؤَكِلَه *

হাদীস নং- ৩২৮

অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সুদ গ্রহণকারী ও সুদ প্রদানকারীর উপর রাসূলুল্লাহ (সা) লা'নত করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আহমদ, দারে কুতনী, তিবরানী আওসাত ও কবীরে, আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালা মরফূ রিওয়ায়েত করেন যে, এক দিরহামের সমান সুদ গ্রহণ যখন সুদ হিসেবে মনে হবে, তখন এটা ছত্রিশটি ব্যভিচার থেকে কঠোর অপরাধ বলে গণ্য হবে। বায়হাকী শুআবুল ঈমানে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে যে রিওয়ায়েত করেছেন, এতে অতিরিক্ত এ বাক্যও রয়েছে, যে ব্যক্তির দেহের গোশত হারাম মালের দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে সে অগ্নি গ্রাসিত হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। মুসলিম শরীফে ও অন্যান্য গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণিত আছে যে, সুদ গ্রহণকারী ও সুদ প্রদানকারী, সুদের লেখক ও সাক্ষ্যদানকারীর উপর নবী করীম (সা) লা'নত

করেছেন। মোট কথা আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সুদ এরূপ জঘন্য পাপ যে, এর সামান্য অংশ গ্রহণকারী আল্লাহ্র লা'নত ও গযবের উপযুক্ত হবে এবং আঁ হযরত (সা) পবিত্র মুখ দিয়ে তাদের উপর লা'নত করেছেন।

بَابُ الرِّبٰوا فِى النَّسِيْئَةِ

ঋণের সুদ

٣٢٩ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَنْسَا الرِّبٰوا فِى النَسِيْئَةِ وَمَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ *

হাদীস নং- ৩২৯

অনুবাদ ঃ হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ঋণের সুদই প্রকৃত সুদ এবং নগদ লেনদেনে কোন দোষ নাই।

ব্যাখ্যা ঃ সুদ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরবর্তী হাদীসে করা হবে।

بَابُ الرِّبٰوا فِى الاَشْيَاءِ السِّتَّةِ بِالْفَضْلِ

ছয় বস্তুর মধ্যে অতিরিক্ত গ্রহণ করা সুদ

٣٣٠ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَن عَطِيَّةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفَضْلُ رِبٰوا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْفَضْلُ رِبوا وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَالْفَضْلُ رِبٰوا والشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفَضْلُ رِبٰوا ـ

وَفِى رِوَايَةٍ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبٰوا وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً بِكَيْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبٰوا وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلاً بِكَيْلٍ وَالْفَضْلُ رِبٰوا*

হাদীস নং- ৩৩০

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ স্বর্ণ-স্বর্ণের পরিবর্তে সমান সমান হলে জায়েয, অতিরিক্ত হলো সুদ। রূপা রূপার পরিবর্তে ওজনে সমান সমান হলে জায়েয হবে, অতিরিক্ত হলে সুদ। খেজুর খেজুরের সমান সমান হলে জায়েয,

অতিরিক্ত হলে সুদ হবে। যব বা বার্লি যবের সমান হলে জায়েয, অতিরিক্ত হলে সুদ হবে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, স্বর্ণ-স্বর্ণের সমান ওজনে ও হাতে হাতে, এর অতিরিক্ত হলো সুদ, গম গমের সমান ওজনে ও হাতে হাতে এবং অতিরিক্ত হলো সুদ, খেজুর খেজুরের সমান ও লবণ লবণের সমান ওজনে, এর অতিরিক্ত হলো সুদ।

ব্যাখ্যা ঃ প্রচলিত অর্থে রিবাকে (ربوا) সুদ বলা হয়। বিরা'র আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ ঐ অতিরিক্ত অংশ বা আধিক্যের নাম, যা দুটি মালের পরিবর্তে কোন বদল ব্যতীত দেয়া নেয়া হয়।

রিবা' মূলত দু'প্রকার ঃ

এক, রিবা নাসিয়া (ربوا نسيه) ঃ নগদ কোন বস্তুকে ধার বা কর্জ হিসেবে বদল করা এবং

দ্বিতীয়, রিবা ফদল (ربوا فضل) ঃ মূলের থেকে অতিরিক্ত দিয়ে হাতে হাতে নগদ দেয়া নেয়া। সূদ (রিবা) হারাম হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا (আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন)। এ আয়াতে রিবার (সুদ) আভিধানিক অর্থ সাধারণ অতিরিক্ত সর্ব সম্মতিক্রমে উদ্দেশ্য নয়, তা হলে কুরআনের আয়াতের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত হয়েছে যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে এবং হাদীসসমূহে এর ব্যাখ্যা রয়েছে। মূল হাদীসে আঁ হযরত (সা) স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খেজুর ও লবণ এ ছয়টি বস্তুকে গণনা করেছেন। এ হাদীস হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

• اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَاِنْ اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الاَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ -

"আঁ হযরত (সা) বলেছেন ঃ স্বর্ণ স্বর্ণের পরিবর্তে, রূপা রূপার পরিবর্তে, গম গমের পরিবর্তে, যব যবের পরিবর্তে, খেজুর খেজুরের পরিবর্তে, লবণ লবণের পরিবর্তে সমান সমান এবং হাতে হাতে অর্থাৎ নগদ মূল্যে জায়েয। যদি এ সমস্ত বস্তুর পরস্পর রূপের পরিবর্তন হয়, তা হলে যেভাবে ইচ্ছা, ক্রয়-বিক্রয় করতে পার যখন তা হবে নগদ মূল্যে। বুখারী ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত এ হাদীস একই বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। মোট কথা, এ হাদীস ষোলজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। আসহাবে যাহির (اصحاب ظاهر) যেহেতু ক্বিয়াস অস্বীকার করে থাকেন, তাঁরা এ হাদীসের বিধানকে বর্ণিত দু'টি বস্তুর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। কিন্তু ইমামগণ ক্বিয়াসের বিষয়টিও গ্রহণ করে এতে বিধানের কারণ সন্ধান করেন এবং ত্রুটির সাথে হারামের বিধানকে অন্যদিকে নিয়ে যান।

এ বিধানের কারণ সন্ধানের ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। মোট কথা ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দু হলো এ হাদীস। হারাম হওয়ার বিধানের কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা ও জিজ্ঞাসার ফলে বিভিন্ন মাসয়ালার সূত্রপাত হয়েছে এবং এগুলোর উপর বিভিন্ন

মাসয়ালার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র) সমস্ত হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে কারণ (علت) হিসেবে দু'টি বস্তু নির্ধারণ করেছেন। এক হলো বস্তু বা জাতি (جنس), দ্বিতীয় হলো হলো পরিমাণ (قدر)। قدر -এর অর্থ হলো ওজন করা বস্তুর ওজন এবং দ্বিতীয় হলো পরিমাপ করা যায় এমন বস্তুর পরিমাপ। কেননা হাদীসে বর্ণিত مَثَلاً بِمِثْلٍ -এর দ্বারা সাদৃশ্য বা একই রকম হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ অতিরিক্ত (زيادتى) ঐ সময় হারাম হবে যখন এ সমস্ত বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য (مما ثلث) হবে। মোট কথা হারাম হওয়ার ভিত্তি হলো সাদৃশ্য এবং একই জাতি থেকে গোপনীয়। সুতরাং এ বস্তুও পরিমাণের কারণের সাথে অতিরিক্ত (فضل) হারাম হওয়ার বিধান দূরীভূত হবে। যেখানে দু'টি অংশের কারণ বিদ্যমান থাকবে, সেখানে নগদের মধ্যে অতিরিক্ত হওয়াও অবৈধ হবে এবং ধারও অবৈধ হবে। যেমন- হাদীসে বর্ণিত বস্তুসমূহের মধ্যে স্বর্ণ স্বর্ণের পরিবর্তে, রৌপ্য-রৌপ্যের পরিবর্তে সমান-সমান এবং নগদ নগদ ইত্যাদি। যদি কারণের (علت) দুটি অংশ না পাওয়া যায় যে, বস্তুও এক নয় পরিমাণও এক নয়, তাহলে নগদের মধ্যে অতিরিক্ত জায়েয হবে, ধার ও নাসিয়াও জায়েয হবে। যেমন গম রৌপ্যের পরিবর্তে বিক্রি করা হলে তাতে উভয় পদ্ধতিতে জায়েয হবে। কেননা এখানে শুধু বস্তুই নয়, পরিমাণের ঐক্যও নেই, যেমন গম পরিমাপের এবং রৌপ্য ওজনের। যদি কারণ এক অংশে একইরূপ হয় এবং দ্বিতীয় অংশে মতপার্থক্য, তাহলে অতিরিক্ত জায়েয হবে। অর্থাৎ নগদই অতিরিক্ত নিয়ে বিক্রি করা যাবে। কিন্তু এখানে ধার জায়েয হবে না। যেমন গম ছোলার পরিবর্তে বিক্রি করা হলে অতিরিক্ত হালাল হবে এবং নাসিয়া হারাম অর্থাৎ নগদ নগদ অতিরিক্ত নেয়া দেয়া যাবে। ধারের উপর সওদা করা যাবে না। কেননা এখানে বস্তুর প্রকার ভিন্ন এবং পরিমাপ এক। কেননা গম এবং ছোলা উভয়ই পরিমাপের, অথবা যেমন ঘোড়া ঘোড়ার পরিবর্তে বিক্রি করতে গেলেও অতিরিক্ত জায়েয হবে। অর্থাৎ এক ঘোড়ার পরিবর্তে দুটি দেয়া অথবা নেয়া যাবে। কিন্তু নাসিয়া হারাম, কেননা এতে যদিও বস্তু এক কিন্তু পরিমাণ নেই। কেননা ঘোড়া পরিমাপেরও নয়, ওযনেরও নয়।

ইমাম আহমদ এক রিওয়ায়েতে ইমাম আবূ হানীফার সাথে একমত পোষণ করেন। ইমাম শাফিঈ (র) হাদীসে বর্ণিত বস্তুসমূহের মধ্যে চারটি যথা ঃ গম, যব, খেজুর, লবণ খাদ্যের উপাদান মনে করেন। কেননা এগুলো পানাহারের কাজে লাগে এবং স্বর্ণ-রৌপ্যে মূল্য আরোপিত হয়। এক রিওয়ায়েতে ইমাম আহমদ (র) তাঁদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। ইমাম শাফিঈ (র) অতিরিক্ত দলীল হিসেবে অপর এক হাদীস পেশ করেছেন। তিনি মুসলিম শরীফে বর্ণিত মুআম্মার ইব্ন আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন ঃ

كُنْتُ اَسْمَعُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيْرُ -

"আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ খাদ্য খাদ্যের পরিবর্তে সমান সমান এবং ঐ সময় আমাদের খাদ্য ছিল যব বা বার্লি।"

এখানে খাদ্য কারণ (عِلَّتْ) হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁদের মতে তরকারি, ফলমূল এবং

ঔষধের মধ্যে অতিরিক্ত সুদ হবে। কেননা এতে খাদ্য ও রিযিক রয়েছে কিন্তু লোহা, তামা, পিতল, চুন ইত্যাদির মধ্যে সুদ হবে না। এগুলোর মধ্যে একই বস্তু অতিরিক্ত হলেও বিক্রি জায়েয হবে।

ইমাম মালিক (র) হাদীসে বর্ণিত এ চার বস্তুর মধ্যে সুদ হওয়ার কারণ রিযিক ও সঞ্চয় বা জমা করা যায় বলে মনে করেন। অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তু সঞ্চয় ও জমা করা যায়, এরূপ চার বস্তুর মধ্যে সুদ হারাম এবং যেগুলো জমা করা যায় না, এগুলোর মধ্যে সুদ হবে না। কেননা তাঁরা বলেন যে, আঁ হযরত (সা) ঐ সমস্ত বস্তুর মধ্যে অতিরিক্ত হারাম হওয়া সম্পর্কে বলেছেন, যেগুলো খাদ্য ও রিযিক হতে পারে এবং সঞ্চয় করার উপযুক্ত। সুতরাং এটাই কারণ (عِلَّتْ) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি। এর উপর ভিত্তি করে তরকারি, ফলমূল এবং পানাহারের ঐ সমস্ত দ্রব্য যা রাখা যায় না, তাঁদের মতে এগুলোর মধ্যে সুদ হবে না। এগুলোর মধ্যে একটি দুটির পরিবর্তে নেয়া দেয়া যায়। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে তাঁদের মতে মূল্য রয়েছে। এ বিষয়ে তাঁরা ইমাম শাফিঈ (র)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী প্রথম কারণ (عِلَّتْ اَوْل) বর্ণিত হাদীস অথবা উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বর্ণিত হাদীসের বাক্য مِثْلاً بِمِثْل -এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়েছে। এছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (রা)-এর এটা শুধু ক্বিয়াসিই নয়, বরং তাঁর কিয়াস স্পষ্ট আয়াতের সাথেও মিলে যায়, যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং দারে কুতনী এবং বাযযার হযরত উবাদা ও হযরত আনাস (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন যা এ রিবার হাদীসের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কিয়াসের সুস্পষ্ট দলীল। হাদীসের বাক্য হলো ঃ

اِنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَايُوْزَنُ مِثْلٌ بِمِثْلٍ اِذَا كَانَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ وَمَايُكَالُ مِثْلُه وَاِذَا اخْتَلَفَا النَّوْعَانِ فَلاَ بَأْسَ بِه -

"নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ ওযন করা যায় এমন প্রত্যেকটি বস্তু যখন সমান সমান হবে, তখন তা একই প্রকার বস্তু হয়। এমনিভাবে যে সমস্ত দ্রব্য মাপা যায়, তাও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। যখন বস্তু বিভিন্ন প্রকারের হওয়ার কারণে পার্থক্য হয়, তা হলে কোন সমস্যা নেই।

এবার ইমাম শাফিঈ (র)-এর দলীল মুআম্মার (রা) বর্ণিত হাদীসে মুকাবিলায় হানাফীদের নিকট নবী করীম (সা)-এর এ সাধারণ নির্দেশ ঃ

لاَتَبِيْعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلاَ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ

"এক দিরহামের পরিবর্তে দু'দিরহাম এবং এক সা' এর পরিবর্তে দু' সা বিক্রি করো না, যা খাদ্য ও অখাদ্য সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফার কিয়াস যথার্থ।

بَابُ اِشْتِرَاءِ الْعَبْدَيْنِ بِعَبْدٍ

একটির পরিবর্তে দু'টি গোলাম ক্রয় করা

٣٣١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرَى عَبْدَيْنِ بِعَبْدٍ *

হাদীস নং- ৩৩১

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) একটি গোলামের পরিবর্তে দুটি গোলাম ক্রয় করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ এ ক্রয়-বিক্রয় নগদ হয়েছে, না ধারে এবং অঙ্গিকারের উপর। এটা মূলত, একই বস্তুর মধ্যে হওয়ায় অতিরিক্ত জায়েয। কেননা এখানে দু'টি বদলকৃত একই বস্তু এবং এগুলোর পরিমাণ নেই। গোলাম পরিমাপ করা যায় না, আবার ওজন করাও যায় না। এটা পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি যাতে রিবাল ফদল জায়েয এবং নাসিয়া (نَسِيَه) হারাম।

٣٣٢ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اِشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ يَسْتَوْفِيْهِ *

হাদীস নং- ৩৩২

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করবে, সে তা বিক্রি করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ গ্রহণ না করবে।

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সা) যে সমস্ত বস্তু নিষেধ করেছেন, এগুলোর মধ্যে একটি হলো ঐ খাদ্যশস্য যা অধিকার বা মালিকানা লাভের পূর্বে বিক্রি করা হয়। মুসলিম শরীফে একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে শুধু اِشْتَرى -এর স্থলে اِبْتَاع রয়েছে। এ হাদীসেও ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালিক এ বিধানকে নাযিলকৃত আয়াত অর্থাৎ খাদ্যশস্যের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর মতে খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য অধিকারের পূর্বে বিক্রি করা জায়েয। ইমাম আহমদ (র) এ বিধানকে প্রত্যেক ওজন ও পরিমাপের বস্তুর উপর কার্যকর মনে করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রত্যেক স্থানান্তরযোগ্য বস্তুকে এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন এবং জমি বিক্রি জায়েয মনে করেন।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে যে কোন বস্তুর অধিকার ব্যতীত বিক্রি জায়েয নয় এবং ইমাম মালিক (র)-এর মতে জমির উপর হাদীসের বিধান জারীর বিষয়টি সীমবদ্ধ করাই মূল উদ্দেশ্য। ইমাম আহমদ (র)-এর মত এর চেয়ে ব্যাপক। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত তো আরো ব্যাপক। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মত এর চেয়ে আরো ব্যাপক। ইমাম আবূ হানীফা (র) স্বীয় মাযহাবের স্বপক্ষে আঁ হযরত (সা)-এর বাণী ঃ حَتّى يَسْتَوْفِيْه দ্বারা দলীল পেশ করেন। অর্থাৎ অধিকারের সম্পর্ক স্থাবর বস্তুর সাথে, অস্থাবর বস্তুর সাথে নয়। অথবা বুখারী শরীফে হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীস ঃ

نَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِهِ فِىْ مَكَانِهِ حَتّٰى يَنْقُلُوْهُ *

"রাসূলুল্লাহ (সা) খাদ্যশস্য স্থান পরিবর্তন না করে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।"

بَابُ النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

প্রতারণার সাথে বিক্রির নিষেধাজ্ঞা

٣٣٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ *

হাদীস নং- ৩৩৩

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতারণামূলক বিক্রি থেকে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম নববী বলেন, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের মধ্যে এ হাদীস একটি মূলনীতির মর্যাদা রাখে। তাই মুসলিম শরীফ এ হাদীস প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ করেছে এবং এ হাদীসের উপর অনেক মাসয়ালা নির্ভর করে। এ হাদীস হালাল-হারামের একটি সামগ্রিক মূলনীতি এবং বৈধ-অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে একটি সীমারেখা অঙ্কন করেছে। যে সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে প্রতারণা করা হয়, তা সম্পূর্ণ হারাম এবং যাতে এরূপ না হয়, তা হালাল। অথবা এটাও বলা যায় যে, এ হাদীস এমন একটি কষ্টিপাথর অথবা মানদণ্ড, যার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ-অবৈধ যে কোন পরীক্ষা করা যায়। যেমন পলায়ণকারী গোলামের বিক্রয়, অবর্তমান ও বর্তমান বস্তুর বিক্রয়, অজ্ঞাত বস্তুর বিক্রয় অথবা এরূপ বস্তু বিক্রয় করা যা হস্তান্তর করা অসম্ভব। অথবা যার উপর বিক্রেতার সম্পূর্ণ অধিকার নেই। অথবা পানির মাছ ক্রয়-বিক্রয় করা, অথবা পশুর স্তনের দুধ ক্রয়-বিক্রয় করা, অথবা পশুর পেটের বাচ্চা বিক্রয় করা, অথবা এটা বলে বিক্রয় করা যে, এ সমস্ত বকরীর মধ্যে যে কোন বকরী বিক্রি করব অথবা কাপড়সমূহের মধ্যে কোন একটি কাপড় বিক্রি করব। এ সমস্ত পদ্ধতি উল্লিখিত মূলনীতির আলোকে অবৈধ।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

মুযাবানা ও মুহাকালা পদ্ধতিতে বিক্রি নিষিদ্ধ

٣٣٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

الاَنْصَارِيِّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ نَهٰى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ *

হাদীস নং- ৩৩৪

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) মুযাবানা ও মুহাকালা (পদ্ধতিতে) বিক্রয়ে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ মুযাবানা বিক্রয় হলো এই যে, কোন প্রকার ওজন ছাড়া বৃক্ষের উপর ভিজা খেজুর শুকনা খেজুরের পরিবর্তে বিক্রি করা। অথবা আঙ্গুর কোন বলদের উপর বোঝাই করে ভিজা বা কাঁচা আঙ্গুর শুকনা আঙ্গুরের পরিবর্তে বিক্রি করা। উভয় পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় উল্লেখিত মূলনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ। কেননা এখানে বিক্রিত দ্রব্য অজ্ঞাত এবং এতে প্রতারণার আশংকা রয়েছে। বিক্রয়ের এ পদ্ধতি যেহেতু আইয়্যামে জাহেলিয়াতে প্রচলিত ছিল, তাই এগুলো পৃথকভাবে বিশেষ করে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বাক্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে– যাতে কোন সন্দেহ বাকী না থাকে, প্রত্যেক শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই উপলব্ধি করতে পারে।

بَابُ النَّهِى عَنْ اِشْتِرَاءِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى يُشْقِحَ

ফল লাল অথবা হলুদ হওয়ার পূর্বে ক্রয় করা নিষেধ

٣٣٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّشْتَرِى ثَمَرَةً حَتّٰى يُشْقِحَ *

হাদীস নং- ৩৩৫

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ফল হলুদ অথবা লাল হওয়ার পূর্বে ক্রয় করার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত ফল প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত না পৌছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রয় করা নিষেধ।

٣٣٦ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ جَبَلَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ حَتّٰى يَبْدُ وَصَلَاحُهُ *

হাদীস নং- ৩৩৬

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) খেজুর ফল পুষ্ট হওয়া পাকার পূর্বে বিক্রি করা থেকে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ বৃক্ষের উপরে কাঁচা অবস্থায় খেজুর বিক্রি করা জায়েয নয়। যদি খাবার উপযুক্ত হওয়ার পর বৃক্ষ থেকে কর্তন করে বিক্রি করা হয়, তা হলে কোন অসুবিধা নেই। কেননা ফল পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং পাকার পূর্বে ক্রয় করলে এক পক্ষ ক্ষতিগস্ত হবে।

٣٣٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا طَلَعَ النَّجْمُ رُفِعَتِ الْعَاهَاتُ يَعْنِى الثُّرَيَّا *

হাদীস নং- ৩৩৭

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যখন তারকা (সুরাইয়া) উদিত হয়, তখন ফলের উপর থেকে বিপদ দূরীভূত হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা ঃ হিজায নগরীতে গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে সুরাইয়া নামক তারকা ফজর নামাযের সাথে সাথে উদিত হয়, এটা যেন ফলের উপর বিপদ দূরীভূত হওয়ার একটি বার্তা এবং ফলসমূহ পূর্ণতালাভের প্রধান লক্ষণ।

بَابُ الاِشْتِرَاطِ مِنْ الْمُشْتَرَى

ক্রেতার পক্ষ থেকে শর্ত আরোপের বর্ণনা

٣٣٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِىِّ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً مُوَبَّرًا اَوْعَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُشْتَرِىُّ -

وَفِى رِوَايَةٍ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَه مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُوَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ *

হাদীস নং- ৩৩৮

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি নর ও মাদী খেজুর বৃক্ষ প্রজনন করার পর বিক্রি করে অথবা এমন

গোলাম যার সম্পদ আছে, তাকে বিক্রি করে, তাহলে ফল এবং মাল বিক্রেতার। কিন্তু যদি ক্রেতা কোন শর্ত করে থাকে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি এমন গোলাম বিক্রি করে যার সম্পদ আছে, তাহলে ঐ সম্পদ ও মাল বিক্রেতার হবে। কিন্তু ক্রেতা যদি কোন শর্ত আরোপ করে থাকে। যে ব্যক্তি প্রজননকৃত খেজুর বৃক্ষ বিক্রি করে, তাহলে এর ফলের মালিক হবে বিক্রেতা, তবে ক্রেতা যদি অন্য কোন শর্ত আরোপ করে থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ مُؤَبَّرْ খেজুরের ঐ বৃক্ষকে বলা হয় যা প্রজনন করানো হয়ে থাকে। এর পদ্ধতি হলো এই যে, আরবের লোকেরা মনে করে, খেজুর গাছের মধ্যে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ আছে। ফলে তারা স্ত্রী লিঙ্গধারী গাছটিকে চিড়ে এর ভিতর পুংলিঙ্গধারী গাছের গাবা সংযুক্ত করে দেয়। এ পদ্ধতিতে গাছ ফলন বেশি হয়। এ পদ্ধতিতে আরবীতে তাবীর বলা হয়।

এ হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (র)-এর মাযহাব হলো এই যে, যদি খেজুর বৃক্ষে প্রজনন করানো হয়, তা হলে এর বিধান হলো কোন শর্ত ছাড়াই ফল বিক্রেতার এবং যদি শর্ত থাকে, তা হলে তা ক্রেতার। যদি প্রজনন না করানো হয়, তাহলে সর্বাবস্থায় তা ক্রেতার।

ইমাম আবূ হানীফা (র) যেহেতু দ্বিতীয় পদ্ধতির সাথে একমত নন, তাই তাঁর মতে খেজুর বৃক্ষ প্রজনন করানো হোক বা না হোক, উভয় পদ্ধতিতে শর্তের কারণে ক্রেতার হবে এবং শর্ত ছাড়া হবে বিক্রেতার। তাঁর মতে হাদীসের বিধানের জন্য তাবীরের শর্ত নেই। তাঁর মতে এ শর্ত প্রচলন এবং অধিকাংশ অবস্থার প্রেক্ষিতে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ইমাম মুহাম্মদ (র) আঁ হযরত (সা) থেকে এক হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

مَنْ اِشْتَرٰى اَرْضًا فِيْهَا نَخْلٌ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

"যে ব্যক্তি এমন জমি ক্রয় করে যেখানে ফলসহ খেজুর রয়েছে, তা হলে ফলসমূহ হবে বিক্রেতার। কিন্তু ক্রেতা যদি কোন শর্ত করে থাকে।"

এখানে গাছে কলম লাগান বা না লাগান এ ব্যাপারে কোন শর্ত নেই, বরং এটা সাধারণ রাখা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ বিধান মূলত কলমের শর্তের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়নি। এ হাদীসটি হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ

দরের উপর দর করা নিষিদ্ধ

٣٣٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَمَّنْ لاَ اَتَّهِمُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ (رضـ) وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ قَالَ لاَيَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ وَلاَيَنْكِحُ عَلٰى

خُطْبَةَ اَخِيْهِ وَلَاتُنْكِحُ الْمَرْاَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا وَلَاتَسْاَلُ الْمَرْاَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَافِى صَحْفَتِهَا فَاِنَّ اللّٰهُ هُوَ رَازِقُهَا وَتُبَايِعُوْا بِالْقَاءِ الْحَجَرِ وَاِذَا اِسْتَاْجَرْتَ اَجِيْرًا فَاَعْلِمْهُ اَجْرَهُ *

হাদীস নং- ৩৩৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যেন তার ভাই-এর দরের উপর দর না করে এবং তার ভাই-এর বিবাহের পয়গামের উপর পয়গাম প্রেরণ না করে। আর এরূপ নারীকে বিবাহ না করবে যার ফুফু বা খালা তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। কোন নারী যেন তার বোনের তালাকের কামনা না করে যাতে তার থালা বা পেয়ালার দ্রব্য নিজের উপর ফিরে আসে। কেননা তার রিযিকদাতা আল্লাহ তা'আলা। পাথর নিক্ষেপ করে বিক্রি করো না এং যখন শ্রমিক নিয়োগ কর, তখন পারিশ্রমিক বলে দাও।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে কোন কোন মাসয়ালার অংশবিশেষ বর্ণনা করা হয়েছে যা সামাজিক জীবনে প্রত্যহ সামনে এসে থাকে।

হাদীসে প্রথম দরের উপর দর করার নিষেধ রয়েছে। তা হলো এই যে, দু' ব্যক্তির মধ্যে কোন একটি দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা হয়ে উভয়ে সম্মত হয়েছে। অর্থাৎ বিক্রেতা বিক্রির জন্য সম্মত হয়ে উভয়ের মধ্যে মূল্য নির্ধারণ হয়েছে, শুধু লেনদেন বাকী আছে। এ সময় কারো পক্ষে দরদাম করে তার ভাই-এর ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করা জায়েয নয়। যদি ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌছে থাকে, তা হলে কয়েকজনে দরদাম করা অবৈধ নয়। সুতরাং নিলামে বিক্রি জায়েয আছে।

দ্বিতীয়ত, বিবাহের পয়গামের উপর পয়গাম বা ঘটক প্রেরণ করা এ সময় বৈধ নয় যখন উভয় পক্ষ কথাবার্তা বলে সম্মত হয়েছে, শুধু আকদ বাকী রয়েছে। এ অবস্থায় বিবাহের জন্য হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু উভয়পক্ষ যদি সম্মত না হয়ে থাকে, তা হলে একই সময় বিভিন্ন পয়গাম বা বার্তা প্রেরণ করা যায়। এতে কোন দোষ নেই। যেমন ফাতিমা বিনতে কায়েসের জন্য একই সময় মুআবিয়া ও আবি জাহম-এর পক্ষ থেকে বিবাহের পয়গাম আসে। কিন্তু নবী করীম (সা) এটাকে খারাপ বা দূষণীয় বলেননি। অবশেষে হযরত উসামা (রা)-এর সাথে বিবাহের সিদ্ধান্ত হয়।

তৃতীয়ত, স্বীয় বোনের তালাক কামনা করার পদ্ধতি হলো এই, যেমন একজন অপরিচিত নারী অপর কোন নারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যক্ষ করে হিংসার বশবর্তী হয়ে তার স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করে যে, তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে, যাতে খোরপোষ এবং জীবন-জীবিকার অন্যান্য আসবাবপত্র তালাক প্রদত্ত নারীর পরিবর্তে তার অধিকারে এসে যায়। এটাকেই আঁ হযরত (সা) উদাহরণ স্বরূপ অপরের থালার দ্রব্য নিজের থালায় ঢালার কথা

বলেছেন। এটা জায়েয নয়। কেননা রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ। রিযিকের আশংকায় বা দরিদ্রতার চিন্তায় এরূপ করা অনুচিত।

٣٤٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ قَالَ اِشْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ قَالُوا وَكَيْفَ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تَقُوْلُوْنَ بِعْنَا اِلٰى مَقَاسِمْنَا وَمَغَانِمنَا *

হাদীস নং- ৩৪০

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ক্রয় কর। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, এটা কিভাবে ? তখন তিনি বলেন ঃ (এটা হলো এই যে,) তোমরা বলে থাক, আমরা আমাদের নগদ মাল দ্বারা বা গনীমতের মাল পাওয়া পর্যন্ত ক্রয় করছি।

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা)-এর বাণীর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ক্রয় কর। সন্দেহযুক্ত ও অনিশ্চিত অবস্থা ও ঘটনার সাথে ঝুলন্ত রেখ না। যেমন বলা যায়, বখশীস, দান অথবা বন্টন হওয়ার পর অথবা গনীমতের মাল আদায়ের পর। কেননা এটা অজ্ঞাত বস্তুর বিক্রি করার ন্যায় হয়ে যায়, যা শরীয়তে জায়েয নয়।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

শিকারী কুকুরের মূল্য আদায় করার অনুমতি

٣٤١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ *

হাদীস নং- ৩৪১

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) শিকারী কুকুরের মূল্য প্রদানের অনুমতি দান করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে কুকুরের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে মাসয়ালা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মধ্যে এটা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। সুতরাং ইমামগণের মতপার্থক্য ও এ সম্পর্কিত সঠিক মাসয়ালা এখানে বর্ণনা করা হলো।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে কুকুর শিকারী হোক বা না হোক, এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। তিনি হাদীস ও কিয়াস দ্বারা তাঁর স্বপক্ষে দলীল পেশ করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্ন

মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী করীম (সা) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণী নারীর মজুরী এবং গণকের পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। কিয়াসের মাধ্যমে তাঁরা বলেন যে, কুকুর হলো মৌলিকভাবে অপবিত্র এবং অপবিত্রতা ও ময়লা ঘৃণার উদ্রেক করে। আর বিক্রয় সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করে। সুতরাং এ দুটো একত্র হবে কিভাবে ? তাই এটা বিক্রি বৈধ নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ সাধারণ নিষেধাজ্ঞার দ্বারা শিকারী কুকুর, গৃহ পালিত জন্তুর পাহারায় নিয়োজিত কুকুর, ফসলের হিফাযত ও বাড়ির পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ব্যতিক্রম বা বাদ দেয়া হয়েছে। তাবিঈনের মধ্যে অনেকেই এ মত পোষণ করেন। যেমন আতা, যুহরী ও অন্যান্যগণ। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহারের স্বপক্ষে শক্তিশালী দলীল হলো বর্ণিত হাদীস যা বাক্য ও বর্ণনার দিক দিয়ে সুস্পষ্ট ও সঠিক। হায়সুম ইব্ন হাবিব আস-সিয়াবনীর নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ইকরামা ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নির্ভরযোগ্যতা খুবই সুপ্রসিদ্ধ। অন্যান্য হাদীস এ মাযহাবের ভিত্তিকে আরো শক্তিশালী করেছে। যেমন তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস ঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ اِلاَّ كَلْبِ صَيْدٍ ـ

"রাসূলুল্লাহ (সা) কুকুরের মূল্য (গ্রহণ থেকে) নিষেধ করেছেন, তবে শিকারী কুকুর ব্যতীত।"

যদিও তিরমিযী এ হাদীসকে সহীহ বলেনি, কিন্তু অন্য রিওয়ায়েতে এর স্বপক্ষে হাদীস বিদ্যমান। রয়েছে। সর্ব প্রথম বর্ণিত হাদীস এগুলোর সাথে মিলে এ ব্যতিক্রম (استثناء) সৃষ্টি করেছে। যদি হাদীস সহীহ না হয়, তবে হাসান (حسن) অবশ্যই হবে।

ইমাম বায়হাকী এর উপর বিরোধিতা করে বলেন, এ হাদীসে হাম্মাদের রিওয়ায়েত কায়েস থেকে সহীহ নয়, মুসলিমের রিজাল (رجال) -এর মধ্যে কারো কোন সমালোচনা নেই। অতঃপর বায়হাকী স্বয়ং এক সূত্রে হযরত জাবির (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ اِلاَّ كَلْبِ الصَّيْدِ ـ

"নবী করীম (সা) কুকুর ও বিড়ালের মূল্য (গ্রহণ) থেকে নিষেধ করেছেন, শুধু শিকারী কুকুর ব্যতীত।"

এ হাদীসে একটি সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, হাম্মাদ (বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন) "عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" বলেননি, অর্থাৎ এ হাদীসকে মরফূ বলেননি। অথচ সমালোচনা-কারীদের মতে এ হাদীস হলো মরফূ। বলা হয়েছে যে, উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা হাম্মাদ থেকে মরফূ রিওয়ায়েত করতে সন্দেহ করেছেন। অথচ সন্দেহ এর দূরীভূত করার মধ্যে কোন বাঁধা নেই। যদি رَفْع হাকীকী না হয়, তবে হুকমী হবে। দারে কুতনী হযরত জাবির (রা) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন যে ঃ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (এটা আমি নবী করীম (সা) থেকে অবগত হয়েছি)। সুতরাং এটা তো নিঃসন্দেহে মরফূ হলো। এছাড়া স্বয়ং বায়হাকী লিখেছেন যে, হায়সুম ইব্ন জামিল হাম্মাদ থেকে ঃ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এবার رفع-এর মধ্যে কি সন্দেহ থাকতে পারে এবং হায়সুম হলেন নির্ভরযোগ্য (ثقه) এবং অধিক নির্ভরযোগ্যতা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। এমনিভাবে ইমাম নাসাঈ (র) হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) বিড়াল ও কুকুরের মূল্য গ্রহণ থেকে নিষেধ করেছেন, শিকারী কুকুর ব্যতীত। এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (ثقه) মোট কথা এ সমস্ত ব্যতিক্রম বা استثناء -এর হাদীসের কোন একটির সনদে দুর্বলতা পাওয়া গেলেও তা متابعت -এর দ্বারা শক্তিশালী হয়ে যায় এবং حسن -এর মর্যাদা পর্যন্ত পৌছে যায়, যা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

এবার যে সমস্ত হাদীস দ্বারা ইমাম শাফিঈ (র) দলীল গ্রহণ করেছেন, এর জওয়াব হলো এই, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা হলো সাধারণ, যা সমস্ত কুকুরের বিক্রি নিষিদ্ধ করে এবং এ সহীহ হাদীসসমূহ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, শিকারী কুকুর, ফসলাদি, ঘরবাড়ি এবং গৃহপালিত জন্তুর পাহারায় নিয়োজিত কুকুর এ বিধান থেকে ব্যতিক্রম। অথবা সাধারণ নিষেধাজ্ঞার হাদীস রহিত করা হয়েছে। ইসলামের প্রারম্ভে এরূপ বিধানই ছিল যে, আঁ হযরত (সা) কুকুর থেকে যে কোন প্রকার উপকারিতা লাভ করা হারাম বলেছেন, কিন্তু পরে অনুমতি প্রদান করেছেন। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) শিকারী কুকুর হত্যা করলে চল্লিশ দিরহাম আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ফসলাদি পাহারায় নিয়োজিত কুকুর হত্যা করলে এক কাবাশ (كبش) আদায় করার নির্দেশ জারী করেছেন। ইবনুল মালিক এটা উল্লেখ করেছেন। এটাও হতে পারে যে, নিষেধাজ্ঞার এ হাদীসে দংশনকারী ও অশিক্ষিত কুকুরকে বুঝানো হয়েছে, যে কুকুর পোষ মানানো, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং উপকারিতা লাভের যোগ্য, সেগুলো নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (রা) ক্বিয়াস দ্বারাও স্বীয় মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেছেন। তাহলো এই যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে কুকুর হলো সম্পদ। কেননা এটা পালন করা এবং এরদ্বারা উপকারিতা লাভ করার অনুমতি রয়েছে। বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কুকুর লালন পালন করবে, তার আমল থেকে প্রত্যহ এক কিরাত হ্রাস হয়ে থাকে। কিন্তু ফসলাদি ও গৃহপালিত জন্তুর পাহারার কাজে নিয়োজিত কুকুর পালন বৈধ। অতঃপর ইব্ন সীরিন এবং আবূ সালিহের সূত্রে যে রিওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে, এতে শিকারী কুকুর ব্যতিক্রম বা আলাদা করা হয়েছে। যখন কুকুর মাল হিসেবে উপকারিতা লাভের যোগ্য এবং সম্পদের মধ্যে গণ্য হয়েছে, তাই অন্যান্য মাল ও সম্পদের মত এটাও ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। এ ছাড়া কুকুরের মূল অপবিত্রতার কারণে ক্রয়-বিক্রয়ে কোন বাধা নেই, যেমন ইমাম শাফিঈ মনে করেন। কেননা হাতিও যেমন অপবিত্র কিন্তু এটা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ এবং সম্পদ হিসেবে গণ্য। এভাবে কুকুরও সম্পদ হিসেবে গণ্য। পবিত্র কুরআনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার হালাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর মূল্য ও টাকা ছাড়া কোথায় পাওয়া যাবে ?

٣٤٢ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى يَعْفُوْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ اُسَيْدٍ

اِلٰى اَهْلَ مَكَّةَ فَقَالَ اِنْهَهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِىْ بَيْعٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ رِبْحٍ مَالَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ مَالَمْ يُقْبَضْ *

হাদীস নং- ৩৪২

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) আত্তাব ইব্ন উসায়দ (রা)-কে এ নির্দেশ দিয়ে মক্কায় প্রেরণ করেন যে, তুমি তাদেরকে দুটি শর্তের সাথে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ কর। কর্জ ও অনিশ্চিত মাল বিক্রয় এবং এরদ্বারা লাভ করা থেকে ও অধিকার লাভ করার পূর্বে বিক্রয় করা থেকে।

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীসে দুটি শর্তকে যুক্ত করা হয়েছে। কেননা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এ দুটো শর্ত জায়েয নয়। বিক্রির মধ্যে শর্ত করার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে যা সামগ্রীকভাবে অবৈধ।

প্রথম হলো এই যে, কোন ব্যক্তি কারো নিকট স্বীয় গোলাম এ শর্তে বিক্রি করে যে, সে তার ঘরও তার নিকট বিক্রি করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় হলো, বিক্রেতা এটা বলে যে, আমি তোমার নিকট এ দ্রব্য নগদ দশ টাকায় বিক্রি করছি এবং বিশ টাকা ধার নেব।

তৃতীয় হলো, বিক্রেতা এটা বলে যে, এ কাপড় আমি তোমার নিকট এ শর্তে বিক্রি করছি যে, এটা ধোলাই করে এবং সেলাই করে দেব।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী লিখেছেন, বিক্রি এবং কর্জের পদ্ধতি হলো এই যে, বিক্রেতা এটা বলে যে, আমি এ দ্রব্য তোমার নিকট এ শর্তে বিক্রি করছি যে, তুমি আমাকে এত টাকা কর্জ প্রদান করবে।

অধিকারবিহীন মাল থেকে লাভবান হওয়ার পদ্ধতি হলো এই যে, কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি থেকে কোন দ্রব্য ক্রয় করল। ক্রেতা এখনো ঐ মালের অধিকার লাভ করেনি কিন্তু ক্রেতা ঐ দ্রব্যের ভাড়া গ্রহণের অধিকার লাভ করতে চায়। এটা তার জন্য জায়েয নয় এবং ভাড়ার অধিকার লাভ করবে বিক্রেতা। কেননা এ অবস্থায় যদি ঐ দ্রব্য হারিয়ে যায়, তা হলে এটা বিক্রেতার ক্ষতি হবে, ক্রেতার নয়। অধিকারবিহীন বস্তুর বিক্রির পদ্ধতি হলো এই যে, যে মাল অধিকার ও মালিকানায় নেই, তা যেন বিক্রয় করা না হয়। এরূপ করা হলে তা হারাম হবে।

٣٤٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَبْتَاعُ اَحَدُكُمْ عَبْدًا وَلَا اَمَةً فِيْهِ شَرْطٌ فَاِنَّهُ عَقْدٌ فِى الرِّقِ *

হাদীস নং- ৩৪৩

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এমন দাস ও দাসী ক্রয় না করে যার মধ্যে কোন শর্ত রয়েছে। কেননা এটা তাদের দাসত্বের একটি গিরা (যা খোলা যায় না)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের বাক্য হলো সংক্ষিপ্ত (مجمل)। কেউ কেউ شرط শব্দের ر ও ش কে যবর দিয়ে পড়েছেন যার অর্থ আলামত বা চিহ্ন। হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, গোলাম যেমন- মুদাব্বির (مدبر) অথবা দাসী উম্মে ওয়ালাদ (ام ولد) হলে তাকে ক্রয় করো না। কেননা গোলাম মুদাব্বির হওয়া এবং দাসীর উম্মে ওয়ালাদ হওয়া এটা না খোলার মত গিরা। আবার কেউ কেউ شرط শব্দের ر সুকুন (سكون) দিয়ে পড়ে থাকে এবং معنى معروف অর্থ করে থাকে। তাদের মতে এটা যেন এক বিক্রির মধ্যে দু' বিক্রির পদ্ধতি হলো।

بَابُ النَّظَرِ عَنِ الْمُعْسِرِ

দরিদ্রকে সুযোগ দেয়া

٣٤٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الاَشْجَعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى رِبْعِىُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ يُؤْتَى بِعَبْدٍ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ اَىُّ رَبِّى مَا عَمِلْتُ اِلاَّ خَيْرًا مَا اَرَدْتُ بِهِ اِلاَّ لِقَاءَكَ فَكُنْتُ اُوْسِعُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَاَنْظُرُ عَنِ الْمَعْسِرِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْكَ فَتَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِى فَقَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِىُّ (رضـ) وَاَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ *

হাদীস নং- ৩৪৪

অনুবাদ ঃ হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি কোন কাজ করিনি, তবে আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি নেককাজ করেছি। আমি সুযোগ দিয়েছি সম্পদশালী লোকদেরকে এবং ক্ষমা করে দিয়েছি দরিদ্রকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ (ক্ষমা ও মার্জনার ব্যাপারে) আমি তোমার চেয়ে বেশি ক্ষমতা ও অধিকার রাখি। (অতঃপর ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ প্রদান করবেন) আমার এ বান্দাকে ক্ষমা কর। আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি [হযরত হুযায়ফা (রা)] এ হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শ্রবণ করেছেন। (অথবা এর অর্থ এই যে,) আমি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে একটি উপদেশ রয়েছে। তা হলো এই যে, লেনদেন ও কাজকর্মে মানুষের সাথে কোমল ও ভদ্র ব্যবহার এবং লেনদেনের মধ্যে ক্ষমা ও মার্জনার দৃষ্টিতে কাজ করা আল্লাহ্র নিকট খুবই প্রিয়। কেননা তিনিও তাঁর বান্দার প্রতি ক্ষমা ও মার্জনা করে থাকেন। কোন

কোন সময় আমীর বা সম্পদশালী ব্যক্তিও দেউলিয়া হয়ে যায়। এ সময় তার প্রতি করুণা ও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা এবং ঋণ থাকলে পরিশোধের সুযোগ দেয়া অত্যন্ত পূণ্যের কাজ।

٣٤٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَدَّدَ عَلٰى اُمَّتِىْ بِالتَّقَاضِى اِذَا كَانَ مُعْسِرًا شَدَّدَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ قَبْرِهٖ *

হাদীস নং- ৩৪৫

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে হানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের দরিদ্র অবস্থায় তার উপর কঠোরতা চাপিয়ে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কবরের উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে ঋণগ্রস্থকে সুযোগ দেয়ার সওয়াবের কথা বলা হয়েছে। যে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি দরিদ্রতার কারণে নির্ধারিত সময়ে ঋণ আদায় করতে সমর্থ না হয়, এ অবস্থায় তার উপর কঠোরতা অবলম্বন করা এবং বিভিন্ন প্রকার চাপ সৃষ্টি করে তার জীবনকে সংকীর্ণ করে দেয়া আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত অপসন্দনীয়। সুতরাং এর শাস্তি হিসেবে ঋণদাতার কবরে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْغَشِّ فِى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা নিষিদ্ধ

٣٤٦ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّه قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ فِى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

হাদীস নং- ৩৪৬

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীসে আমাদের দলভুক্ত না হওয়ার অর্থ এই যে, তার মধ্যে আমাদের মুসলমানদের মত চরিত্র ও অভ্যাস নেই এবং সে ইসলামী পদ্ধতির উপরেও নেই। তিরমিযী শরীফে এই বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সা) একবার খাদ্যশস্যের এক স্তূপের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তূপের ভিতর স্বীয় হাত প্রবেশ করালেন এবং অঙ্গুলী আর্দ্র পেলেন। তিনি খাদ্যশস্যের মালিককে বললেন ঃ এ খাদ্যশস্য এরূপ ভিজা কেন ? মালিক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ স্তূপের উপর বৃষ্টির পানি পড়েছিল। তখন তিনি বললেন ঃ

তুমি কেন তা উপরে রাখলে না যাতে এগুলো লোক দেখতে পেত। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, তারা আমাদের মধ্যে গণ্য নয়।

٣٤٧ – حَمَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ قَالَ اَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ الدِّيْنَارَ تُبَّعٌ وَهُوَ اَسْعَدُ اَبُوْ كَرْبٍ وَاَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الدَّرَاهِمَ تُبَّعُ الاَ صْغَرُ وَاَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الْفَلُوْسَ وَاَدَارَهَا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ نَمَرُوْدُ بْنُ كِنْعَانُ *

হাদীস নং- ৩৪৭

অনুবাদ ঃ হযরত হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান (র) বলেন, সর্ব প্রথম যিনি স্বর্ণের মুদ্রা বা ছাঁচ তৈরি করেছেন, তিনি হলেন, তুব্বা (تبّع) বা আসআদ আবূ কারব এবং সবং প্রথম রৌপ্যের মূদ্রা তৈরি করেন তুব্বা আসগার। আর সর্ব প্রথম ধাতব মুদ্রা তৈরি করেন এবং তা জনগণের মধ্যে প্রচলন করেন নমরূদ ইব্ন কিন্আন।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত এ কিনআন হলেন হযরত নূহ (আ)-এর দৌহিত্র, টাকা-পয়সার জোরের কথা সবাই অবহিত। কিন্তু এর আবিস্কারকের নাম জানার আগ্রহ সবার। এই হাদীসে আবিস্কারকদের নাম বলা হয়েছে।

كِتَابُ الرَّهْنْ

বন্ধকের বিবরণ

٣٤٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرٰى مِنْ يَهُوْدِىٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا *

হাদীস নং- ৩৪৮

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এক ইয়াহূদীর নিকট থেকে খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট লৌহ বর্ম বন্ধক রাখেন।

ব্যাখ্যা ঃ আঁ হযরত (সা)-এর এ বন্ধককৃত বর্ম ছিল লৌহ নির্মিত এবং তিনি এটা ত্রিশ সা' (صاع) মূল্য দিয়ে ক্রয় করেছেন। অধিকাংশ বর্ণনার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর (সা)-এর ইনতিকাল পর্যন্ত বর্মটি বন্ধক ছিল। ইবনুল মাতলা' বলেন, তাঁর ইনতিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) বন্ধক থেকে এটি ছাড়িয়ে আনেন। এ হাদীস থেকে বন্ধকের কয়েকটি প্রয়োজনীয় মাসয়ালা বের হয়ে থাকে।

প্রথমত, হাদীসের দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহূদী অথবা অন্যান্য যিম্মীদের সাথে মুসলমান লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করতে পারে। যদিও ইয়াহূদী সুদ গ্রহণ করে থাকে। পবিত্র কুরআনেও এ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। মূলত শরীয়তে মুসলমানদের তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন করা বৈধ রেখেছে।

দ্বিতীয়ত, যদি কারো অধিকাংশ মাল হারাম হয়, তবে তার থেকেও কোন দ্রব্য নেয়া যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা অবগত হওয়া না যায় যে, যে দ্রব্য তার থেকে নেয়া হয়েছে, তা হারাম পদ্ধতিতে অর্জন করা হয়েছে।

তৃতীয় হলো, সফরেও বন্ধক রাখা যায়। যদিও কুরআন করীমে সফরের প্রেক্ষাপটে এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এখানে সফরের কথা ঘটনাক্রমে এসেছে।

এখানে এ মাসয়ালার বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। বন্ধকী দ্রব্য থেকে ঋণদাতা বা বন্ধক গ্রহণকারী উপকার লাভ করার অধিকার রাখে না। কেননা উক্ত দ্রব্যের মূল্য তার পক্ষ থেকে এক প্রকার ঋণ যা বন্ধক প্রদানকারীর উপর আদায় করা ওয়াজিব। যদি সে বন্ধকী দ্রব্য থেকে উপকারিতা লাভ করে, তা হলে ঋণের উপর কোন বিনিময় ব্যতীত উপরকার লাভ হলো। এটা সুস্পষ্টভাবে সুদ ও হারাম। বন্ধকী দ্রব্য শুধু বন্ধকগ্রহীতার সান্ত্বনা ও ভরসার জন্য রাখা হয়, কিন্তু তার ফায়দা হাসিলের জন্য নয়। কেননা বন্ধকী দ্রব্য থেকে বন্ধক প্রদানকারীর মালিকানা বাতিল হয় না। তাই এর লাভও তারই হবে এবং তার ক্ষতিপূরণও তার যিম্মায় থাকবে, বন্ধক গ্রহণকারীর যিম্মায় নয়। সুতরাং এরপর বন্ধকী দ্রব্য থেকে বন্ধক গ্রহণকারী কিভাবে ফায়দা হাসিল করবে ?

ইমাম শাফিঈ (র) সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রা) থেকে মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হযরত (সা) বলেছেন ঃ

لَايَغْلَقُ الرِّهْنُ الرَّهِنِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِىْ رَهَنَهُ وَلَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ غَرْمَهُ *

"কোন বস্তু বন্ধক রাখার দ্বারা তা বন্ধক প্রদানকারী ব্যক্তির মালিকানা থেকে বের হয়ে যায় না। যে ব্যক্তি বন্ধক রাখে, তার জন্যই এর লাভ থাকবে এবং তার উপরই এর ক্ষতিপূরণ থাকবে।"

তৎপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে এ হাদীস রহিত হয়ে গিয়েছে যা তিরমিযীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মরফূ' বর্ণিত আছে ঃ

اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِ يَشْرَبُ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِىْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفْقَتُه *

"যখন আরোহণের জন্তু বন্ধকী হয়, তখন আরোহী এর ব্যবহার করবে এবং দুগ্ধবতী জন্তুর দুধও পান করবে যখন তা বন্ধকী হয় এবং যে আরোহণের জন্তু নেবে ও দুধপান করবে, তার উপর এর পানাহারের দায়িত্ব থাকবে।"

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

শুফ'আর বর্ণনা

٣٤٩ - اَبُوْ مُحَمَّدٍ كَتَبَ اِلَى ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ

(رضـ)قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ

হাদীস নং- ৩৪৯

অনুবাদ ঃ হযরত সুলায়মান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ প্রতিবেশী তার শুফ'আর ব্যাপারে বেশি অধিকার রাখে।

ব্যাখ্যা ঃ পরবর্তী হাদীসে বিস্তারিতভাবে শুফ'আর (شفعة) ব্যাখ্যা করা হবে।

٣٥٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اَرَادَ سَعْدُ بَيْعَ دَارِهِ فَقَالَ لِجَارِهِ خُذْهَا بِسَبْعِ مِاَئَةَ فَانِّى قَدْ اُعْطِيَتُ بِهَا ثَمَانَ مِاَئَةِ دِرْهَمٍ وَلٰكِنْ اَعْطَيْتُكَهَا لاَنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنِ الْمِسْوَرِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضـ) قَالَ عَرَضَ عَلَىَّ سَعْدٌ بَيْتًا فَقَالَ لَهُ خُذْهُ اَمَا اَنِّى قَدْ اُعْطِيتُ بِهِ اَكْثَرَ مِمَّا تُعْطِنِىْ وَلٰكِنَّكَ اَحَقُّ بِهِ فَانِّى سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنِ الْمِسْوَرِ عَنْ رَافِعٍ مَوْلٰى سَعْدٍ اَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ يَعْنِى سَعْدًا اَخَذَ هٰذَا الْبَيْتَ بِاَرْبَعِ مِاَئَةِ فَيَقُوْلُ اَمَا انِّى اُعْطِيْتُ ثَمَانَ مِاَئَةِ دِرْهَمٍ وَلٰكِنِّى اَعْطَيْتُكَهُ لِحَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ عَرَضَ بَيْتًا لَهُ عَلٰى جَارِهِ بِاَرْبَعِ مِاَئَةٍ وَلٰكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ *

হাদীস নং- ৩৫০

অনুবাদ ঃ হযরত মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সাআদ (রা) স্বীয় ঘর বিক্রির ইচ্ছা করেন। তখন তিনি তাঁর প্রতিবেশী [হযরত আবূ রাফে (রা)]-কে

বললেন, তুমি এটা সাত'শ দিরহাম দিয়ে নিয়ে যাও। অবশ্য আমি এর জন্য আটশ' দিরহাম পেতে পারি। কিন্তু আমি তোমাকে এটা কম মূল্যে (সাতশ' দিরহামে) এজন্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রতিবেশী তার শুফ'আর ব্যাপারে বেশি হকদার।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা হযরত রাফে' ইবন্ খাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত সাআদ ইব্ন মালিক (রা) আমার নিকট তার ঘর বিক্রির কথা পেশ করে বললেন, তুমি এ ঘর নিয়ে যাও, অবশ্য তুমি আমাকে যা দিচ্ছ, এর চেয়ে বেশি মূল্য আমি পেতে পারি কিন্তু তুমি এর বেশি হকদার। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রতিবেশী তার শুফ'আর ব্যাপারে বেশি অধিকার রাখে।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, মিসওয়ার আবূ রাফে' (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি এ ঘর চার'শ দিরহাম নিয়ে নাও। অবশ্য আমি এর পরিবর্তে আট'শ দিরহাম পেতে পারি। কিন্তু আমি তোমাকে ঐ হাদীসের কারণে দিচ্ছি যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ প্রতিবেশী শুফআর ব্যাপারে বেশি হকদার।

অন্য এক রিওয়ায়েতে হযরত সাআদ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি চারশ' দিরহামে নিজের ঘর তাঁর এক প্রতিবেশীকে দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আমি এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রতিবেশী তার শুফ'আর ব্যাপারে অধিক হকদার।

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন বর্ণনায় রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা)-কে হযরত সাআদ ইব্ন মালিকের গোলাম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যে, তিনি হযরত সাআদের (রা) আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। কিন্তু সঠিক হলো এই যে, তিনি আঁ হযরত (সা)-এর গোলাম ছিলেন, হযরত সাআদের নয়। অধিকাংশ রিওয়ায়েতে এটাই বলা হয়েছে। অথবা সাআদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে مَوْلَى শব্দের অর্থ বন্ধু ও সাহায্যকারীর অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

শুফ'আ (شفعه) সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ ও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। মতপার্থক্যের বিষয় হলো এই যে, তিনজন ইমামের মতে শুফ'আ শরীক তথা অংশীদারদের জন্য, প্রতিবেশীর জন্য নয়। তাঁদের দলীল বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত জাবির (রা)-এর হাদীস ঃ

قَضَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ـ

"নবী করীম (রা) প্রত্যেক এমন বস্তুতে শুফ'আর বিধান জারী করেন যা এখনো বন্টন করা হয়নি। অতঃপর যখন সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং রাস্তাঘাট পরিবর্তন করে আলাদা করা হয়ে যায়, তখন শুফ'আ থাকে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে অনেক হাদীস রয়েছে। বর্ণিত হাদীস প্রথম অথবা এরও পরের, যাতে বলা হয়েছে ঃ শুফ'আ প্রতিবেশীর জন্য।

দ্বিতীয়ত বুখারী শরীফে বর্ণিত আবূ রাফে (রা)-এর হাদীসে আছে ঃ

اِنَّه سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِه

"তিনি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছেন যে, (নিকটবর্তী হওয়ার কারণে) প্রতিবেশী শুফ'আর অধিক হকদার।"

তৃতীয়ত আবদুল মালিক ইব্ন আবী সুলায়মান এবং আতা (র)-এর সূত্রে হযরত জাবির (রা) থেকে তিরমিযী ও সিহাহ সিত্তাহর অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস ঃ

اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةٍ يَنْتَظِرُ بِهِ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا

"প্রতিবেশী শুফ'আর বেশি অধিকার রাখে। যদি সে অনুপস্থিত থাকে, তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এটা হবে যখন তার রাস্তা এক হয়।"

চতুর্থত তিরমিযী ও অন্যান্য গ্রন্থে একই বাক্যে বর্ণিত হাদীস ঃ جَارِ الدَّارِ اَحَقُّ بِالدَّارِ "ঘরের প্রতিবেশী ঘরের বেশি হকদার।"

পঞ্চমত নাসাঈ শরীফে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত মরফূ' হাদীস ঃ قَضٰى بِالشُّفْعَةِ بِالْجَوَارِ "আঁ হযরত (সা) প্রতিবেশীর জন্য শুফ'আর বিধার জারী করেছেন।"

হানাফী মাযহাবের মত অগ্রহণযোগ্য বলে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রতিপক্ষ দুটি পথ অবলম্বন করেছেন। প্রথমত তাদের মতে হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে পেশকৃত হাদীস "جار" শব্দের অর্থ প্রতিবেশী নয়, বরং শরীক, কোন বাড়ি বা জমির অংশীদার। অথচ جار শব্দের অর্থ প্রতিবেশী, এটা খুবই প্রসিদ্ধ। মূলত প্রতিপক্ষের এরূপ অর্থ গ্রহণ করা অর্থহীন। কেননা এটা প্রথম বাস্তবতা বিরোধী। কেননা এর প্রকৃত অর্থ প্রতিবেশী। যদি ধরে নেয়া হয় এটা রূপক (مجاز) অর্থ হবে, কিন্তু রূপক অর্থের জন্য পূর্বাপর সম্পর্ক ও দলীল থাকতে হবে। এখানে কোন দলীল নেই বরং যে কোন অবস্থায় এটাকেই সবাই বিরাট দলীল হিসেবে জানে। দ্বিতীয়ত অন্যান্য সহীহ রিওয়ায়েতে এ ব্যাখ্যা কঠোরভাবে খন্ডন করে। যেমন নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ, ইব্ন আবী শায়বা, আমর ইব্ন শরীফ (র) থেকে রিওয়ায়েত করেন এবং তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমার জমিতে কারো কোন অংশ নেই, কোন শরীকও নেই, তবে প্রতিবেশী রয়েছে, তখন তিনি বলেন ঃ "প্রতিবেশী অধিক হকদার নিকটবর্তীদের থেকে।" সুতরাং এ হাদীস এ বিষয়ের উপর দলীল হলো যে, শুফ'আর অধিকার শরীক ও অংশীদার ছাড়া প্রতিবেশী হওয়ার কারণেও লাভ হয়ে থাকে এবং এখানে جار -এর অর্থ শরীক নয়।

ইমাম হালওয়ানী (র) অত্যন্ত আশ্চর্য ও আফসোস করে বলেন ঃ

تَرَكَ الشَّافِعِيَّةُ الْعَمَلَ بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ مَعَ شُهْرَتِهِ وَصِحَّتِهِ وَهُمْ سَمُّوْا اَنْفُسَهُمْ بِاَصْحَابِ الْحَدِيْثِ وَكَيْفَ يُرَادُ بِالْجَارِ الشَّرِيْكِ وَقَدْ اَخْرَجَ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ الْاٰخر -

"এ হাদীস মশহূর ও সহীহ হওয়া সত্ত্বেও শাফিঈগণ এ হাদীসের উপর আমল পরিত্যাগ করেছেন অথচ তারা নিজেদের নাম রেখেছে আসহাবে হাদীস বা আহলে হাদীস হিসেবে এবং "جَار" দ্বারা শরীক অর্থ গ্রহণ করেছেন। বস্তুত ইব্ন আবী শায়বা (র) এ হাদীসটি তৎসংকলিত কিতাবে বর্ণনা করেছেন।"

এ ছাড়া ও নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ ও তাহাভী শুরায়ক নামক রাবী থেকে বর্ণনা করেন ঃ

انَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْجَارُ وَالشَّرِيْكُ اَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مَاكَانَ يَأْخُذُهَا وَيَتْرُكُ *

"নবী করীম (সা) বলেছেন, প্রতিবেশী ও অংশীদার শুফআর ব্যাপারে বেশি হকদার, চাই গ্রহণ করুক অথবা পরিত্যাগ করুক।"

এখানে শব্দ شريك কে جار শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, جار ও شريك একার্থবোধক শব্দ নয়, বরং উভয়ের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। মোট কথা এ ধরনের সমস্ত রিওয়ায়েত এ কথারই প্রতিধ্বনি করে যে, جار শব্দের ব্যাখ্যা شريك দ্বারা করার কোন অর্থ হয়না।

হানাফী মাযহাবের মতামত খন্ডন করার লক্ষ্যে প্রতিপক্ষ দ্বিতীয় পথ এটা অবলম্বন করেছেন যে, আবদুল মালিক ইব্ন আবী সুলায়মানের সূত্রে হযরত জাবির (রা) বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহকে দুর্বল (ضعيف) প্রমাণ করার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ চেষ্টা প্রথম পদক্ষেপের চেয়েও অধিক হাস্যকর হয়েছে। তাদের অভ্যাস হলো এই যে, যখন কোন মাযহাবের বর্ণনাকারীকে দুর্বল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছা করেন, তখন কোন সমালোচককে নিয়োগ করে থাকেন এবং ভাবতেও চেষ্টা করেন না যে, এ ব্যক্তি কে, তারা একজন না একাধিক। এরপর তাদের মতামতকে কঠোরভাবে উপেক্ষা করে। যারা বর্ণনাকারী আবদুল মালিকের সমালোচনা করছেন, তারা শুধু সন্দেহ পেয়েছেন এবং দলবদ্ধ হয়ে একজনকে উদ্দেশ্য করে এ মতামত পেশ করেন যে, এ হাদীস দুর্বল (ضعيف)।

তানকীহ গ্রন্থ প্রণেতা স্পষ্ট বলেছেন যে, এ হাদীসের বর্ণনাকারী সন্দেহের কারণে অভিযুক্ত আবদুল মালিকের মধ্যে কোন অনিষ্টতা নেই। কেননা তিনি নির্ভরযোগ্য এবং ফিকহ্শাস্ত্রে পারদর্শীদের অন্তর্ভুক্ত। এতে কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহের অভিযোগ ছাড়া অন্য বিষয়ে যারা এতে সমালোচনা করেছেন, তারা শুধু সন্দেহের অনুসরণ করেছেন। বাস্তবে তাদের অভ্যাস হলো এই যে, যখন কেউ একজনের সাথে একমত পোষণ করেন, তখন ঐ ব্যক্তি একজন থাকেন না, বরং তা ناس দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং বলতে থাকেন تَكَلَّمُ فِيْهِ النَّاس "লোকজন এ বিষয়ে সমালোচনা করেছে" এখানে ناس দ্বারা নিজকে বুঝানো হয়েছে। এভাবে লোকজনকে ভীতিগ্রস্থ করে। তাই তানকীহ প্রণেতা এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন, মুসলিম শরীফ আবদুল মালিক থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারী (র), এর থেকে সনদ গ্রহণ করেছেন। মুনযিরী তাঁর মুখতাসারুস সুনানে এ সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন। বায়হাকী বলেন, কেউ শুবাকে বলেন, আপনারা আবদুল মালিকের সূত্রে বর্ণিত হাদীস পরিত্যাগ করেন, কামাল প্রণেতাও ইব্ন মুঈন-এর কথা বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল মালিক-এর উপর কথা বলা যায় কিন্তু আবদুল মালিক হলেন নির্ভরযোগ্য (ثقه) ও সত্যবাদী। এরূপ ব্যক্তির মধ্যে কোন অনিষ্টতা আবিস্কার করা যায় না। ইমাম তিরমিযী (র)-ও তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন। কিন্তু তাদের নীতি হলো এই যে, বর্ণনাকারীর সবচেয়ে দুর্বলতা বিরোধী মাযহাবের রিওয়ায়েত খন্ডন করে দেয়া। কাজেই তাদের এ পদ্ধতিও ফলপ্রসূ হয়নি।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, হানাফী মাযহাবের হাদীসসমূহ এর বাহ্যিক অর্থই প্রকাশ করে, কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। অবশ্য ইমামত্রয় হযরত জাবির (রা)-এর যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন, এর কয়েকটি জওয়াব দেয়া যায় যা কিয়াসের নিকটবর্তী এবং বিবেকও তা সমর্থন করে। প্রথম একটি বিষয় উল্লেখ করায় দ্বিতীয় বিষয় অস্বীকার করতে হবে কেন ? দ্বিতীয় হাদীসে এতটুকু তো আছে। কিন্তু সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ করার মত এখানে কোন শব্দ নেই। তৃতীয় فلا شفعة শব্দ যা প্রকৃত ভুলের কারণ, এরদ্বারা এ অর্থ গ্রহণ করা বিবেক ও কিয়াস বিরোধী। কেননা যখন সীমানা নির্ধারণ হয়ে যায় এবং রাস্তা পরিবর্তন করে দেয়া হয়, অতঃপর কোন প্রকার শুফ'আর অস্তিত্ব থাকে না। এটা কেন অর্থ হবে না যা প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে এবং যার প্রকৃত অর্থ যে, বর্ণিত অবস্থায় শরীকের জন্য শুফ'আ নেই। কেননা শরীকের জন্য শুফ'আ যেমন, প্রতিবেশীর জন্যও তেমন এক বিশেষ গুরুত্ব রাখে যার উদ্দেশ্য ও ধারণা ভিন্ন। সুতরাং শরীকের জন্য তা না হলে প্রতিবেশীর জন্য শুফ'আ কেন হবে ?

٣٥١ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الاَقْمَرِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَضَعَ خَشَبَتَه فِى حَائِطِه فَلَايَمْنَعْه *

হাদীস নং- ৩৫১

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের লাকড়ী নিজের অথবা প্রতিবেশীর দেয়ালে রাখার ইচ্ছা করে, তখন এতে প্রতিবেশীকে বাধা দেয়া উচিৎ নয়।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত বিষয়ে আঁ হযরত (সা)-এর এ নির্দেশ ওয়াজিব অথবা নফল, এটা নিয়ে উলামার মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফিঈ (র) নফল হওয়ার পক্ষে মত পেশ করেছেন। ইমাম মালিক (র) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। প্রথম হলো ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় মত হলো নফল।

كِتَابُ الْمُزَارِعَةِ

বর্গাচাষের বর্ণনা

٣٥٢ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابِرَةِ *

হাদীস নং- ৩৫২

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) মুখাবারা থেকে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ مزارعه এবং مخابره এ দুটি শব্দ প্রায় সমার্থক। জমি ভাড়া দেয়ার দুটি পদ্ধতি রয়েছে। مزارعه হলো উৎপন্ন শস্যের কিছু অংশের পরিবর্তে, যেমন এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের পরিবর্তে জমি ভাড়া দেয়া এবং বীজ হবে জমির মালিকের। مخابره এর পদ্ধতিও একই, তবে এতে বীজ দিতে হবে ভাড়াটিয়ার। হাদীসের আলোকে ভাড়ার এ দুটি পদ্ধতি ইমাম আবূ হানীফা (র)ও ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে অবৈধ।

٣٥٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى حُصَيْنٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ مَرَّ بِحَائِطٍ فَاعْجَبَهُ فَقَالَ لِمَنْ هٰذَا فَقُلْتُ لِىْ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ هَوْلَكَ قُلْتُ اِسْتَاْجَرْتُه ـ قَالَ فَلاَ تَسْتَاْجِرَهُ بِشَىْءٍ مِّنْهُ ـ

وَفِى رِوَايَةٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَائِطٍ فَقَالَ لِمَنْ هٰذَا فَقُلْتُ لِىْ وَقَدْ اِسْتَاْجَرْتُه فَقَالَ فَلاَ تَسْتَاْجِرْهُ *

হাদীস নং- ৩৫৩

অনুবাদ ঃ হযরত রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) একটি বাগানের নিকট গমন করছিলেন, বাগানটি দেখে আঁ হযরত (সা)-এর খুব পসন্দ হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কার। [হযরত রাফে' (রা) বলেন] আমি বললাম, আমার। অতঃপর তিনি বললেন ঃ এটা তুমি কোথা থেকে অথবা কিভাবে পেয়েছ ? আমি বললাম, এটা আমি ভাড়ায় নিয়েছি। তখন তিনি বললেন ঃ এর উৎপন্ন শস্যের কিছু অংশের পরিবর্তে ভাড়া নেবে না।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) একটি বাগানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন বললেন ঃ এটা কার ? [হযরত রাফে' (রা) বলেন] আমি বললাম, আমার এবং এটা ভাড়ায় নিয়েছি। তিনি (এটা শুনে) বললেন ঃ এভাবে ভাড়া নেবে না।

ব্যাখ্যা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ ধরনের ভাড়া নেয়া জায়েয নয়।

كِتَابُ الْفَضَائِلِ

ফযীলত ও সম্মান বর্ণনা

بَابُ فَضَائِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নবী করীম (সা)-এর ফযীলত ও সম্মান

٣٥٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ وَرَبِيْعَةَ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَهُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَسِتِّيْنَ وَقُبِضَ اَبُوْ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلٰثَ وَسِتِّيْنَ وَقُبِضَ عُمَرَ وَهُوَ ابْنُ ثَلٰثَ وَسِتِّيْنَ *

হাদীস নং- ৩৫৪

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন আর হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত উমর (রা)-ও তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের দ্বারা হুযূর (সা)-এর সঠিক বয়স জানা গেল। অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, হযরত আলী (রা)-ও তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। মোট কথা নবী করীম (সা) এবং তাঁর তিনজন খলীফা একই বয়সে ইন্তিকাল করেন। অবশ্য হযরত উসমান (রা) আশি অথবা এর চেয়ে কিছু বেশি বয়সে ইনতিকাল করেন।

٣٥٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَأْسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا وَتُوُفِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ *

হাদীস নং- ৩৫৫

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ চল্লিশ বছর বয়সে রিসালত লাভ

করেন। অতঃপর দশ বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেন। যখন তাঁর ইনতিকাল হয়, তখন তাঁর দাঁড়ি ও মাথার বিশটি চুলও সাদা হয়নি।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আঁ হযরত (সা)-এর বয়স ছিল ষাট বছর। যেমন মুসলিম ও তিরমিযীর রিওয়ায়েতে এটাও অতিরিক্ত রয়েছে যে, তিনি ষাট বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। কিন্তু সঠিক রিওয়ায়েত হলো এই যে, হুযূর (সা)-এর ইনতিকালের দুঃখ ও বেদনাদায়ক ঘটনা তাঁর তেষট্টি বছরের সময়ে সংঘটিত হয়।

٣٥٦ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ بِرِيْحِ الطِّيْبِ اِذَا اَقْبَلَ مِنَ اللَّيْلِ

হাদীস নং- ৩৫৬

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন রাতে আগমণ করতেন, তখন তাঁর পবিত্র দেহের সুঘ্রাণ দ্বারা তাঁকে চেনা যেত।

ব্যাখ্যা ঃ দারেমী হযরত জাবির (রা) থেকে রিওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সা) যখন কোন রাস্তা দিয়ে গমন করতেন এবং তাঁর পিছনে কেউ ঐ রাস্তা অতিক্রম করত, তখন তাঁর পবিত্র দেহের সুঘ্রাণের দ্বারা বুঝতে পারতো যে, তিনি এ রাস্তা দিয়ে গমন করছেন। হযরত সাবিত ইব্ন আনাস (রা) থেকে এটাও বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি আম্বর, মেশ্‌ক অথবা অন্য কোন সুগন্ধিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-থেকে বেশি সুবাস ছড়াতে দেখিনি এবং কোন রেশমী কাপড়ও তাঁর চেয়ে বেশি নরম পাইনি।

٣٥٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْرَفُ بِاللَّيْلِ اِذَا اَقْبَلَ اِلَى الْمَسْجِدِ بِرِيْحِ الطِّيْبِ *

হাদীস নং- ৩৫৭

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে যখন মসজিদে গমন করতেন, তখন পবিত্র সুগন্ধি দ্বারা তাঁকে চেনা যেত।

ব্যাখ্যা ঃ আঁ হযরত (সা) সুগন্ধি অত্যন্ত পসন্দ করতেন, তাই ব্যবহারও করতেন বেশি। এমন কি যখন তিনি রাস্তা দিয়ে গমন করতেন, তখন বাতাস সুগন্ধিতে ভরে যেত এবং চারিদিকে তা ছড়িতে পড়ত।

٣٥٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَحَارِبَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ لِىْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِىْ وَزَادَنِىْ *

হাদীস নং- ৩৫৮

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। তিনি তা আদায় করেন এবং আমাকে আরো কিছু অতিরিক্ত প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা ঃ আঁ হযরত (সা)-এর পক্ষ থেকে এ অতিরিক্ত ছিল সাহায্য ও অনুগ্রহ।

٣٥٩ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ مَامَسَسْتُ بِيَدِىْ خَزًّا وَلاَ حَرِيْرًا اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ مَارُئِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادًّا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ جَلِيْسٍ لَهُ قَطُّ *

হাদীস নং- ৩৫৯

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমি কোন খায্ (উল এবং রেশমের তৈরী এক প্রকার কাপড়) অথবা রেশম স্পর্শ করিনি যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র হাত থেকে অধিক নরম ও কোমল।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কেউ কখনো দেখেনি যে, তিনি একত্রে উপবিষ্ট সাথীদের থেকে হাঁটু সামনে দিয়ে আগে বসেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন নবী করীম (সা) কারো সাথে মুসাফাহা করতেন এ সময় যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি স্বীয় হাত টেনে না নিতেন, ততক্ষণ তিনি স্বীয় পবিত্র হাত তার হাত থেকে বের করতেন না। এমনিভাবে তার থেকে মুখ ফিরাতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি নিজে মুখ ফিরিয়ে চলে না যেতেন এবং উপবিষ্ট সাথীদের সামনে হাঁটু ছড়িয়ে বসতেন না।

٣٦٠ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اَمَا تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ *

হাদীস নং- ৩৬০

অনুবাদ ঃ হযরত মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা কি কুরআন পাঠ করনি ?

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) প্রশ্নের দ্বারা এটা অবহিত করতে চেয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন আঁ হযরত (সা)-এর উত্তম অভ্যাস ও পুত-চরিত্রের সঠিক ব্যাখ্যা করে থাকে এবং তাঁর চারিত্রিক জীবন ও সীরাতে পাকের অত্যন্ত সুস্পষ্ট চিত্র পেশ করে থাকে। অথবা এটাও বলা যায় যে, আঁ হযরত (সা) স্বীয় পুত-চরিত্র পসন্দনীয় অভ্যাস ও মনোনীত আমলের দ্বারা কুরআন করীমের সঠিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। সুতরাং যে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞ, সে মূলত কুরআন মজীদ সম্পর্কে অজ্ঞ। বস্তুত এক কুরআন ছিল লিপিবদ্ধ এবং দ্বিতীয় কুরআন হলো স্বয়ং হুযূর (সা)-এর পুত-চরিত্র।

٣٦١ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ وَيَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ *

হাদীস নং- ৩৬১

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-গোলামের দাওয়াত কবূল করতেন, রোগীর সেবা করতেন এবং গাধার উপর আরোহণ করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ গোলামের দ্বারা আযাদকৃত গোলামকে বুঝানো হয়েছে। অথবা এর অর্থ এই যে, গোলাম যদি তার মনিবের পক্ষ থেকে এসে দাওয়াত করত, তাহলেও তিনি তা কবূল করতেন। অর্থাৎ যদিও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দীন ও দুনিয়ার বাদশাহী ও নেতৃত্ব দান করেছিলেন কিন্তু তবু গৌরব ও অহংকার, রাজ প্রতাপ, জাঁকজমক এবং মিথ্যা আস্ফালন তাঁর মধ্যে মোটেই ছিল না। বরং কাজ-কর্মে, আচার-ব্যবহারে অমায়িক নম্রতা ও ভদ্রতা প্রকাশ পেত। যেমন অত্যন্ত দরিদ্র লোকের দাওয়াত গ্রহণ করতেন, অত্যন্ত সাধারণ মুসলমান অসুস্থ হলে তার সেবা করার জন্য গমন করতেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিতেন। আরোহণের জন্য কখনো গাঁধা ব্যবহার করতেন। অথচ আরবে আমীরগণ উট ও ঘোড়ার উপর এবং দরিদ্রগণ গাধার উপর আরোহণ করতেন।

٣٦٢ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى بَيَاضِ قَدَمَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ اَتَى الصَّلٰوةَ اِلٰى مَرْضِهٖ *

হাদীস নং- ৩৬২

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র পা-এর শুভ্রতা দেখছি, এ অবস্থায়, যখন তিনি অসুস্থ অবস্থায় নামাযের জন্য মসজিদে গমন করছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ঐ দৃশ্যটি এখনো আমার স্মরণ আছে, যেন আমি তা

এখনই দেখছি এবং সম্পূর্ণ চিত্রটি যেন আমার দৃশ্যপটে ঘুরছে যে, সর্দারে দোজাহাঁ হযরত নবী করীম (সা) মৃত্যুর রোগের সময় মসজিদে গমন করেছেন।

٣٦٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرِضَ الْمَرْضَ الَّذِى قُبِضَ فِيْهِ اسْتَحَلَّ اَنْ يَكُوْنَ فِىْ بَيْتِى فَاَحْلَلْنَ لَهُ قَالَتْ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذٰلِكَ قُمْتُ مُسْرِعَةً فَكَنَسْتُ بَيْتِىْ وَلَيْسَ لِىْ خَادِمٌ وَفَرَشْتُ لَه فِرَاشًا حَشْوُ مِرْفَقَتِهِ الْاِذْخِرُ فَاَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَادِىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتّٰى وَضَعَ عَلٰى فِرَاشِىْ *

হাদীস নং- ৩৬৩

অনুবাদ ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত, তখন তিনি উম্মুল মুমিনীনগণের নিকট আমার ঘরে থাকার জন্য অনুমতি চাইলেন। সবাই ঐকমত্য হয়ে অনুমতি প্রদান করেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন আমি এটা শুনলাম, তখন দ্রুত ঘর ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করলাম। কেননা আমার কাছে কোন খাদিম ছিল না এবং আঁ হযরত (সা)-এর জন্য এমন বিছানা বিছালাম যার কনুই রাখার বালিশের মধ্যে ইযখির ঘাস ভর্তি ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দু'জন লোকের সাহায্য নিয়ে (আমার ঘরে) আগমণ করেন এবং তারা তাঁকে আমার বিছানায় বসিয়ে দেন।

ব্যাখ্যা ঃ উম্মুল মু'মিনীনগণের নিকট হুযূর (সা)-এর এ অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারে বুখারী শরীফে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

٣٦٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَأٰى عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِفَّةً فَاسْتَأْذَنَهُ اِلٰى امْرَاَتِه بِنْتُ خَارِجَةَ وَكَانَتْ فِى حَوَائِطْ الاَنْصَارِ وَكَانَ ذٰلِكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ وَلاَ يَشْعُرُ فَاَذِنَ ثُمَّ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَاَصْبَحَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَرَامُوْنَ فَاَمَرَ اَبُوْ بَكْرٍ غُلاَمًا يَسْتَمِعُ ثُمَّ يُخْبِرُهُ فَقَالَ اَسْمَعُهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَاتَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاقَطْعَ ظَهْرَاهُ فَمَا بَلَغَ اَبُوْ بَكْرٍ الْمَسْجِدَ

حَتَّى ظَنُّوْا اَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ وَاَرْجَفَ الْمُنَافِقُوْنَ فَقَالُوْا لَوْكَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًا لَمْ يَمُتْ - فَقَالَ عُمَرُ (رضـ) لاَ اَسْمَعُ رَجُلاً يَقُوْلُ مَاتَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَكَفُّوْا لِذٰلِكَ - فَلَمَّا جَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجِىْ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ جَعَلَ يَلْثِمَهُ فَقَالَ مَاكَانَ اللّٰهُ لِيُذِيْقَكَ الْمَوْتَ مَرَّتَيْنِ اَنْتَ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ - ثُمَّ خَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَاِنَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ لاَ يَمُوْتُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ اَنْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ - قَالَ فَقَالَ عُمَرَ (رضـ) لَكَاَنَّا لَمْ نَقْرَأْهَا قَبْلَهَا قَطُّ فَقَالَ النَّاسُ مِثْلَ مَقَالَةِ اَبِىْ بَكْرٍ مِنْ كَلاَمِهِ وَقِرَأَتِهِ وَمَاتَ لَيْلَةَ الاِثْنَيْنِ فَمَكَثَ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثَّلٰثَاءِ وَكَانَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَاَوْسُ بْنُ خَوْلٰى يَصُبَّانِ وَعَلِىٌّ وَالْفَضْلُ يَغْسِلاَنِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

হাদীস নং- ৩৬৪

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা) বর্ণিত, হযরত আবূ বকর (রা) যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটু সুস্থ দেখতে পেলেন, তখন আনসারের বাগানে অবস্থানরত স্বীয় স্ত্রী বিনতে খারিজার নিকট যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। অথচ এ সুস্থতা অত্যন্ত সাধারণ ছিল কিন্তু এটা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। নবী করীম (সা) তাঁকে অনুমতি দান করেন এবং ঐ রাতেই তিনি ইনতিকাল করেন। ভোর হওয়ার পর লোকজন হুযূর (সা)-এর বাড়ির দিকে জমা হতে লাগলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর গোলামকে সঠিক খবর শুনে তাকে অবহিত করার জন্য নির্দেশ দান করেন। হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আমি লোকজনকে এ কথা বলতে শুনছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করেছেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) এটা বলে দ্রুত রওয়ানা হলেন, হায় আফসোস! কোমর ভেঙ্গে গেল। হযরত আবূ বকর (রা) তখনও মসজিদে নববীতে পৌছেননি, ফলে লোকজন ধারণা করলেন যে, তিনি এখনো সংবাদ পাননি। মুনাফিকের দল এ কথা ছড়াতে লাগল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) যদি নবী হতেন তা হলে ইনতিকাল করতেন না।

এ সংবাদ শুনে হযরত উমর (রা) বলেন, আমি যেন কাউকে এটা বলতে না শুনি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করেছেন। অন্যথায় তাকে আমি তলোয়ার দিয়ে হত্যা করব। তাঁর এ কথায় মুনাফিকের দল থেমে যায়।

অতঃপর যখন হযরত আবূ বকর (রা) আগমণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র দেহ কাপড় দ্বারা আবৃত ছিল। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর পবিত্র চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে কপালে চুমো খেলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি মৃত্যুর তিক্ততা বা কষ্ট আপনাকে আস্বাদন করাবেন না। আপনি আল্লাহ্র নিকট এর চেয়েও অধিক সম্মানিত (এ কথার দ্বারা হযরত উমরের কথার বিরোধিতা করাও উদ্দেশ্য ছিল)। এরপর আবূ বকর (রা) বাইরে এসে বললেন, হে লোক সকল! যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের ইবাদত করত (তোমরা জেনে রাখ), তিনি ইনতিকাল করেছেন এবং যারা মুহাম্মদের রবের ইবাদত করত (তোমরা জেনে রাখ), কখনো মুহাম্মদের রব ইনতিকাল করবেন না। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ اَنْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ *

"মুহাম্মদ একজন রাসূল ব্যতীত আর কেউ নন। নিশ্চয়ই তার পূর্বেও অনেক রাসূল পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। যদি তিনি ইনতিকাল করেন অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা ফিরে যাবে ? যে ব্যক্তি ফিরে যাবে (স্বীয় দল থেকে), তারা আল্লাহ্র কিছুই অনিষ্ট করতে পারবে না। অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে পুরস্কার প্রদান করবেন।" (৩ ঃ ১৪৪)

হযরত উমর (রা) বলেন, মনে হয় আমরা যেন এর পূর্বে কখনো এ আয়াত তিলাওয়াত করিনি। অতঃপর লোকজন হযরত আবূ বকর (রা)-এর কথার মত বলতে লাগলেন এবং একই আয়াত পাঠ করতে লাগলেন। সোমবার রাতে আঁ হযরত (সা) ইনতিকাল করেন এবং দু'দিন ও দু'রাত অতিবাহিত হওয়ার পর বৃহস্পতিবারে তাঁর দাফন কাজ সম্পন্ন হয়। (গোসলের সময়) হযরত উসামা ইব্ন যায়দ ও হযরত আউস ইব্ন খাওলা (রা) পানি ঢালেন এবং হযরত আলী ও হযরত ফযল ইব্ন 'আব্বাস (রা) হুযূর (সা)-কে গোসল দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ আঁ হযরত (সা)-এর ইনতিকালের মাধ্যমে নবুওয়তের উজ্জ্বল প্রদীপ চিরতরে অস্ত যাওয়ার ঘটনাটি এমন হৃদয় বিদারক, দুঃখ-বেদনা ও মর্মান্তিক ঘটনা ছিল যে, হযরত উমরের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষও এ সময় ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ সময় হযরত আবূ বকর (রা)-কে ধৈর্য ও সহনশীলতা দান করেন এবং তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে এমন উপদেশ ও শিক্ষনীয় খুতবা প্রদান করেন, যার ফলে লোকজনের ধারণা ঠিক হয়ে যায় এবং বিবেকের আচ্ছন্নতা দূরীভূত হয়। জ্ঞান ও বিবেক ফিরে আসে। স্বয়ং হযরত উমর (রা) বলেন, এ মোহাবিষ্ট ও আচ্ছন্নতার সময় যখন হযরত আবূ বকর (রা) وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ الاية তিলাওয়াত করেন, তখন মনে হয় যে, আমরা এ আয়াত এইমাত্র প্রথম শ্রবণ করলাম।

بَابُ فَضَائِلِ شَيْخَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর ফযীলত

٣٦٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزَّعْرَاءِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْتَدُوْا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِىْ اَبُوْ بَكْرٍ (رضـ) وَعُمَرَ (رضـ) *

হাদীস নং- ৩৬৫

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার পর তোমরা হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর অনুসরণ আনুগত্য কর।

ব্যাখ্যা ঃ অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সা) খুলাফায়ে রাশেদার চারজন খলীফার অনুসরণের জন্য জোর দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ বাধ্যতামূলকভাবে খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ কর। অন্য এক হাদীসে আছে, তিনি বলেছেন ঃ আমার সাহাবীগণ তারকার মত, এদের মধ্যে তোমরা যার অনুসরণ করবে, হিদায়ত লাভ করবে। কিন্তু এখানে দুই বুযর্গকে এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা গৌরব দান করেছেন যে, তাঁদের অনুসরণের উপর জোর দিয়েছেন। কেননা এ দুইজন সাহাবীর ব্যক্তিত্ব ও সম্মান মূলত সবার চেয়ে বেশি। খুলাফায়ে রাশেদার আঁ হযরত (সা)-এর থেকে যে বৈশিষ্ট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছিল, এঁদের মধ্যে এ দুই বুযর্গ সর্বাধিক সম্মানিত ছিলেন।

بَابُ فَضَائِلِ عَمَّار رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا وَعَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

হযরত আম্মার (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর ফযীলত

٣٦٦ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِىٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِىْ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَاهْتَدُوْا بِهَدْىِ عَمَّارٍ (رضـ) وَتَمَسَّكُوْا بِعَهْدِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ *

হাদীস নং- ৩৬৬

অনুবাদ ঃ হযরত হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ আমার পর (খলীফা হিসেবে) হযরত আবূ বকর ও উমরের অনুসরণ কর এবং হযরত আম্মার (রা)-এর চরিত্র গ্রহণ কর, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর ওসীয়ত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর ফযীলত সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থ-সমূহে প্রচুর বর্ণনা রয়েছে। আঁ হযরত (সা) অত্যন্ত মহব্বতের সাথে এ দুইজনের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। কোথাও বলেছেন, নবী ও রাসূলগণের পর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষের মধ্যে, এমন কি সমস্ত বেহেশতবাসীর তাঁরা উভয়ই হবেন সর্দার। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) আমার চোখ ও কান। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, আবূ বকর আমার থেকে এবং আমি তার থেকে। তিনি ইহকাল ও পরকালে আমার ভাই। কোথাও এরূপ বলেছেন যে, উমর আমার সাথে আছে এবং আমিও তার সাথে আছি। আমার পর হক ও ন্যায় তার সাথে থাকবে, যেখানেই হোক না কেন।

এ হাদীস হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারও অকাট্য সুস্পষ্ট, যেমন মোল্লা আলী ক্বারী (র) লিখেছেন। তাই ইমাম আযম (র) তাঁর খলীফার পর সমস্ত সাহাবার মধ্যে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-কে মানদন্ড মনে করতেন এবং তাঁর কথা ও বর্ণনার উপর স্বীয় মাযহাবের অধিকাংশ বিষয়ের ভিত্তি নির্ধারণ করেছেন। কেননা শরীয়তের আহকাম ও ইলমে দীনের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত যোগ্য ও সবার শিরোমণি ছিলেন এবং আঁ হযরত (সা)-এর বাণী, যাতে তিনি বলেছেন ঃ "ইব্ন মাসউদের ওসীয়ত শক্তভাবে আঁকড়ে ধর" এটা তাঁর অনুসরণ বাধ্যতামূলক হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রমাণ বহন করে। আল্লামা তুরপশতী (র)-এর মতে এ হাদীসে عهد -এর অর্থ খিলাফতের বিষয় অর্থাৎ হুযূর (সা) বলেন যে, খিলাফতের বিষয়ে ইব্ন মাসউদের মতামত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করবে। সুতরাং তাদের মতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নির্বাচনের ব্যাপারে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মতামত ছিল এই যে, দুনিয়ার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমরা কি এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করব না যাকে আঁ হযরত (সা) দীনের জন্য নির্বাচন করেছেন ? কারো কারো মতে এটা হযরত আলী (রা)-এর উক্তি, কিন্তু এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসের অর্থে মনোসংযোগ সৃষ্টি হয় যে, তিনি বলেছেন, আমার পর আবূ বকর ও উমর (রা)-এর অনুসরণ ও আনুগত্য কর, যারা আমার পর খলীফা হবেন এবং এ ব্যাপারে হযরত ইব্ন মাসউদের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান কর এবং তা পালন কর। হযরত ইব্ন মাসউদ (র)-এর তিনটি উপনাম ছিল। পিতার দৃষ্টিকোণ থেকে ইব্ন মাসউদ, তাঁর মা-এর দিক থেকে ইব্ন উম্মে আবদ, কেননা তাঁর মা-এর উপনাম ছিল উম্মে আবদ এবং তাঁর ছেলের দিক থেকে আবূ আবদুর রহমান।

بَابُ فَضِيْلَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

হযরত উসমান (রা)-এর ফযীলত

٣٦٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِعُثْمَانَ وَهُوَ حَزِيْنٌ قَالَ مَايَحْزُنُكَ قَالَ اَلاَ اَحْزَنُ وَقَدْ انْقَطَعَ الصِّهْرُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذٰلِكَ حَدَّثَانَ مَاتَتْ بِنْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرَ اُزَوِّجُكَ حَفْصَةَ ابْنَتِىْ فَقَالَ حَتّٰى اَسْتَاْمِرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَاهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ اَنْ اَدُلَّكَ عَلٰى صِهْرٍ هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ عُثْمَانَ وَاَدُلَّ عُثْمَانَ عَلٰى صِهْرٍ هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ زَوِّجْنِىْ حَفْصَةَ وَاَزَوِّجُ عُثْمَانَ ابْنَتِىْ فَقَالَ نَعَمْ فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

হাদীস নং- ৩৬৭

অনুবাদ ঃ হযরত মূসা ইব্ন আবী কাসীর (র) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা) একবার হযরত উসমান (রা)-এর নিকট আগমণ করেন। এ সময় হযরত উসমান (রা) অত্যন্ত বিষন্ন ও চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞাসা করেন, কোন বস্তু আপনাকে চিন্তাগ্রস্থ করেছে ? হযরত উসমান (রা) বললেন, কেন আমি চিন্তা করব না, অথচ আমার এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে আত্মীয়তা ভেঙ্গে গেছে। এটা ছিল আঁ হযরত (সা)-এর কন্যা এবং হযরত উসমান (রা)-এর স্ত্রী রুকাইয়া (রা)-এর ইনতিকালের কিছু দিন পরের ঘটনা। তখন হযরত উমর (রা) বললেন, আমার মেয়ে হাফসাকে আমি আপনার সাথে বিবাহ দিয়ে দিচ্ছি। হযরত উসমান (রা) বললেন, এটা কখনো হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা না করব। অতঃপর হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমণ করেন। তিনি হযরত উমর (রা)-কে বললেন, আমি কি তোমাকে উসমান থেকে উত্তম জামাতা এবং উসমানকে তোমার থেকে উত্তম শ্বশুর সম্পর্কে সংবাদ দেব ? হযরত উমর (রা) বললেন, অবশ্যই বলুন। হুযূর (সা) তখন বললেন, তুমি হাফসাকে আমার নিকট বিবাহ দান কর এবং আমি আমার মেয়ে উম্মে কুলসুমকে উসমানের নিকট বিবাহ দিচ্ছি। হযরত উমর (রা) বললেন, এটা অতি উত্তম। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা) তাই করলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে হযরত উসমানের (রা) মাহাত্ম্য ও বুযর্গী প্রতীয়মান হয়। এক রিওয়ায়েতে আছে, নবী করীম (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার কলিজার টুকরা

প্রিয় কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে উসমানের নিকট বিবাহ দেয়ার জন্য আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত উসমান (রা) বলেন, আঁ হযরত (সা)-এর কন্যা রুকাইয়ার মৃত্যুতে আমি ভীষণ ক্রন্দন করছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কেন কাঁদছ? আমি বললাম, আমার এবং আপনার মধ্যে শ্বশুর ও জামাতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল! তিনি বললেন, এইমাত্র জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আগমণ করে বললেন, আমি যেন রুকাইয়ার বোনকে (উম্মে কুলসুমকে) তোমার নিকট বিবাহ দিয়ে দেই। অপর এক রিওয়ায়েতে এরূপ বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) প্রতিজ্ঞা করে বললেন, যদি আমার একশ' কন্যা সন্তান হয় এবং তারা পরপর মৃত্যুবরণ করে, তবুও আমি তাদেরকে তোমার নিকট বিবাহ দেব যদিও তারা এভাবে সবাই মৃত্যুবরণ করে।

بَابُ فَضَائِلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

হযরত আলী (রা)-এর ফযীলত

٣٦٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ حَيَّةَ الْعَرَبِيِّ وَهُوَ الْهَمْدَانِيِّ مِنْ اَصْحَابِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اَنَا اَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ *

হাদীস নং- ৩৬৮

অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রা)-এর একজন ছাত্র বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে এটা বলতে শুনেছি যে, আমি হলাম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি।

ব্যাখ্যা ঃ সর্ব প্রথম কে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তা নিয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, হযরত আবূ বকর (রা) সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কেউ বলেছেন, হযরত আলী (রা), কেউ বলেছেন যে, হযরত খাদীজা (রা), কেউ বলেছেন হযরত বিলাল (রা), আবার কেউ বলেছেন, হযরত যায়দ ইব্ন হারিসা (রা)। কেউ কেউ এ সমস্ত বিভিন্ন মতামতের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করে বলেছেন, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা), কিশোরদের মধ্যে হযরত আলী (রা), আযাদকৃত গোলামের মধ্যে হযরত যায়দ (রা) এবং গোলামদের মধ্যে হযরত বিলাল (রা) সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

এটাও প্রকাশ থাকে যে, ইসলাম গ্রহণের মধ্যে অগ্রগামী হওয়ার সৌভাগ্য যাঁরই হোক না কেন, এ ক্ষেত্রে মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সবার শিরোমণি হলেন হযরত আবূ বকর (রা)। কেননা মর্যাদা ও ফযীলত শুধু ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আরো অনেক কারণ রয়েছে। যেমন ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যে

কোন বিপদ-আপদে তাঁর সঙ্গে থাকা, ইসলাম প্রচারে মুসলমানের পথ প্রদর্শন এবং কাফিরদের শাস্তি প্রদান, ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা এবং কুফরীর ঝান্ডা ভূপাতিত ও অবনমিত করার ক্ষেত্রে হযরত আবূ বকর (রা) হলেন অগ্রগামী। এ গৌরব অর্জন করা অন্যদের ভাগ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে হয়নি। কেননা এ সমস্ত কাজে না মহিলা, না কিশোর এবং না কোন গোলাম তাঁর সমকক্ষ হতে পারে।

এ বর্ণনার দ্বারা হযরত খাদীজা (রা)-এর ফযীলতও প্রকাশ পেয়ে যায়। কেননা মহিলাদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা আযওয়াজে মুতাহ্হারাত ও উম্মুল মুমিনীনদের থেকে অনেক উর্ধ্বে। তিনিও ইসলামের প্রসার ও প্রচার এবং আঁ হযরত (সা)-এর সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থনের ব্যাপারে যে কোন কঠিন অবস্থায়ও অবহেলা, উপেক্ষা বা ত্রুটি করেননি। ধন-সম্পদ ত্যাগ করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেননি, আত্মত্যাগের ব্যাপারেও অনিচ্ছা বা অসম্মতি প্রকাশ করেননি। তাই তাঁর ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ হযরত খাদীজা (রা) ঐ সময় আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, যখন সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তিনি ঐ সময় আমাকে মালদ্বারা সাহায্য করেছেন, যখন সবাই আমাকে বঞ্চিত করেছে।

٣٦٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ اِلٰى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَاٰهُ جَائِعًا فَقَالَ يَا عَلِيُّ مَا اَجَاعَكَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَمْ اَشْبَعْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ *

হাদীস নং- ৩৬৯

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন হযরত আলী (রা)-কে ক্ষুধার্ত দেখে বললেন ঃ কোন্ বস্তু তোমাকে ক্ষুধার্ত করেছে ? তিনি উত্তরে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অমুক অমুক সময় থেকে আহার করা ভাগ্যে হয়নি। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে হযরত আলী (রা)-এর মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা আঁ হযরত (সা)-এর পবিত্র মুখে বেহেশতের সুসংবাদ শ্রবণ করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপারে।

بَابُ فَضِيْلَةِ حَمْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

হযরত হামযা (রা)-এর ফযীলত

٣٧٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ رَجُلٌ دَخَلَ اِلٰى اِمَامٍ فَاَمَرَهُ وَنَهَاهُ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ اِلٰى اِمَامٍ جَائِرٍ فَاَمَرَهُ وَنَهَاهُ *

হাদীস নং- ৩৭০

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন হযরত হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব শহীদগগণের নেতা হবেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তি, যে কোন নেতার নিকট গমন করে এবং সে তাকে কোন কাজের নির্দেশ দেয় অথবা কোন কাজ থেকে তাকে বাধা প্রদান করে (অতঃপর তাকে শহীদ করে দেয়া হয়)।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, কিয়ামতের দিন হযরত হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব শহীদ-গণের সর্দার হবেন। অতঃপর যে ব্যক্তি কোন যালিম নেতার কাছে গমন করবে এবং সে তাকে কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করবে অথবা কোন কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে (সে ব্যক্তি)।

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন রিওয়ায়েতে ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীসের শেষে فقتله (অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়) শব্দ রয়েছে। তরজমা দ্বারা মূল অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এ হাদীসের দ্বারা হযরত হামযা (রা)-এর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা তাঁকে শহীদগণের মধ্যে নেতৃত্বের সৌভাগ্য দান করা হয়েছে। তবে এর সাথে সাথে শহীদগণের মধ্যে হযরত হুসায়ন (রা)-এর নেতা হওয়ার বিষয়টিও স্বীকৃত।

بَابُ فَضِيلَةِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

হযরত যুবায়র (রা)-এর ফযীলত

٣٧١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْتِيْنَا بِالْخَبَرِ لَيْلَةَ الاَحْزَابِ فَيَنْطَلِقُ الزُّبَيْرُ فَيَأْتِيْهِ بِالْخَبَرِ كَانَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِىٌّ وَحَوَارِىِّ الزُّبَيْرُ *

হাদীস নং- ৩৭১

অনুবাদ ঃ হযরত যুবায়র (রা) বর্ণনা করেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কে আমাদের নিকট প্রতিপক্ষের সংবাদ নিয়ে আসবে ? তিনবার তিনি এটা বললেন। [হযরত যুবায়র (রা) প্রত্যেকবার বললেন, আমি]। অতঃপর হযরত যুবায়ের (রা)

যেতেন এবং সংবাদ নিয়ে আসতেন। তখন নবী করীম (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্য একজন বিশেষ বন্ধু বা সহচর থাকে এবং আমার বিশেষ বন্ধু ও সহচর হলেন হযরত যুবায়র (রা)।

ব্যাখ্যা ঃ এটা ও অত্যন্ত গৌরব ও সম্মানের বিষয়। কেননা আঁ হযরত (সা)-এর বন্ধু বা সহচর হওয়া যে কোন ব্যক্তির ভাগ্যে হয় না। হযরত যুবায়র (রা)-কে তিনি এ সম্মানের দ্বারা গৌরবান্বিত করেন।

بَابُ فَضَائِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর ফযীলত

٣٧٢ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ اَسْمَرَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَالَ فَخَرَجَا وَخَرَجَ مَعَهُمَا فَمَرُّوا بِابْنِ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَقْرَأُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ كَمَا اُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَأَةِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ ـ

وَجَعَلَ يَقُوْلُ لَهُ سَلْ تُعْطَهُ فَاَتَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ يُبَشِّرَانِهِ فَسَبَقَ اَبُوْ بَكْرٍ عُمَرَ اِلَيْهِ يُبَشِّرُهُ وَاَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَمَرَهُ بِالدُّعَاءِ ـ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ اِيْمَانًا دَائِمًا لاَ يَزُوْلُ وَنَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ فِى جَنَّةِ الْخُلْدِ ـ

وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ (رضـ) سَمَرَا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَا وَخَرَجَ مَعَهُمَا فَمَرُّوْا بِابْنِ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَقْرَأُ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّقْرَأَ الْقُرْاٰنَ غَضًّا كَمَا اُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلٰى قِرَأَةِ ابْنِ اُمِّ عبْدٍ وَجَعَلَ يَقُوْلُ سَلْ تُعْطَهُ وَذَكَرَ تَمَامَ الاَوَّلِ *

হাদীস নং- ৩৭২

অনুবাদ ঃ জনৈক ব্যক্তি থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

এক রাতে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে বসে আলাপ করছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর এ দু'জন সাহাবী এবং নবী করীম (সা) বাইরে আগমণ করেন। তারপর তাঁরা তিনজন হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট গমন করেন। এ সময় তিনি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তখন নবী করীম (সা) ইরশাদ করেনঃ কুরআন মজীদ যেভাবে নাযিল হয়েছে, সে পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করার যার ইচ্ছা হয়, সে যেন ইব্ন উম্মে আবদ (আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ)-এর কিরআতের পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করে।

অতঃপর আঁ হযরত (সা) বললেন, হে ইব্ন মাসউদ! তুমি দু'আ কর, তোমার চাহিদা অনুযায়ী তোমাকে দেয়া হবে (দু'আ কবূল করা হবে)। এরপর হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) সুসংবাদ দেয়ার জন্য তাঁর নিকট গমন করেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) অগ্রগামী হয়ে তাঁকে এ সংবাদ দান করেন। সাথে সাথে এ সংবাদও প্রদান করেন যে, নবী করীম (সা) তাঁকে দু'আ করার জন্য বলেছেন (কেননা তাঁর দু'আ কবূল হবে)। তখন তিনি এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এমন স্থায়ী ও অটুট ঈমান কামনা করি যা কখনো দূরীভূত হবে না। এমন নিয়ামতসমূহের আকাঙ্ক্ষা করছি যা কখনো শেষ হবে না এবং চিরস্থায়ী বেহেশ্‌তে তোমার নবীর সাথী হতে চাই।

অন্য এক রিওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, এক রাতে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে বসে আলাপ করছিলেন। এরপর উভয় সাহাবী এবং আঁ হযরত (সা)-বের হয়ে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। এ সময় তিনি নামাযে (তাহাজ্জুদ) কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ এটা যার পসন্দ হবে যে, পবিত্র কুরআন যে পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে, সে পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করবে, তবে সে যেন ইব্ন উম্মে আবদ অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করে। অতঃপর তিনি ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বললেন, তুমি দু'আ কর, দু'আ অনুযায়ী তোমাকে প্রদান করা হবে (তোমার দু'আ কবূল করা হবে)। এরপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী দু'আ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসেও হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সম্মান ও মর্যাদার কথা প্রমাণিত হয়। প্রথমত তাঁর ক্বিরআতের প্রশংসা করা হয়েছে এবং রসূল (সা) তাঁর ক্বিরআত অনুযায়ী পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ ছাড়া তাঁকে مستجاب الدعوات অর্থাৎ "তাঁর দু'আ গ্রহণযোগ্য বা কবূল করা হবে" এটাও প্রকাশ করেছেন। বস্তুত এ হাদীসও তাঁর মরতবা, সম্মান ও ইল্‌মের গভীরতা প্রকাশ করেছে।

٣٧٣ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَوْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَانَ اِذَا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَهُ اَرْسَلَ وَالِدَتَهُ اُمَّ عَبْدٍ تَنْظُرُ اِلٰى هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَلِّهِ وَسَمْتِهِ فَتُخْبِرُ بِذٰلِكَ فَيَتَشَبَّهُ بِهِ *

হাদীস নং- ৩৭৩

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় ঘরে প্রবেশ করতেন তখন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) তাঁর মা উম্মে আবদকে নবী করীম (সা)-এর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও আকৃতি প্রত্যক্ষ করার জন্য ভিতরে প্রেরণ করতেন। সুতরাং তিনি সবকিছু দেখে এসে হযরত ইব্ন মাসঊদকে বলতেন এবং তিনি আঁ হযরত (সা)-এর অনুপম চরিত্র মাধুর্য অনুকরণ ও অনুসরণ করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ বর্ণনা করেন, আবূ মূসা (রা) বলেছেন, আমি এবং আমার ভাই যখন ইয়েমেন থেকে আগমণ করি এবং কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করি, তখন আমরা এটা মনে করতাম যে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) আহ্লে বায়ত বা নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আমরা তাকে এবং তার আম্মাকে নবী করীম (সা)-এর খিদমতে কোন লৌকিকতা ছাড়াই যাতায়াত করতে দেখেছি। এমনিভাবে আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত হুযায়ফা (রা)-এর নিকট এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের নবী করীম (সা)-এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে এবং যাতে আমরা তার কাছ থেকে তা শিখতে পারি। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, আমার মতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সাথে ইব্ন উম্মে আবদ অর্থাৎ হযরত ইব্ন মাসঊদের কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে।

তিরমিযী যাযান (র)-এর সূত্রে হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আপনি খলীফা নিয়োগ করে যেতেন। তিনি বললেন, যদি আমি তোমাদের উপর খলীফা নিয়োগ করে যাই এবং তোমরা তার নাফরমানী কর, তাহলে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে। তবে হুযায়ফা তোমাদের নিকট যে হাদীস বর্ণনা করে তা তোমরা সত্য মনে কর এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ তোমাদেরকে যেভাবে (পবিত্র কুরআন) শিক্ষাদান করে, তোমরা সেভাবে তিলাওয়াত কর। এ হাদীসকে ইমাম তিরমিযী (র) হাসান বলেছেন। সুতরাং এ সমস্ত হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব কত উর্ধ্বে তা অনুধাবন করা যায়। কেননা হাদীসের দ্বারা এটাও প্রতীয়মান হয় যে, আঁ হযরত (সা)-এর দরবারে তাঁর এবং তাঁর আম্মার কিরূপ অধিকার ছিল। বেশি যাতায়াতের ফলে প্রত্যক্ষদর্শীরা মনে করতো যে, তাঁরা নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এটাও প্রতীয়মান হয় যে, সম্মানিত সাহাবী হযরত হুযায়ফা (রা)-এর দৃষ্টিতে হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর চেয়ে বেশি নবী করীম (সা)-এর চরিত্র মাধুর্যের সাদৃশ্য ও নিকটতম আর কেউ ছিল না। তাঁর উক্তি বা বক্তব্য মানদন্ড হিসেবে গণ্য হতো। শেষে হাদীসের দ্বারা এটাও জানা যায় যে, আঁ হযরত (সা) খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি এজন্য প্রয়োজন মনে করেন নি যে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) এবং হযরত হুযায়ফা (রা)-এর মত ব্যক্তিত্ব মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, যাঁদের পথ-নির্দেশ ও পরিচালনার দ্বারা ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কার্যক্রম সুন্দরভাবে প্রতিপালন করা যেতে পারে। যেমন খিলাফতের কার্যক্রম। প্রথমত আল্লাহ্র কিতাব কুরআন ও রাসূলের সুন্নাত তথা হাদীস বিদ্যমান এবং এর সাথে তাঁদের মত এরূপ সম্মানিত ও সুবিখ্যাত সাহাবীও বিদ্যমান, তাই খলীফা নির্বাচনের এতটুকু প্রয়োজন নেই। উক্ত আলোচনার দ্বারা এ ফলাফল লাভ করা যায় যে, সম্মানের

দিক দিয়ে সর্বজন স্বীকৃত চার খলীফার পর ইলম ও রিওয়ায়েত, চরিত্র মাধুর্য ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে আঁ হযরত (সা)-এর সঠিক আদর্শের প্রতীক হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) আঁ হযরত (সা)-এর বাড়িতে অবস্থান এবং সফর, আভ্যন্তরীন ও বাইরের যাবতীয় কাজকর্মে সাথী ও সহচর ছিলেন। নবী করীম (সা)-এর চাদরের হিফাযত এবং মাদুর ও বিছানা, লাঠির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত ছিল। এ ছাড়া হুযূর (সা)-এর সওয়ারীর হিফাযত, তাঁর মিসওয়াক বহন করার গৌরবও তিনি অর্জন করেন। উযূর লোটা ও জুতা বহন করার দায়িত্বও তাঁর উপরই ন্যস্ত ছিল। মোট কথা যে সৌভাগ্যবান মানুষকে আঁ হযরত (সা)-এর এত অধিক খিদমতের দায়িত্ব একই সময় অর্পণ করা হয়, এমন ব্যক্তির কাছ থেকে রাসূল করীম (সা)-এর সীরাত সম্পর্কে অবগত না হলে আর কার কাছ থেকে অবগত হওয়া যাবে এবং তাঁর উক্তি মানদন্ড না হলে আর কার উক্তি মানদন্ড হবে ? এ কারণেই হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) শরীয়তের অধিকাংশ বিধান ও ফিকহ্র মাসয়ালা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর মত ও বর্ণনার উপর ভিত্তি করে লিপিবদ্ধ করেছেন।

٣٧٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَوْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ حَصِيْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

وَفِى رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِبَ عَصَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

وَفِى رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِبَ رِدَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

وَفِى رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِبَ الرَّاحِلَةِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَفِى رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِبَ سِوَاكِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَ الْمِيْضَأَةِ وَصَاحِبَ النَّعْلَيْنِ *

হাদীস নং- ৩৭৪

অনুবাদ ঃ হযরত আওন তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) আঁ হযরত (সা)-এর মাদুর বা চাটাই বহন করতেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর লাঠি বহন করতেন।

এক রিওয়ায়েতে আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাদর সংরক্ষণ করতেন।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সওয়ারীর হিফাযতের দায়িত্ব পালন করতেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, (সফরে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিসওয়াক, উযূর পাত্র বা লোটা এবং জুতা তাঁর দায়িত্বে থাকতো।

ব্যাখ্যা ঃ এ সমস্ত খেদমতের কারণে যে বুযর্গী ছিল, এ ছাড়া তাঁর উপর আঁ হযরত (সা)-এর আন্তরিক দু'আও ছিল।

٣٧٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَعْنٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ مَا كَذَبْتُ مُنْذُ اَسْلَمْتُ اِلاَّ كَذْبَةً وَّاحِدَةً كُنْتُ اَرْحَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتٰى رَجُلٌ مِنَ الطَّائِفِ فَسَأَلَنِىْ اَيُّ الرَّاحِلَةِ اَحَبُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ الطَّائِفِيَّةَ الْمَكِّيَّةَ وَكَانَ يَكْرَهُهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا اُتِىَ بِهَا قَالَ مَنْ رَحَّلَ لَنَا هٰذِهِ - قَالُوْ رَحَّالُكَ - قَالَ مُرُوا ابْنَ اُمِّ عَبْدٍ فَلْيُرَحِّلْ لَنَا فَاَعَيْدَتُ اِلَىَّ الرَّاحِلَةُ -

وَفِىْ رِوَيَةٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِىءَ بِرَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ فَسْأَلَنِى الطَّائِفِىُّ فَقَالَ اَىُّ الرَّاحِلَةِ اَحَبُّ اِلَيْهِ قُلْتُ الطَّائِفِيَّةُ الْمَكِيَّةُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَنْ صَاحِبُ هٰذِهِ الرَّاحِلَةِ قِيْلَ الطَّائِفِىُّ قَالَ لاَحَاجَةَ لَنَا بِهَا *

হাদীস নং- ৩৭৫

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, আমি যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি, তখন থেকে একটি ব্যতীত কোন মিথ্যা কথা বলিনি। আমি নবী করীম (সা)-এর উটের উপর হাওদা বাঁধছিলাম। এ সময় তায়েফ থেকে হাওদা বাঁধাইকারী আগমণ করে এবং আমার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন হাওদা অধিক পসন্দ করেন ? আমি বললাম, তায়েফ ও মক্কার অর্থাৎ সেখানে যেভাবে বাঁধা হয়। অথচ তিনি তা অপসন্দ করতেন। অতঃপর উটের উপর হাওদা বেঁধে যখন খেদমতে হাযির করা হয়, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ হাওদা কে বেঁধেছে ? সবাই বলল, আপনার জন্য হাওদা বাঁধাইকারী (যিনি তায়েফ থেকে এসেছেন)। তিনি তখন বললেন ঃ ইব্ন উম্মে আবদকে বলো, সে যেন আমার জন্য হাওদা বাঁধে [হযরত আবদুল্লাহর (রা) বলেন] এরপর আমি দ্বিতীয়বার হাওদা বাঁধি।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, তায়েফ থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আগমণ করে। ঐ তায়েফবাসী আমার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, নবী করীম (সা)-কোন্ ধরনের হাওদা পসন্দ করেন ? আমি বললাম, তায়েফ অথবা মক্কার (অর্থাৎ সেখানে যেভাবে বাধা হয়)। অতঃপর যখন হুযূর (সা) বাইরে আগমণ করেন, তখন জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ হাওদা কে বেঁধেছে। বলা হলো, এক তায়েফবাসী। তিনি বললেন ঃ এটা আমাদের প্রয়োজন নেই।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের দ্বারা ও হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর উঁচু মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। মোটকথা তাঁর মর্যাদা সম্পর্কিত অনেক হাদীস রয়েছে। তিরমিযী হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা) বলেছেন ঃ যদি আমি কোন পরামর্শ ছাড়া কাউকে আমীর নিয়োগ করতাম, তা হলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে আমীর নিয়োগ করতাম।

٣٧٦ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ الشَّعْبِىْ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَاكَذَبْتُ مُنْذُ اَسْلَمْتُ اِلاَّ وَاحِدَةً كُنْتُ اُرَحِّلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتٰى رَحَّالُ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ اَىُّ الرَّاحِلَةِ اَحَبُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ الطَّائِفِيَّةُ الْمَكِّيَّةُ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُهَا فَلَمَّا رَحَّلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِىَ بِهَا قَالَ مِنْ رَحَّلَ لَنَا هٰذِهِ الرَّاحِلَةَ ـ قَالَ رَحَّالُكَ الَّتِىْ اُتِيَتْ بِهِ مِنَ الطَّائِفِ ـ فَقَالَ رُدِّ الرَّاحِلَةَ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ *

হাদীস নং- ৩৭৬

অনুবাদ ঃ মাসরূক থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। তবে একবার বলেছি। (ঘটনা হলো এই যে,) আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উটের হাওদা বাঁধছিলাম। এ সময় তায়েফ থেকে একজন হাওদা তৈয়ারকারী আগমণ করে এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ ধরনের হাওদা রাসূলুল্লাহ (সা) পসন্দ করেন ? আমি (ইবন্ মাসঊদ) বললাম, তায়েফ ও মক্কার (অর্থাৎ তায়েফ ও মক্কাবাসীগণ যেভাবে তৈরি করে), অথচ তিনি তা অপসন্দ করতেন। অতঃপর হাওদা তৈরি করে যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে উপস্থিত করা হয়, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ হাওদা কে বেঁধেছে ? তখন কেউ বললেন, তায়েফ থেকে আগমণকারী এক ব্যক্তি হাওদা বেঁধেছে। তিনি বললেন ঃ হাওদা বাঁধার জন্য উটটি ইব্ন মাসঊদের নিকট নিয়ে যাও (যাতে সে হাওদা বাঁধে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ সমস্ত হাদীস হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর গুণাবলী ও মর্যাদার কথা প্রমাণ করে।

بَابُ فَضِيلَةِ خُزَيْمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

হযরত খুযায়মা (রা)-এর গুণাবলী ও মর্যাদা

٣٧٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ

الْجَذَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ اَنَّهُ مَرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَعْرَابِىٌّ يَجْحَدُ بَيْعَهُ فَقَالَ خُزَيْمَةُ اَشْهَدُ لَقَدْ بِعْتَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَيْنَ عَلِمْتَهُ قَالَ تَجِيْئُنَا بِالْوَحْىِ مِن السَّمَاءِ فَنُصَدِّقُكَ قَالَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ -

وَفِى رِوَايَةٍ اَنَّهُ مَرَّ بِاَعْرَابِىٍّ وَهُوَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَجْحَدُ بَيْعًا قَدْ عَقَدَهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُزَيْمَةُ اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بِعْتَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَيْنَ عَلِمْتَ ذٰلِكَ - فَقَالَ تَجِيْئُنَا بِالْوَحِىِّ مِنَ السَّمَاءِ فَنُصَدِّقُكَ - قَالَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَه بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ -

وَفِى رِوَايَةٍ اَجَازَ شَهَادَةً بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ حَتّٰى مَاتَ *

হাদীস নং- ৩৭৭

অনুবাদ ঃ হযরত খুযায়মা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। এ সময় এক বেদুঈন তাঁর নিকট বিক্রয়ের বিষয়টি অস্বীকার করছিল। তখন হযরত খুযায়মা (রা) বললেন, হে বেদুঈন! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ক্রয়-বিক্রয় করেছ। নবী করীম (সা) হযরত খুযায়মাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি এটা কিভাবে জানতে পারলে ? হযরত খুযায়মা (রা) বলেন, আপনি ঐশীবাণীর কথা বলেন এবং আমরা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করি। হযরত খুযায়মা (রা) বলেন, এরপর থেকে হুযূর (সা) তাঁর একজনের সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্যের সমান বলে নির্ধারণ করেন।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত খুযায়মা (রা) এক বেদুঈনের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ছিল এবং একটি বিক্রয়ের বিষয় নিয়ে অস্বীকার করছিল। অথচ সে পূর্বেই আঁ হযরত (সা)-এর সাথে কাজটি সম্পাদন করেছিল। তখন হযরত খুযায়মা (রা) বলেন, হে বেদুঈন! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি নবী করীম (সা)-এর সাথে ক্রয়-বিক্রয় করেছ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তুমি এটা কিভাবে জানলে ? হযরত খুযায়মা (রা) বলেন, আপনি আমাদের নিকট ঐশীবাণী নিয়ে আসেন এবং আমরা আপনার উপর বিশ্বাস করি (সুতরাং যমীনের

কথা কেন বিশ্বাস করব না যা আকাশ থেকে অধিক নিকটে)। হযরত খুযায়মা (রা) বলেন, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাক্ষ্যকে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান বলে স্থির করেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সাক্ষ্য দু'জনের সাক্ষ্যের সমান বলে গণ্য করা হতো।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের দ্বারা হযরত খুযায়মা (রা)-এর গুণাবলী ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর একজনের সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্যের সমান বলে গণ্য করা হতো।

بَابُ فَضِيْلَةِ خَدِيْجَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا

হযরত খাদীজা (রা)-এর ফযীলত

٣٧٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) بُشِّرَتْ خَدِيْجَةُ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ لَاصَخَبَ فِيْهَا وَلَا نَصَبَ *

হাদীস নং- ৩৭৮

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত খাদীজা (রা)-কে বেহেশতে এমন ঘরের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যেখানে কোন শোরগোল চিৎকার থাকবে না এবং কোন দুঃখ-কষ্টও থাকবে না।

ব্যাখ্যা ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) হলেন মহিলাদের মধ্যে অপরিসীম সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁর গুণাবলী ও মর্যাদা সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) যিনি স্বয়ং অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী, তিনি বলেছেন ঃ হযরত খাদীজা (রা) ব্যতীত আর কারো প্রতি আমার এত ঈর্ষা হতো না। তিনি কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কারণে গৌরবান্বিত ছিলেন। প্রথমত তাঁর কোন সতীন বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। দ্বিতীয়ত উম্মুল মু'মিনীনগণের মধ্যে দ্বিগুণের চেয়ে বেশি নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। তৃতীয়ত তিনি কখনো আঁ হযরত (সা)-এর মেজাজের মধ্যে সামন্যতম বিষাদ সৃষ্টি করেননি। চতুর্থত নারীদের নেত্রী (سَيِّدَةُ النِّسَاءِ) নবী বংশের গৌরব হযরত ফাতিমা (রা) তাঁরই কন্যা ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথমে হযরত খাদীজা (রা)-এর ইব্ন হালা ইব্ন যুরারার সাথে বিবাহ হয়। অতঃপর আতীক ইব্ন আয়িযের সাথে, এরপর নবী করীম (সা)-এর পবিত্র স্ত্রী (زَوْجَةٌ مُطَهَّرَةٌ) হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যখন হযরত খাদীজার (রা) চল্লিশ বছর, তখন আঁ হযরত (সা)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। এরপূর্বে তিনি কখনো বিবাহ করেননি এবং হযরত খাদীজা (রা) জীবিত থাকাকালে তিনি দ্বিতীয় কোন বিবাহও করেননি। হযরত ইবরাহীম ব্যতীত হুযূর (সা)-এর সমস্ত সন্তান হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভজাত ছিল। বিভিন্ন বর্ণনামতে হিজরতের পাঁচ অথবা চার বা তিন বছর পূর্বে তাঁর ইনতিকাল হয়। এ সময় নবুওয়তের দশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়।

ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়ষট্টি বছর। পঁচিশ বছর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্যে জীবিত ছিলেন। বিভিন্ন বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনিই সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

بَابُ فَضِيْلَةِ عَائِشَةَ صِدِّيْقَةٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর ফযীলত

٣٧٩ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّه لَيَهُوْنُ عَلَىَّ الْمَوْتُ اِنِّى رَأَيْتُكِ زَوْجَتِىْ فِى الْجَنَّةِ ـ

وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنِّى رَأَيْتُكِ زَوْجَتِىْ فِى الْجَنَّةِ ثُمَّ الْتَفَتَ وَقَالَ هُوِّنَ عَلَىَّ الْمَوْتُ لِاَنِّىْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ فِى الْجَنَّةِ *

হাদীস নং- ৩৭৯

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মৃত্যু আমার উপর সহজ হয়ে গিয়েছে যে, আমি বেহেশতের মধ্যে তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে দেখেছি।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, [নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ] আমি বেহেশতের মধ্যে তোমাকে (আয়েশাকে) আমার স্ত্রী হিসেবে দেখেছি। এরপর দৃষ্টি দিলেন এবং বললেন ঃ আমার উপর মৃত্যু সহজ হয়ে গিয়েছে। কেননা আমি আয়েশা (রা)-কে বেহেশতে আমার স্ত্রী হিসেবে দেখেছি।

ব্যাখ্যা ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর সাথে হুযূর (সা)-এর গভীর মহব্বত ও ভালবাসা ছিল। তাঁকে ব্যতীত তিনি শান্তি ও আরাম পেতেন না। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা আঁ হযরত (সা)-কে বেহেশতে হযরত আয়েশা (রা) সদৃশ দেখিয়ে দিয়েছেন, যাতে বেহেশতের জীবনে তাঁর পবিত্র আত্মা আরো বন্ধুবৎসল হয়ে যায়। কেননা জীবনের আনন্দ-বেদনা প্রিয় ব্যক্তিদের বিদ্যমান থাকা ও অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে। এটা আঁ হযরত (সা)-এর কিভাবে সহনীয় হতে পারে যে, তাঁর দুঃখ-বেদনার বন্ধু, জীবন-সাথী ও অংশীদার, দুঃখ ও আনন্দের সাথী, ভালবাসার প্রাণকেন্দ্র, পবিত্র স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বেহেশতে স্বীয় সাহচর্য থেকে তাঁর অন্তরের শান্তির কারণ না হবেন। সুতরাং দুনিয়াতেই তাঁকে এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা) বেহেশতে তাঁর সাথী হবেন। এছাড়া স্বয়ং নবী করীম (সা) এ আন্তরিক ভালবাসা ও মহব্বতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা)-কে বেহেশতে প্রত্যক্ষ করায় আমার মৃত্যু সহজ হয়ে গিয়েছে। কেননা এখন এ সন্দেহ দূরীভূত

হয়েছে যে, হয়ত মৃত্যু এ অন্তরঙ্গ বন্ধুর বিচ্ছেদের কারণ হবে এবং এরদ্বারা চিরদিনের জন্য পৃথক ও আলাদা করে দেবে।

٣٨٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنَّ لِى خِصَالٌ سَبْعٌ لَمْ يَكُنْ لِاَحَدٍ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ اَحَبَّهُنَّ اِلَيْهِ اَبًا وَاَحَبَّهُنَّ اِلَيْهِ نَفْسًا وَتَزَوَّجَنِىْ بِكْرًا - وَمَا تَزَوَّجَنِىْ حَتّٰى اَتَاهُ جِبْرِئِيْلُ بِصُوْرَتِىْ - وَلَقَدْ رَأَيْتُ جِبْرَئِيْلَ وَمَارَاهُ اَحَدٌ مِّنَ النِّسَاءِ غَيْرِىْ - وَكَانَ يَأْتِيْهِ جِبْرِيْئِلَ وَاَنَا مَعَهُ فِى شِعَارِهِ - وَلَقَدْ نَزَلَ فِى عُذْرٍ وَكَانَ اَنْ يَهْلِكَ فِأَمُّ النَّاسِ - وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَيْتِىْ وَلَيْلِىْ وَيَوْمِىْ وَبَيْنَ سَحْرِىْ وَنَحْرِىْ *

হাদীস নং- ৩৮০

অনুবাদ ঃ শা'বী (র) থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার মধ্যে সাতটি বৈশিষ্ট্য এমন ছিল যে, নবী (সা)-এর অপর কোন স্ত্রীর তা ছিল না। (প্রথমত) আমার পিতা হযূর (সা)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র ছিলেন আর আমি নিজেও তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। (দ্বিতীয়) আমাকেই কেবল নবী (সা) কুমারী অবস্থায় বিবাহ করেছেন। (তৃতীয়) হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট আমার চেহারা না দেখানো পর্যন্ত তিনি (সা) আমাকে বিয়ে করেননি। (চতুর্থ) আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখেছি। নবী (সা)-এর অন্য কোন স্ত্রী এ সৌভাগ্য লাভ করেননি। (পঞ্চম) আমরা একই চাদরের নিচে থাকা অবস্থায়ও হযরত জিবরাঈল (আ) আগমণ করেছেন। (ষষ্ঠ) আমার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। এমনকি এরদ্বারা একদল মুসলমান ধ্বংস থেকে রেহাই পান। (সপ্তম) আমার ঘরেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জান কবয করা হয় আমারই পালার দিনে-রাতে আমার বক্ষ ও কণ্ঠের মধ্যবর্তী স্থানে মাথা রেখে।

ব্যাখ্যা ঃ পরবর্তী হাদীসে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হবে।

٣٨١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَوْنٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ فِى سَبْعِ خِصَالٍ لَيْسَتْ فِىْ وَاحِدَةٍ مِنْ اَزْوَاجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) تَزَوَّجَنِىْ وَاَنَا بِكْرٌ - وَلَمْ يَتَزَوَّجَ اَحَدًا مِنْ نِّسَائِهِ بِكْرًا غَيْرِىْ (٢) وَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ بِصُوْرَتِىْ قَبْلَ اَنْ يَّتَزَوَّجَنِىْ وَلَمْ يَنْزِلْ بِصُوْرَةِ وَّاحِدَةٍ مِنْ نِّسَائِهِ غَيْرِىْ

(٣) وَاَرَانِىْ جِبْرَئِيلُ وَلَمْ يُرَهُ اَحَدًا مِنْ اَزْوَاجِهِ غَيْرِىْ (٤) وَكُنْتُ مِنْ اَحَبِّهِنَّ اِلَيْهِ نَفْسًا وَاَبًا - (٥) وَنَزَلَتْ فِىَّ اٰيَاتٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَادَ اَنْ يُّهْلِكَ فِيْهِمْ مِنَ النَّاسِ - (٢) وَمَاتَ فِى لَيْلَتِىْ وَيَوْمِىْ (٧) وَفِىْ بَيْنِ سَحْرِىْ وَنَحْرِىْ -

وَفِى رِوَايَةٍ اِنَّهَا قَالَتْ اِنَّ فِىَّ سَبْعَ خِصَالٍ مَاهُنَّ فِىْ وَاحِدَةٍ مِنْ اَزْوَاجِهِ - (١) تَزَوَّجَنِىْ بِكْرًا وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرِىْ - (٢) وَاَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ بِصُوْرَتِىْ قَبْلَ اَنْ يَّتَزَوَّجَنِىْ وَلَمْ يَأْتِهِ جِبْرَئِيلُ بِصُوْرَةِ اَحَدٍ مِّنْ اَزْوَاجِهِ غَيْرِىْ - (٣) وَكُنْتُ اَحَبَّهُنَّ اِلَيْهِ نَفْسًا وَاَبًا - (٤) وَاُنْزِلَ فِىْ عُذْرٌ كَانَ يَهْلِكَ فِيْهِ فَنَامَ مِنَ النَّاسِ (٥) وَمَاتَ فِى يَوْمِىْ وَلَيْلَتِىْ (٦) وَبَيْنَ سَحْرِىْ وَنَحْرِىْ (٧) وَاَرَانِىْ جِبْرَئِيْلُ وَلَمْ يُرِهُ اَحَدٌ مِّنْ اَزْوَاجِهِ غَيْرِىْ *

হাদীস নং- ৩৮১

অনুবাদ ঃ শা'বী (র) থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার মধ্যে এমন সাতটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্য কোন স্ত্রীর মধ্যে ছিল না ঃ (১) নবী (সা) কুমারী বা কিশোরী অবস্থায় আমাকে বিবাহ করেছেন। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে আর কাউকে কুমারী অবস্থায় বিবাহ করেননি। (২) বিবাহের পূর্বে হযরত জিবরাঈল (আ) আমার আকৃতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পেশ করেছেন। আমাকে ব্যতীত অন্যকোন স্ত্রীর আকৃতি বিবাহের পূর্বে তাঁকে এভাবে দেখানো হয়নি। (৩) আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখেছি। আমি ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রী তাঁকে দেখেননি। (৪) আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাঁর নিজের চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলাম এবং আমার পিতাও তাঁর নিকট প্রিয় ছিলেন। (৫) আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে কুরআনের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যথায় (ইফ্কের ঘটনার ব্যাপারে) মানুষের একটি দল ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। (৬) আমার ঘরে এবং পালার রাত ও দিনে তিনি ইনতিকাল করেন। (৭) আমার গলা ও বুকের মধ্যে তাঁর পবিত্র আত্মা কবয করা হয়।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার মধ্যে এমন সাতটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আঁ হযরত (সা)-এর অন্য কোন স্ত্রীর মধ্যে ছিল না ঃ (১) কুমারী অবস্থায় তিনি আমাকে বিবাহ করেছেন। আমাকে ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীকে কুমারী অবস্থায় বিবাহ করেননি। (২) আমাকে বিবাহ করার পূর্বে হযরত জিবরাঈল আমার আকৃতি (প্রতিকৃতি) নিয়ে তাঁর সামনে অবতীর্ণ হয়েছেন। অথচ আমাকে ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীর আকৃতি নিয়ে তিনি অবতীর্ণ হননি। (৩) নিজ

সত্তা থেকেও আমি তাঁর নিকট অধিক প্রিয় ছিলাম এবং আমার পিতাও তাঁর নিকট খুবই প্রিয় ছিলেন। (৪) আমার পবিত্রতার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়। অন্যথায় তখন মানুষের একটি দল ধ্বংস হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। (৫) আমার ঘরে ও আমার পালার দিন তিনি ইনতিকাল করেন। (৬) আমার গলা ও বুকের মধ্যে মাথা রেখে তিনি ইনতিকাল করেন। (৭) আমাকে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখানো হয়েছে। অথচ আমাকে ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীকে তা দেখানো হয়নি।

ব্যাখ্যা ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত আছে এবং যা সহীহ বলা হয়েছে, তিনি যখন নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন সমস্ত মানুষের মধ্যে আপনার নিকট অধিক প্রিয় কে ? তখন তিনি বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা), এরপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন পুরুষদের মধ্যে কে ? তিনি বললেন, তাঁর পিতা অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা)। হযরত আনাস (রা) থেকেও এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছয় বছর বয়সে হযরত আয়েশা (রা)-এর বিবাহ হয়, নয় বছর বয়সে তিনি স্বামীর বাড়ি গমন করেন। হিজরতের আট বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং আঠার বছর বয়সে আঁ হযরত (সা) ইনতিকাল করেন। তিরিমিযী শরীফে ইব্ন আবী মুলায়কার সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত জিবরাঈল (আ) সবুজ রেশমের কাপড়ে আচ্ছাদিত হয়ে নবী করীম (সা)–এর খেদমতে আগমণ করেন এবং বলেন, ইনি হলেন আপনার ইহকাল ও পরকালের স্ত্রী।

তিরমিযী আবি সালমার সূত্রে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেন ঃ হে আয়েশা! ইনি হলেন জিবরাঈল এবং ইনি তোমাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ

وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَتُه ـ

তিরমিযী শরীফের এক রিওয়ায়েতে হযরত উম্মে সালমাকে (রা)-কে সম্বোধন করার সময় আঁ হযরত (সা)-এর এ ধরনের একটি বাক্য বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে আয়েশার ব্যাপারে কষ্ট দিও না। কেননা তার এ সৌভাগ্য হয়েছে যে, আমি তোমাদের মধ্যে শুধু তার লেপের মধ্যে থাকা অবস্থায় ওহী নাযিল হয়েছে।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা افك এর ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ্ পাকের সাক্ষ্য দ্বারা তাঁর পবিত্রতা প্রমাণিত হয়েছে। অদ্যাবধি পৃথিবীতে হযরত মরিয়ম (আ) ব্যতীত অন্য কেউ এ মর্যাদা লাভ করতে পারেননি।

এ সমস্ত হাদীসের দ্বারা একটি চিত্তাকর্ষক প্রশ্নের উদ্রেক হয়। তা হলো এই যে, হযরত খাদীজা, হযরত আয়েশা ও হযরত ফাতিমা (রা) এই তিনজনের মধ্যে কে অধিক উত্তম। প্রত্যেকের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। এগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের মধ্যে কোন একজনের উত্তম হওয়ার বিষয়টি মীমাংসা করা খুবই কঠিন। এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আহমদ ও তিবরানী (র) হযরত আনাস (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন যে, দুনিয়ার সমস্ত মহিলার মধ্যে সর্বোত্তম হলেন চারজন। হযরত মরিয়ম বিনতে ইমরান, হযরত খাদীজা বিনতে খুরাইলিদ, হযরত ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ এবং ফিরআউনের স্ত্রী হযরত আছিয়া (রা)।

হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, বেহেশতের মহিলাদের নেত্রী হবেন চারজন। হযরত মরিয়ম, হযরত খাদীজা, হযরত ফাতিমা ও হযরত আছিয়া।

নায্যার ও তিবরানী হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে হযরত খাদীজার মর্যাদা ও ফযীলত এরূপ, যেরূপ দুনিয়ার সমস্ত মহিলার উপর হযরত মরিয়মের ফযীলত ও মর্যাদা বিদ্যমান।

নাসাঈ শরীফে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, বেহেশতের মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন হযরত খাদীজা ও হযরত ফাতিমা (রা)।

সুতরাং এ সমস্ত রিওয়ায়েতের দৃষ্টিকোণ থেকে দুনিয়া ও বেহেশতের সমস্ত মহিলার মধ্যে হযরত খাদীজা ও হযরত ফাতিমার অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে আয়েশা (রা) ও অন্যান্ন উম্মুল মুমিনীনও রয়েছেন।

এবার তাঁদের মধ্যে পরস্পরের ফযীলত সম্পর্কে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ (হযরত ফাতিমা বেহেশতের নারীদের নেত্রী)। এরদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত খাদীজা, (রা)-এর চেয়েও হযরত ফাতিমার ফযীলত বেশি। তাই আল্লামা তাকীউদ্দীন সুবকী (র) ফযীলতের ক্রমধারা বর্ণনা করে বলেন, প্রথম হযরত ফাতিমা, এরপর হযরত খাদীজা অতঃপর আয়েশা। হযরত আয়েশা (রা)-এর ফযীলত সম্পর্কে স্বয়ং হযরত আয়েশার উল্লেখিত সাতটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তাঁর ফযীলত প্রমাণ করে। এ ছাড়া মশহুর হাদীসে রয়েছে যে, আঁ হযরত (সা) বলেছেন ঃ

فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

"সমস্ত মহিলার উপর আয়েশার ফযীলত এরূপ যেমন খাদ্যের মধ্যে সারীদ-এর মর্যাদা।"

বেহেশতের সুসংবাদের ফযীলত আমরা ধারণা করতে পারব না। সেই ফযীলত নবী করীম (সা)-এর সমস্ত স্ত্রীগণ লাভ করেছিলেন। সুতরাং এ সমস্ত হাদীসের ভিত্তিতে উলামায়ে কিরামের মতামত এক বিশেষ দিকে নিবদ্ধ হতে পারে না। বিভিন্নজন বিভিন্নজনকে উত্তম বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত হলো এই যে, প্রকৃতপক্ষে সর্বোত্তম হওয়ার অধিকার রাখেন একমাত্র হযরত খাদীজা (রা)। কেননা উল্লেখিত রিওয়ায়েত এর প্রমাণ বহন করে এবং এটাও একটি প্রমাণ যে, আঁ হযরত (সা)-এর নিকট হযরত খাদীজা (রা) অধিক প্রিয় হওয়ার কারণে হযরত আয়েশা (রা) ঈর্ষা করেছেন। পূর্ববর্তী হাদীসে এর বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং এরদ্বারা সর্বোত্তম হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-এর সম্মানিত আম্মা।

এ ছাড়া ইমাম আহমদ ও তিবরানী বর্ণনা করেন, একবার হযরত আয়েশা (রা) হুযূর (সা)-এর সামনে বলেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে একজন বৃদ্ধার পরিবর্তে একজন কিশোরী দান করেছেন। এখন আর তাঁর স্মরণের কি অর্থ আছে ? এটা শুনে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। হযরত আয়েশা ভীত হয়ে বললেন, ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন,

ভবিষ্যতে আমি তাকে এভাবে কখনো উল্লেখ করব না। বরং তার উত্তম দিকের কথা বলব। আঁ হযরত (সা)-এর এ অসন্তুষ্টির দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হযরত খাদীজার মর্যাদা ছিল হযরত আয়েশার চেয়ে অধিক। অবশ্য হযরত আয়েশা এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে আঁ হযরত (সা) একটি শব্দও সহ্য করতেন না।

অতঃপর হযরত খাদীজা (রা)-এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তাঁর ফযীলত বা সর্বোত্তম হওয়ার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। তা হলো, ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়া, তাঁর কোন সতীন বা প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকা, আঁ হযরত (সা)-এর সমস্ত সন্তান তাঁর থেকে জন্মলাভ করা, হযরত ফাতিমা (রা)-এর সম্মানিত মা হওয়া, নবী করীম (সা)-এর সাথে তাঁর দাম্পত্য জীবন দীর্ঘ দিন হওয়া ইত্যাদি। অবশেষে বিবেক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য যে,

هر گلے را رنگ وبوے دیگراست (প্রত্যেক ফুলের রং ও ঘ্রাণ আলাদা) প্রত্যেকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বিশেষ সৌন্দর্য দান করেছেন যা অন্যের ভাগ্যে হয়নি যা মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। যেমন হযরত আয়েশা (রা)-এর ইল্‌ম ও ইজ্‌তিহাদের যোগ্যতা, যার ফলে তিনি সবার মধ্যে সর্বোত্তম বলে গণ্য। এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। এমন কি এটা বলা হয়ে থাকে যে, আহকামে শরীয়ার এক-চতুর্থাংশ তাঁর থেকে বর্ণিত। তাই আত্তার ইব্‌ন আবী রিবাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি সবচেয়ে বেশি ফকীহ্, আলিম, যাহিদ এবং সঠিক মতামত প্রদানকারী ছিলেন। হযরত উরওয়াহ (র) বলেন, ফিকহ্, চিকিৎসা ও কাব্য সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) থেকে আমি অন্য কাউকে অধিক জ্ঞানী দেখিনি। সম্ভবত সারীদ-এর হাদীস দ্বারা ঐ উত্তম গুণাবলীর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ দিকে হযরত খাদীজা (রা)-এর বয়সের পরিপক্কতা, অভিজ্ঞতা, আঁ হযরত (সা)-এর জন্য আত্মত্যাগ, ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়া, হুযূর (সা)-এর দুঃখ-কষ্টকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি এবং তাঁর সুখে আনন্দ প্রকাশ করা ইত্যাদি তাঁর সর্বাধিক মর্যাদা প্রমাণ করে। অতঃপর সরকারে দো'আলম (সা)-এর কলিজার টুকরা হযরত ফাতিমা (রা) সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ فَاِنَّهَا بُضْعَةٌ مِنِّىْ "ফাতিমা আমার দেহের এক টুকরা।" তাঁর সাথে আঁ হযরত (সা)-এর বংশ, স্বভাব ও প্রকৃতি, স্নেহ-মহব্বত ছিল, এটা তাঁর মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়, যাতে অন্য কারো সমকক্ষতা অর্জনের কোন সুযোগ নেই।

٣٨٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّهُ كَانَ اِذَا حَدَّثَ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَ حَدَّثَتْنِى الصِّدِّيْقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيْقِ الْمَرْاَةَ حَبِيْبَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

হাদীস নং- ৩৮২

অনুবাদ ঃ মাসরূক থেকে বর্ণিত, যখন তিনি যখন হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন সিদ্দীকা (সত্যবাদিনী) যিনি হযরত সিদ্দীকের কন্যা, যিনি পবিত্র (অভিযোগ থেকে) এবং যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয়।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মাসরূক সংক্ষিপ্ত বাক্যের দ্বারা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর গুণাবলী ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। ইফ্কের তথা অপবাদের ঘটনায় হযরত সিদ্দীকা (রা)-এর সত্যবাদিতা, সততা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে। তাই তাঁর নামের সাথে সিদ্দীকা উপাধি মর্যাদার কারণ হিসেবে গণ্য হয়েছে। যেহেতু তাঁর পবিত্রতা আসমানী শাহাদত ও কুরআনের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, এজন্য তাঁকে مبرات উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। যেহেতু তাঁর মহব্বত ও ভালবাসা রাসূল মাকবূল (সা)-এর পবিত্র অন্তরে সবচেয়ে বেশি স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল, তাই তাঁকে হাবিবায়ে রাসূল (حبيبه رسول) উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়েছিল।

٣٨٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهُ اِسْتَأْذَنَ عَلٰى عَائِشَةَ لِيَعُوْدَهَا فِى مَرْضِهَا فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ اَنِّى اَجِدُ غَمًّا وَكَرْبًا وَاَنْصَرِفْ ـ فَقَالَ لِلرَّسُوْلِ مَا اَنَا بِالَّذِىْ يَنْصَرِفُ حَتّٰى اَدْخُلَ فَرَجَعَ الرَّسُوْلُ فَاَخْبَرَهَا بِذٰلِكَ فَاَذِنَتْ لَهُ فَقَالَتْ اِنِّى اَجِدُ غَمًّا وَكُرْبًا وَاِنَّا مُشْفِقَةٌ مِمَّا اَخَافُ اَنَّ اَهْجُمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) اَبْشِرِىْ فَوَاللّٰهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَائِشَةُ (رض) فِى الْجَنَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّزَوِّجَهُ جَمْرَةً مِنْ جَهَنَّمَ فَقَالَتْ فَرَجْتَ فَرَجَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ *

হাদীস নং- ৩৮৩

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে পীড়িত অবস্থায় দেখার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত আয়েশা (রা) এটা বলে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, আমি এ সময় ব্যথা-বেদনায় কষ্টে আছি, সুতরাং আপনি এবার ফিরে যান। অতঃপর তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বললেন, আরো বলেন যে, আমি হাযিরা না দিয়ে ফিরে যাওয়ার মত ব্যক্তি নই। রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরে এলেন এবং একই কথা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট পুনরায় বললেন। তখন তিনি তাকে আসার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। এরপর তিনি বলেন, আমি চিন্তা ও দুঃখে-বেদনায় পতিত হয়েছি এবং আমি মৃত্যু যন্ত্রণাকে ভয় করছি। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, সুসংবাদ নিন। আল্লাহ্র শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এটা বলতে শুনেছি যে, আয়েশা (রা) বেহেশতে থাকবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্র নিকট এর চেয়েও মর্যাদাসম্পন্ন যে, তাঁর বিবাহ দোযখের এক অগ্নি স্ফুলিঙ্গের সাথে হবে। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তুমি আমার দুঃখ-বেদনা দূর করে দিয়েছ, আল্লাহ তোমার দুঃখ দূর করে দেবেন।

بَابُ فَضِيلَةُ الشَّعَبِىْ رحمه اللّٰهُ تعالٰى

হযরত শা'বী (র)-এর ফযীলত

٣٨٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ قَالَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمَغَازِىْ وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُهُ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ حَدِيْثَهُ اِنَّهُ يُحَدِّثُ كَاَنَّهُ شَهِدَ الْقَوْمَ *

হাদীস নং- ৩৮৪

অনুবাদ ঃ হযরত আমির শা'বী (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন তিনি মাগাযী অর্থাৎ যুদ্ধের বিবরণ শুরু করতেন হযরত ইবন উমর (রা) তা শুনেতেন। শোনার সময় তিনি বলতেন, তিনি (ইমাম শা'বী) এমনভাবে বর্ণনা করতেন, যেন তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দলের সাথে ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে হযরত শা'বীর হাদীস বর্ণনার প্রশংসা করা হয়েছে।

٣٨٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَامِرٍ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَغَازِىِّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَلْقَةٍ فِيْهَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ اِنَّهُ لَيُحَدِّثُ حَدِيْثًا كَانَ يَشْهَدُ *

হাদীস নং- ৩৮৫

অনুবাদ ঃ হযরত শা'বী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতেন, এরূপ মজলিসে, যেখানে হযরত ইব্ন উমর (রা) স্বয়ং উক্ত যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

بَابُ فَضَائِلِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلْقَمَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

হযরত ইবরাহীম, আলকামা এবং আবদুল্লাহ (রা)-এর ফযীলত

٣٨٦ – زُفَرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ حَمَّادً يَقُوْلُ كُنْتُ اِذَا نَظَرْتُ اِلى اِبْرَاهِيْمَ فَكُلُّ مَنْ رَاَى هَدْيَه يَقُوْلُ كَانَ هَدْيُه هَدْىُ عَلْقَمَةَ وَيَقُوْلُ مَنْ رَاَى عَلْقَمَةَ يَقُوْلُ كَانَ هَدْيُه هَدْىُ عَبْدِ اللّٰهِ وَيَقُوْلُ مَنْ رَاَى هَدْىَ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ هَدْيُه هَدْىُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

হাদীস নং- ৩৮৬

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হানীফা (র) বলেন, আমি হাম্মাদ (র)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, আমি যখন ইবরাহীম নখঈ (র)-কে দেখতাম, তখন তাঁর স্বভাব-চরিত্র প্রত্যক্ষকারী প্রত্যেক ব্যক্তি বলতেন, তাঁর স্বভাব-চরিত্র হযরত আলকামার মত। যিনি হযরত আলকামা (রা)-কে দেখেছেন, তিনি বলতেন, তাঁর স্বভাব ও চরিত্র হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মত এবং যিনি হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-কে দেখেছেন, তিনি বলতেন, তাঁর চরিত্র হুবহু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মত।

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীসে তিনজন বুযর্গের ফযীলত ও মর্যাদা এবং সুন্নাত ও তরীকতে আঁ হযরত (সা)-এর সাথে সাদৃশ্যের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

بَابُ فَضِيْلَةِ الاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَه اللّٰهُ تَعَالٰى

হযরত আবূ হানীফা (র)-এর ফযীলত

٣٨٧ – اَبُوْ حَمْزَةَ الاَنْصَارِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ دَاوُدَ يَقُوْلُ لاَبِىْ حَنِيْفَةَ مَنْ اَدْرَكْتَ مِنْ الْكُبَرَاءِ قَالَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَطَاؤُسًا وَعِكْرَمَةَ وَمَكْحُوْلاً وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ وَالْحَسَنَ الْبَصْرِىَّ وَعَمْرُو بْنَ دِيْنَارٍ وَاَبَا الزُّبَيْرِ وَعَطَاءَ وَقَتَادَةَ وَاِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبِىَّ وَنَافِعًا وَاَمْثَالَهُمْ *

হাদীস নং- ৩৮৭

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন দাউদ বলেন, আমি হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনি প্রথম সারির তাবেঈদের মধ্যে কার সাহচর্য লাভ করেছিলেন ? তখন তিনি বলেন, হযরত কাসিম, সালিম, তাউস, ইকরামা, মাকহুল, আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, হাসান বসরী, আমর ইব্ন দীনার, আবূ যুবায়র, আতা, কাতাদা, ইবরাহীম, শা'বী, নাফি (র) প্রমুখ মনীষীবর্গের।

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর উস্তাদবৃন্দের সংখ্যা চার হাজার এবং ছাত্র ছিল অসংখ্য।

كِتَابُ فَضْلِ اُمَّتِه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মতের ফযীলত

٣٨٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ يَّسْجُدُ وَا سَجَدَتْ اُمَّتِىْ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الاُمَمِ طَوِيْلاً قَالَ فَيُقَالُ اِرْفَعُوْا رُؤُسَكُمْ فَقَدْ جَعَلْتُ عَدُوَّكُمْ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى فِدَاءَكُمْ مِنَ النَّارِ *

হাদীস নং- ৩৮৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ কিয়ামতের দিন সমস্ত লোকজনকে সিজদার জন্য আহবান করা হবে। কাফিরগণ সিজদা করার শক্তি পাবে না। সমস্ত উম্মতের মধ্যে আমার উম্মতগণ দু'টি দীর্ঘ সিজদা করবে। তিনি বলেন ঃ আমার উম্মতগণকে বলা হবে, মাথা উঠাও। আমি নিশ্চয়ই তোমাদের শত্রু ইয়াহূদী-খ্রীস্টানদেরকে তোমাদের পরিবর্তে অগ্নির (দোযখের) জন্য বদল করে দিয়েছি।

ব্যাখ্যা ঃ এটা হলো ইহকাল ও পরকালের সর্দার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর প্রতি সদকা। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্মানের দ্বারা তাঁর উম্মতকে গৌরবান্বিত করেছেন যে, তাদের দুশমন আহলি কিতাব তথা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তিনি তাদের পরিবর্তে দোযখের জন্য নির্বাচন করেছেন।

٣٨٩ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُعْطِىْ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى فَيُقَالُ هٰذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ

وَفِى رِوَايَةٍ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَعْطَى اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّ رَجُلٍ مِّنْ هٰذَا الاُمَّةِ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ۔

وَفِى رِوَايَةٍ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِّنْ هٰذَا الاُمَّةِ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقِيْلَ لَهُ هٰذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ ۔

وَفِى رِوَايَةٍ اِنَّ هٰذِهِ الاُمَّةِ اُمَّةٌ مَّرْحُوْمَةٌ عَذَابُهَا بِاَيْدِيْهَا *

হাদীস নং- ৩৮৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ বুরদা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মুসলমানকে ইয়াহূদী-নাসারা থেকে এক-এক ব্যক্তিকে দেয়া হবে এবং বলা হবে যে, এ ব্যক্তি দোযখের জন্য তোমাদের পক্ষ থেকে ফিদয়া স্বরূপ দেয়া হলো।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের প্রত্যেককে আহলি কিতাব থেকে এক-এক কাফির দেবেন এবং তাদেরকে বলা হবে দোযখ থেকে মুক্তির জন্য এ ব্যক্তি হলো তোমাদের জন্য ফিদয়া।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, কিয়ামতের দিন এ উম্মতের প্রত্যেককে আহলি কিতাব থেকে এক-এক ব্যক্তিকে অর্পণ করা হবে এবং তাকে বলা হবে যে, ঐ ব্যক্তি হলো তোমাদের দোযখ থেকে মুক্তির জন্য ফিদয়া।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এ উম্মতের উপর এভাবে রহমত করা হয়েছে যে, তাদের আযাব ও শাস্তি তারা পূর্বেই পেয়ে যাবে (অর্থাৎ পৃথিবীতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে অধিকাংশ হাদীসের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

٣٩٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لِاَصْحَابِهِ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ - قَالُوْا نَعَمْ - قَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ - قَالُوْا نَعَمْ - قَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوْا نَعَمْ - قَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِائَةُ صَفٍّ مِنْ اُمَّتِىْ مِنْ ذٰلِكَ ثَمَانُوْنَ صَفًّا *

হাদীস নং- ৩৯০

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ বুরদা থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবাগণকে বললেন ঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্টি আছ যে, তোমরা এবং তোমাদের পরবর্তী আগমণকারী অর্থাৎ সমস্ত উম্মত বেহেশতের এক-চতুর্থাংশ হবে ? তাঁরা বললেন, জি হাঁ। অতঃপর হুযূর (সা) বললেন ঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরা এক-তৃতীয়াংশ বেহেশতবাসী হবে ? তাঁরা বললেন, হাঁ নিশ্চয়ই। পুনরায় তিনি বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরা বেহেশতবাসীদের মধ্যে অর্ধেক হবে ? সবাই বললেন, জ্বি হাঁ! তখন হুযূর (সা) বললেন, তোমরা সুসংবাদ শোন এবং সন্তুষ্ট হয়ে যাও। নিশ্চয়ই বেহেশতবাসীদের এক শ' বিশ কাতার হবে। এর মধ্যে আশি কাতার হবে আমার উম্মতের।

ব্যাখ্যা ঃ আঁ হযরত (সা)-এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে সে, তাঁর উম্মতগণ বেহেশবাসীর মধ্যে দু'-তৃতীয়াংশ হবে। তিরমিযী শরীফে এর সাথে وَاَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ। (অন্যান্য উম্মতগণের–৪০% হবে।)

٣٩١ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُمَّتِىْ اُمَّةٌ مَرْحُوْمَةٌ عَذَابُهَا بِاَيْدِيْهَا فِى الدُّنْيَا ـ وَزَادَ فِى رِوَايَةٍ بِالْقَتْلِ *

হাদীস নং- ৩৯১

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ বুরদা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার উম্মত হলো উম্মতে মরহুমা, তাদের আযাব ও শাস্তি দুনিয়াতেই হয়ে যাবে। অন্য এক রিওয়ায়েতে "بِالْقَتْلِ" শব্দ অতিরিক্ত রয়েছে। অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড, ফিতনা-ফাসাদ ইত্যাদি থাকবে।

ব্যাখ্যা ঃ আবূ দাউদ, বায়হাকী, হাকিম, তিবরানী, আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

اُمَّتِى مَرْحُوْمَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِى الْاٰخِرَةِ اِنَّمَا عَذَابُهَا فِى الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ وَالْبَلَايَا ـ

"আমার উম্মত হলো উম্মতে মরহুমা। তাদের উপর পরকালে আযাব হবে না। অবশ্য তাদের আযাব হলো দুনিয়াতে ফিতনা, কম্পন, হত্যাকান্ড এবং বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদ।"

٣٩٢ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ زِيَادٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ اُمَّتِى بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الطَّعْنُ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُوْنَ قَالَ وَخْزُ اَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَفِىْ كُلٍّ شَهَادَةٌ *

وَفِى رِوَايَةٍ وَفِى كُلٍّ شُهَدَاءُ *

হাদীস নং- ৩৯২

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের ধ্বংস طعن (বর্শা খেলা) এবং طاعون দ্বারা হবে। আরয করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! طعن -এর অর্থ আমরা জানি কিন্তু طاعون এর অর্থ কি ? তিনি বললেন ঃ এটা হলো তোমাদের শত্রু জ্বিনদের বিদ্ধকারী বর্শা অর্থাৎ এক প্রকার মহামারী বা রোগ। এগুলোর কারণে মৃত্যু হলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ হয়ে থাকে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, উভয়ের দ্বারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ হয়।

ব্যাখ্যা ঃ তাঊন (طاعون) -এর রোগে মৃত্যুবরণকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন। এটা যেহেতু আকস্মিক মৃত্যু, তাই আল্লাহ্ তা'আলা রহমত স্বরূপ এ করুণা করেছেন।

٣٩٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَاءُ اُمَّتِىْ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ - فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الطَّعْنُ قَدْ عَلِمْنَاهُ فَمَا الطَّاعُوْنُ قَالَ وَخْزُ اَعْدَائِكُمْ مِنْ الْجِنِّ وَفِىْ كُلٍّ شَهَادَةٌ *

হাদীস নং- ৩৯৩

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ طعن এবং طاعون দ্বারা আমার উম্মত ধ্বংস হবে। আরয করা হয়, হে আল্লাহর রাসূল ! طعن সম্পর্কে আমরা জানি কিন্তু طاعون কি ? তিনি বললেন ঃ এটা তোমাদের শত্রু জ্বিন দ্বারা বিদ্ধকারী বর্শা। এ সমস্ত দ্বারা (মৃত্যুবরণকারী) শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে আঁ হযরত (সা) (طاعون) -এর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে বলেছেন, এটা অত্যন্ত ধ্বংসকারী ও ভীতিপ্রদ ভয়ানক রোগ, এটা জ্বিনদের ক্রিয়া দ্বারা ছড়িয়ে থাকে।

كِتَابُ الْاَطْعِمَةِ وَالْاَشْرِبَةِ وَالضَّحَايَا وَالصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

পানাহারের দ্রব্যাদি, কুরবানী, শিকার এবং যবেহ সম্পর্কে বর্ণনা

٣٩٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَارِبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ *

হাদীস নং- ৩৯৪

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে সব পশু দাঁত দ্বারা শিকার করে, রাসূলুল্লাহ (সা) তা খেতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ যে সব পশু দাঁত দ্বারা শিকার করে, এগুলো খাওয়া নিষেধ। যেমন বাঘ, সিংহ, চিতা, শিয়াল, হাতি, বানর ইত্যাদি। এ হাদীস হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ, হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ, আবূ সা'লাবা আল খুশানী, আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ ছ'জন সম্মানিত সাহাবা থেকে সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে এবং এগুলোর অর্থ সাধারণ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে অকাট্য প্রমাণ বহন করে। রিওয়ায়েতের দৃষ্টিতেও অকাট্যের নিকটবর্তী, সুতরাং গণ্ডার এবং খেকশিয়াল এ সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এটাও দাঁত দ্বারা শিকারকারী জন্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটাই হলো ইমাম আবূ হানীফা (রা)-এর মাযহাব।

ইমাম শাফিঈ ও মালিক (রা) এ দুটোকে হালাল মনে করেন। দলীল হিসেবে তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ ও নাসাঈ শরীফে আবদুর রহমান ইব্ন আবী আম্মার সূত্রে বর্ণিত হাদীস পেশ করে থাকেন।

একই বিষয়ে আবদুর রহমান হযরত জাবির (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন, গন্ডার শিকার করা কি জায়েয ? তিনি বললেন, হাঁ। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি আমরা খেতে পারি ? হযরত জাবির (রা) বললেন, হাঁ। অতঃপর আবদুর রহমান (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কি এ ব্যাপারে বলেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। এখানে গভীরভাবে বিষয়টি চিন্তা করা উচিত যে, একদিকে অকাট্য প্রমাণিত হাদীসের সাধারণ বিধান, অপরপক্ষে এ হাদীস ظنى -এর দ্বারা বিশেষ অনুমতি কিভাবে সমান হতে পারে ? এ হাদীস সনদ ও রিওয়ায়েতের দিক থেকে প্রথম হাদীস থেকে দুর্বল, সুতরাং এটা কিভাবে পূর্ববর্তী হাদীসের প্রতিপক্ষ হতে পারে ? যদি কিছু সময়ের জন্য এটা মেনে নেয়া হয়, তাহলে এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, সন্দেহের সময় হারামকে হালালের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। অতঃপর এটা বলা যায় যে, এ বিধান ইসলামের প্রারম্ভে ছিল এবং অকাট্য প্রমাণিত হাদীস দ্বারা তা রহিত করা হয়ে গিয়েছে। মোট কথা এ হাদীস স্বীয় স্থানে অটল এবং খন্ডন করার যোগ্য নয়। খেকশিয়ালকে ইমাম শাফিঈ (র) গন্ডারের উপর কিয়াস করে এর বিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ اكْلِ كُلِّ ذِيْ مَخْلَبٍ

প্রত্যেক থাবা বা নখ দ্বারা আক্রমণকারী পশু খাওয়া হারাম

٣٩٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِيْ مُخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ *

হাদীস নং- ৩৯৫

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা) খায়বরের যুদ্ধের দিন থাবা বা নখ দ্বারা শিকারকারী কোন পাখি খেতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ বায, শাহীন, শকুন, চিল প্রভৃতি নখ দ্বারা শিকারকারী পাখি। এগুলো এ হাদীস দ্বারা হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ اكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ

গৃহপালিত গাধা খাওয়া থেকে নিষেধাজ্ঞা

٣٩٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ *

হাদীস নং- ৩৯৬

অনুবাদ ঃ হযরত বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস প্রায় চৌদ্দজন সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত আছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ হাদীস বর্ণিত আছে। তাই এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। ইব্ন আবদুল বার (র) তামহীদ গ্রন্থে বলেন, গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম, এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। অবশ্য হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা গাধার গোশত খাওয়াকে তেমন কোন দোষ মনে করেননি। কিন্তু তাঁদের পক্ষ থেকেও সহীহ রিওয়ায়েত অনুযায়ী এর গোশত খাওয়া হারাম। সমস্ত উলামায়ে কিরামের এটাই হলো মাযহাব।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ

যমীনের কীট-পতঙ্গ খাওয়া নিষিদ্ধ

٣٩٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَيْنَا عَنْ خِشَاشِ الاَرْضِ *

হাদীস নং- ৩৯৭

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, আমাদেরকে যমীনের কীট-পতঙ্গ খাওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ কীট-পতঙ্গের হারাম হওয়ার কারণ এগুলোর অপবিত্রতা। আবূ দাউদের এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যা তিনি حشرات الارض বা জমির পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গ সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সা)-এর সামনে যখন ইঁদুর ও এ জাতীয় কীট-পতঙ্গের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তিনি বলেন ঃ এগুলো অপবিত্র বস্তুসমূহের একটি অপবিত্র বস্তু। সুতরাং এটা বুঝা যায় যে, ইঁদুর অথবা এগুলোর মত অন্যান্য কীট-পতঙ্গের হারাম হওয়া এগুলোর অপবিত্রতা ও পূতিগন্ধময়তার উপর নির্ভর করে। এ কারণেই যমীনের সমস্ত কীট-পতঙ্গ হারাম। তাই আয়াতে করীমা وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (তাদের উপর অনিষ্টকর ও দূষিত বস্তু হারাম করা হয়েছে)– এর তাফসীরে এটাই বলা হয়েছে।

٣٩٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ ضِفْدِعًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُحْرِمًا كَانَ اَوْحَلاَلاً *

হাদীস নং- ৩৯৮

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ব্যাঙ হত্যা করবে, তার উপর একটি বকরী সদকা দেয়া ওয়াজিব। ঐ ব্যক্তি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় হোক অথবা হালাল অবস্থায় হোক।

ব্যাখ্যা ঃ আবূ দাউদ তায়ালিসী স্বীয় মুসনাদে, আবূ দাউদ স্বীয় মুসনাদে, এমনিভাবে নাসাঈ ও হাকিম আবদুর রহমান ইব্ন উসমান (রা)-এর সূত্রে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন যে, একজন চিকিৎসক ঔষধের মধ্যে ব্যাঙ ব্যবহারের ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে ব্যাঙ নিধন করা থেকে নিষেধ করেন। ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, ব্যাঙ সম্পর্কে আরো শক্তিশালী হাদীস রয়েছে। সুতরাং হাফিয মুনযিরী দলীল হিসেবে এর উপর আলোচনা করে বলেছেন, নবী করীম (সা) এটা হত্যা বা নিধন করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং জীবজন্তু হত্যা করা থেকে নিষেধ করা হয়ত এটা হারাম হওয়ার কারণে হতে পারে। যেমন মানুষের ব্যাপারে। অথবা এ কারণে যে, এর গোশত হারাম। অধিকন্তু প্রথম কারণ অর্থাৎ হারাম হওয়ার বিষয়টি এখানে বিদ্যমান নেই, কাজেই দ্বিতীয় কারণ এখানে স্থীর হয়েছে যে, যেহেতু এটা খাওয়া হারাম, তাই এটা হত্যা ও নিধন করাও নিষিদ্ধ। এ কারণেই এটা নিধনকারীর উপর বকরী সদকা ওয়াজিব হয়েছে, যাতে মানুষ এ কাজ থেকে বিরত থাকে।

بَابُ حُكْمِ اكْلِ الضَّبِّ

গুইসাপ খাওয়ার বিধান

٣٩٩ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهُ اُهْدِىَ لَهَا ضَبٌّ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهَا مِنْ اَكْلِهِ فَجَاءَ سَائِلٌ فَاَمَرْتُ لَهُ بِهِ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَطْعَمِيْنَ مَالاَ تَأْكُلِيْنَ *

হাদীস নং- ৩৯৯

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, কোন এক ব্যক্তি হাদিয়া হিসেবে তাঁর নিকট গুইসাপ প্রেরণ করে। তিনি বলেন, আমি এটা খাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করি। তিনি এটা খেতে নিষেধ করেন। এরপর একজন ভিক্ষুক আগমণ করে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি এ গুইসাপ তাকে দেয়ার নির্দেশ দান করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যা তোমরা নিজেরা খাও না, তা অপরকে কেন খাওয়াতে চাও ?

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে গুইসাপ খাওয়ার ব্যাপারে যে বিধান রয়েছে, এ বিষয়ে ইমাম আবূ

হানীফা (রা), ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালিক (র)-এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আযম একে মাকরূহ বলেছেন এবং অন্যান্য ইমামগণ এটা হালাল বলেছেন।

ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালিক (র) বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে আমার খালা মায়মূনার নিকট গমন করি। তাঁর নিকট একটি ভুনাকরা গুইসাপ দেখে আঁ হযরত (সা) এর দিকে পবিত্র হাত বাড়ালেন। এ সময় একজন মহিলা বললেন, আপনার সামনে এটা কি পেশ করা হয়েছে, তা তো আপনাকে বলা প্রয়োজন। এটা হলো গুইসাপ। তখন আঁ হযরত (সা) স্বীয় হাত গুটিয়ে নিলেন। হযরত খালিদ (রা) জিজ্ঞাসা করেন, এটা কি হারাম ? তিনি বললেন ঃ না, তবে এটা যেহেতু আমাদের এখানে নেই, তাই আমি এটাকে মাকরূহ জানি। হযরত খালিদ (রা) বললেন, এরপর আমি খেতে থাকি এবং তিনি তা প্রত্যক্ষ করছিলেন কিন্তু আমাকে নিষেধও করেন নি।

ইমাম আবূ হানীফা (রা)-এর মাযহাবের স্বপক্ষে সহীহ সনদ সম্বলিত হাদীসসমূহ দলীল পেশ করেছেন। প্রথমত বর্ণিত হাদীস, যাতে নবী করীম (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে গুইসাপ খাওয়া থেকে বাধা প্রদান করেছেন। এরদ্বারা সম্পূর্ণরূপে হারাম না হলেও কমপক্ষে মাকরূহ তো অবশ্যই হবে।

দ্বিতীয়ত আবূ দাউদে হযরত আবদুর রহমান ইব্ন শাযীদ (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ نَهى عَنْ اَكْلِ لَحْمِ الضَّبِ [নবী করীম (সা) গুইসাপের গোশত খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন]। এ হাদীস দূর্বল প্রমাণ করার জন্য প্রতিপক্ষ অনেক সমালোচনা করেছেন এবং স্বয়ং নিজের কলম দ্বারা স্বীয় বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। কেননা এর সনদে প্রতিপক্ষ যমযম ইব্ন যুরআ (র) রিওয়ায়েত করেছেন। তাই এদেরকে সমালোচনার জন্য চিহ্নিত করেছেন। ইমাম বায়হাকী (রা) যদিও ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ تَفَرَّدَبِهِ اِسْمَعِيْلُ بْنِ عَيَّاشٍ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ (ইসমাঈল এর সনদে তিনি একক হওয়ার কারণে দলীল হওয়ার যোগ্য নয়)। কেউ কি তাদেরকে এটা স্মরণ করিয়ে দেয়নি যে, হযরত! আপনি তো নিজেই স্বীয় সুনানে অধ্যায়ে "تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِنَ الدَّمِ" বলে এসেছেন যে, ইসমাঈলের রিওয়ায়েত শামীদের থেকে সহীহ এবং যমযম (র) নিঃসন্দেহে শামী। এ ছাড়া অন্যান্য সমীক্ষকগণ, যেমন ইমাম বুখারী ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন (র)-ও ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইসমাঈলের রিওয়ায়েত শামীদের থেকে সহীহ। সুতরাং ইমাম আবূ দাউদ এ হাদীসের উপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন যা এর সহীহ বা হাসান হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। সুতরাং এর বিরুদ্ধে উক্তি করা হঠকারিতা ও অনর্থক ধরে নেয়া যায়।

তৃতীয়ত ঐ হাদীস যা ইমাম আহমদ, বাযযার, তিবরানী ও অন্যান্যগণ আবদুর রহমান ইব্ন হাসানার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমরা আঁ হযরত (সা)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমরা এমন যায়গায় গিয়ে অবস্থান করলাম যেখানে প্রচুর গুইসাপ ছিল। আমরা একটি শিকার করে যবেহ করি এবং রান্নার জন্য ডেকচীর মধ্যে রাখার পর তা টগবগ করছিল। এ সময় নবী করীম (সা) সেখানে আগমণ করেন এবং তিনি এটা দেখে বললেন ঃ বনী ইসরাঈলের একটি দল যমীনের

কীট-পতঙ্গের আকৃতিতে রূপান্তর হয়ে যায়। আমার ভয় হচ্ছে যে, উক্ত ঘটনার পূনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে। হুযূর (সা)-এর শুধু ভয় ও আশংকাই কোন বস্তুর হারাম বা মাকরূহ হওয়াকে প্রমাণ করে। সুতরাং এ হাদীস গুইসাপের কমপক্ষে মাকরূহ হওয়ার জন্য সুস্পষ্ট দলীল।

চতুর্থত মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে গুইসাপ হাযির করা হয়, তিনি এটা খাওয়ার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ আমি জানি না যে, হয়ত এ সমস্ত লোক আকৃতি পরিবর্তিত দলের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়। এ সমস্ত হাদীস হলো বিশেষ করে গুইসাপ মাকরূহ হওয়ার দলীল। এ ছাড়াও হযরত নাফে এবং হযরত ইব্ন উমর (রা) সূত্রে হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসেও যমীনের কীট-পতঙ্গ হারাম হওয়া প্রমাণ করে এবং গুইসাপ খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কেননা এটাও যমীনের কীট-পতঙ্গের মধ্যে গণ্য হওয়ায় ঐ বিধানের অন্তর্ভুক্ত এবং নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিও এর উপর আবর্তিত হবে।

ইমাম নববী (র) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন ঃ

وَاَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى اَنَّ الضَّبَّ حَلاَلٌ لَيْسَ بِمَكْرُوْهٍ اِلاَّ مَاحُكِىَ عَنْ اَصْحَابِ اَبِى حَنِيْفَةَ مِنْ كَرَاهَتِهِ وَاِلاَّ مَا حَكَاهُ الْقَاضِىْ عِيَاضُ عَنْ قَوْمٍ اَنَّهُمْ قَالُوْا هُوَ حَرَامٌ وَمَا اَظُنُّهُ يَصِحُّ عَنْ اَحَدٍ وَاِنْ صَحَّ عَنْ اَحَدٍ فَمَحْجُوْجٌ بِالنُّصُوْصِ وَاِجْمَاعِ مَنْ قَبْلِهِ ـ

"মুসলমানগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, গুইসাপ খাওয়া হালাল, মাকরূহ নয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ছাত্রদের থেকে এর বিপরীত অর্থাৎ মাকরূহ বলে বর্ণনা রয়েছে। কাযী আয়ায কোন কোন দল থেকে এর হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আমার (ব্যাখ্যাকারের) মতে, কারো থেকেই সহীহ পদ্ধতিতে প্রমাণিত নয়। যদিও প্রমাণিত হয়, তবুও সহীহ রিওয়ায়েত হলো এর বিপরীত দলীল এবং পূর্বের ঐকমত্যও এর বিপরীত। "এখানে ইমাম নববী (র) থেকে পদস্খলন হয়ে গেছে।"

মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, দিমায়রী বলেছেন, গুইসাপ হালাল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে, এ ভুল বর্ণনার জন্য আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অথচ তিরমিযী সুস্পষ্টভাবে বলেছে ঃ

وَقَدْ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِى اَكْلِ الضَّبِّ فَرَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرُهُمْ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ ـ

"উলামায়ে কিরাম গুইসাপ খাওয়ার ব্যাপারে অনৈক্য প্রকাশ করেছেন। নবী করীম (সা)-এর সাহাবাগণের মধ্যে কোন কোন আহলে ইলম এতে অনুমতি প্রদান করেছেন। আবার কেউ কেউ মাকরূহ বলেছেন।"

তা হলে কি ইমাম নববী এবং দিমায়রী ইজমার দাবি করার সময় ইমাম তিরমিযী (র)-এর বর্ণনা প্রত্যক্ষ করেননি এবং হানাফী মাযহাবের প্রমাণে উল্লেখিত রিওয়ায়েত তাদের ইল্মের

বহির্ভূত ছিল। এ সমস্ত ছিল বিভিন্ন রিওয়ায়েতের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা। কিয়াসের দৃষ্টিকোণ থেকেও কয়েকটি কারণে এটা মাকরূহ প্রমাণিত হয়।

প্রথমত, এখানে দলীলের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং দলীলের মধ্যে বিরোধ বা অনৈক্য মাকরূহ হওয়ার প্রমাণই কিয়াসের দৃষ্টিতে অধিক।

দ্বিতীয়, উসূলের সর্বজন স্বীকৃত বিধান হলো এই যে, হারাম ও হালালের রিওয়ায়েত যখন এক জায়গায় একত্র হয়, তখন হারামই অগ্রগণ্য হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, সতর্কতার মূল উদ্দেশ্য এই যে, হারাম হওয়াকে বিবেচনা করা। কেননা যদি হালালও হয় এবং খাওয়া না হয়, তা হলে কোন পাপ নেই। কিন্তু যদি হারাম হয় এবং খাওয়া হয়, তা হলে মারাত্মক পাপী হতে হবে।

بَابُ صَيْدِ الْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা শিকার করা

٤٠٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (رض) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَبْعَثُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَنَأْكُلُ مِمَّا اَسْكَنَ عَلَيْنَا فَقَالَ اِذَا ذَكَرْتَ اِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا مَالَمْ يَشْرِكْهَا كَلْبٌ غَيْرُهَا قُلْتُ وَاِنْ قَتَلَ قَالَ وَاِنْ قَتَلَ قُلْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدُنَا يَرْمِى بِالْمِعْرَاضِ - قَالَ اِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَرَقَ فَكُلْ وَاِنْ اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَاتَأْكُلْ *

হাদীস নং- ৪০০

অনুবাদ ঃ হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে দিয়ে থাকি, সুতরাং ঐ কুকুর আমাদের জন্য যে শিকার নিয়ে আসে, তা কি আমরা খেতে পারি ? তখন তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা কুকুর প্রেরণের সময় বিসমিল্লাহ বল এবং প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোন কুকুর ঐ কুকুরের সাথে না থাকে (তাহলে খেতে পার)। আমি বললাম, যদি ঐ শিকার মরে যায় ? তিনি বললেন ঃ যদিও মরে যায়। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে কেউ ফলা ব্যতীত তীর শিকারের উপর ছেড়ে থাকে (এর বিধান কি) ? তিনি বললেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহ্র নামে তীর ছাড়বে এবং ঐ তীর শিকারের উপর আঘাত করে ভিতরে প্রবেশ করে ফেঁড়ে ফেলে, তাহলে সেটা খেতে পার। যদি তীরের পার্শ্বের আঘাতে শিকার মরে, তা খাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর হলো ঐ কুকুর যাকে রীতিমত শিকারের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যদি এর মালিক এটাকে শিকারের জন্য প্রেরণ করে, তা হলে এটা দৌড়িয়ে যায় আবার যদি

হঠাৎ বাঁধা দান করে, তাহলে থেমে যায়। যখন শিকার ধরে, তখন মালিকের জন্য জমা রাখে। এর গোশ্‌ত, চামড়া বা দেহের কোন অংশ স্পর্শ করে না বা খায় না। যদি তিনবার এরূপ পরীক্ষা করা হয়, তাহলে এটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বলে গণ্য হবে। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এ কুকুরের বিধান জারী করা হবে। এ বিষয়ে বিধানের মূল উৎস হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ -

"এবং আক্রমণকারী জন্তুর মধ্যে তোমরা যে কুকুরকে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দান কর, ঐ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর যা তোমাদের জন্য শিকার করে আনয়ন করে, তা তোমরা খাও এবং এর উপর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ কর।" (৫ ঃ ৪)

٤٠١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلْ *

হাদীস নং- ৪০১

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ যে মাছ পানি ছেড়ে দেয়, তা খেতে পার বা খাও।

ব্যাখ্যা ঃ যে মাছ মরার পর পানির উপর ভেসে উঠে, তা ছাড়া সমস্ত মাছ হালাল। তিরমিযী শরীফে হযরত জাবির (রা) থেকে মরফূ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

مَا اصْطَدْتُّمُوْهُ وَهُوَ حَىٌّ فَكُلُوْهُ وَمَا وَجَدْتُّمُوْهُ مَيْتًا طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُوْهُ -

"যে মাছ তোমরা জীবিত শিকার কর, তা তোমরা খাও এবং যে মৃত মাছ তোমরা পানির উপর ভাসমান অবস্থায় পাও, তা খাবে না।"

بَابُ التَّخْيِيْرِ فِىْ اَكْلِ الْجَرَادِ

টিড্ডি বা ফড়িং খাওয়ার ব্যাপারে অধিকার দেয়া হয়েছে

٤٠٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرُ جُنْدِ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ الْجَرَادُ لَا اَكْلُهُ وَلَا اُحَرِّمُهُ *

হাদীস নং- ৪০২

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা বিনতে আজরদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ভূপৃষ্ঠের

উপর আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় বাহিনী হলো টিড্ডি বা ফড়িং। আমি তা নিজে খাই না এবং তা হারামও করি না।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম নববী (র) বলেন, টিড্ডি হালাল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। ইবনুল আরাবী স্পেনের টিড্ডি এ বিধান থেকে পৃথক করেছেন। কেননা এগুলো শুধু অনিষ্টকর। ইমাম মালিক (র)-এর মতে যদি টিড্ডির মাথা পৃথক করা যায়, তাহলে তা হালাল হবে, নতুবা হালাল হবে না।

٤٠٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبَايَةِ بنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنْ بَعِيْرًا مِنْ ابِلِ الصَّدْقَةِ نَدَّ فَطَلَبُوْهُ فَلَمَّا اَعْيَاهُمْ اَنْ يَأْخُذُوْهُ رَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَاَصَابَ فَقَتَلَهُ فَسْأَلُوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَ بِاَكْلِه ـ وَقَالَ اِنَّ لَهَا اَوْ اَبَدَاكَاوَابْدَ الْوُحُوْشِ فَاِذَا خَشِيْتُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا مِثْلَ مَاصَنَعْتُمْ بِهٰذَا الْبَعِيْرِ ثُمَّ كُلُوْهُ ـ

وَفِى رِوَايَةٍ اِنْ بَعِيْرًا مِنْ ابِلِ الصَّدَقَةِ نَدَّ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَكْلِه فَقَالَ كُلُوْهُ فَاِنَّ لَهَا اَوَابِدَ كَاوَابِدَ الْوَحْشِ *

হাদীস নং- ৪০৩

অনুবাদ ঃ হযরত রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, সদকার উটের মধ্য থেকে একটি উট পালিয়ে যায়। তখন এটা ধরার জন্য চেষ্টা চলল। যখন চেষ্টা করেও ধরা গেল না, তখন এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে। এটা উটের গায়ে লাগে এবং উটটিকে হত্যা করে। অতঃপর তারা হযরত (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করে (এ উট খাওয়া যাবে কিনা)। তিনি এটা খাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন ঃ এ উটও বন্য পশুর মত ভয় পেয়েছিল। সুতরাং যখন তোমরা এটা সম্পর্কে ভয় কর, তখন তোমরা এরূপ করো যেরূপ তোমরা ঐ উটের সাথে করেছ। অতঃপর এটা খাও।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, সদকার উটের মধ্যে একটি উট ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। তখন এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে এটাকে মেরে ফেলে। নবী করীম (সা)-এর নিকট এটা খাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন ঃ এটা খাও। কেননা এটাও বন্য প্রাণীর মত হিংস্র হতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ ভড়কে যাওয়া উটকে বন্য প্রাণী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং এমতাবস্থায় এটা খাওয়া জায়েয করেছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ

পশুকে নিশানা বানিয়ে এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ

٤٠٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ الْمُجَثَّمَةِ *

হাদীস নং- ৪০৪

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন জন্তুকে নিশানা বানিয়ে এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ مجثمه হলো ঐ জন্তু যা সামনে বেঁধে তীর নিক্ষেপের জন্য লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা হয়। এরূপ করার জন্য যদি তা মরে যায়, তা হলে এটা খাওয়া হারাম। বুখারী শরীফে হিশাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস (রা)-এর সাথে হিকাম ইব্ন আইউবের নিকট গমন করি। হযরত আনাস (রা) কয়েকজন যুবককে দেখতে পেলেন যে, একটি জীবিত মুরগীকে সামনে রেখে এটাকে লক্ষ্যবস্তু স্থির করে খেলা করছে। হযরত আনাস (রা) বললেন, নবী করীম (সা) চতুষ্পদ জীবিত জন্তুকে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। মুসলিম শরীফে যবেহ অধ্যায়ে এবং আবূ দাউদে আযাহী অধ্যায়ে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মোট কথা প্রায় একই বিষয়ে অন্যান্য হাদীসের কিতাবেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْمَرْوَةِ

পাথর দ্বারা যবেহ করা জায়েয

٤٠٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ غَنِيْمَةً كَانَتْ لَهَا رَاعِيَةٌ فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِّنْهَا الْمَوْتَ فَذَبَحَتْهَا بِمَرْوَةٍ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَكْلِهَا *

হাদীস নং- ৪০৫

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা) একবার নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এক মহিলা বক্‌রী চরাত। সে একটি বকরীর মৃত্যুর আশংকা করে এটাকে ধারাল পাথর দ্বারা যবেহ করে নেয় (এটা খাওয়ার ব্যাপারে কি বিধান)। তিনি এটা খাওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দান করেন।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম মালিক (র) এ হাদীস মুয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থে বাক্যের কিছু পরিবর্তনসহ এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসে দুটি মাসয়ালা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমটি হলো, নারীদের যবেহ করা জায়েয। দ্বিতীয়টি হলো, যে কোন ধারাল বস্তু, যার দ্বারা শরীরের অংশ কেটে রক্ত প্রবাহিত হয়, এরদ্বারা যবেহ করা জায়েয। যেমন পাথর, লাকড়ী ইত্যাদি। কেননা ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ শু'বা (র)-এর সূত্রে হযরত আদী ইব্ন হাতীমের সূত্রে বর্ণনা করেন। এর সারাংশ হলো এই যে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! একটু বলে দিন যে, যদি আমাদের মধ্যে কেউ শিকার পেলেন কিন্তু তার নিকট ছুরি না থাকে, তাহলে কি পাথর অথবা লাঠির টুকরা দ্বারা যবেহ করতে পারবে ? তিনি বললেন ঃ যে কোন বস্তু দ্বারা হোক, রক্ত প্রবাহিত কর এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর।

٤٠٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجَ غُلَامٌ مِنَ الاَنْصَارِ قِبَلَ اُحُدٍ فَمَرَّ فِى طَرِيْقَتِهِ فَاصْطَادَ اَرْبًا فَلَمْ يَجِدْ مَا يَذْبَحُهَا فَذَبَحَهَا بِحَجَرٍ فَجَاءَ بِهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلَّقَهَا بِيَدِهِ فَاَمَرَهُ بِاَكْلِهَا ـ

وَفِى رِوَايَةٍ اَنَّ رَجُلاً اَصَابَ اَرْنَبَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ يَعْنِى الْحَجَرَ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَكْلِهَا ـ

وَفِى رِوَايَةٍ اَصَابَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلَمَةَ اَرْنَبًا بِاُحُدٍ فَلَمْ يَجِدْ سِكِّيْنًا فَذَبَحَهَا بِحَجَرٍ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَكْلِهَا *

হাদীস নং- ৪০৬

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আনসারের একটি বালক ওহুদের দিকে গমন করে। যাওয়ার পথে সে একটি খরগোশ শিকার করে কিন্তু যবেহ করার জন্য সে কিছুই পেল না। অবশেষে সে পাথর দ্বারা খরগোশটি যবেহ করল। অতঃপর হাতে লটকিয়ে এটা নিয়ে (এ ব্যাপারে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করার জন্য) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলো। তিনি এটা খাওয়ার জন্য নির্দেশ দান করেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, এক ব্যক্তি দু'টি খরগোশ শিকার করে এবং এগুলো পাথর দ্বারা যবেহ করে। তখন নবী করীম (সা) তাকে এগুলো খাওয়ার জন্য নির্দেশ দান করেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, বনী সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি ওহুদ পাহাড়ে একটি খরগোশ শিকার করেন। কিন্তু তিনি যবেহ করার কোন ছুরি না পেয়ে পাথর দ্বারা খরগোশটি যবেহ করেন। নবী করীম (সা) এটা খাওয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দান করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসও উল্লেখিত দুটি মাসয়ালার সাক্ষ্য বহন করে।

٤٠٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَ مِنْ ذَبِيْحَةِ اِمْرَأَةٍ وَنَهٰى عَنْ قَتْلِ اِمْرَأَةٍ *

হাদীস নং- ৪০৭

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলার যবেহকৃত (পশুর) গোশত আহার করেছেন এবং যুদ্ধের সময় নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর হাদীসের দ্বারা মহিলাদের যবেহকৃত জন্তুর গোশত হালাল প্রমাণিত হয়েছে এবং উল্লেখিত হাদীস দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়েছে।

بَابُ فِىْ فَضِيْلَةِ اَيَّامِ عَشْرِ الاَضْحٰى

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত

٤٠٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَحْفُوْلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَيَّامٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ اَيَّامِ عَشْرِ الاَضْحٰى فَاَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى *

হাদীস নং- ৪০৮

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র নিকট যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন থেকে উত্তম কোন দিন নেই। তাই উক্ত দিনসমূহে বেশি বেশি আল্লাহ্র যিকির কর।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের সম্মান, বরকত, ফযীলত ও আযমতের সুস্পষ্ট দলীল। যেহেতু এ দিনসমূহ বরকতময়, তাই এ দিনে আল্লাহ্র যিক্র, আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনসহ অনেক অনেক পূণ্য ও সওয়াবের কারণ। তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের চেয়ে বেশি কোন দিনের ইবাদত পসন্দনীয় নয়। এর প্রত্যেক দিনের রোযা সারা বছরের রোযার সমান এবং এর এক রাতের তাহাজ্জুদ লায়লাতুল কদরের কিয়ামের সমান মর্যাদা রাখে।

٤٠٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحّٰى بِكَبْشَيْنِ اَشْعَرَيْنَ اَمْلَحَيْنِ اَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْاٰخَرُ عَمَّنْ شَهِدَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِنْ اُمَّتِهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ نَحْوُهُ وَلَمْ يُذْكَرْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ *

হাদীস নং- ৪০৯

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) অধিক পশম বিশিষ্ট সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের দুটি ভেড়া কুরবানী করেছেন। একটি নিজের পক্ষ থেকে। অপরটি স্বীয় উম্মতের প্রতিটি কালেমা উচ্চারণকারী মানুষের পক্ষ থেকে।

এ হাদীসের অপর একটি সূত্র রয়েছে, যাতে হযরত জাবির (রা)-এর উল্লেখ নেই।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস সহীহ গ্রন্থসমূহে প্রায় সাতজন সাহাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে। হয়ত সামান্য একটু শব্দের পার্থক্য থাকতে পারে। বাকী বিষয় এক।

٤١٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ يَنَارٍ اَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَجْزِئُ عَنْكَ وَلاَ تَجْزِيْ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ *

হাদীস নং- ৪১০

অনুবাদ ঃ হযরত আবি বুরদা (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি ঈদের নামাযের পূর্বে একটি বকরী কুরবানী করেন। নবী করীম (সা)-এর নিকট তা উল্লেখ করা হয়। তিনি (হযরত আবি বুরদাকে উদ্দেশ্য করে) বলেন ঃ এ কুরবানী শুধু তোমার পক্ষ থেকে যথেষ্ট বা গ্রহণ করা হয়েছে। তোমার পর কারো পক্ষ থেকে যথেষ্ট বা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ ইব্ন মাজাহ ব্যতীত অবশিষ্ট সিহাহ গ্রন্থে এ হাদীস হযরত বারা' ইব্ন আযিব (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে এ বৈশিষ্ট্য হযরত আবি বুরদার দিকে করা হয়েছে। ইব্ন মাজাহ অপর এক সাহাবীকে এ ঘটনার মূল বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বায়হাকীর রিওয়ায়েত অনুয়ায়ী তিনি হলেন উকবা ইব্ন আমির (রা)। আবূ দাউদের রিওয়ায়েতের দৃষ্টিতে যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা)। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে চারজন সাহাবী এ বৈশিষ্ট্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার কেউ কেউ পাঁচজনের কথাও উল্লেখ করেছেন।

٤١١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ وَحَمَّادٍ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الاَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلَثَةِ اَيَّامٍ لِيُوْسِعَ مُوْسِعُكُمْ عَلَى فَقِيْرِكُمْ *

হাদীস নং- ৪১১

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত রেখে দেয়ার ব্যাপারে নিষেধ করেছি, যাতে তোমাদের ধনী ব্যক্তিগণ দরিদ্রদেরকে গোশত দান করতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ তিরমিযী শরীফের রিওয়ায়েতে "كُلُوْا مَاشِئْتُمْ" বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে। অর্থাৎ এখন যতদিন ইচ্ছা খাও, অপরকে খাওয়াও এবং রেখে দাও। এ ছাড়া হযরত আয়েশা (রা) থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে যে, তাঁর নিকট কেউ একজন কুরবানীর গোশত রেখে দেয়ার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন, নিষেধ নেই। কিন্তু ঐ সময় অবস্থা ছিল এই যে, কুরবানী করার মত লোক ছিল খুবই কম। তাই তিনি এটা পসন্দ করতেন যে, কুরবানীদানকারী যারা কুরবানী করে নি, তাদেরকেও খাওয়াবে। নতুবা আমরা এটা বৈধ রাখতাম, দশ দিন পর এটা খেতাম। মূলত আঁ হযরত (সা) যদি তিন দিনের বেশি গোশত রাখার অনুমতি প্রদান করতেন, তা হলে অনেক মিসকীন ও দরিদ্র লোক ভুখা থাকত এবং কুরবানী দানকারী দিনের পর দিন গোশত রেখে খেত। এখন যেহেতু ধনী ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মিসকীনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ,কাজেই তিন দিনের বাধ্য-বাধকতা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

بَابُ فَضِيْلَةِ الْخَلِّ

সিরকার ফযীলত

٤١٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقَرَّبَ اِلَيْهِ خُبْزًا وَخَلاً ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نِعْمَ الاِدَامُ الْخَلُّ *

হাদীস নং- ৪১২

অনুবাদ ঃ হযরত মুহারিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার হযরত জাবির (রা)-এর নিকট গমন করেন। তিনি রুটি ও সিরকা হযরত মুহারিবের সামনে হাযির করেন এবং বলেন, নবী করীম (সা) বলতেন ঃ সিরকা অত্যন্ত উত্তম তরকারি।

ব্যাখ্যা ঃ লৌকিকতা বা কৃত্রিমতা নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। ইব্ন আসাকির স্বীয় তারীখে হযরত সালমান (রা) মরফূ' রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, لاَتَكَلَّفُوْا لِلضَّيْفِ (মেহমানদের জন্য লৌকিকতা করোনা)। বায়হাকী শুআবুল ঈমানে এ হাদীস বর্ণনা করেন ঃ لاَيَتَكَلَّفَنَّ اَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَالاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ (কোন ব্যক্তি যেন তার ক্ষমতার বাইরে তার মেহমানের জন্য কোন লৌকিকতা না করে)। বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আমাদেরকে লৌকিকতা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। দায়লামী মুসনাদুল ফিরদাউস গ্রন্থে হযরত জাবির (রা) থেকে রিওয়ায়েত করেন যে, "আমি এবং আমার উম্মতের নেকবখত লোকজন লৌকিকতাকে অপসন্দ করে থাকি।"

٤١٣ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الاِدَامُ الْخَلُّ *

হাদীস নং- ৪১৩

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সিরকা কত উত্তম তরকারী !

ব্যাখ্যা ঃ সিরকার প্রশংসায় এমনিভাবে সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে কয়েকটি সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে। তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে হানী (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একবার হুযূর (সা) আমার নিকট আগমণ করেন এবং আমাকে বলেন ঃ তোমার নিকট কি কিছু আছে ? আমি আরয করলাম, হুযূর, শুকনা রুটি ও সিরকা আছে। তিনি বললেন ঃ যা আছে তাই নিয়ে এসো, যে ঘরে সিরকা আছে, ঐ ঘর তরকারি থেকে শূন্য নয়। মূলত সিরকা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খুব পসন্দনীয় ছিল।

٤١٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَافِرُ يَأْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِىْ مَعًى وَاحِدٍ *

হাদীস নং- ৪১৪

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কাফির সাত অন্ত্র দ্বারা আহার গ্রহণ করে এবং মু'মিন এক অন্ত্র দ্বারা আহার গ্রহণ করে।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মূল অর্থ হলো কাফির হিসাববিহীন প্রচুর পরিমাণে খায় এবং মুমিন অল্প আহারে তৃপ্তি লাভ করে।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاَكْلِ مُتَّكِئًا

ঠেস দিয়ে আহার করার নিষেধাজ্ঞা

٤١٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ الاَقْمَرِ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اَنَا فَلاَ اَكَل مُتَّكِئًا اكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَاَشْرُبُ كَمَا يَشْرَبُ الْعَبْدُ وَاَعْبُدُ رَبِّى حَتّٰى يَأْتِيَنِىْ الْيَقِيْنُ *

হাদীস নং- ৪১৫

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি ঠেস দিয়ে আহার করি না, বরং এরূপ বিনয়ের সাথে খেয়ে থাকি যেরূপ একজন গোলাম খেয়ে থাকে। এমনভাবে পান করি যেভাবে একজন গোলাম পান করে থাকে এবং আমি আমার প্রভুর ইবাদত করতে থাকব আমার মৃত্যু এসে যাওয়া পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা ঃ ঠেস দিয়ে পানাহারের মধ্যে অহংকার প্রকাশ পেয়ে থাকে, এটা হুযূর (সা)-এর খুব অপসন্দ ছিল। তাই তিনি ঠেস দিয়ে বসার পদ্ধতি গ্রহণ করেননি, বরং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বসে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিয়ামত আহার করতেন এবং আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ فِى انِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করা নিষিদ্ধ

٤١٦ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهَا نَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَشْرَبَ فِى انِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا وَاَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيْرَ وَالدِّيْبَاجَ قَالَ وَهِىَ لِلْمُشْرِكِيْنَ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الاُخْرٰى *

হাদীস নং- ৪১৬

অনুবাদ ঃ হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে স্বর্ণ-রৌপ্যের থালায় পানাহার এবং রেশমের বস্তু পরিধান করতে নিষেধ করেছেন এবং এটাও বলেছেন যে, এ সমস্ত দুনিয়াতে মুশরিকদের জন্য এবং পরকালে হবে তোমাদের জন্য।

ব্যাখ্যা ঃ হযূর (সা) দুনিয়ার এ সমস্ত চাকচিক্যময় ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে নিষেধ করার কারণও সাথে সাথে প্রকাশ করে দিয়েছেন। মুমিনদের জন্য এ সমস্ত পরকালে, তাই দুনিয়াতে তাদেরকে এ সমস্ত বস্তু থেকে হাত গুটিয়ে রাখতে হবে। যাতে এ বৈশিষ্ট্য পরকালের জন্য নির্ধারিত থাকে এবং মুশরিক যেহেতু সমস্ত স্বাদ ও মজা দুনিয়াতে ভোগ করে থাকে, তাই দুনিয়াতে এরদ্বারা ফায়দা লাভ করে। সুতরাং পরকালে তাদের কোন অংশ থাকবে না। فَمَالَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ "অতঃপর তাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই।"

٤١٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ نَزَلْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ عَلٰى دِهْقَانٍ بِالْمَدَائِنِ فَاَتٰى بِطَعَامٍ فَطَعِمْنَا ثُمَّ دَعَا حُذَيْفَةُ بِشَرَابٍ فَاَتٰى بِشَرَابٍ فِى اَنَاءِ فِضَّةٍ فَضَرَبَ بِهٖ وَجْهَهٗ فَسَاءَنَا مَاصَنَعَ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ لِمَا صَنَعْتُ بِهٖ هٰذَا فَقُلْنَا لَا فَقَالَ اِنِّىْ نَزَلْتُ عَلَيْهِ فِى الْعَامِ الْمَاضِىْ فَدَعَوْتُ بِشَرَابٍ فَاَتَانِىْ بِشَرَابٍ فِيْهِ فَاَخْبَرْتُهٗ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اَنْ نَاْكُلَ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ نَشْرَبَ فِيْهَا وَاَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيْرَ وَالدِّيْبَاجَ فَاِنَّهَا لِلْمُشْرِكِيْنَ فِى الدُّنْيَا وَهِىَ لَنَا فِى الْاٰخِرَةِ *

হাদীস নং- ৪১৭

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র) বলেন, আমরা হযরত হুযায়ফা (রা)-এর সাথে মাদায়েনে কোন এক গ্রামবাসীর কাছে হাযির হলাম। সে আমাদের জন্য খাবার আনল, আমরা আহার করলাম। এরপর হুযায়ফা (রা) পানি চাইলেন। তখন তারা রৌপ্যের পেয়ালায় পানি নিয়ে আসল। হযরত হুযায়ফা (রা) পানির পেয়ালা তার মুখের উপর নিক্ষেপ করলেন। তাঁর এ কাজ আমাদের অপসন্দ হলো। তিনি বললেন, তোমরা কি জান আমি এ গ্রামবাসীর সাথে কেন এরূপ করেছি ? আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, গত বছর আমি তাদের এখানে এসেছিলাম এবং আমি পানি চাইলে তারা আমাকে রৌপ্যের পেয়ালায় পানি সরবরাহ করে। আমি তাদেরকে বলেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে এবং রেশমের বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এ সমস্ত বস্তু দুনিয়াতে মুশরিকদের জন্য এবং আখিরাতে আমাদের জন্য।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত হুযায়ফা (রা)-এর মারাত্মক অসন্তুষ্টির কারণ ছিল গ্রামবাসীর সুন্নত বিরোধী কাজ। কেননা তিনি গ্রামবাসীকে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসও শুনিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও যখন সে এরূপ করেছে, তখন তাঁর ক্রোধের উদ্রেক হয়েছে। তিনি মেজবানের সাথে খারাপ ব্যবহার করেননি, বরং শরীয়ত বিরোধী কাজের জন্য কঠোর নিন্দা

করেছেন। হযরত হুযায়ফা (রা)-এর পক্ষ থেকে এটা রাসূলের সুন্নত অনুসরণের উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি এটা প্রত্যক্ষ করতেও সম্মত নন যে, কোন ব্যক্তির রাসূলের সুন্নত অবগত হওয়ার পর সে এর বিরুদ্ধে চলবে।

٤١٨ – حَمَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى قَالَ اِسْتَسْقٰى حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ مِنْ دَهْقَانٍ فَاَتَى بِشَرَابٍ فِى اِنَاءِ فِضَّةٍ فَاَخَذَ الاِنَاءَ فَضَرَبَ بِهِ وَجْهَهُ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ نَشْرَبَ فِى اَنِيَةِ فِضَّةٍ *

হাদীস নং- ৪১৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র) থেকে বর্ণিত, হযরত হুযায়ফা (রা) এক গ্রামবাসীর নিকট পানি চান। তখন সে রৌপ্যের পেয়ালায় পানি নিয়ে আসে। তিনি ঐ পেয়ালা তার মুখের উপর নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে রৌপ্যের পেয়ালায় পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে পূর্ববর্তী ঘটনার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

٤١٩ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقٰى دِهْقَانًا فَاَتَاهُ بِهِ فِى جَامٍ فِضَّةٍ فَرَمٰى بِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هِىَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ *

হাদীস নং- ৪১৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র) বলেন, আমি হযরত হুযায়ফা (রা)-এর সাথে মাদায়েনে সফর করছিলাম। তিনি এক গ্রামবাসীর নিকট পানি চাইলে সে রৌপ্যের পেয়ালায় পানি দেয়। তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ এটা তাদের (মুশরিকদের) জন্য দুনিয়াতে এবং তোমাদের জন্য আখিরাতে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে এটা আলোচনা করা হয়েছে।

٤٢٠ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ *

হাদীস নং- ৪২০

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) কদুর খোলস এবং সবুজ রং এর কলস থেকে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ "دُبَّاء" কদু বা লাউয়ের শুকনা খোলস দ্বারা তৈরি পাত্রকে বলা হয়। حَنْتَمْ সবুজ রং এর কলস। এ সমস্ত পাত্র মদ ও শরাব তৈরির কাজে ব্যবহার করা হতো। মদ হারাম হওয়ার সাথে সাথে হুযূর (সা) এ সমস্ত পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যাতে নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আকর্ষণ দূরীভূত হয়ে যায়।

٤٢١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَيْنَاكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَقَدْ اُذِنَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى زِيَارَةِ قَبْرِ اُمِّهِ فَزُوْرُوْهَا وَلاَ تَقُوْلُوْا هُجْرًا وَعَنْ لُحُوْمِ الاَضَاحِىِ اَنْ تُمْسِكُوْا فَوْقَ ثَلَثَةَ اَيَّامٍ وَاِنَّا نَهَيْنَاكُمْ لِيُوْسِعَ مَوْسِرَكُمْ عَلَى فَقِيْرِكُمْ - وَالاٰنَ قَدْ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَكُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا - وَعَنِ الشُّرْبِ فِى الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّةِ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ النَّقِيْرِ وَالدُّبَّاءِ فَاشْرَبُوْا فِىْ كُلِّ ظَرْفٍ شِئْتُمْ فَاِنَّ الظَّرْفَ لاَيُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ وَلاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا -

وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ اِنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ ثَلثٍ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَنَهَيْنَاكُمْ اَنْ تُمْسِكُوْا لُحُوْمَ الاَضَاحِىِّ فَوْقَ ثَلَثَةِ اَيَّامٍ فَاَمْسِكُوْهَا وَتَزَوَّدُوْهَا فَاِنَّمَا نَهَيْنَاكُمْ اَنْ تَشْرَبُوْا فِى الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّةِ فَاشْرَبُوْا فِيْمَا بَدَالَكُمْ فَاِنَّ الظَّرْفَ لاَيُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ وَلاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا -

وَفِى رِوَايَةٍ نَحْوَهُ وَفِيْهِ عَنِ النَّبِيْذِ فِى الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّةِ فَاشْرَبُوْا فِىْ كُلِّ ظَرْفٍ وَلاَتَشْرَبُوْا مُسْكِرًا *

হাদীস নং- ৪২১

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ আমরা তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করেছি, কিন্তু যখন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর সম্মানিত মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে, সুতরাং এবার তোমরা কবর যিয়ারত কর কিন্তু কদর্য ও অসৌজন্যমূলক কথা বল না। এবং (আমরা তোমাদেরকে) কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক জমা করে রাখতে নিষেধ করেছি। আর এ জন্য নিষেধ করেছি যাতে তোমাদের সম্পদশালী ব্যক্তিগণ তোমাদের দরিদ্রদেরকে গোশত দিয়ে তাদের মধ্যে গোশত খাওয়ার আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে। এখন যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সবাইকে প্রশস্ততা দিয়েছেন, তাই খাও এবং সংরক্ষণ কর এবং (আমরা তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম) হানতাম ও মুযাফফাত বা কদুর খোল থেকে তৈরি পাত্র দ্বারা পান করা থেকে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে নাকির ও দুব্বায় পান করা থেকে। সুতরাং এবার যে পাত্রে ইচ্ছা, পান কর। কেননা পাত্র বা থালা কোন বস্তুকে হালাল ও হারাম করে না। হাঁ, নেশা সৃষ্টি করে এরূপ দ্রব্য পান করো না।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, আমরা তোমাদেরকে তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেছি। প্রথম, কবর যিয়ারত থেকে, এখন থেকে যিয়ারত কর। দ্বিতীয়, আমরা তোমাদেরকে নিষেধ করেছি, কুরবানীর গোশত তিনদিনের চেয়ে বেশি জমা রাখার ব্যাপারে। এখন থেকে জমা রাখ এবং সংরক্ষণ কর। আমরা তোমাদেরকে নিষেধ করেছি, দুব্বা ও মুযাফফাতে পান করা থেকে। এখন থেকে যে পাত্রে ইচ্ছা, পান কর। কেননা পাত্র বস্তুকে না হালাল করতে পারে এবং না হারাম। তবে নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য পান করো না।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, আমরা নিষেধ করেছি তোমাদেরকে দুব্বা, হানতাম ও মুযাফফাতে নবীয তৈরি করা থেকে। এখন সমস্ত পাত্রে পান কর কিন্তু নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু পান কর না।

ব্যাখ্যাঃ মুযাফফাত (مزفت)রৌগন লাগান পাত্র, নাকির (نقير) কাঠ চিরে তৈরি করা পাত্র।

٤٢٢ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَحَمَّادٍ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِشْرَبُوْا فِى كُلِّ ظَرْفٍ فَاِنَّ الظَّرْفَ لَايُحِلُّ شَيْئًا وَلَايُحَرِّمُهُ *

হাদীস নং- ৪২২

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, তোমরা যে কোন পাত্রে পান কর। কেননা পাত্র কোন বস্তুকে না হালাল করতে পারে, না হারাম।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের বিষয়বস্তু নিয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

بَابُ شُرْبِ النَّبِيْذِ

নাবীয পান করা

٤٢٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَأْكُلُ طَعَامًا ثُمَّ دَعَا بِنَبِيْذٍ فَشَرِبَ فَقُلْتُ رَحِمَكَ اللّٰهُ تَشْرَبُ النَّبِيْذَ وَالاُمَّةُ تُتَدِىْ بِكَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ النَّبِيْذَ وَلَوْلاَ اَنِّى رَأَيْتُهُ يَشْرَبُ مَاشَرِبْتُهُ *

হাদীস নং- ৪২৩

অনুবাদ ঃ হযরত আলকামা (রা) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে দেখেছি, তিনি আহার করলেন এবং নাবীয (نبيذ) চেয়ে পান করলেন। আমি বললাম, আল্লাহ্ আপনার উপর রহমত করুন। আপনি নাবীয পান করেন এবং (নবীর) উম্মতগণ (শরীয়তের ব্যাপারে) আপনার অনুসরণ করে থাকে ? তখন হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নাবীয পান করতে দেখেছি। যদি আমি তাঁকে পান করতে না দেখতাম, তা হলে আমিও পান করতাম না।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে নাবীযের মাসয়ালা বর্ণনা করা হয়েছে অথবা নাবীযের প্রশংসা করা হয়েছে। নাবীয (نبيذ) হলো শুকনা আঙ্গুর অথবা খেজুর পানির মধ্যে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রেখে দেয়া, যাতে এর মিষ্টি ঐ পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে যায় এবং এতে খুব স্বাদ ও মজাদার শরবত তৈরি হয়। এটা যেরূপ খুব স্বাদযুক্ত হয়, তেমনি স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী হয়। নাকী-ও (نقيع) এ ধরনের একটি শরবতের নাম। কিন্তু এতে আঙ্গুর বা খেজুর পানির মধ্যে অল্প সময়ের জন্য রাখা হয়।

নাবীয হুযূর (সা) পান করেছেন। যেমন এ হাদীসে অথবা শামাইলে তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি এ পেয়ালা দ্বারা আঁ হযরত (সা)-কে পান করার সমস্ত বস্তু পান করিয়েছি। যেমন, নাবীয, মধু, দুধ। মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা একটি মশকে হুযূর (সা)-এর জন্য নাবীয তৈরি করেছি। মশকটি উপর দিক থেকে বন্ধ থাকত, এর নিচেও একটি মুখ থাকত। ভোরে এ পাত্রে খেজুর ঢেলে নাবীয তৈরি করেছি। এটা তিনি রাতে পান করতেন অথবা রাতে তৈরি করেছি যা তিনি ভোরে পান করতেন। সুতরাং সমস্ত উলামায়ে কিরামের মতে নাবীয জায়েয এবং হালাল। যদি এটা সামান্য গরম করা হয় এবং নেশার সীমানা পর্যন্ত না পৌছে, তা হলে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন মত ও বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এটা জায়েয বলে মত পোষণ করেছেন। শর্ত হলো এই যে, এটা হজমশক্তি ঠিক করার জন্য ব্যবহার করা হয়, আমোদ-ফুর্তির জন্য নয়। হানাফীদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালিক (র) এটা নাজায়েয মনে করেন। কিন্তু হানাফী মাযহাবেও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতের উপর ফতওয়া রয়েছে। ফকীহ্ আবুল লাইস বলেন, আমাদের আমল এর উপর। নাবীয যেভাবে আঙ্গুর ও খেজুর দ্বারা তৈরি হয়, তেমনি অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দ্বারাও তৈরি হয়। যেমন গম, বার্লি, ডুমুর, মধু ইত্যাদি।

٤٢٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمِسْعَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيْذِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ *

হাদীস নং- ৪২৪

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আঙ্গুর ও খেজুরের নাবীয এবং আধা পাকা ও পাকা খেজুর একত্রে মিলিয়ে নাবীয তৈরি করা থেকে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস সহীহ হাদীস গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবি কাতাদা ইব্ন রিবঈ থেকে রিওয়ায়েত আছে যে, আধা পাকা ও পাকা খেজুর দ্বারা এবং পাকা খেজুর ও আঙ্গুর দিয়ে নাবীয তৈরি করো না। তবে পৃথক পৃথকভাবে এগুলো দ্বারা নাবীয তৈরি কারা জায়েয কিন্তু একত্রে জমা করে তা জায়েয নয়। এ বিধি-নিষেধ এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, একত্রে জমা করে তৈরি করার ফলে এর একটি খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়ে এর মধ্যে মাদকতা সৃষ্টির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে এবং তা অন্য বস্তুর মধ্যে বিস্তার লাভ করতে পারে। কিন্তু অজ্ঞতার কারণে তখন হারাম বস্তু ব্যবহারের মধ্যে এসে যাবে। এজন্য এ পদ্ধতি নাজায়েয বলে স্থির করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, এ মাসয়ালার মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফের মতে এ মিশ্রিত নাবীযের মধ্যে যদি নেশা সৃষ্টি না হয়, তা হলে এটা ব্যবহার করা জায়েয। ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদের মতে নেশা সৃষ্টি হোক বা না হোক, হাদীসের বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা হারাম। হানাফীদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ উক্ত তিন আয়িম্মার সাথে একমত অর্থাৎ হারাম হওয়ার পক্ষেই তিনি মত প্রকাশ করেছেন। হারামের পক্ষে মতামত প্রদানকারীদের দলীল হলো বর্ণিত হাদীসসহ অন্যান্য হাদীস। হানাফীদের মতে এখানেও ফতওয়া হলো ইমাম মুহাম্মদের মতের উপর। ইমাম আবূ হানীফা (র) নিষেধাজ্ঞার হাদীসসমূহ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার উপর আরোপ করেন। যখন দরিদ্রতার কারণে মুসলমানদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমীরদের উপর একই সময় দুটি বস্তু ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল– যাতে দরিদ্রগণ দ্বিতীয়টি ব্যবহার করতে পারে এবং এটা যাতে না হতে পারে যে, কেউ দুটি ব্যবহার করবে আবার কেউ একটি থেকেও বঞ্চিত হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কয়েকটি বস্তুর ব্যাপারে এ বিধান জারী হয়েছিল। কারণ হিসেবে তারা এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে

থাকেন। ইমাম মুহাম্মদ 'কিতাবুল আসারে' উল্লেখ করেন, ইব্ন যিয়াদ বলেন, আমি হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট গমন করি। তখন তিনি আমাকে শরবত পান করালেন, যার প্রতিক্রিয়ায় আমার স্বীয় ঘরে পৌছা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, দ্বিতীয় দিন সকালে যখন আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করি, তখন আমি তাঁর নিকট ঘটনা খুলে বললাম। হযরত ইব্ন উমর (রা) বললেন, আমি তোমাকে শুধু খেজুর ও আঙ্গুরের নাবীয পান করিয়েছি। সুতরাং যদি এ মিশ্রণ হারাম হতো, তা হলে হযরত ইব্ন উমর (রা), যিনি রাসূলের সুন্নত পালনে খ্যাত ছিলেন, কিভাবে তিনি হারাম বস্তু পান করতেন অথবা অন্যকে পান করাতেন ? শায়খুল ইসলামের মাবসূতে ইবরাহীম নখঈ থেকেও এ ধরনের রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

٤٢٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ وَحَمَّادِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا *

হাদীস নং- ৪২৫

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করো না।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীস গ্রন্থসমূহে নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম হওয়ার ব্যাপারে অনেক বর্ণনা রয়েছে।

٤٢٦ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى عَوْنٍ مُحَمَّدِ الثَّقَفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّهُ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ *

হাদীস নং- ৪২৬

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শরাব বা মদ কম হোক বা বেশি হোক, হারাম করা হয়েছে। যে কোন শরাবে নেশা রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমদ ও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। মতপার্থক্যের বিষয় হলো এই যে, তিনজন আয়িম্মার মতে প্রত্যেক নেশাজাতীয় দ্রব্যকে خمر (শরাব বা মদ) বলা হয় এবং এর কম বা বেশি সমস্ত হারাম এবং এটা পানকারী যে কোন পরিমাণ হোক না কেন, শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। তাঁরা বলেন, خمر মুলত مخامرت থেকে উৎসারিত অর্থাৎ জ্ঞান বা বিবেক লুপ্তকারী। এখন যে কোন শরাব নেশার কারণে জ্ঞান লুপ্ত বা শূন্য করে দেয়, তাই খুমুরের (خمر) বিধানে পড়ে এবং কম হোক বা বেশি, তা হারাম। রিওয়ায়েতের দৃষ্টিতে তাঁরা মুসলিম শরীফে বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ

করে থাকেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (প্রত্যেকে নেশা জাতীয় বস্তু হারাম)। অথবা ঐ হাদীস, যেমন হুযূর (সা) বলেছেন ঃ اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ (খুমুর বা শরাব এ দু' গাছ থেকে তৈরি হয় এক আঙ্গুরের গাছ, অপরটি খেজুরের গাছ)। অর্থাৎ আঙ্গুরের সাথে খেজুরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, خمر শব্দের উৎস হলো تخمر যার অর্থ সবল ও শক্তি যা অন্য কোন বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায় না। তাই এটাকে ام الخبائث বা অপবিত্রতা ও দুষ্কর্মের মূল বলা হয়েছে। অভিধানের দৃষ্টিতে বা আরবের জনসাধারণের ভাষায় خمر আঙ্গুরের কাঁচা পানিকে বলা হয়, যখন এটা নেশায় পরিণত হয়। এ অর্থে এর হারাম হওয়া অকাট্য বা নিশ্চিত। পবিত্র কুরআনেও এর হারাম হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট আয়াতে বলা হয়েছে ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ الاٰيَةَ (হে বিশ্বাসীগণ ! নিশ্চয়ই শরাব জুয়া ও শর)। ..... (৫ ঃ ৯০) সুতরাং কুরআন ও হাদীস দ্বারা এর হারাম প্রমাণিত হয়েছে। বাকী অন্যান্য বস্তুর হারাম হওয়া অকাট্য বা নিশ্চিত নয়, বরং ظنى বা অনুমান বা কিয়াসনির্ভর। যেমন, গম, বার্লি ইত্যাদি দ্বারা তৈরি শরাব বা মদ। এগুলো সম্পর্কে خمر শব্দ ব্যতিরেকে অন্য বাক্য ব্যবহার হয়েছে। যেমন নাবীয, নাকী, সাকার (نبيذ - نقيع - سكر) ইত্যাদি। সুতরাং এগুলোর ঐ বিধান নয়, যা আঙ্গুরের তৈরি শরাবের জন্য রয়েছে যে, কম হোক বা বেশি হোক, হারাম এবং সামান্য পানকারীও শাস্তির যোগ্য। বরং অন্যান্য শরাব, যা সামান্য ব্যবহারে নেশা সৃষ্টি হয় না, তা হারাম নয়। হাঁ, যদি নেশা সৃষ্টি হওয়ার মত পান করে, তা হলে হারাম এবং পানকারীর উপর শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে। এমনিভাবে উভয়ের মধ্যে এ পার্থক্য রয়েছে যে, আঙ্গুরের শরাব হারাম হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকারকারী কাফির হবে কিন্তু অন্যান্য শরাবের হারাম হওয়া অস্বীকারকারী কাফির হবে না। কেননা এগুলোর প্রমাণ হলো অনুমান বা কিয়াসনির্ভর, অকাট্য নয়।

ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবের স্বপক্ষে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করা যায়, যাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, خَمَرٌ (আঙ্গুরের তৈরি শরাব) কম এবং বেশি যে কোন পরিমাণ সম্পূর্ণভাবে হারাম। অন্যান্য শরাবের হারাম হলো হালালের জন্য নেশাকে পৃথক করার সীমা অথবা পার্থক্য করার চিহ্ন হিসেবে স্থির করা হয়েছে এবং নেশার উদ্রেক করতে পারে এতটুকু পরিমাণ শরাব হারাম, এর চেয়ে কম পরিমাণে নয়। তবে আঙ্গুরের শরাবে এরূপ নয়। এর মধ্যে এক ফোঁটাও এরূপ হারাম যেরূপ পূর্ণ বোতল বা এর চেয়ে বেশি পরিমাণ।

ইমামত্রয়ের দলীল হিসেবে পেশকৃত হাদীসের (كل مسكر خمر) জওয়াব হলো এই যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন এর উপর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনটি হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত, এর প্রমাণ নেই। প্রথম لاَنِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ দ্বিতীয় مَنْ

مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ এবং তৃতীয় হলো كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন এরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি যে, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেছেন, যে হাদীস সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন অবগত নন, ঐ হাদীস মূলত হাদীস নয়। দ্বিতীয় হাদীসের জওয়াব হলো এই যে, আঁ হযরত (সা) خمر -এর মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেননি, বরং এর বিধান বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর এটা কাজ নয় যে, তিনি বাক্যের আভিধানিক বা মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করবেন। বরং এখানে হলো শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা। এবার প্রতিপক্ষ বর্ণিত হাদীসের السكر শব্দের সহীহ হওয়াকে অত্যন্ত কঠোরভাবে বাতিল করেন– যার উপর সম্পূর্ণ মাযহাবের ভিত্তি রয়েছে। এবং এটা বলেন যে, مسكر সহীহ, অথচ বিভিন্ন সূত্রে السكر শব্দটি বর্ণিত হয়েছে। তিবরানী বলেন, حَرَّمَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَالسُّكْرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ [আল্লাহ্ তাআলা মূল خمر (শরাব) হারাম করেছেন এবং প্রত্যেক শরাবের মধ্যে নেশাকে হারাম করেছেন]। বাযযার ও দারে কুতনী একইভাবে মরফূ ও মওকূফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ সিকাহ (ثقه) বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে এ হাদীস একই বাক্যে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ শব্দ স্বীয় স্থানে সহীহ।

অতঃপর প্রতিপক্ষ বলেন, হাদীসের সংযোগ ও বিচ্ছিন্ন এবং তুলে দেয়া ও অটল থাকার (وَصَلَ وَاَنْقَطَا) এবং (رَفَعَ وَقَفَ) মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে যা এ হাদীসের দুর্বলতার (ضعيف) দলীল। আমরা বলছি যে, এ মতপার্থক্য হাদীসের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা নয়। যেমন (رفع) অতিরিক্ত এবং বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (ثقه) হলে তার অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। এটাও প্রমাণিত হলো যে, মাসয়ালায় ইজতিহাদের অধিকার নেই, এর وقف মূলত رَفَعَ -এর বিধানে নিহীত। অথবা যেমন انقطاع হাদীসের সহীহ হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করে না, যখন বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (ثقه) হন। বরং এরূপ হাদীস মুরসালের (مرسل) বিধানে পড়ে। এ ব্যাপারে এখনো সহীহ ও সঠিক মীমাংসার প্রয়োজন।

بَابُ حُرْمَةُ اكْلِ ثَمَنِ الْخَمْرِ

শরাবের (মদের) মূল্য ভক্ষণ করা হারাম

٤٢٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ اَبِى عَامِرٍ الثَّقَفِيِّ اِنَّهُ كَانَ يُهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى كُلِّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ –

وَفِى رِوَايَةٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيْفٍ يُكَنَّى اَبَا عَامِرٍ كَانَ يُهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ فَاَهْدَى فِى الْعَامِ الَّذِى

حَرَمَتْ فِيْهِ الْخَمْرُو رَاوِيَةً كَمَا كَانَ يُهْدِىْ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا عَامِرٍ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِىْ خَمْرِكَ قَالَ خُذْهَا فَبِعْهَا فَاسْتَعِنْ بِثَمَنِهَا عَلٰى حَاجَتِكَ فَقَالَ يَا اَبَا عَامِرٍ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَبَيْعَهَا وَاَكْلَ ثَمَنِهَا *

হাদীস নং- ৪২৭

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন কায়স আল-হামদানী (র) থেকে বর্ণিত, আবূ আমির আস-সাকাফী প্রতি বছর নবী করীম (সা)-এর জন্য আঙ্গুরের এক মশক শরাব হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করতেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, সাকীফের এক ব্যক্তি যার উপনাম ছিল আবূ আমির, তিনি নবী করীম (সা)-কে প্রতি বছর আঙ্গুরের তৈরি এক মশক শরাব প্রেরণ করতেন। শরাব হারাম হওয়ার বছরও তিনি প্রথমত এক মশক শরাব প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হে আবূ আমির ! যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা শরাব হারাম করে দিয়েছেন, তাই এখন তোমার শরাবের আমার প্রয়োজন নেই। তখন তিনি বললেন, কোন অসুবিধা নেই, আপনি এটা নিয়ে নিন এবং এটা বিক্রি করে এর মূল্য দ্বারা আপনার প্রয়োজনীয় কাজ মিটাবেন। হুযূর (সা) বললেন ঃ হে আবূ আমির ! আল্লাহ তা'আলা শরাব পান করা, বিক্রি করা এবং এর মূল্য খাওয়া বা ভোগ করা সমস্ত কিছুই হারাম করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শরাব হারাম হওয়া সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ
পোশাক ও সৌন্দর্যের বর্ণনা

بَابُ ذِكْرِ قَلَنْسُوَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর টুপীর বর্ণনা

٤٢٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَنْسُوَةٌ شَامِيَةٌ –

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ كَانَ لِرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَنْسُوْةٌ بَيْضَاءُ شَامِيَةٌ *

হাদীস নং- ৪২৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর টুপী ছিল শামী।

অপর এক রিওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর টুপী ছিল সাদা রঙের শাম দেশীয়।

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে, হুযূর (সা)-এর টুপী সাদা ছিল। কোন রিওয়ায়েতে আছে, তিনি পাগড়ী ছাড়াও টুপী পরতেন, আবার পাগড়ীর সাথেও পরতেন এবং টুপী ছাড়াও পাগড়ী পরতেন। যুদ্ধের সময় তিনি কানওয়ালা টুপী পরতেন।

بَابُ السَّدْلِ
কাপড় ঝুলানোর বিবরণ

٤٢٩ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الاَقْمَرِ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ سَادِلٍ ثَوْبَهُ فَاعْطَفَهُ عَلَيْهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الاَقْمَرِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَطِعًا *

হাদীস নং- ৪২৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমন করছিলেন, যে কাপড় ঝুলিয়েছিল। তখন তিনি কাপড় তার কাঁধের উপর উল্টিয়ে দিলেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, আলী ইব্ন আকমার থেকে এ হাদীস মুনকাতি' (مُنْقَطِع)।

ব্যাখ্যা ঃ ভাঁজ করা ব্যতীত কাপড় ঝুলানো এবং ছড়িয়ে রাখা নিষেধ। তাই হুযূর (সা) লোকটির কাঁধের উপর কাপড় রেখে তা ভাঁজ করে দেন।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ لُبَسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ

রেশম ও রেশমী বস্ত্র পরিধানে নিষেধাজ্ঞা

٤٣٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَقَالَ اِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ مَنْ لاَخَلاَقَ لَه *

হাদীস নং- ৪৩০

অনুবাদ ঃ হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) রেশম এবং রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি এটাও বলেছেন ঃ এগুলো তারা পরিধান করে, যাদের (পরকালে) কোন অংশ নেই।

ব্যাখ্যা ঃ রেশম ও রেশমী বস্ত্রের হারাম হওয়া পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। কেননা তিবরানী তার মু'জাম নামক গ্রন্থে হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) কোথাও বের হলেন, তখন তাঁর এক হাতে রেশমের কাপড়ের এক টুকরা ছিল, অন্য হাতে স্বর্ণের টুকরা। তখন তিনি বললেন ঃ এ দুটো বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং মহিলাদের জন্য হালাল। অবশ্য চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশম পুরুষদের জন্য জায়েয। অন্য রিওয়ায়েতে আঁ হযরত (সা) থেকে এ পরিমাণের জন্য অনুমতি প্রমাণিত আছে।

بَابُ بَيَانِ التَّمَاثِيْلِ

ছবির বর্ণনা

٤٣١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِىٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ اَنَّهُ كَانَ عَلَّقَ فِىْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَاَبْطَأَ جِبْرِئِيْلُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ لَهُ مَا اَبْطَاكَ عَنِّى قَالَ اِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَتَمَاثِيْلُ فَابْسُطِ السِّتْرَ وَلاَ تُعَلِّقْهُ وَاقْطَعْ رُؤُسَ التَّمَاثِيْلِ وَاَخْرِجَ هٰذَا الْجَرْوَ *

হাদীস নং- ৪৩১

অনুবাদ ঃ আসিম ইব্ন হামযা (র) থেকে বর্ণিত, হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরের দরজায় এমন একটি পর্দা লটকালেন যার মধ্যে ছবি রয়েছে। ফলে হযরত জিবরাঈল (আ) আগমণে বিলম্ব করলেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) আগমণ করেন। আঁ হযরত (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার নিকট আসতে কেন বিলম্ব করলে? হযরত জিবরাঈল (আ) বললেন, ফিরিশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না সেখানে কুকুর অথবা ছবি রয়েছে। সুতরাং আপনি পর্দা খুলে তা বিছিয়ে নিন এবং এটা লটকাবেন না, ছবিগুলোর মাথা কেটে দিন এবং কুকুরের এ সিঁড়িটি বের করে দিন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে ছবির মাসয়ালা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এরদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রহমতের ফিরিশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে ছবি অথবা কুকুর থাকে। ছবির অনিষ্টতা সবাই অবগত। বর্তমান যুগে ইসলামী সমাজকে ধ্বংসকারী সবচেয়ে বড় বস্তু হলো ছবি। যা কতো বংশ ও গোষ্ঠীর চারিত্রিক অবস্থাও ধ্বংস করে দিয়েছে।

بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ

মেহেদী দ্বারা চুল খেযাব করা

٤٣٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْضِبُوْا شَعَرَكُمْ بِالْحِنَّاءِ خَالِفُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ *

হাদীস নং- ৪৩২

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা মেহেদী দ্বারা স্বীয় চুল রঙ্গিন কর এবং আহলে কিতাবের বিরোধিতা কর।

ব্যাখ্যা ঃ আহলে কিতাব খেযাব ব্যবহার করে না। তাই তাদের বিরোধিতা করার জন্য খেযাব ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়, তাদের বিরোধিতা করা মুস্তাহাব। এছাড়া অন্য হাদীসে মেহেদীর প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু এরূপ বলা হয়েছে যে, এটা সুগন্ধিযুক্ত, আবার কোথাও বলা হয়েছে যে, মেহেদী তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। মোট কথা খেযাব (মেহেদী) লাগান জায়েয যাতে চুল লাল হয়ে যায় অথবা লাল চুল কাল হয়। অবশ্য সম্পূর্ণ কাল করা জায়েয নয়।

بَابُ الْخِضَابِ بِالْكَتَمِ

কাতাম (নীল) দ্বারা খেযাব লাগানো

٤٣٣ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْكِنْدِىْ عَنْ اَبِى الاَسْوَدِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءَ وَالْكَتَمِ –

وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ اَحْسَنُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّعْرَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ –

وَفِى رِوَايَةٍ مِنْ اَحْسَنِ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءَ وَالْكَتَمَ *

হাদীস নং- ৪৩৩

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ তোমরা যে সমস্ত উত্তম বস্তু দ্বারা বার্ধক্যকে পরিবর্তন কর, তা হলো মেহেদী ও নীল।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, যে সমস্ত উত্তম বস্তু দ্বারা চুলের রং পরিবর্তন কর, তা হলো মেহেদী ও নীল।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, যে সমস্ত উত্তম বস্তু দ্বারা তোমরা বার্ধক্যকে পরিবর্তন কর, তা হলো মেহেদী ও কাতাম (নীল)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস মেহেদী ও নীলের খেযাবের বৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الاَخْذِ بِنَوَاحِى اللِّحْيَةِ

দাঁড়ির চতুষ্পার্শ্ব ও কিনারা (ছেঁটে) ঠিক করা

٤٣٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ اَنَّ اَبَا قُحَافَةَ اَتَى النَّبِىَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتُه قَدِ انْتَشَرَتْ قَالَ فَقَالَ لَوْ اَخَذْتُمْ وَاَشَارَ اِلٰى نَوَاحِىْ لِحْيَتِه *

হাদীস নং- ৪৩৪

অনুবাদ ঃ জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আবূ কুহাফা আগমণ করেন, এ সময় তাঁর দাঁড়ি বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো ছিল। তখন তিনি তাঁর দাঁড়ির কিনারার দিকে ইঙ্গিত করে তাঁকে বললেন ঃ যদি তুমি এগুলো কর্তন করতে এবং ঠিক করতে।

ব্যাখ্যা ঃ জংলীদের মত দাঁড়ি রাখা ঠিক নয় ; বরং এগুলো সঠিক করতে হবে। আবূ কুহাফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পিতা ছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন আঁ হযরত (সা)-এর খেদমতে আগমণ করেন। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) স্বীয় পবিত্র দাঁড়ি চওড়া ও লম্বাভাবে কর্তন করতেন।

٤٣٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ اُمِّ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ لاَ بَأْسَ اَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِالصُّوْفِ اِنَّمَا نَهٰى بِالشَّعْرِ وَفِى رِوَايَةٍ لاَ بَأْسَ بِالْوَصَلِ اِذَا لَمْ يَكُنْ شَعْرٌ بِالرَّأْسِ *

হাদীস নং- ৪৩৫

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহিলাদের চুলের মধ্যে পশম মিলানোর মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য চুলের সাথে চুল সংযোজন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, যদি মাথার উপর চুল না থাকে, তা হলে মিলানো জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা ঃ মহিলাদের চুলের সাথে চুল সংযোজন করা বুখারীর এক রিওয়ায়েতে হারাম বলা হয়েছে।

كِتَابِ الطِّبِّ وَفَضْلِ الْمَرَضِ وَالرُّقٰى وَالدَّعْوَاتِ

চিকিৎসা, পীড়ার বরকত, দম ও দু'আর বর্ণনা

٤٣٦ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَكْتُبُ

لِلاِنْسَانِ الدَّرَجَةَ الْعُلْيَا فِى الْجَنَّةِ وَلاَ يَكُوْنُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَبْلُغُهَا فَلاَ يَزَالُ يَبْتَلِيْهِ اللّٰهُ حَتّٰى يَبْلُغَهَا *

হাদীস নং- ৪৩৬

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এক বান্দার জন্য বেহেশতে উঁচু মর্যাদা নির্ধারণ করে দেন। কিন্তু ঐ মর্যাদায় পৌছার মত তার আমল নেই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সব সময়ের জন্যে রোগে আক্রান্ত করে রাখেন। ফলে ঐ ব্যক্তি ঐ মর্যাদায় পৌছে যায়।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম আহমদ মুহাম্মদ ইব্ন খালেদ আস-সুলামী থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার জন্য বেহেশতে উচ্চ মর্যাদা পূর্ব থেকে লিপিবদ্ধ করে থাকেন কিন্তু ঐ মর্যাদা পর্যন্ত সে নিজের আমল দ্বারা পৌছতে না পারে, তখন আল্লাহ্পাক তার জীবন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাকে পরীক্ষা করেন এবং তাকে ধৈর্য দান করেন। ফলে ঐ বান্দা তার জন্য লিপিবদ্ধকৃত মর্যাদায় পৌছে যায়। তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, মুমিন নারী-পুরুষ তাদের জীবন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা বিপদে পতিত হয়ে থাকে এবং ধৈর্য ধারণের ফলে সে আল্লাহ্র সাথে এমনিভাবে মিলিত হয় যে, তার কোন গুনাহ্ থাকে না।

٤٣٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ ابْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ وَهُوَ عَلٰى طَائِفَةٍ مِنَ الْخَيْرِ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لِمَلاَئِكَتِهِ اُكْتُبُوْا لِعَبْدِىْ مِثْلَ اَجْرِ مَاكَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ -

وَفِى رِوَايَةٍ مَعَ اَجْرِ الْبَلاَءِ -

وَفِى رِوَايَةٍ اُكْتُبُوا لِعَبْدِىْ مَاكَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ -

وَفِى رِوَايَةٍ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ وَعَلٰى عَمَلٍ مِنَ الطَّاعَةِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ لِحَفَظَتِهِ اُكْتُبُوا لِعَبْدِىْ اَجْرَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ *

হাদীস নং- ৪৩৭

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

যখন কোন এরূপ বান্দা অসুস্থ হয়, যে সুস্থ অবস্থায় উত্তম ও নেককাজ করে, তখন আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তা'আলা ফিরিশতাগণকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমার বান্দার জন্য ঐ আমলের সওয়াব লিপিবদ্ধ কর যে আমল সে সুস্থ অবস্থায় করতো।

অন্য এক রিওয়ায়েতে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, রোগের সওয়াবও (অর্থাৎ এর উপর ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সওয়াব)।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, আমার বান্দার জন্য ঐ আমল লিপিবদ্ধ কর, যা সে সুস্থ অবস্থায় করতো।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, যখন কোন ইবাদতকারী বান্দা অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা কিরামুন কাতেবীনকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমার বান্দার জন্য ঐ আমলের পূণ্য লিপিবদ্ধ কর, যা সে সুস্থ অবস্থায় করতো।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আহমদ ও বুখারী হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন যে, যখন কোন বান্দা অসুস্থ হয়, অথবা সফর করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য ঐ আমলের সওয়াব লিখে দেন, যা সে সুস্থ অবস্থায় অথবা দেশে বা বাড়ি থাকতে আমল করতো। তিবরানী আওসাত নামক গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন যে, যখন কোন বান্দা তিন দিন অসুস্থ অবস্থায় থাকে, তা হলে সে তার পাপ থেকে নবজাত শিশুর ন্যায় পবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং হাদীস দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের রোগ তার গুনাহর কাফফারা ও ক্ষমার উপায় হয়ে যায়।

٤٣٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمُقَاتِلٌ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ جَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى دَوَاءً فَاِذَا اَصَابَ الدَّاءَ دَوَاوُهُ بَرِئَ بِاِذْنِ اللّٰهِ *

হাদীস নং- ৪৩৮

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক রোগের ঔষধ তৈরি করেছেন। সুতরাং যখন রোগের সঠিক ঔষধ পাওয়া যায়, তখন আল্লাহ্র ফযলে মানুষ সুস্থ হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আহমদ ও মুসলিম হযরত জাবির (রা) থেকে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٣٩ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً اِلاَّ السَّامَ وَالْهَرَمَ فَعَلَيْكُمْ بِاَلْبَانِ الْبَقَرِ فَاِنَّهَا تُخْلَطُ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ *

হাদীস নং- ৪৩৯

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার কোন ঔষধ নেই– মৃত্যু এবং বার্ধক্য ব্যতীত (এ গুলোর কোন ঔষধ নেই)। তোমরা গাভীর দুধ অবশ্যই পান করবে। কেননা এতে সমস্ত গাছ ও তরুলতার অংশ বিদ্যমান রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ مَاأَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ প্রেরণ বা সৃষ্টি করেননি যার থেকে মুক্তির কোন ব্যবস্থা রাখেননি)। হাকিম আবূ সাঈদ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার চিকিৎসা বা শেফা নেই। যাকে ইচ্ছা, তিনি এর নির্দেশ প্রদান করেন এবং যাকে ইচ্ছা, এর থেকে অজ্ঞ রাখেন। এটা আল্লাহ তা'আলার একটি সীমাহীন ইনসাফের স্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি বান্দাকে এমন কোন রোগ দেননি যার থেকে মুক্তির উপকরণ ও ঔষধ সৃষ্টি করেননি। এরপর যাকে ইচ্ছা, এর জ্ঞান ও পরিচয় সম্পর্কে অবগত করেন এবং যাকে ইচ্ছা, অজ্ঞ রাখেন। এটা তাঁর বিচক্ষণতা যা তিনি সমস্ত বিশ্বে অব্যাহত রেখেছেন।

٤٤٠ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْزِلِ اللّٰهُ دَاءً اِلاَّوَاَنْزَلَ مَعَهُ الدَّوَاءَ اِلاَّ الْهَرْمَ فَعَلَيْكُمْ بِاَلْبَانِ الْبَقَرِ فَاِنَّهَا تَرُمُّ مِنَ الشَّجَرِ ـ

وَفِى رِوَايَةٍ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يَجْعَلْ فِى الاَرْضِ دَاءً اِلاَّ جَعَلَ لَهُ دَوَاءً اِلاَّ الْهَرْمَ وَالسَّامَ فَعَلَيْكُمْ بِاَلْبَانِ الْبَقَرِ فَاِنَّهَا تُخْلَطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ـ

وَفِى رِوَايَةٍ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ دَاءٍ اِلاَّ اَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً اِلاَّ السَّامَ وَالْهَرْمَ فَعَلَيْكُمْ بِاَلْبَانِ الْبَقَرِ فَاِنَّهَا تُخْلَطُ مِنَ الشَّجَرِ ـ

وَفِى رِوَايَةٍ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يَضَعْ فِى الاَرْضِ دَاءً اِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً اَوْدَوَاءً فَعَلَيْكُمْ بِاَلْبَانِ الْبَقَرِ فَاِنَّهَا تُخْلَطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَعَلَيْكُمْ بِاَلْبَانِ الْبَقَرِ فَاِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ شَجَرَةٍ وَفِيْهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ *

হাদীস নং- ৪৪০

অনুবাদ ঃ হযরত ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ প্রেরণ করেননি একমাত্র বার্ধক্য ব্যতীত, যার জন্য ঔষধ প্রেরণ

করেননি। তোমরা গাভীর দুধ পান কর, কেননা ঐ দুধে সমস্ত গাছপালার অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার কোন চিকিৎসা বা ঔষধ তৈরি করেন নি। একমাত্র বার্ধক্য ও মৃত্যু ব্যতীত। সুতরাং তোমরা গাভীর দুধ অবশ্যই পান করবে। কেননা এতে সমস্ত তরুলতার নির্যাস মিশ্রিত হয়ে থাকে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন রোগ প্রেরণ করেননি যার কোন ঔষধ প্রেরণ করেন নি, একমাত্র মৃত্যু ও বার্ধক্য ব্যতীত। সুতরাং তোমরা গাভীর দুধ অবশ্যই পান করবে। কেননা এর মধ্যে গাছপালা ও তরুলতার অংশ মিশ্রিত থাকে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ তা'আলা ভূমিতে এমন কোন রোগ রাখেননি বা প্রেরণ করেননি যার জন্য কোন শেফা অথবা ঔষধ রাখেননি বা সৃষ্টি করেননি। সুতরাং তোমরা গাভীর দুধ অবশ্যই পান করবে। কেননা এতে সমস্ত গাছপালা ও তরুলতার অংশ অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি পুনরায় ইরশাদ করেন ঃ তোমরা গাভীর দুধ অবশ্যই পান কর। কেননা এতে সমস্ত বৃক্ষ ও তরুলতার অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং এতে সর্ব রোগের শেফা ও রোগ মুক্তি রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে গাভীর দুধের প্রশংসা করা হয়েছে। ইব্ন হারাম, হাকিম ও আবূ নুআঈম থেকে বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা) বলেন ঃ গাভীর দুধ পান করা বাধ্যতামূলক করে নাও। কেননা এটা ঔষধ এবং এর ঘি হলো শেফা। এর গোশত খাওয়া থেকে দূরে থাক। কেননা এতে রোগ রয়েছে। মোট কথা গাভীর দুধ দেহের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক।

٤٤١ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَ الشِّفَاءُ فِى الْجَنَّةِ السَّوْدَاءَ وَالْحَجَامَةَ وَالْعَسَلَ وَمَاءَ السَّمَاءِ *

হাদীস নং- ৪৪১

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ পাক কলুনজি (কালজিরা), শিংগা, মধু ও আকাশের (বৃষ্টির) পানিতে শেফা রেখেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে কালজিরা (كلو نجى) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ اِنَّ لِهذه الْجَنَّة السَّوْدَاء شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاء [এ কালবীজ (কালজিরা) হলো প্রত্যেক রোগের জন্য শেফা বা মহৌষধ]। পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রশংসনীয় উপাদান রয়েছে। মধু সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইযযত ঘোষণা করেছেন ঃ فِيْه شِفَاءٌ لِلنَّاسِ [এতে (মধুর মধ্যে) মানুষের জন্য শেফা রয়েছে]। আকাশের পানি অর্থাৎ বৃষ্টির পানি যেহেতু সর্ব প্রকার ময়লা ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র, তাই এটাকে শেফা বলা হয়েছে।

٤٤٢ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ عَنْ عَمْرٍو الْجَرَشِىِّ عَنْ سَعِيْدِ

بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنَ الْمَنِّ الْكَمْأَةُ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ *

হাদীস নং- ৪৪২

অনুবাদ ঃ হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সাপের বা ব্যাঙের ছাতা মান (আসমানী খাদ্য)-এর অন্তর্ভুক্ত। এর পানি চোখের জন্য শেফা ও উপকারী।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী শরীফেও বর্ণিত আছে। ইমাম আহমদও মুসনাদে তা রিওয়ায়েত করেছেন। মান-এর সাথে কয়েকটি কারণে এর উপমা দেয়া হয়েছে। যেমন বনী ইসরাঈল কোন পরিশ্রম ও কষ্ট ছাড়াই খাদ্য পেত, তেমনিভাবে এটাও বিনামূল্যে পাওয়া যায়। যা বহু পরিমাণে জন্ম হয়।পচা কাঠ, দ্রব্য ও আবর্জনার মধ্যে সাধারণত এগুলো জন্মে থাকে। চোখের জন্য এটা উপকারী। এককভাবে কিংবা সুরমা বা তুঁতের সাথে মিলিয়ে এটা ব্যবহার করা যায়। আল্লামা নববী এর উপকারিতার ব্যাপারে পরীক্ষা করে উপকার পেয়েছেন।

٤٤٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرُّهُ عَقْرَبٌ حَتّٰى يُمْسِىَ وَمَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِى لَمْ يَضُرَّهُ عَقْرَبٌ حَتّٰى يُصْبِحَ -

وَفِى رِوَايَةٍ مَنْ قَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ حِيْنَ يُصْبِحُ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ عَقْرَبٌ يَوْمَئِذٍ - وَاِذَا قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِى لَمْ يَضُرُّهُ عَقْرَبٌ لَيْلَةً *

হাদীস নং- ৪৪৩

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে তিনবার اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ (আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি আল্লাহ্র পূর্ণ কালেমা দ্বারা) পাঠ করে, তা হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে বিচ্ছু দংশন করবে না এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ কালেমা পাঠ করবে, তাকে ভোর পর্যন্ত বিচ্ছু দংশন করবে না।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ ভোরে সূর্য উদয়ের পূর্বে তিনবার পাঠ করবে, তাকে ঐ দিন বিচ্ছু দংশন করবে না। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ কালেমা পাঠ করবে, সে রাতে বিচ্ছু তাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ব্যাখ্যা ঃ মুসনাদ ছাড়াও এ হাদীস অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ইব্ন আবদুল বার তামহীদ

নামক গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি এ বিষয় অবহিত হয়েছি যে, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ পাঠ করবে, বিচ্ছু তাকে দংশন করবে না।

٤٤٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ (رض) لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُتِىَ بِمَرِيْضٍ يَدْعُوْلَه يَقُوْلُ اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِى لَاشِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَمًا *

হাদীস নং- ৪৪৪

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম (সা) যখন কোন রোগীর পরিদর্শনে গমন করতেন, তখন তার জন্য তিনি এ দু'আ করতেন ঃ اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِى لَاشِفَاءَ اِلَّاشِفَاؤُكَ شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَمًا "হে মানব জাতির পালনকর্তা, রোগ দূরীভূত কর, শেফা দান কর, তুমি শেফাদানকারী। তোমার শেফা মূলত প্রকৃত শেফা যা থেকে কোন রোগই ব্যতিক্রম নয়।"

ব্যাখ্যা ঃ এ সমস্ত দু'আর অনেক ফলাফল রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো এই যে, আল্লাহ্ স্মরণে থাকে এবং রোগীর মধ্যে ধৈর্য সৃষ্টি হয়।

٤٤٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُّذِلَّ نَفْسَه قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَه قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ مَالَا يُطِيْقُ.

হাদীস নং- ৪৪৫

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তির জন্য নিজকে অপদস্থ বা অপমানিত করা উচিত নয়। জিজ্ঞাসা করা হয়, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিভাবে মুমিন নিজকে অপদস্থ করে ? তখন তিনি বলেন ঃ তা এভাবে যে, সে নিজকে এমন মুসীবতে ফেলে দেয় যা সহ্য করার মত ক্ষমতা সে রাখে না।

ব্যাখ্যা ঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজকে দীনের (ইবাদত) এমন কোন কষ্টের কাজে নিয়োজিত করে যা সে পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় না, অবশেষে বাধ্য হয়ে ঐ আমল ত্যাগ করে এবং সামান্য ইবাদত করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে, তবে এটাই হলো নিজকে অপদস্থ করা। আল্লাহ্ তা'আলা এটা পসন্দ করেন না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সা) বলেছেন ঃ নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী আমল গ্রহণ কর। কেননা

আল্লাহ তা'আলা ক্লান্ত হন না কিন্তু তোমরা ক্লান্ত হয়ে যাও। তাই হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) সওমে বেসাল (صوم وصال) বা বিরতিহীন রোযা থেকে নিষেধ করে বলেছেন ঃ "তোমরা আমার মত নও। আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পানাহার করান। সুতরাং তোমরা এমন আমল কর যা তোমরা সম্পন্ন করতে সক্ষম হও।" হাদীসে এটাও বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক ঐ নেক আমলকে সর্বাধিক পসন্দ করেন যা কম হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই এরূপ আমল গ্রহণ কর, যা সর্বদা করা যায়। ক্ষমতার বাইরে নেক আমল গ্রহণ করা মানুষের জন্য অত্যন্ত বিপদের কারণ হতে পারে।

٤٤٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَارُزِقْتُ وَلَدًا قَطُّ وُلِدَلِيْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَيْنَ اَنْتَ مِنْ كَثْرَةِ الاِسْتِغْفَارِ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ تُرْزَقُ بِهِمَا فَكَانَ الرَّجُلُ يَكْثِرُ الصَّدَقَةَ وَيُكْثِرُ الاِسْتِغْفَارِ قَالَ جَابِرُ فَوُلِدَ لَهُ تِسْعَةُ ذُكُوْرٍ *

হাদীস নং- ৪৪৬

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আনসারদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ভাগ্যে কোন সন্তান-সন্ততি হয়নি। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে যে, তুমি বেশি বেশি ইস্তিগফার কর না এবং অধিক পরিমাণে সদকা-খয়রাত কর না– যার বরকতে সন্তান ভাগ্যে হবে? অতঃপর ঐ ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সদকা ও খয়রাত দান এবং অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করতে থাকেন। হযরত জাবির (রা) বলেন, এরপর ঐ ব্যক্তির নয়টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

ব্যাখ্যা ঃ এ নির্দেশে মূলত এ আয়াতের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিষয় উদ্ঘাটন করা হয়েছে। হযরত নূহ (আ)-এর কিসসার মধ্যে রয়েছে, তিনি তাঁর উম্মতদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ

اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّه كَانَ غَفَّارًا - يُّرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا - وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ -

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, কেননা তিনি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করবেন।" (৭১ ঃ ১০-১১) এটা হলো ইস্তিগফারের বিস্ময়কর ক্রিয়া। সদকা সম্পর্কে অন্য স্থানে বলা হয়েছে ঃ اَلصَّدَقَةُ يُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ (সদকা-খয়রাত আল্লাহ্র ক্রোধ নিভিয়ে দেয়)। যখন আল্লাহ্র ক্রোধ শেষ হয়ে যায়, তখন তাকে পৃথিবীর সমস্ত নিয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেয়। এ অধ্যায়ের সাথে এ হাদীসের সংযোগ এভাবে হয়েছে যে,

সন্তান-সন্ততি দুনিয়াতে মানুষের জন্য নিন্দনীয় নয়; বরং সবচেয়ে কষ্টদায়ক হলো রোগ। সুতরাং রোগমুক্তির উপায় এতেই নিহিত রয়েছে যে, মানুষ আল্লাহ্‌র দরবারে স্বীয় গুনাহ্‌র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদের প্রার্থনা করে। যাতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেন।

٤٤٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَعِيْلَ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلِمَ اَنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُلَهُ فَهُوَ مَغْفُوْرٌ لَهُ *

হাদীস নং- ৪৪৭

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে হানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এটা অবগত যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করে দেবেন , তা হলে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফেও বর্ণিত আছে। তিবরানী সগীর নামক গ্রন্থে হযরত আবি মাসউদ (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন ঃ

مَنْ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ غُفِرَلَه وَاِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ ـ

"যে ব্যক্তি কোন পাপ করে এবং এটা অবগত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা এ পাপের বিষয়টি জেনে ফেলেছেন বা জ্ঞাত হয়েছেন, তাহলে তার পাপ মার্জনা করা হয়। যদিও সে ক্ষমা প্রার্থনা না করে।"

আল্লাহ তা'আলা বান্দার গুনাহ ক্ষমা করার জন্য ওসীলা বা বাহানা খুঁজে থাকেন এবং বান্দার সামান্যতম আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হওয়াকে গুনাহ মাফের জন্য ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন। মূলত তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

٤٤٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ اَلسَّلَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ *

হাদীস নং- ৪৪৮

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা হলেন সালাম (শান্তি) এবং সালাম বা শান্তি তাঁর থেকেই এসে থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সালাম হওয়ার অর্থ এই যে, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সমস্ত পরিবর্তন-পরিবর্ধন, দোষত্রুটি থেকে পবিত্র ও নিরাপদ। আল্লাহ্ তা'আলার সালাম হওয়ার অর্থ এই যে, বালা-মুসীবত ও বিপদ-আপদ থেকে হিফাযত ও নিরাপত্তার জন্য একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা যায়। সুতরাং রোগ থেকে মুক্তির জন্য তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া হয়। এ দিক থেকে এ হাদীসটি হাদীসের অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।

كِتَابُ الأَدَبِ
আদব অধ্যায়

بَابُ الأَدَبِ
আদব বর্ণনা

٤٤٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتَ وَمَالُكَ لاَبِيْكَ *

হাদীস নং- ৪৪৯

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের ব্যাখ্যা আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহয় বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা)-এর নিকট এক ব্যক্তি আগমণ করে আরয করে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিকট সম্পদ আছে এবং আমার পিতাও আছেন কিন্তু তিনি অভাবী। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি এবং তোমার মাল তোমার পিতার। অবশ্য তোমার সন্তান তোমার পবিত্র উপার্জন। সুতরাং তুমি তোমার সন্তানের উপার্জন থেকে পানাহার কর। এ হাদীস দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, যদি পিতা তার জীবনের হিফাযতের জন্য স্বীয় পুত্রের অবর্তমানে তার অনুমতি ব্যতীত তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তা হলে এতে কোন দোষ নেই।

٤٥٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادِ فَقَالَ اَحَىٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ *

হাদীস নং- ৪৫০

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে জিহাদে গমনের উদ্দেশ্যে হাযির হয়। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার পিতামাতা কি জীবিত

আছেন ? লোকটি বলল, হাঁ। হুযূর (সা) বললেন, তুমি তাদের নিকট জিহাদ কর (অর্থাৎ তাদের খেদমতের জন্য চেষ্টা কর। এটাই হবে তোমার জন্য জিহাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে পিতামাতার সম্মান– মর্যাদা ও তাদের প্রতি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। তাদের খেদমত ও হক আদায়ের মাধ্যমে জিহাদের বদল হয়ে যায়। বরং তা এর চেয়ে উত্তম। সুতরাং জমহুর উলামায়ে কিরামের মত হলো এই যে, যদি পিতামাতা মুসলমান হন এবং তাঁরা জিহাদে গমনে বাধা দান করেন, তাহলে জিহাদে অংশগ্রহণ করা হারাম। এটা এ শর্তের কারণে যে, তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ফরযে আইন বা বাধ্যতামূলক এবং জিহাদ ফরযে কিফায়া। এছাড়া সমস্ত মাযহাবের সুস্পষ্ট বিধান হলো এই যে, দাদা-দাদীও পিতামাতার বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

٤٥١ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ زِيَادٍ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ اَمَرَ بِالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ *

হাদীস নং- ৪৫১

অনুবাদ ঃ হযরত যিয়াদ (র) থেকে মরফূ হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ ও উপকার করার নির্দেশ দান করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ نصح শব্দের অর্থ خلوص কিন্তু এখানে অর্থ হলো কল্যাণ করা, অন্যের কল্যাণ করা। সৎ নিয়্যতে আন্তরিকতার প্রেরণা নিয়ে নিষ্কলুষ প্রেম ও মহব্বতের মধ্যেই সব কিছু নিহিত। বরং গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সম্পূর্ণ দীন এ অর্থের মধ্যেই লুক্কায়িত ও নিহিত। তাই মুসলিম শরীফে মরফূ হাদীস বর্ণিত আছে, اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ (দীন সম্পূর্ণই নসীহত)। রাসূল (সা) কথাটি তিনবার বলেছেন। সাহাবাগণ আরয করলেন, কার জন্য ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌র কিতাবের জন্য এবং তাঁর রাসূলের জন্য। আয়িম্মায়ে মুসলিমীন ও সাধারণ মুসলমানের জন্য।

٤٥٢ – جَادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِى مُسْلِمٍ الاَغَرِّ صَاحِبِ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعْنِى وَاحِدًا مِّنْهُمَا اَلْقَيْتَهُ فِى جَهَنَّمَ *

হাদীস নং- ৪৫২

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ গৌরব ও অহংকার আমার চাদর, আজমত ও মহানত্ব আমার লুঙ্গী বা পায়জামা। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দুটোর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করবে, আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো।

ব্যাখ্যা ঃ চাদর ও লুঙ্গী হওয়ার অর্থ হলো, এদু'টি গুণ শুধু আল্লাহ্‌র সাথে নির্দিষ্ট। অন্য কেউ এর সাথে অংশীদার নেই। গৌরব ও অহংকারের সম্পর্ক তাঁর সত্তার সাথে এবং আজমতের সম্পর্ক তাঁর গুণাবলীর সাথে।

٤٥٣ – حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ الْمُتَكَبِّرَ رَأْسُهُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ حَيْثُ كَانَ يَرْتَفِعُ بِرَأْسِهِ فِى تَابُوْتٍ مِنْ نَارٍ مُقْفَلٌ عَلَيْهِ وَلَايَخْرُجُ اَبَدًا مِّنَ النَّارِ*

হাদীস নং- ৪৫৩

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র) বলেন, আমি এ বিষয়ে অবগত হয়েছি যে, অহংকারী ব্যক্তি যেহেতু তার মাথা দ্বারা অহংকার প্রকাশ করে থাকে, তাই তার মাথা কিয়ামতের দিন তার উভয় পায়ের মধ্যে অবস্থান করবে। আগুনের সিন্ধুকের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। কখনোই আগুন থেকে বের হতে পারবে না।

ব্যাখ্যা ঃ অহংকার যেহেতু মাথা দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাই এর শাস্তি এটা দেয়া হয়েছে যে, মাথা তার দু'পায়ের মধ্যে প্রবেশ করানো হবে এবং এভাবে তার অহংকার মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে। সিন্ধুকের মধ্যে এমনিভাবে বন্ধ করা হবে যে, সে সৃষ্টিজগত দেখার জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। অতঃপর এ বিপদ তার উপর সর্বদা অব্যাহত থাকবে কিন্তু এ শাস্তি থেকে তার ভাগ্যে কখনো মুক্তি হবে না। অহংকারের কুফল সম্পর্কে হাদীসে অনেক বর্ণনা রয়েছে এবং এর উপর কঠোর শাস্তির কথা রয়েছে। ইব্‌ন আসাকির হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা) বলেছেন ঃ তোমরা অহংকার থেকে বেঁচে থাক। কেননা ইবলিসকে অহংকারই হযরত আদম (আ)-কে সিজদা না করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে। তোমরা লোভ-লালসা থেকে দূরে থাক। কেননা হযরত আদম (আ)-কে গমের বৃক্ষ খাওয়ার ব্যাপারে লোভই তাকে উৎসাহ দিয়েছে। তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক, কেননা হিংসার বশবর্তী হয়েই হযরত আদম (আ)-এর পুত্রগণ একজন অন্যজনকে হত্যা করেছে। সুতরাং এ তিনটি ভয়াবহ ত্রুটি সমস্ত অনিষ্টের মূল।

তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণে অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে দোযখে থাকবে না। এটাও বর্ণিত আছে, কঠোর ও বদমেযাজী এবং অহংকারী লোকদের দ্বারা দোযখ ভর্তি হবে এবং দুর্বল ও পরাজিত লোকদের দ্বারা বেহেশত আবাদ হবে। তিরমিযী শরীফে হযরত সালমা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি সর্বদা নিজকে বুযর্গ মনে করত এবং জনগণ থেকে দূরে থাকত, ফলে তার নাম অহংকারী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর ইহকাল ও পরকালে যে বিপদ বিদ্রোহীদের উপর পতিত হয়, তা তার উপরও নিপতিত হয়।

بَابُ الرِّفْقِ وَالْخُلُقِ

বিনয় ও সচ্চরিত্র

٤٥٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ زِيَادٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شُرَيْكٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالاَعْرَابُ يَسْأَلُوْنَه قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاخَيْرُ مَا اُعْطَىَ الْعَبْدُ ـ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ *

হাদীস নং- ৪৫৪

অনুবাদ ঃ হযরত উসামা ইব্ন শুরাইক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়েছি, এ সময় কতিপয় গ্রাম্য লোক তাঁর কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করছিল। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! বান্দাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম বস্তু কি ? তখন তিনি বললেন ঃ সচ্চরিত্র।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানের উত্তম আমল হলো সচ্চরিত্র। অনেক সহীহ হাদীসে এর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসেও এটাই প্রকাশিত হয়েছে যে, মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা যে উত্তম গুণাবলী দান করেছেন, এর মধ্যে সচ্চরিত্র হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। মুসলিম, তিরমিযী, বুখারী আদাবুল মুফরাদে নাওয়াস ইব্ন সামআন থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন যে, নেকী হলো সচ্চরিত্রের নাম এবং গুনাহ হলো ঐ বস্তু যা তোমার মনে খট্কা লাগে, তুমি তা মানুষের সামনে প্রকাশ হওয়াকে দূষণীয় মনে করবে, অনীহা প্রকাশ করবে। তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ দারদা (রা) থেকে মরফূ হাদীসে বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী যে বস্তু রাখা হবে, তা হলো সচ্চরিত্র, আল্লাহ তা'আলা বেহুদা কথোপকথনকারী ও বেহুদা কথাবার্তা অত্যন্ত অপসন্দ করেন। আবূ দাউদে হযরত আয়েশা (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণিত আছে, মু'মিন স্বীয় সচ্চরিত্রের কারণে ঃ قَائِمُ اللَّيْلِ وَصَائِمُ الدَّهْرِ অর্থাৎ রাতে দাঁড়িয়ে ইবাদতকারী ও দিনে রোযাপালনকারীর মর্যাদা অর্জন করে থাকে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের সচ্চরিত্রবান হওয়া উচিত ও বাঞ্ছনীয়।

٤٥٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ الرِّفْقَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ يُرَى لَمَارُئِيَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى خَلْقٌ اَحْسَنَ مِنْهُ وَلَوْ اَنَّ الْخَرَقَ خُلِقَ يُرَى لَمَارُئِيَ مِنْ خَلَقِ اللّٰهُ تَعَالٰى اَقْبَحَ مِنْهُ *

হাদীস নং- ৪৫৫

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যদি বিনয় ও

সচ্চরিত্র দৈহিক আকৃতিতে প্রদর্শন করা হতো, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এর থেকে সুন্দর ও উত্তম কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হতো না। যদি অসচ্চরিত্র দৈহিক আকৃতিতে প্রকাশ হতো, তা হলে আল্লাহ্ পাকের সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এর চেয়ে অধিক খারাপ আকৃতির কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হতো না।

ব্যাখ্যা ঃ খারায়েতী মাকারিমে আখলাক-এর আলোচনার মধ্যে এটাকে এভাবে বর্ণনা করেন যে, যদি সচ্চরিত্র (حسن خلق) একজন যাতায়াতকারী মানুষের আকৃতিতে প্রকাশ হতো তা হলে এটা অত্যন্ত নেকবখত পূণ্যবান মানুষ হতো। যদি অসচ্চরিত্র মানুষের আকৃতিতে প্রকাশ হতো তা হলে অত্যন্ত খারাপ আকৃতিতে দেখা যেত। তিবরানী আওসাত নামক গ্রন্থে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন যে, বিনয়ের মধ্যে বরকত রয়েছে এবং রূঢতা ও রুক্ষতার মধ্যে রয়েছে অশুভ ও অকল্যাণ। বুখারী হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন যে, তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সচ্চরিত্র। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আঁ হযরত (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, লোকজনকে বেহেশতে কোন্ বস্তু বেশি প্রবেশ করাবে ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্কে ভয় করা এবং উত্তম চরিত্র।

٤٥٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ مَا اَخْرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدِيْ جَلِيْسٍ لَهُ قَطُّ بَلْ يَقْعُدُ مُسَاوِيًا لَهُمْ وَلاَ تَنَاوَلَ اَحَدٌ يَدَهُ فَيَتْرُكُهَا قَطُّ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ يَدَعُهَا وَمَا جَلَسَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدٌ قَطُّ فَقَامَ حَتّٰى يَقُوْمَ قَبْلَهُ - وَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَطُّ اَطْيَبُ مِنْ رِيْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ مَا قَامَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فِى حَاجَةٍ فَانْصَرَفَ عَنْهُ قَبْلَهُ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ -

وَفِى رِوَايَةٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَافَحَ اَحَدًا لاَيَتْرُكُ يَدَهُ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ هُوَ الَّذِى يَتْرُكُ *

হাদীস নং- ৪৫৬

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন বৈঠকে উপবেশন-কারীদের মধ্যে স্বীয় হাঁটু কখনো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বসতেন না, বরং সর্বদা সমান্তরাল হয়ে উপবেশন করতেন। কেউ কখনো তাঁর হাত আঁকড়িয়ে ধরেনি যে, তিনি স্বীয় হাত তার হাত

থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন, যতক্ষণ না সে স্ব ইচ্ছায় তার হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে এবং কেউ কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে বসেনি এ অবস্থায় যে, ঐ ব্যক্তি দাঁড়ানোর পূর্বে তিনি দাঁড়িয়েছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলূল্লাহ (সা)-এর পবিত্র দেহের চেয়ে অধিক সুগন্ধিময় আর কোন বস্তু পাইনি।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত আনাস (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট কোন প্রয়োজনে দাঁড়ায়নি, এ অবস্থায় যে, তিনি পবিত্র মুখমন্ডল ফিরিয়ে নিয়েছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি মুখ না ফিরিয়ে নিয়েছে।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, রাসূলূল্লাহ (সা) কখনো কারো সাথে মুসাফাহা করে হাত ছাড়েননি যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি হাত না ছাড়তো।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত বিষয়গুলো রাসূলে পাক (সা)-এর মহান চরিত্রের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি কারো মনে কষ্ট দিতেন না। যদি এ মানবতা বা ভদ্রতার জন্য তাঁরই কষ্ট হতো কিন্তু কারো অন্তরে আঘাত করা কোন অবস্থাতেই তিনি পসন্দ করতেন না। অবুঝ ও জ্ঞানহীন লোকদের অর্থহীন কর্মকান্ডকে তিনি মানবতা ও উত্তম চরিত্রের কারণে সহ্য করতেন এবং এটা প্রমাণ হতে দিতেন না যে, তিনি সাথীর প্রতি বিরক্ত হয়েছেন,এখন তাঁর থেকে দূরে থাকতে হবে। এ ছাড়া হাদীসে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, যদিও আল্লাহ্‌র রাব্বুল ইয্যত আঁ হযরত (সা)-কে সমস্ত সৃষ্টির উপর সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন অধিবেশন বা সভায় তাঁর জন্য পার্থক্য ও আলাদা বৈশিষ্ট্য তিনি পসন্দ করতেন না। তিনি চরিত্রের এ গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে এ কথার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الاَخْلاَقِ (আমি পূর্ণতাদানের জন্যই আবির্ভূত হয়েছি)।

٤٥٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَجُلاً نَادى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَبَّيْكَ قَدْ اَجَبْتُكَ فَخَرَجَ اِلَيْهِ *

হাদীস নং- ৪৫৭

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আহবান জানালো। তখন তিনি বাড়িতেই ছিলেন এবং আমি হাযির আছি, বলেই তিনি তার নিকট বেরিয়ে এলেন।

ব্যাখ্যা ঃ হুযূর আকরাম (সা)-এর মহান চরিত্রের অপর একটি উদাহরণ হলো এই যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন ঃ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (নিশ্চয়ই আপনাকে মহান চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে)।

٤٥٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرْ عَنْ اُمَيْمَةَ بِنْتِ

رُقَيْقَةَ (رضـ) قَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاُبَايِعَهُ فَقَالَ اِنِّى لَسْتُ اُصَافِحُ النِّسَاءَ *

হাদীস নং- ৪৫৮

অনুবাদ ঃ হযরত উমায়মা বিনতে রুকায়কা (রা) বলেন, আমি বায়আত গ্রহণের জন্য নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমি মহিলাদের সাথে হাত মিলাই না।

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সা) মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করতেন না। আবূ নুআঈম হিলয়া নামক গ্রন্থে বাহ্লা বিনতে আবদুল্লাহ আল-বাকরীয়া থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একটি দলের সাথে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হই। তিনি পুরুষদের বায়আত গ্রহণের সময় তাদের সাথে মুসাফাহা করেন এবং মহিলাদেরও বায়আত গ্রহণ করেন কিন্তু তাদের সাথে মুসাফাহা করেননি। যদি মুসাফাহা করেও থাকেন, তবে কাপড়ের আড়ালে। যেমন তিবরানী হযরত মা'কাল ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বায়আতে রিদওয়ানের দিন নবী করীম (সা) কাপড়ের আড়াল থেকে মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করেন। অর্থাৎ তিনি মহিলাদের হাত স্পর্শ করেননি। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ পবিত্রতা ও সংযমশীলতা, লজ্জা ও শরমের কত উন্নত ধরনের উদাহরণ এবং উম্মতের জন্য কত অমূল্য শিক্ষা ! কিন্তু বিরাট অনুতাপের বিষয় এই যে, আমরা এটাও ভুলতে বসেছি। এটা শুনেছি যে, কোন কোন লোক পবিত্রতার জামায় প্রকাশ হয়ে এবং দীনের নেতা সেজে নারী-পুরুষের সাথে সমান ব্যবহার করে, নারীদের সাথে অন্তঃপুরে বাস করে থাকে। نَعُوذُ بِاللّٰه مِنْ ذٰلِكَ আঁ হযরত (সা)-এর এ আমল ও সতর্কতা এবং এর বিপরীতে আমাদের চালচলন ও নির্ভয়তা ! প্রকৃতপক্ষে এরূপ আমল বা কাজ ইসলামের সম্মান ও মর্যাদাকে ধ্বংস করে দেয় এবং ইসলামের নামের উপর কালিমা লেপন করে।

٤٥٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ عُذْرَ مُسْلِمٍ يَقْدِرُ اِلَيْهِ فَوِزْرُهُ كَوِزْرِ صَاحِبِ مَكْسٍ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا صَاحِبُ مَكْسٍ قَالَ عَشَّارٌ *

হাদীস নং- ৪৫৯

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ওযর পেশকারী কোন মুসলমানের ওযর গ্রহণ করে না, তার পাপ সাহেবে মাকসের (صاحب مكس) পাপের সমান হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল ! صاحب مكس কে ? তিনি বলেন ঃ عشار অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যে অত্যন্ত কঠোরতার সাথে ও নির্যাতন দ্বারা উশর আদায় করে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা এটা প্রকাশ হয়েছে যে, যদি কোন ব্যাপারে কোন মুসলমান স্বীয় অক্ষমতার ওযর পেশ করে, তা হলে তার ওযর গ্রহণ করা উচিত। ওযর গ্রহণ না করা এবং তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা আল্লাহপাকের নিকটে মারাত্মক পাপ। এমনকি তার পাপ যুলুম ও অত্যাচার করে উশর আদায়কারীর পাপের সমান বলে স্থির করা হয়েছে। তারা অত্যন্ত পাপী ও অন্যায়কারী। কেননা তারা রাষ্ট্রের সহায়তায় দরিদ্র প্রজাদের উপর সীমাহীন যুলুম করে থাকে। তাদের থেকে ঘুষ গ্রহণ করে এবং নানাভাবে তাদেরকে হয়রানী করে থাকে। এটা অত্যন্ত বড় যুলুম। এরূপ যালিমদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

٤٦٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِعْتَذَرَ اِلَيْهِ اَخُوْهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ فَوِزْرُهُ كَوِزْرِ صَاحِبِ مَكْسٍ يَعْنِى عَشَّارًا *

হাদীস নং- ৪৬০

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির নিকট তার কোন মুসলমান ভাই (কোন কথা ও কাজের কষ্টের কারণে) ওযর পেশ করে কিন্তু সে ওযর গ্রহণ না করে, তা হলে তার পাপ صاحب مكس অর্থাৎ অত্যাচারের মাধ্যমে উশর আদায়কারীর পাপের সমান হবে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী হাদীসের সাথে মিল রয়েছে। তাই উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা দেখা যেতে পারে।

٤٦١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اُتِىَ اَحَدُكُمْ بِطِيْبٍ فَلْيُصِبْ مِنْهُ *

হাদীস নং- ৪৬১

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদেরকে সুগন্ধি প্রদান করা হয়, তখন এটা অবশ্যই গ্রহণ করবে।

ব্যাখ্যা ঃ সুগন্ধি ফিরিয়ে দেয়া ভাল নয়। তিরমিযী স্বীয় জামে' এবং শামাইলে হযরত সুমামা ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না এবং বলতেন, নবী করীম (সা)-ও সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ النَّظْرِ فِى النُّجُوْمِ

জ্যোতির্বিজ্ঞানে দৃষ্টি দেয়া নিষিদ্ধ

٤٦٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ نَهَى

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّظْرِ فِى النُّجُوْمِ *

হাদীস নং- ৪৬২

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) علم نجوم বা জ্যোতির্বিজ্ঞানে দৃষ্টি দিতে ও শিক্ষা করতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা ও চিন্তায় মগ্ন হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায়। দায়লামী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানকে পর্যবেক্ষণকারী এরূপ, যেমন- সূর্যের গোলকের দিকে দর্শনকারী। এর দিকে যে পরিমাণ দেখবে, ততটুকু দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হয়ে যাবে। দারে কুতনী হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন যে, শুষ্ক ও নৌপথে অন্ধকারে দিক নির্ণয়ের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তোমরা ততটুকু জ্যোতির্বিজ্ঞান শিখতে পার। কিন্তু অতিরিক্ত শিক্ষা থেকে বিরত থাক। অর্থাৎ পার্থিব কাজকর্ম ও পথ এবং অন্যান্য বিষয়ে অবহিত হওয়া জায়েয আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ اِنَّكُمْ لَمُهْتَدُوْنَ (নিশ্চয়ই তোমরা পথের সন্ধান পাবে।) এতে সম্পূর্ণ প্রবেশ করা বা গ্রহণ করা সঠিক নয়। মুসলিম ও আবূ দাউদে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা করল, সে যেন যাদুবিদ্যা শিক্ষা করল।

٤٦٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَّدْخُلَ الْحَمَّامَ اِلاَّ بِمِيْزَرٍ وَلَمْ يَسْتُرْ عَوْرَتَهُ مِنَ النَّاسِ كَانَ فِىْ لَعْنَةِ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ *

হাদীস নং- ৪৬৩

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের উপর বিশ্বাস করে, তার জন্য গোসলখানায় লুঙ্গী ব্যতীত প্রবেশ করা জায়েয নয় এবং যে ব্যক্তি স্বীয় সতর (নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত) গোপন না রাখে, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা এবং সমস্ত সৃষ্টির পক্ষ থেকে লা'নত বর্ষিত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তার সাথে লোকজনকে স্বীয় সতর দেখানো আল্লাহ্ তা'আলার অত্যন্ত অসন্তুষ্টির কারণ। অতঃপর এ ধরনের লোকজনের উপর ফিরিশতা এবং আল্লাহ্র সৃষ্টির অভিশাপ পতিত হবে।

٤٦٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ اَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُاللّٰهِ وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ

হাদীস নং- ৪৬৪

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সবচেয়ে পসন্দনীয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।

ব্যাখ্যা ঃ আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান এ দুটো আঁ হযরত (সা)-এর নিকট এজন্য পসন্দনীয় ছিল যে, এ নামের অংশ উত্তম এবং পসন্দনীয় অর্থ প্রকাশ করে। বান্দার জন্য দাসত্ব অত্যন্ত উপযোগী এবং আল্লাহ্র নাম হলো বরকতময়। এ ছাড়া সবচেয়ে বড় হলো, স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও মা'বূদের সাথে বান্দার সম্পর্ক ও সংযোগ হয়ে থাকে। এমনিভাবে আবদুর রহমানে আব্দ-এর সংযোগ রহমানের দিকে হয়ে থাকে এবং যেহেতু রহম ও করমের (رحم وكرم) সম্পর্ক আল্লাহ্র অত্যন্ত পসন্দনীয়, তাই এ গঠন ও বিন্যাস উত্তম। সুতরাং এর সাথে মিলানো নাম, যেমন আবদুর রহীম, আবদুল কাদির ইত্যাদি হলো উত্তম নাম। অনেক লোক না বুঝে স্বীয় সন্তানের নাম উল্টা রেখে থাকে। যার কোন-কোনটি অর্থহীন এবং কোন-কোনটি খারাপ অর্থ প্রকাশ করে। হুযূর (সা) নামের ভালমন্দের দিকে অত্যন্ত লক্ষ্য রাখতেন। কারো খারাপ নাম শুনলে তা পরিবর্তন করে দিতেন। একবার তিনি একটি মেয়ের নাম শুনলেন আসিয়া (عاصيه) যার অর্থ গুনাহ্গার ও নাফরমান, তখন তিনি তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন জামিলা (جميله) বা সুন্দরী।

মুয়াত্তা ইমাম মালিক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলে পাক (সা) বললেন ঃ এ উটের দুধ কে দোহন করবে ? এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার নাম কি ? লোকটি বলল, مُرَّه (তিক্ত)। তিনি বললেন ঃ তুমি বস। অতঃপর বললেন ঃ এ উটের দুধ কে দোহন করবে ? অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমি। তিনি তাকেও জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার নাম কি ? সে বলল, حَرْبٌ (যুদ্ধ)। তিনি তাকেও বললেন ঃ তুমি বস। এরপর পুনরায় তিনি বললেন ঃ এর দুধ কে দোহন করবে ? তৃতীয় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমি। তিনি তাকেও জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার নাম কি ? সে বলল, يَعِش এটা عَيْش থেকে নির্গত (যার অর্থ আনন্দ-উল্লাস) তখন হুযূর (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি দোহন কর।

٤٦٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِرُّ لَايَبْلٰى وَالاِثْمُ لَايُنْسٰى *

হাদীস নং- ৪৬৫

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নেক ধ্বংস হয় না এবং পাপ ভোলানো যায় না।

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীসের অর্থ হলো এই যে, নেক ও কল্যাণ ইহকাল ও পরকালে প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল না দেখিয়ে থাকে না এবং কখনো ধ্বংস হয় না। বরং উত্তম ফলাফল সৃষ্টি করে থাকে, ভবিষ্যতকে উত্তম ও সুন্দর করে থাকে। এমনিভাবে পাপ ও অন্যায় ইহকাল ও পরকালে দুঃখ-কষ্ট, শাস্তি ও ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। খারাপ ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সামনে নিয়ে আসে এবং পাপীকে অন্যায়ের শাস্তি ও পুরস্কার না দিয়ে ছাড়ে না।

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে যুলুম করবে, তাকে পরকালে বিভিন্ন প্রকার অন্ধকারের আযাবে শাস্তি প্রদান করা হবে। এভাবে তার যুলুমের পূর্ণ শাস্তি প্রদান করা হবে।

٤٦٩- اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ قَوْمًا مِنَ الاَنْصَارِ فِى دِيَارِهِمْ فَذَبَحُوْا لَهُ شَاةً وَصَنَعُوْا لَهُ مِنْهَا طَعَامًا فَاَخَذَ مِنَ اللَّحْمِ شَيْئًا فَلاَكَهُ فَمَضَغَهُ سَاعَةً لاَيَسِيْغُهُ فَقَالَ مَاشَانُ هٰذَا اللَّحْمِ - فَقَالُوا شَاةٌ لِفُلاَنٍ ذَبَحْنَاهَا حَتّٰى يَجِئَ فَنُرْضِيَهِ مِنْ ثَمَنِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطْعِمُوْهَا الْاُسَرَاءَ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ عَاصِمْ ابْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَنَعَ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَقَامَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا وُضِعَ الطَّعَامُ تَنَاوَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُضْعَةً مِّنْ ذٰلِكَ اللَّحْمِ فَلاَكَهَا فِى فِيْهِ طَوِيْلاً فَجَعَلَ لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَأْكُلَهَا فَاَلْقَاهُ مِنْ فِيْهِ وَاَمْسَكَ عَنِ الطَّعَامِ فَقَالَ اَخْبِرْنِى عَنْ لَحْمِكَ هٰذَا مِنْ اَيْنَ هُوَ - قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ شَاةٌ كَانَتْ لِصَاحِبٍ لَنَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا فَنَشْتَرِيْهَا مِنْهُ وَعَجَّلْنَا بِهَا وَذَبَحْنَاهَا وَوَضَعْنَاهَا لَكَ حَتّٰى يَجِئَ فَنُعْطِىَ ثَمَنَهَا فَاَمَرَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَفْعِ هٰذَا الطَّعَامِ وَاَمَرَ اَنْ يُّطْعِمَهُ الاُسَرَاءَ -

قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدُ قُلْتُ لاَبِى حَنِيْفَةَ مِنْ اَيْنَ اَخَذْتَ هٰذَا الرَّجُلَ يَعْمَلُ فِىْ مَالِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ يَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ قَالَ اَخَذْتُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ *

হাদীস নং- ৪৬৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আনসারদের এক কওমের বাড়িতে গমন করে তাদের সাথে সাক্ষাত করেন। তারা তাঁর মেহমানদারীর জন্য একটি বকরী যবেহ করে এবং এরদ্বারা আহার্য দ্রব্য তৈরি করে। হুযূর (সা) (আহারের সময়) গোশতের

٤٦٦ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدْنَا حَيْثُ اِنْتَهَى الْمَجْلِسُ *

হাদীস নং- ৪৬৬

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) বলেন, আমরা যখন নবী করীম (সা)-এর মজলিসে হাযির হতাম তখন মজলিসের শেষ প্রান্তে বসতাম।

ব্যাখ্যা ঃ শামাইলে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সা) যখন কওমের মজলিসে গমন করতেন, তখন মজলিসের শেষ প্রান্তে উপবেশন করতেন এবং এভাবে বসার নির্দেশও প্রদান করতেন। তিবরানী ও বায়হাকী হযরত শায়বা ইব্ন উসমান (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন যে, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন মজলিসে অংশগ্রহণ করবে, তখন কোন শূন্য জায়গা পাওয়া গেলে অথবা যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই বসে পড়বে।

٤٦٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ *

হাদীস নং- ৪৬৭

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ্র প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

ব্যাখ্যা ঃ মোল্লা আলী ক্বারী (র) এর কারণ হিসেবে লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন বান্দার সামান্য ইহসানের স্বীকৃতি দেয় না এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে কিভাবে আল্লাহ্ পাকের এত বিপুল পরিমাণ ইহসান ও দয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে ? অথবা এর অর্থ হলো এই যে, বান্দার দয়াও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পাকেরই দয়া। তাই যে ব্যক্তি বান্দার ইহসান ও দয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে যেন আল্লাহ্রই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

٤٦٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكَ وَالظُّلْمَ فَاِنَّ اَلظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

হাদীস নং- ৪৬৮

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ তুমি (কারো প্রতি) যুলুম থেকে বিরত থাক। কেননা কিয়ামতের দিন যুলুম অন্ধকারময় হয়ে আবির্ভূত হবে।

এক টুকরা মুখে দিয়ে কিছুক্ষণ চিবালেন কিন্তু গলাধঃকরণ করতে পারলেন না। তখন তিনি বললেন ঃ এটা কি ধরনের গোশত ? লোকজন বলল, এটা অমুক ব্যক্তির বকরী ছিল। (তার অনুমতি ব্যতীত) আমরা এটা যবেহ করেছি– এ আশায় যে, তিনি (বকরীর মালিক) আগমণ করলে তাকে বকরীর মূল্য প্রদান করে সম্মত করিয়ে নেব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এ গোশত বন্দীদেরকে খাওয়াও।

অপর এক রিওয়ায়েতে ইবন কুলায়ব থেকে বর্ণিত আছে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)-এর সাহাবাদের মধ্যে এক ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত করলেন। হুযূর (সা) গমন করলেন, আমরাও তাঁর সাথে গিয়েছি। যখন আহার্য দ্রব্য রাখা হলো, তখন তিনি গোশতের একটি টুকরা মুখে রাখলেন এবং বেশ কিছুক্ষণ চিবালেন কিন্তু তা গলাধঃকরণ করতে পারলেন না। তখন তিনি তা মুখ থেকে বের করে ফেলে দিলেন এবং খানা থেকে হাত উঠিয়ে বললেন ঃ এ গোশত কোথা থেকে সংগ্রহ করেছ, তা আমাকে বল। মেজবান বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা আমাদের এক সাথীর বকরী ছিল। সে উপস্থিত ছিল না যে, আমরা তার থেকে ক্রয় করব। সুতরাং আমরা এটা জলদি করে যবেহ করেছি এবং আপনার খেদমতে উপস্থিত করেছি। শুধু এ আশায় যে, বকরীর মালিক আগমণ করবে এবং তাকে বকরীর মূল্য আদায় করে দেব। তখন নবী করীম (সা) ঐ খাদ্য উঠিয়ে নেয়ার জন্য বললেন এবং বন্দীদেরকে খাওয়ানোর জন্য নির্দেশ দান করলেন।

আবদুল ওয়াহেদ বলেন, আমি হযরত আবূ হানীফা (র)-কে বললাম, আপনি এ মাসয়ালা কোথায় পেলেন যে, যদি কেউ কারো মাল তার অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করে, তা হলে সে এর লাভ সদকা করে দেবে ? তিনি বললেন ঃ হযরত আসিম (র)-এর হাদীস থেকে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে একটি মাসয়ালা বর্ণিত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির বকরী অনুমতি ব্যতীত যবেহ করে, তা হলে এর মূল্য প্রদানের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হবে এবং তার উপর এটা সদকা করা ওয়াজিব হবে। এ ছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত বকরীর মূল্য আদায় না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ বকরী দ্বারা কোন উপকার লাভ করার অধিকার তার প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ অবস্থায় বকরী তার মালিকের মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়। যদি তার মালিকানা থেকে বের না হতো, তা হলে আঁ হযরত (সা) এটাকে সদকা করার নির্দেশ দান করতেন না। বরং মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতেন অথবা তার হাতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতেন এবং এর মূল্য মালিকের জন্য হিফাযতে রাখার নির্দেশ দিতেন। কেননা জরুরী অবস্থায় কোন ব্যক্তির মাল বিক্রি করার ক্ষমতা আমীরের রয়েছে।

٤٧٠ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ *

হাদীস নং- ৪৭০

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কল্যাণমূলক কাজের প্রতি পথপ্রদর্শনকারী ব্যক্তি (পুরস্কারের ব্যাপারে) আমলকারী ব্যক্তির অনুরূপ বলে গণ্য।

ব্যাখ্যা ঃ দারে কুতনী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ وَالدَّالَ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ اِغَاثَةَ اللَّهْفَانَ

"প্রত্যেকটি ভাল কাজ হলো সদকা। কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শনকারী তার আমলকারীর সমান ফল পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা যে বিপদগ্রস্থ লোককে সাহায্য করে, তাকে মহব্বত করেন।"

٤٧١ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ *

হাদীস নং- ৪৭১

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ভাল কাজের দিকে পথ প্রদর্শনকারী তার আমলকারীর সমান ফল পাবে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٤٧٢ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَحْمَلَهُ فَقَالَ مَا عِنْدِى مَا اَحْمِلُكَ عَلَيْهِ وَلٰكِنْ سَاَدُلُّكَ عَلٰى مَنْ يَحْمِلُكَ اِنْطَلِقْ اِلٰى مَقْبَرَةِ بَنِى فَلَانٍ فَاِنَّ فِيْهَا شَابًّا مِنَ الاَنْصَارِ يَتَرَامٰى مَعَ اَصْحَابٍ لَه وَمَعَهُ بَعِيْرٌلَهُ فَاسْتَحْمَلَهُ فَاِنَّهُ سَيَحْمِلُكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَاِذَا بِه يَتَرَامٰى مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللّٰهِ لَقَدْ قَالَ لِهٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفَ لَهُ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلٰثًا ثُمَّ حَمَلَهُ فَمَرَّبِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ فَاَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ـ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْطَلِقْ فَاِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ ـ

وَفِى رِوَايَةٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَاعِنْدِىَ مِنْ شَئْىٍ اَحْمِلُكَ عَلَيْهِ وَلٰكِنْ اِنْطَلِقْ فِى مَقْبَرَةِ بَنِى فَلَانٍ فَاِنَّكَ سَتَجِدُ ثَمَّهُ شَابًّا مِنَ الاَنْصَارِ يَتَرَامٰى مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ فَاسْتَحْمَلَهُ فَاِنَّهُ

سَيَحْمِلُكَ - فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتّٰى اَتَى الْمَقْبَرَةَ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَاسْتَحْلَفَهُ - فَقَالَ اللّٰهُ الَّذِى لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلَنِى اِلَيْكَ فَاَعْطَاهُ بَعِيْرًا لَهُ فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْطَلِقْ فَاِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ *

হাদীস নং- ৪৭২

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে একটি সওয়ারী চাইলেন। তিনি বললেন ঃ আমার নিকট এমন কোন সওয়ারী নেই যা আমি তোমাকে দিতে পারি। অবশ্য আমি তোমাকে এমন ব্যক্তির কথা বলতে পারি যে তোমাকে সওয়ারী দেবে। অমুক গোত্রের কবরস্থানে যাও, সেখানে একজন আনসারী যুবককে দেখতে পাবে যে তার সাথীদের সাথে তীরন্দাযী করছে। তার সাথে একটি উট রয়েছে। তুমি তার নিকট সেটা চাও। সে তোমাকে এটা দিয়ে দেবে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি সেখানে গমন করল। সেখানে পৌছে দেখতে পেল, ঐ যুবক তার সাথীদের সাথে তীরন্দাযী খেলায় ব্যস্ত। ঐ ব্যক্তি আনসারী যুবককে নবী করীম (সা)-এর নির্দেশের কথা বর্ণনা করলেন। আনসারী যুবক তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করল যে, বাস্তবেই কি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ বলেছেন ? ঐ ব্যক্তি দুই অথবা তিনবার কসম করলেন। তখন আনসারী তাকে উটটি দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি উট নিয়ে নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন এবং তাঁর নিকট সমস্ত কথা বর্ণনা করলেন। তখন নবী করীমে (সা) বলেন ঃ ভালকাজের প্রতি পথ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি ভাল কাজকারীর ব্যক্তির সমান সওয়াব পারে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, এক ব্যক্তি হুযূর (সা)-এর নিকট হাযির হয়ে একটি সওয়ারী চাইলেন। তিনি বললেন। আল্লাহ্র শপথ! তোমাকে দেওয়ার মত কোন সওয়ারী আমার নিকট নেই। তবে তুমি অমুক গোত্রের কবরস্থানে যাও, সেখানে একজন আনসারী যুবককে দেখতে পাবে, সে তার সঙ্গীদের সাথে তীরন্দাযী করছে। তখন ঐ ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে পৌছল, যেখানকার ঠিকানা রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে দিয়েছিলেন এবং আনসারী যুবককে পেয়ে তার নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। আনসারী তার নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করল। সে বলল, শপথ ঐ আল্লাহ্র, যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তোমারই নিকট পাঠিয়েছেন। তখন আনসারী তাকে উটটি দিয়ে দিল। ঐ ব্যক্তি উট নিয়ে নবী করীম (সা)-এর নিকট হাযির হলেন। নবী করীম (সা) তাকে বললেন ঃ এবার চলে যাও, নিশ্চয়ই উত্তম ও নেককাজের দিকে পথপ্রদর্শনকারী ঐ কাজে আমলকারীর মতই পূণ্যলাভ করবে।

ব্যাখ্যা ঃ আঁ হযরত (সা) স্বীয় পবিত্র সত্তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যেহেতু তিনি উত্তম কাজের দিকে পথ-প্রদর্শন করেছেন এবং আবেদনকারীকে এমন এক ব্যক্তির সংবাদ দিয়েছেন যার কাছ থেকে তার উদ্দেশ্য সফল হবে। তাই হুযূর (সা)-ও সে সওয়াব পাবেন যা আনসারী উট দান করে লাভ করেছে।

٤٧٣ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ *

হাদীস নং- ৪৭৩

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক (সা) বলেছেন ঃ যালিম বাদশাহ্র সামনে সত্য কথা বলা উত্তম জিহাদ।

ব্যাখ্যা ঃ উত্তম জিহাদ এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে যে, প্রচলিত জিহাদে মুসলমান তাদের ঐক্যবদ্ধ ও সামরিক শক্তি, শান-শওকত ও জাঁকজমকের অধিকারী হয়ে থাকে। জয়-পরাজয় উভয়ের সম্মুখীন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যালিম ও অত্যাচারী বাদশাহ্র সম্মুখে সত্য বলা অত্যন্ত সহায়হীন ও অসমর্থ অবস্থায় হয়ে থাকে। শুধু ধ্বংস ও মৃত্যুর চিত্র তার সামনে থাকে। কিন্তু এ দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তি শুধু তার দীন, মর্যাদাবোধ ও চেতনার কারণে স্বীয় জীবন নিয়ে খেলে থাকে এবং সত্য বলার সাহসিকতা প্রদর্শন করে। সুতরাং এটা হলো উত্তম জিহাদ।

٤٧٤ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِسْتَشَارَكَ فَاَشِرْهُ بِالرُّشْدِ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خُنْتَهُ *

হাদীস নং- ৪৭৪

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার নিকট পরামর্শ চায়, তাকে সৎ পরামর্শ দাও। যদি তুমি এটা না কর, তাহলে তুমি তার অধিকারের মধ্যে খেয়ানত করলে।

ব্যাখ্যা ঃ মূল কথা হলো, যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়, তাকে আমানতদার মনে করা হয় এবং তার উপর পূর্ণ ভরসা করা হয়। যদি এখন ঐ ব্যক্তি অবিশ্বাসের প্রমাণ দেয় এবং সঠিক ও উত্তম পরামর্শ না দিয়ে কৃপণতা করে অথবা ভুল পথ প্রদর্শন করে, তাহলে সে খেয়ানতকারী হয়ে যাবে। এ জন্য হুযূর (সা) এরূপ ব্যক্তিকে খেয়ানতকারী বলেছেন।

٤٧٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ

يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ جَسَدٍ وَاحِدٍ اِذَا اشْتَكَى الرَّاسُ تَدَاعَى لَه سَائِرَهُ بِالْهَرِ وَالْحُمّٰى *

হাদীস নং- ৪৭৫

অনুবাদ ঃ হযরত নু'মান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এটা বলতে শুনেছি যে, মু'মিনদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বত ও সম্পর্কের উদাহরণ হলো একটি দেহের মত যেমন মাথায় যখন ব্যথা হয়, তখন সমস্ত দেহে ব্যথা ও জ্বর অনুভূত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ সত্যিকার মু'মিন বান্দাদের পরস্পরের মধ্যে এমন মহব্বত ও সহানুভূতি থাকে যে, একজনের দুঃখ ও বিপদে সবাই অস্থির ও চিন্তিত হয়ে যায়। যদি একজন আনন্দিত হয়, তবে সবাই আনন্দিত হয়।

٤٧٦ – حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَازَالَ جِبْرِئِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ يُوَرِّثُهُ وَمَا زَالَ جِبْرِئِيْلُ يُوصِيْنِىْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّ خِيَارَ اُمَّتِىْ لاَ يُنَامُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً *

হাদীস নং- ৪৭৬

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার (সদ্ব্যবহার) সম্পর্কে এমনিভাবে ওসীয়ত করতে থাকেন যে, আমার ধারণা হলো যেন, তাদেরকে মীরাস প্রদানের ব্যাপারে নির্দেশ হতে পারে এবং হযরত জিবরাঈল (আ) অব্যাহতভাবে আমাকে (ইবাদতে) রাত্রি জাগরণের জন্য ওসীয়ত করতে থাকেন, যার ফলে আমার মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, আমার উম্মতের মধ্যে উত্তম লোকজন খুব কমই শয়ন করবে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে দু'টি বিষয়ের গুরুত্বের প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমত প্রতিবেশীর অধিকারের কথা বলা হয়েছে। হযরত জিবরাঈল (আ) প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উত্তম ব্যবহার করার জন্য বার বার এমন জোর দিয়েছেন যে, আঁ হযরত (সা)-এর মধ্যে আশংকা সৃষ্টি হয়েছে, হয়তো প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারীদের থেকে অংশ মিলতে পারে। তিবরানী নামক গ্রন্থে মুআবিয়া ইব্ন হায়দা এবং হযরত মু'আয (রা) থেকে মরফূ হাদীসে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তার সেবা কর, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ কর। যদি কর্জের প্রত্যাশী হয়, তা হলে তাকে কর্জ দিয়ে সহযোগিতা কর। যদি খারাপ অবস্থা হয়, তাহলে তাকে গোপনে সাহায্য কর। যদি তার

কোন আনন্দের বিষয় হয়, তা হলে তাকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন কর। যদি বিপদগ্রস্থ হয়, তাহলে দুঃখ প্রকাশ কর। স্বীয় দালান তার দালান থেকে উঁচু করো না। কেননা এতে তার বাতাস বাধাগ্রস্থ হতে পারে। হযরত মু'আয (রা)-এর হাদীসে এ বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে যে, যদি তোমরা ফল ক্রয় কর, তাহলে তাদের জন্য কিছু নিয়ে নাও। নতুবা প্রতিবেশীর শিশুগণের মধ্যে তোমার ফল দেখে এটা পাওয়ার লোভ বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো রাত্রি জাগরণ এবং তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা। ফরযের পর এ ইবাদত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যন্ত পসন্দনীয়। পবিত্র কুরআনে এর প্রশংসা করা হয়েছে। রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশে এ ইবাদত অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

٤٧٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ اِغَاثَةَ اللَّهْفَانَ *

হাদীস নং- ৪৭৭

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা অসহায় ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তির প্রার্থনাকে খুব পসন্দ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি কোন দুঃখী ও বিপদগ্রস্থ মানুষের সমব্যথী হয় ও তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে এবং সাহায্য করে ও তার বিপদ দূর করে, এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা খুব পসন্দ করেন। কেননা তিনি নিজেও বিপদগ্রস্থ লোকদের সাহায্যকারী।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ

কাল বা সময়কে গালি দেয়া নিষেধ

٤٧٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ *

হাদীস নং- ৪৭৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সময় ও কালকে খারাপ বলো না বা গালি দিও না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা হলেন যুগ বা সময় ও কাল।

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন অজ্ঞ ও নির্বোধ লোক দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে তিক্ততার কারণে সময় বা কালের উপর লা'নত, নিন্দা বা গালাগালি করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বাস্তবে এ গর্হিত ও অশোভনীয় কথা জ্ঞান ও বিবেক সমর্থন করে না। কেননা যদিও যুগ বা কাল দুনিয়ার ঘটনাবলীর

উপর কোন প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া রাখে, তবুও তাকে খারাপ বলার কোন অর্থ হয় না। কেননা প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তনে কালের কোন প্রতিক্রিয়া নেই, কাল বা যুগ সম্পূর্ণ প্রভাবহীন। সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌র রাব্বুল আলামীন করে থাকেন। সমস্ত কিছুই তাঁর অধীনে ও ক্ষমতার মধ্যে এবং প্রতিটি কাজ হিকমত ও কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত যা তিনিই খুবই ভাল জানেন এবং বুঝেন। মানুষের কি শক্তি আছে যে, তাঁর গুপ্ত রহস্য ভেদ করে এবং তাঁর কলা-কৌশল ও হিকমত পর্যন্ত পৌছতে পারে ? তাই যুগ, কাল বা সময়কে খারাপ বলা জ্ঞান ও বিবেক বিরোধী এবং মাযহাবেও নিষেধ রয়েছে।

٤٧٩ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَلِدْتُ سَنَةَ ثَمَانِيَنِ وَقَدِمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ (رض) صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُوْفَةَ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَتَسْعِيْنَ وَرَأَيْتُه وَسَمِعْتُ مِنْهُ وَاَنَا ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حُبُّكَ الشَّىْءِ يُعْمِى وَيُصِمُّ *

হাদীস নং- ৪৭৯

অনুবাদ ঃ হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, আমি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবা হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (রা) ৯৪ হিজরীতে কূফায় আগমণ করেন। আমি তাঁকে দেখেছি এবং চৌদ্দ বছর বয়সে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি ঃ কোন বস্তুর মহব্বত তোমাকে অন্ধ ও বধির করে দিতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মানুষের ইন্দ্রিয় সেবা ও অমোঘ চাহিদার এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার কথা বলে এর অনিষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে আত্মার কামনা-বাসনা এবং ফিতনা ও বিপদ থেকে মুক্ত থাকা উচিত।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشَّمَاتَةِ

কারো বিপদে আনন্দ প্রকাশ করা নিষেধ

٤٨٠ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ وَاَثِلَةَ بْنَ الاَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَتُظْهِرَنَّ شَمَاتَةً لاَخِيْكَ فَيَعَافِيْهِ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ اللّٰهُ *

হাদীস নং- ৪৮০

অনুবাদ ঃ হযরত ওয়াসিলা ইব্‌ন আসকা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) বলতে শুনেছি

যে, তুমি তোমার ভাই-এর (বিপদে) আনন্দ প্রকাশ করো না, নতুবা আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বিপদ তার থেকে দূর করে তোমাকে উক্ত বিপদে জড়িত করে দেবেন।

ব্যাখ্যা ঃ একজন মুসলমান ভাই-এর বিপদ-আপদে কোন মানুষের আনন্দ প্রকাশ করা মানবতা, ভদ্রতা, বিবেক, জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা বিরোধী কাজ। এটাও কোন অসম্ভব বা দূরের ব্যাপারে নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ শিষ্টাচার বিরোধী কাজের প্রতিশোধে দুঃখী মানুষের দুঃখ লাঘব করে আনন্দ প্রকাশকারীকে ঐ বিপদে নিপতিত করতে পারেন।

كِتَابُ الرِّقَاقِ

আত্মাকে নরমকারী কথাবার্তা

٤٨١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِى الاِنْسَانِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ وَاِذَا سَقِمَتْ سَقِمَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ اَلاَوَهِىَ الْقَلْبُ *

হাদীস নং- ৪৮১

অনুবাদ ঃ হযরত নু'মান ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ মানুষের (দেহের) মধ্যে একটি গোশতের টুকরা আছে। যখন এটা সুস্থ ও সঠিক থাকে, তখন তার সমস্ত দেহ সুস্থ থাকে। যখন এটা অসুস্থ হয়, তখন সমস্ত দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাবধান হও ! এটা (গোশতের টুকরা) হলো দিল বা আত্মা।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের দেহের মধ্যে দিল বা আত্মা হলো এমন একটি বস্তু যার উপর সমস্ত দেহের সুস্থতা নির্ভর করে। কেননা আমলসমূহের ভালমন্দ নিয়্যত ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এবং নিয়্যতের উৎস হলো দিল বা আত্মা। তাই সমস্ত দেহের মধ্যে এটাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি এটা সঠিক হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত কিছু ঠিক থাকে, আর এটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবে।

٤٨٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاشَبِعْنَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا مِنْ خُبْزٍ مُتَتَابِعًا حَتّٰى فَارَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَازَالَتِ الدُّنْيَا عَلَيْنَا كُدْرَةً عَسِيْرَةً حَتّٰى فَارَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا فَلَمَّا فَارَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا صُبَّتْ عَلَيْنَا صَبًّا -

وَفِى رِوَايَةٍ صُبَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا صَبًّا -

وَفِى رِوَايَةٍ مَا شَبِعَ الُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ مِنْ خُبْزِالْبُرِّ *

হাদীস নং- ৪৮২

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা অনবরত তিন দিন তিন রাত্র কখনো পেটপুরে তৃপ্তি সহকারে রুটি খেতে পারিনি। এমনি অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা) আমাদের থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। অভাব-অনটন সর্বদা আমাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখে। অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (সা) আমাদের থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পর দুনিয়া আমাদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

কোন কোন বর্ণনায় صُبَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا صَبًّا এর পরিবর্তে صُبَّتْ عَلَيْنَا صَبًّا উল্লেখ রয়েছে।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবার-পরিজন তিন দিন অনবরত কখনো পেটপুরে তৃপ্তি সহকারে গমের রুটি খেতে পারেননি।

٤٨٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شَكَاةٍ شَكَاهَا فَاِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى عَبَائَةٍ قَطُوَانِيَةٍ وَمِرْفَقَةٍ مِنْ صُوْفٍ حَشْوُهَا اَنْخَرُ فَقَالَ بِاَبِى اَنْتَ وَاُمِّى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كِسْرٰى وَقَيْصَرُ عَلَى الدِّيْبَاجِ فَقَالَ يَاعُمَرُ ! اَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَكُمُ الاٰخِرَةُ - ثُمَّ اِنْ عُمَرَ (رضـ) مَسَّهُ فَاِذَا هُوَ فِى شِدَّةِ الْحُمّٰى فَقَالَ تَحْمِ هٰكَذَا وَاَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ - فَقَالَ اِنْ اَشَدَّ هٰذِهِ الاُمَّةِ بَلَاءً نَبِيُّهَا ثُمَّ الاَخْيَرُ ثُمَّ الاَخْيَرُ وَكَذٰلِكَ كَانَتِ الاَنْبِيَاءُ قَبْلَكُمْ وَالاُمَمُ *

হাদীস নং- ৪৮৩

অনুবাদ ঃ হযরত আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত একবার, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন। এ সময় তিনি রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং একটি কাতওয়ানী অমসৃণ চাদর গায়ে শায়িত ছিলেন, তাঁর বালিশটি ছিল পশমের, যার ভিতরে ছিল

ইযখির নামক ঘাস। হযরত উমর (রা) বললেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হোক, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিস্‌রা ও কায়সার (ইরান ও রোম অধিপতির উপাধী) বাদশাহ্ রেশমী গালিচায় (শয়ন করে) থাকে, আর আপনি এ অবস্থায়! হুযূর (সা) বললেন ঃ হে উমর! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হতে পার না যে, এ কাফিরদের জন্য হলো (অস্থায়ী) দুনিয়া এবং তোমাদের জন্য পরকালের (স্থায়ী সুখ)।

অতঃপর হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা) -এর পবিত্র দেহ স্পর্শ করে দেখতে পেলেন, তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত। তখন তিনি বললেন, আপনি এরূপ মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত অথচ আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল ! তখন তিনি বললেন, এ উম্মতের মধ্যে কঠোর পরীক্ষা হলো তাদের নবীর জন্য, এরপর একটু কম নেককারদের জন্য, অতঃপর অপেক্ষাকৃত কম নেককারদের জন্য, তোমাদের পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের উম্মতদের ছিল এ অবস্থা।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, দুনিয়াতে মুমিনের ঈমানী শক্তি অনুয়ায়ী পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। যার ঈমানী শক্তি বেশি, তিনি কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এমন কি কঠোর স্তর অতিক্রম করে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়ে যান। যেমন তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

فَمَا بَرِحَ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتّٰى يَتْرُكَهُ يَمْشِى عَلَى الْاَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ -

"বান্দার উপর সর্বদা বা অব্যাহতভাবে বিপদ পতিত হয়ে থাকে, ফলে সে দুনিয়াতে এভাবে চলাফেরা করে যে, গুনাহ্ থেকে সম্পূর্ণ হালকা হয়ে যায়।"

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ
অপরাধ অধ্যায়

بَابُ الْجِنَايَاتْ
অপরাধের বর্ণনা

٤٨٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَفَاعَنْ دَمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ *

হাদীস নং- ৪৮৪

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রক্ত অর্থাৎ হত্যার অপরাধ ক্ষমা করে, তার পুরস্কার হলো একমাত্র বেহেশত।

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীসে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে ঃ

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ـ

"মন্দের শাস্তি বা বদলা মন্দ দ্বারা হয়, অতঃপর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং সন্ধি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্র উপর অর্থাৎ আল্লাহ পাক তার প্রতিদান দেবেন।"

٤٨٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دِيَةِ الْيَهُوْدِىِّ وَالنَّصْرَانِىِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ *

হাদীস নং- ৪৮৫

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারাদের রক্তমূল্য মুসলমানদের মতই সমান।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে দিয়্যত (دیت) বা রক্তমূল্যের মাসয়ালা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিক (রা)-এর মতে ইয়াহূদী ও

নাসারাদের রক্তমূল্য মুসলমানের রক্তমূল্যের অর্ধেক। অর্থাৎ ছ' হাযার দিরহাম। কেননা তাঁর মতে পূর্ণ দিয়্যত বা রক্তমূল্য হলো বার হাযার দিরহাম।

হযরত ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে, ইয়াহূদী ও নাসারাদের রক্তমূল্য এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ চার হাযার দিরহাম।

হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা)-এর মতে ইয়াহূদী ও নাসারাদের রক্তমূল্য ও আযাদ মুসলমানের রক্তমূল্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যেকের জন্য একই রক্তমূল্য অর্থাৎ দশ হাযার দিরহাম। কেননা তাঁর মতে পূর্ণ রক্তমূল্যের পরিমাণ এটা। ইমাম মালিকের মাযহাবের পক্ষে সুনানে আরবাআ (তিরমিযী আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ) আমর ইব্ন শুআয়ব (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ "মুআহিদ বা চুক্তিকারীর রক্তমূল্য হলো আযাদের অর্ধেক।"

তিরমিযী শরীফে বণিত আছে ঃ عَقْلَ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ "কাফিরের রক্তমূল্য মু'মিনের অর্ধেক।"

ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর মাযহাবের স্বপক্ষে স্বীয় মুসনাদে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ইয়াহূদী ও নাসারার রক্তমূল্য চার হাযার দিরহাম এবং মজূসীর (অগ্নি উপাসক বা যরথুস্ত্রীয় ধর্মের অনুসারী) আট শ' দিরহাম। অথবা তিনি মুসান্নিফে ইব্ন আবদুর রাযযাকে আমর ইব্ন শুআয়বের সূত্রে মরফূ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اَرْبَعَةَ الاَفٍ ـ

"রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক ঐ মুসলমানের উপর চার হাজার দিরহাম রক্তমূল্য প্রদান ওয়াজিব করেছেন যে কোন আহলে কিতাবকে হত্যা করবে।"

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাবের স্বপক্ষে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন যে, আহলে কিতাব ও মুসলমানের রক্তমূল্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ হাদীসের সনদে কোন সন্দেহ এবং অর্থের কোন জটিলতা নেই। অধিকন্তু এ হাদীস হলো মরফূ। এ ছাড়া আবূ দাউদ মারাসিলে (مراسيل) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ دِيَةُ كُلِّ ذِى عَهْدٍ فِى عَهْدِه اَلْفُ دِيْنَارٍ "প্রত্যেক চুক্তিকারীর রক্তমূল্য চুক্তির সময়ে এক হাযার দীনার।" অতঃপর একই হাদীস হযরত ইমাম শাফিঈ (র) হযরত সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব থেকে মওকুফ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী শরীফে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى الْعَامِرِيْنِ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ لَهَا عَهْدٌ مِّنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

"নবী করীম (সা) মুসলমানের সমপরিমাণ আমেরাইনের রক্তমূল্য আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ

(সা)-এর সাথে তাদের চুক্তি ছিল।" অন্য সহীহ রিওয়ায়েতে এর প্রমাণ রয়েছে যে, হুযূর (সা) এবং খুলাফায়ে রাশেদার পবিত্র সময়ে এ বিধানই প্রচলিত ছিল। এমনকি হযরত মুআবিয়া (রা)-এর শাসনকালে এটা প্রচলিত ছিল যে, অর্ধেক রক্তমূল্য নিহতের উত্তরাধিকারীদেরকে এবং বাকী অর্ধেক বায়তুলমালে জমা করা হতো। সুতরাং আবূ দাউদ স্বীয় মারাসিলে (مراسيل) রাবিয়াতুর-রায়-এর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

كَانَ عَقْلُ الذِّمِّيِّ مِثْلَ عَقْلِ الْمُسْلِمْ فِى زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَمَنِ اَبِىْ بَكْرٍ وَزَمَنِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ الْحَدِيْثُ ـ

"রাসূলুল্লাহ (সা), হযরত আবূ বকর, হযরত উসমান (রা)-এর পবিত্র যুগে যিম্মীদের রক্তমূল্য মুসলমানদের সমপরিমাণ ছিল। এবং এটা হযরত মুআবিয়া (রা)-এর শাসনকালের প্রথমভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।"

আবদুর রাযযাক ও ইমাম যুহরী থেকে একই হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ اِنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لِيَكُوْنَ دِمَائُهُمْ كَدِمَائِنَا وَاَمْوَالُهُمْ كَاَمْوَالِنَا "তারা (চুক্তিকারী ইয়াহূদী ও নাসারা) এ জন্য জিযিয়া প্রদান করত, যাতে তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মত এবং তাদের মাল আমাদের মালের সমপরিমাণ মূল্য হয়।"

এ হাদীস তো সমস্ত বিতর্কের অবসান করে দিয়েছে এবং এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, যিম্মীদের রক্তমূল্য এবং মুসলমানদের রক্তমূল্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং হুযূর (সা) ও খুলাফায়ে কিরামের আমলের দ্বারা সহীহ সনদের মরফূ, মারাসিল ও মওকুফ হাদীসের দৃষ্টিতে বিশ্বস্ততা প্রতীয়মান হয়। কেননা অন্য দু'জন আয়িম্মার হাদীসসমূহ প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধতা এবং সূত্রের আধিক্যের মধ্যে এ মর্যাদা নেই। যদি প্রতিপক্ষ মারাসিলে ইরসালের (ارسال) দোষক্রটি বের করে এবং মওকুফের মধ্যে মওকুফ হওয়া প্রকাশ করে যে, মারাসিল সর্বসম্মতিক্রমে মকবূল বা গ্রহণযোগ্য। এ ছাড়া ঐ মওকুফ হাদীস, যাতে কিয়াসের কোন অবকাশ নেই, তা মরফূ হাদীসের বিধানের অন্তর্ভুক্ত এবং এতে কিয়াসের এজন্য অধিকার নেই যে, উভয়ের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য নেই যে, কিয়াস করা যাবে। অতঃপর কিয়াসও হানাফী মাযহাবের পক্ষ সমর্থন করে। কেননা বিভিন্ন দলীল যখন পরস্পর বিরোধী হয়, তখন সতর্কতা অবলম্বন করা জ্ঞান ও রিওয়ায়েতের অতি নিকটবর্তী এবং এ সতর্কতা (احتياط) হানাফী মাযহাবে রয়েছে, যা অন্য মাযহাবে নেই।

٤٨٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيُسْتَقَادُ مِنَ الْجَرَاحِ حَتّٰى تَبْرَأَ *

হাদীস নং- ৪৮৬

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আহতকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আহত ব্যক্তির ক্ষত ভাল না হয়।

ব্যাখ্যা ঃ যখন কোন ব্যক্তি কাউকে আহত করে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তার ক্ষত ভাল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আহতকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। এ মাসয়ালার ব্যাপারেও ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফিঈ (র)-এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মত আহত করার পরই আহতকারী থেকে বদলা বা কিসাস আদায় করতে হবে। কেননা এতে কিসাসের কারণ পাওয়া গিয়েছে। তাই এখন বিলম্বের প্রয়োজন নেই। তিনি এটাকে নিহত ব্যক্তির কিসাসের উপর অনুমান করেছেন যে, এতে বিধান এরূপই রয়েছে।

কিন্তু উল্লেখিত অন্যান্য আয়িম্মা এ মত পোষণ করেন যে, ক্ষত অবস্থায় সাথে সাথে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না ,বরং ক্ষত ভাল হওয়ার অপেক্ষা করতে হবে। তাঁদের ধারণা বা মত কয়েকটি যুক্তিপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে। তাঁরা বলেন, ক্ষত বা যখমের মারাত্মক বা হালকা হওয়ার ব্যাপারে শেষ ফল বা অবস্থার দ্বারা উপলব্ধি করা যায় কিন্তু বর্তমান অবস্থার দ্বারা নয়। যে ক্ষত এখন সামান্য ও হালকা দৃষ্টিগোচর হয়, যদি তা ভবিষ্যতে মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং আহত ব্যক্তির জীবনায়ূ শেষ হয়ে যায়, তাহলে আহতকারী ব্যক্তি তার হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এটাও সম্ভব যে, জখম একটি সীমায় পৌছে ভাল হয়ে যাবে। এটা বর্ণনার একটি দিক। অন্যদিকে রিওয়ায়েতও এর সমর্থন করে। দারে কুতনী এবং বায়হাকী হযরত জাবির (রা) থেকে হাদীস. বর্ণনা করেন যে, জখমের পরিমাণ ঠিক করতে হবে। এরপর এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অতঃপর বাস্তব অবস্থা জেনে তদনুযায়ী ফয়সালা দিতে হবে। দারে কুতনীর রিওয়ায়েতের সূত্রে ইয়াযিদ ইব্ন আয়ায এটাকে পরিত্যক্ত (متروك) বলে হাদীসকে مجروح বা সন্দেহযুক্ত করে ফেলেন। বায়হাকীর সনদের সূত্রের মধ্যে ইব্ন লাহ্ইয়া রয়েছেন। তিনি তাঁকে সন্দেহজনক বলে চিহ্নিত করেছেন অথচ তিনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। যাক, আমরা একথা বলছি যে, মাযহাবের দলীল হিসেবে প্রমাণের জন্য হযরত শা'বীর সূত্রে বর্ণিত ইমাম আবূ হানীফা (র) বর্ণিত হাদীস কোন অংশে কম নয়।

بَابُ الأَحْكَامِ

আহকামের বর্ণনা

٤٨٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ اَلاِمَارَةُ اَمَانَةٌ وَهِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ اِلاَّمَنْ اَخَذَهَا مِنْ حَقِّهَا وَادَّى الَّذِى عَلَيْهِ وَاَنَّى ذٰلِكَ ـ

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى عَسَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاِمَارَةُ اَمَانَةٌ وَهِىَ

يَوْمِ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ اِلاَّ مَنْ اَخَذَهَا مِنْ حَقِّهَا وَاَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ وَاَنَّى ذٰلِكَ يَا اَبَا ذَرٍّ *

হাদীস নং- ৪৮৭

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হে আবূ যর! ইমারত (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা) হলো একটি আমানত এবং কিয়ামতের দিন হবে লাঞ্ছনা, অপমান ও অনুশোচনার কারণ। কিন্তু (ঐ ব্যক্তির জন্য লাঞ্ছনা ও অপমানকর নয়) যে ব্যক্তি ইমারত ও রাষ্ট্রের হক আদায় করে এবং যে দায়িত্ব তার উপর অর্পিত ছিল, তা যথাযথভাবে আদায় করে। রাষ্ট্রের এ হক ও যিম্মাদারী আদায় হয় কোথায় ?

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ ইমারত (امارت) হলো একটি আমানত। এটাই কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তার উপর অর্পিত হক ও যিম্মাদারী সঠিকভাবে পালন করবে (তার জন্য লাঞ্ছনার কারণ হবে না)। অতঃপর হুযূর (সা) বললেনঃ এ দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় হয় কোথায়?

ব্যাখ্যা ঃ তিবরানী ও বাযযার সহীহ সনদের দ্বারা হযরত আউফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ

اَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ وَثَانِيهَا زَرَامَةٌ وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّمَنْ عَدَلٍ -

"ইমারতের প্রারম্ভে হলো নিন্দা ও ভর্ৎসনা, দ্বিতীয় স্তরে হলো অপমান এবং তৃতীয় স্তরে হলো কিয়ামতের শাস্তি।" তবে ঐ ব্যক্তি, যে ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে (তার জন্য নিন্দা, অপমান ও শাস্তির ভয় নেই)।"

মুসলিম শরীফেও একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে উক্ত হাদীসের প্রারম্ভে এ বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে যে, হযরত আবূ যর (রা) হুযূর (সা)-এর নিকট আবেদন করে বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাকে কোথাও কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা বা গভর্নর নিয়োজিত করেন না কেন ? তিনি তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন ঃ হে আবূ যর! তুমি দুর্বল। অতঃপর হাদীসে বর্ণিত বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। মোটকথা এ হাদীসে রাষ্ট্র, শাসন কর্তৃত্ব, আধিপত্বের গুরুত্ব ও দায়িত্বের সঠিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যারা রাষ্ট্রকে খেল-তামাশা মনে করে এটাকে দুনিয়ার আনন্দ উল্লাস এবং জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যম তৈরি করে নেয়, তাদের জন্য এক মারাত্মক চাবুকের আঘাতের মত যে, রাষ্ট্র ক্ষমতাকে যেখানে আমানত বলা হয়েছে, এর হক বা দাবি সঠিকভাবে যে আদায় না করে, তাকে খেয়ানতকারী বলা হয়েছে, সুতরাং এরূপ ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হবে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে।

এ ছাড়া এ আমানত খুব সাধারণ নয়। হাকিম বা বিচারকের কাঁধের উপর আল্লাহ্র হক আদায়ের বোঝা অর্পিত হয়ে থাকে এবং অসংখ্য লোকের অধিকারের দায়িত্বও তার উপর থাকে। তাই এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে আছে, যে এ সমস্ত হক ও অধিকারসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করে এবং এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ? তাই আঁ হযরত (সা) বলেছেন ঃ وَاَنَّى ذٰلِكَ "এরূপ কোথায় হয় ?" কেননা হাযারের মধ্যে একটি বের হলে তা না হওয়ার মতই। কোন কোন

উলামায়ে কিরামের মত হলো এই যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ (৩৩ ঃ ৭২)-এর দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ আমানত বলতে রাষ্ট্র বা হুকুমতকে বুঝানো হয়েছে এবং এতেও ঐ আমানতের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যদি মানুষের মন ও মস্তিষ্কে রাষ্ট্রের এ গুরুত্বের বিষয়টি বসে যায়, তা হলে মানুষ রাষ্ট্রের যিম্মাদারী নিতে এরূপ ভয় করত, যেরূপ মৃত্যুকে ভয় করে থাকে।

٤٨٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَرْفَعَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِمَامٌ عَادِلٌ *

হাদীস নং- ৪৮৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী হবে ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ।

ব্যাখ্যা ঃ যালিম, অত্যাচারী ও নির্দয় বাদশাহর নিন্দা এবং ন্যায় বিচারক ও দয়ালু বাদশাহ্র প্রশংসায় অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। তিবরানী কবীরে এবং বায়হাকী শুআবুল ঈমানে হযরত আবূ বাকরা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, পৃথিবীতে বাদশাহ্ হলো আল্লাহ্র ছায়া। যে তার সম্মান করলো, সে যেন আল্লাহ্র সম্মান করলো। যে তার অবমাননা করে, সে যেন আল্লাহ্র অবমাননা করলো। বাযযার স্বীয় মুসনাদে এবং বায়হাকী শুআবুল ঈমানে হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, দুনিয়ায় বাদশাহ হলো আল্লাহ্র ছায়া। যার নিকট আগমণ করে আল্লাহ্র মযলূম বা নির্যাতীত বান্দারা আশ্রয় গ্রহণ করে। সুতরাং তিনি যদি ন্যায় বিচার করেন, তাহলে তার জন্য পুরস্কার ও সওয়াব রয়েছে এবং প্রজাদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যদি বাদশাহ যুলুম ও অত্যাচার করে, তাহলে এর জন্য পাপী হবে এবং প্রজাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে। হাকিম বা বিচারকগণ যখন যুলুম করে, তখন আকাশ দূর্ভিক্ষের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং যখন যাকাত বন্ধ করে দেয়া হয়, তখন গবাদি পশু ধ্বংস হতে থাকে।

বায়হাকী শুআবুল ঈমানে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, বাদশাহ হলো আল্লাহ্র ছায়া। যে ব্যক্তি এর থেকে দূরে অবস্থান করবে, সে বিপথগামী হবে। যে এর থেকে নসীহত গ্রহণ করবে, সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আবূ নুআঈম হিলয়াতুল আওলিয়া গ্রন্থে হযরত ওয়াসিলা (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন যে, চার ব্যক্তির দু'আ আল্লাহ্পাকের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। প্রথম ন্যায় বিচারক নেতা, দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে তার ভাই-এর অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করে থাকে, তৃতীয় মযলূম ও নির্যাতীত, চতুর্থ যে তার পিতামাতার জন্য দু'আ করে। নাসাঈ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা চার ব্যক্তিকে অত্যন্ত ঘৃণা ও অপসন্দ করেন। প্রথম শপথকারী ব্যবসায়ী, দ্বিতীয় অহংকারী ফকীর, তৃতীয় ব্যভিচারকারী বৃদ্ধ, চতুর্থ অত্যাচারী বাদশাহ। বর্ণিত হাদীসের অর্থ ও মর্মানুযায়ী অনেক সহীহ হাদীস অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ قَاضِيَانِ فِى النَّارِ وَقَاضٍ يَقْضِىْ فِى النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيُوْكِلُ بَعْضُهُمْ مَالَ بَعْضٍ وَقَاضٍ يَتْرُكُ عِلْمُهُ وَيَقْضِىْ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَهٰذَانِ فِى النَّارْ - وَقَاضٍ يَقْضِىْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ *

হাদীস নং- ৪৮৯

অনুবাদ ঃ হযরত বুরায়দা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বিচারক (قاضى) তিন প্রকার। এর মধ্যে দু'প্রকার হবে দোযখবাসী। অর্থাৎ এক প্রকার হলো ঐ বিচারক যে কুরআন ও হাদীসের ইল্‌ম ব্যতীত মানুষের মধ্যে ফয়সালা দিয়ে থাকে এবং একজনকে অন্যজনের মাল নাহকভাবে ভোগের ব্যবস্থা করে দেয়। দ্বিতীয় ঐ বিচারক যে তার ইল্‌ম ত্যাগ করে (বা ভুলে যায়) এবং অন্যায়ভাবে ফয়সালা প্রদান করে। সুতরাং এ দু'প্রকার বিচারক দোযখবাসী হবে। অন্য এক প্রকার বিচারক যিনি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা প্রদান করবেন, তিনি হবেন বেহেশতবাসী।

ব্যাখ্যা ঃ আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ ও অন্যান্য কিতাবে সামান্য সংক্ষিপ্ত আকারে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে,

اَلْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ اِثْنَانِ فِى النَّارِ وَوَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهِ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحَقِّ فَهُوَ فِى النَّارِ -

"বিচারক তিন প্রকার, দু' প্রকার হবে দোযখবাসী এবং এক প্রকার বেহেশতবাসী। বেহেশতবাসী হবেন ঐ ব্যক্তি যিনি হক বা অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তদনুযায়ী মীমাংসা প্রদান করেছেন। এছাড়া যে ব্যক্তি অজ্ঞতার সাথে লোকজনের মধ্যে ফয়সালা দান করে, সে হবে দোযখবাসী এবং যে ব্যক্তি হক বা অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে কিন্তু হক প্রদানে যুলুম করেছে, সেও দোযখবাসী হবে।"

যে ব্যক্তি হক ও ইনসাফ থেকে দূরে এবং এগুলো অজ্ঞ থেকে ফয়সালা করে, তা হলে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে। এরূপ পথভ্রষ্ট ব্যক্তির শাস্তি দোযখেই হবে এবং যে জেনে বুঝে মন্দ কাজ করে, লোকজনকে পথভ্রষ্ট করে, ভুল ফয়সালা দেয়, এরূপ ব্যক্তি শুরু থেকেই বড় পাপী। কেননা ইলমকে গোপন করা একটি মারাত্মক পাপ যা তার দিকে

স্বাভাবিকভাবেই আরোপিত হয় এবং যার শাস্তি স্বরূপ সে দোযখের উপযোগী হবে। তৃতীয় হলো, যে আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা দিয়ে থাকে এবং লোকজনের মধ্যে আল্লাহ্‌র সত্য নির্দেশ জারী করে থাকে, দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র সত্যিকার খিলাফতের ফরযসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে, এরূপ বিচারক (قاضى) বেহেশতের অধিকারী হবে।

٤٩٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ اَنَّ اَبَاهُ كَتَبَ اِلَيْهِ اِنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَقْضِى الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ *

হাদীস নং- ৪৯০

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা তাঁর কাছে লিখেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এটা বলতে শুনেছেন, কোন হাকিম বা বিচারক ক্রোধের অবস্থায় ফয়সালা দেবে না।

ব্যাখ্যা ঃ বিচারকের জন্য এটা অতীব প্রয়োজন যে, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার সময় তার মন ও মস্তিষ্ক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় থাকতে হবে। কেননা তিনি যদি ভারসাম্যতা পরিত্যাগ করেন, তা হলে অবশ্যই তাঁর মতামত ও ফয়সালা হক ও ন্যায় থেকে দূরে সরে যাবে। ক্রোধের সময় মন ও মেজাজ থেকে ভারসাম্য হারিয়ে যায়। গরমে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ফয়সালার মধ্যে ও কঠোরতা, রূঢ় মেজাজ ও রুক্ষতা সৃষ্টি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই এ অবস্থায় সিদ্ধান্ত দেয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং ফকীহ্‌গণ এ প্রকৃতিগত বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ হাদীসের আওতায় এ অবস্থায় সিদ্ধান্ত ও ফয়সালা প্রদান করা অবৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং ঐ সময়ে যাতে মানুষের মন ও মস্তিষ্ক স্থির না থাকে। যেমন প্রচন্ড ক্ষুধার সময়, কষ্টদায়ক রোগের কারণে অস্থিরতার সময়, ভয়-ভীতির কারণে আতঙ্কের মধ্যে পতিত হলে, অত্যধিক আনন্দের সময়, নিদ্রারভাব বৃদ্ধি পেলে, মন ও মস্তিষ্কে চিন্তার উদ্রেক হলে, প্রশ্রাব-পায়খানার চাপে অস্থির হলে, অত্যাধিক গরম ও উষ্ণতার কারণে অথবা অধিক শীতে কাতর হলে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা জায়েয নয়।

٤٩١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلٰثَةٍ عَنِ الصَّبِىِّ حَتّٰى يَكْبَرَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَفْتِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلٰثَةٍ عَنِ النَّائِمِ

حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يُفِيْقَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ

হাদীস নং- ৪৯১

অনুবাদ ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে (অর্থাৎ দীনের যিম্মাদারী থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে)। প্রথমত শিশু, যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়। দ্বিতীয়ত পাগল যতক্ষণ পর্যন্ত সে সুস্থ মস্তিষ্ক না হয়, তৃতীয়ত নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাগ্রত না হয়।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, তিন ব্যক্তি থেকে (আমল লেখার) কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে (তাদের উপর শরীয়তের আহকাম জারী হবে না)। নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ জাগ্রত না হবে, পাগল যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ না হবে এবং শিশু যতক্ষণ পর্যন্ত বালেগ বা বয়ঃপ্রাপ্ত না হবে।

ব্যাখ্যা ঃ শরীয়তের বিধান পালনের বিষয়টি মূলত জ্ঞান-বুদ্ধি ও বোধশক্তির উপর নির্ভর করে। এর থেকে এ তিন প্রকার মানুষ বঞ্চিত। তাই এ অবস্থায় দীনের দায়িত্ব পালন থেকে তারা মুক্তি ও পরিত্রাণ পেয়ে থাকে। এ অবস্থায় যদি তাদের উপর শরীয়তের আহকাম পালনের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়, তাহলে এটা হবে ক্ষমতাহীনের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা যা আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দার উপর প্রদান করেন না।

٤٩٢ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الشَّعْبِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ اَوْلٰى بِالْيَمِيْنِ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ *

হাদীস নং- ৪৯২

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন দাবিদার বা ফরিয়াদীর (مدعى) নিকট কোন দলীল পাওয়া না যাবে, তখন বিবাদী (مدعى عليه) থেকে কসম বা শপথ গ্রহণ করা উত্তম।

ব্যাখ্যা ঃ বায়হাকী হযরত উমর (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

اَلْمُدَّعٰى عَلَيْهِ اَوْلٰى بِالْيَمِيْنِ اِلاَّ اَنْ تَقُوْمَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ -

"বিবাদীর জন্য শপথ কিন্তু এটা তখনই হবে যখন দাবিদার তার দাবির স্বপক্ষে স্বাক্ষী পেশ করবে।"

দাবিদারের সাক্ষী পেশ করার পর বিবাদী থেকে শপথ নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বায়হাকী হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে মরফূ হাদীস রিওয়ায়েত করেন ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى اللّٰهُ بِدَعْوَاهُمْ

لاَدَّعى رِجَالٌ اَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَائَهُمْ وَلٰكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعى وَالْيَمِيْنَ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ -

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যদি আল্লাহ্ তা'আলা শুধু মানুষের দাবির উপর ফয়সালা দিতেন তাহলে মানুষ দাবি করে অন্য মানুষের মাল-দৌলত নিয়ে নিত এবং তাদের রক্তমূল্য আদায় করতো। কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দাবিদারের উপর সাক্ষী পেশ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অস্বীকারকারীর (مدعى عليه) উপর কসম বা শপথ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।"

এ হাদীস মূলত দু'টি মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালা নিয়ে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর বিরুদ্ধে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এতে শক্ত দলীল রয়েছে। মতপার্থক্যের বিষয় হলো এই যে, দাবি পেশ করার পর সবার মতে দাবিদার থেকে সাক্ষী গ্রহণ করতে হবে। যদি সে শপথ (قسم) করে, তা হলে ফয়সালা তার পক্ষে হবে। যদি সে শপথ করতে অস্বীকার করে, তা হলে ইমাম আবূ হানীফার মতে এরপরও দাবিদারের (مدعى) পক্ষেই ফয়সালা হবে এবং দাবিদার থেকে শপথ নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা মোকাদ্দমার অনুসন্ধানের সর্বশেষ যে দিক ছিল, তা সমাপ্ত হয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, এ অবস্থায় দাবিদারের শপথ করতে হবে। যদি সে শপথ করে, তাহলে সে বিজয়ী হবে অর্থাৎ তার দাবি বলবৎ হবে। অন্যথায় তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদও ইমাম শাফিঈ-এর মত পোষণ করেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, বিবাদী যখন শপথ গ্রহণে অস্বীকার করে, তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে দাবিদারের (مدعى) অনুকূল হলো, সুতরাং তার থেকে শপথ গ্রহণ করা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাবের স্বপক্ষে বর্ণিত হাদীসেসমূহ অকাট্য দলীল। যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাবিদারের যিম্মা শুধু সাক্ষী পেশ করা। শপথের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই এবং বিবাদীর (مدعى عليه) যিম্মায় হলো শুধু শপথ এবং এর সাথেই তার ভাগ্যের সর্বশেষ ফয়সালা। সাক্ষী প্রদানের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ আঁ হযরত (সা) দাবিদার ও বিবাদীর প্রত্যেকের দায়িত্ব বন্টন করে দিয়েছেন। সুতরাং এতে এখন কোন সংযোগ অবশিষ্ট নেই।

তিরমিযী শরীফে হযরত ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ كِنْدَةَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا غَلَبَنِى عَلٰى اَرْضٍ لِى فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِى اَرْضِى وَفِى يَدَىَّ لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِى اَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِى عَلٰى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَىْءٍ

قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ اِلاَّ ذٰلِكَ قَالَ انْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ لَه فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَدْبَرَ لَئِنْ اَدْبَرَ عَلَى مَالِه لِيَاكُلَهُ لَيَلْقَيَنَّ اللّٰهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ -

"তিনি বলেন, হাদরামাউতের একজন বাসিন্দা এবং কিন্দার একজন বাসিন্দা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলো। হাদরামী বললো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ব্যক্তি আমার জমি ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্দাবাসী বললো ঃ এটা আমার জমি, আমার অধিকার আছে, এতে তার কোন অধিকার নেই। তখন হুযূর (সা) হাদরামীকে বললেন ঃ তোমার দাবির স্বপক্ষে তোমার নিকট সাক্ষী আছে কি ? সে বললো ঃ নেই। তখন তিনি তাকে বললেন ঃ এখন এ বিষয়ে তোমার থেকে শপথ (قسم) গ্রহণ করতে হবে। তখন ঐ ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! এ লোকটি হলো মন্দ চরিত্রের। সে ভয় বা চিন্তাই করবে না যে, কিসের উপর সে শপথ করলো। এবং কোন বস্তু থেকে সে মুক্ত থাকে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমার জন্য এখন তারপক্ষ থেকে এটাই আছে (আর কি বা থাকতে পারে)। হযরত ওয়ায়েল (রা) বলেন, ঐ ব্যক্তি শপথের জন্য গেল। ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন ঃ যদি তার মালের উপর শপথ কর যে, তার মাল হজম (ভোগ) করবে, তা হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সাথে এমনিভাবে মিলিত হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুখ ফিরিয়ে রাখবেন।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে কিছু বাক্যের পরিবর্তন সহ এ হাদীস বর্ণিত আছে। সুতরাং এ হাদীসে হুযূর আকরাম (সা)-এর বাণী لَيْسَ لَكَ مِنْهُ اِلاَّ ذٰلِكَ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীকেই শপথ গ্রহণ করতে হবে এবং দাবিদারের পক্ষ থেকে সাক্ষী পাওয়া না গেলে এটা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অতঃপর আরবী ব্যাকরণের নীতিমালা অনুযায়ী হাদীসটি পর্যালোচনা করলেও হানাফী মাযহাবের সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। হযরত ইব্ন আব্বাসের হাদীসের بينة এবং يمين উভয়ের উপর الف ولام এসেছে। এখানে কোন বিশেষ بينة এবং يمين উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এখানে جنس بينة এবং جنس يمين উদ্দেশ্য হবে। এবং جنس بينه এর সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছু দাবিদারের সাথে সুর্নির্দিষ্ট হবে এবং يمين -এর সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছু বিবাদীর জন্য হবে। সুতরাং يمين -এর কোন ব্যক্তি বা অংশকে দাবিদারের (مدعى) জন্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হলো হাদীসের বিরোধিতা করা।

মতপার্থক্যের দ্বিতীয় পর্যায় হলো এই যে, সময়মত যদি দাবিদার সাক্ষী উপস্থিত করতে অসমর্থ হয় এবং একজন মাত্র সাক্ষী উপস্থিত করা সম্ভব হয়, তা হলে ইমাম শাফিঈ-এর মতে তার থেকে শপথ গ্রহণ করতে হবে এবং একজন সাক্ষী ও শপথের কারণে তার পক্ষে রায় দেয়া হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, দাবিদারের (مدعى) জন্য মাত্র দু'টি ব্যবস্থা রয়েছে। হয়ত সে সাক্ষী হিসেবে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা উপস্থিত করবে। যদি এ দুটো ব্যবস্থা করতে অসমর্থ হয়, তা হলে এরপর বিবাদীর উপর কসমের দায়িত্ব পড়বে। কসম বা শপথের সাথে দাবিদারের কোন সম্পর্ক নেই।

শাফিঈ মাযহাবের দলীল হিসেবে মুসলিম শরীফ থেকে বর্ণিত, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ

"রাসূলুল্লাহ (সা) (দাবিদারের পক্ষ থেকে) কসম ও এক সাক্ষীর উপর ফয়সালা দান করেছেন।

হানাফী মাযহাবের জন্য উপরোল্লিখিত হাদীসই শক্তিশালী দলীল। এ ছাড়া পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ (দু'জন পুরুষ সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত কর)– এর উপর আরো জোর সমর্থন করে। উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কোন অবস্থাতেই দাবিদারের শপথের (قسم) সাথে কোন সম্পর্ক নেই, সে সাক্ষী পেশ করুক বা না করুক। না বিবাদীর সাক্ষী পেশ করার সাথে কোন সম্পর্ক আছে, সে শপথ করুক বা না করুক। বুখারী শরীফে ইয়াহূদীর ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ شاهداك اويمينه "হয় তো হে দাবিদার! তোমার সাক্ষীর উপরই ফয়াসালা নির্ভর করে অথবা বিবাদীর শপথের উপর।"

মোট কথা এতদসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় এক জায়গায় জমা হতে পারে না। এ ছাড়া মুসলিম ও তিরমিযীর হাদীস ঃ لَيْسَ لَكَ اِلاَّ فَلَكَ এর সমর্থন করে। অতঃপর এ সমস্ত হাদীস হানাফী ও শাফিঈ সবাই সহীহ বলে মেনে নিয়েছেন। তিরমিযী এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। পক্ষান্তরে কসম এবং এক সাক্ষীর হাদীস غريب (গরীব) বলে মেনে নেয়া হয়েছে। ইয়াহ্হিয়া ইব্ন মুঈন এটাকে বাতিল করে দিয়েছেন। এ ছাড়া হাদীসে দু'স্থানে ইনকিতা' প্রমাণিত হয়েছে। কারো মতে হাদীসের সনদে কায়স নামক যে ব্যক্তি রয়েছেন, তিনি আমর ইব্ন দীনার থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি এবং কারো মতে আমর ইব্ন দীনার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। সুতরাং দারে কুতনী আমর এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মধ্যে তাউসকে নিয়ে এসেছেন। সুতরাং হানাফীদের হাদীস ও এ হাদীসের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং হাদীসের মধ্যে হানাফীদের হাদীসই দলীল হিসেবে শক্তিশালী।

এবার সবচেয়ে শক্তিশালী পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করা হলো। আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى -

"তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী হিসেবে ঠিক কর। যদি দু'জন পুরুষ পাওয়া না যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে নাও যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পসন্দ কর। যাতে এ দু'জন মহিলা থেকে যদি কেউ একজন ভুলে যায়, তাহলে অন্যজন তা স্মরণ করিয়ে দেবে।" (২ ঃ ২৮২)

সুতরাং কে আছে এরূপ ব্যক্তি যে আল্লাহ পাকের কালাম থেকে এক সাক্ষী ও কসমের কথা

হাদীস নং- ৪৯৩

অনুবাদ ঃ এক ব্যক্তি হযরত হাম্মাদের নিকট বর্ণনা করেন, আশআস ইব্ন কায়স হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে একটি গোলাম (দাস) ক্রয় করেন। হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) তাঁর নিকট গোলামের মূল্যের জন্য তাগাদা দেন। এখন আশআস (র) বলেন, আমি দশ হাযার দিরহাম দিয়ে তোমার থেকে গোলাম ক্রয় করেছি। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, আমি বিশ হাযার দিরহামে তোমার নিকট (গোলাম) বিক্রি করেছি। হযরত ইব্ন মাসঊদ আরো বলেন, তুমি আমাকে এবং অন্য কাউকে ফয়সালাকারী নির্ধারণ কর (যার দ্বারা আমাদের বিবাদ মিটে যাবে)। আশআস বলেন, তুমিই আমাদের মধ্যে ফয়সালাকারী হও। সুতরাং হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, (আচ্ছা তাহলে) আমি তোমাকে ঐ ফয়সালা শুনাব যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে (কোন দ্রব্যের) মূল্যের পরিমাণ নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং উভয়ের কোন সাক্ষী না পাওয়া যায়, কিন্তু বিক্রিত দ্রব্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে বিক্রেতার দাবি গ্রহণ করা হবে। সে ঐ বিক্রি ফিরিয়ে নিতে পারবে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের ব্যাখ্যার তেমন কোন প্রয়োজন নেই।

٤٩٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ الاَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ اِشْتَرٰى مِنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) رَقِيْقًا مِنْ رَقِيْقِ الاِمَارَةِ فَتَقَاضَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ فَاخْتَلَفَا فِيْهِ فَقَالَ الاَشْعَثُ اِشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشَرَةِ اٰلاَفِ دِرْهَمٍ - وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بِعْتُ مِنْكَ بِعِشْرِيْنَ اَلْفًا - فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِجْعَلْ بَيْنِى وَبَيْنَكَ رَجُلاً - فَقَالَ الاَشْعَثُ فَاِنِّى اَجْعَلُكَ بَيْنِى وَبَيْنَ نَفْسِكَ - قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاِنِّى سَاَقْضِى بَيْنِى وَبَيْنَكَ بِقَضَاءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ فَاِمَّا اَنْ يَّرْضَى الْمُشْتَرِىْ بِهِ اَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانْ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ اَوْ يَتَرَادَّانِ - زَادَ فِى رِوَايَةِ الْبَيْعَ -

وَفِى رِوَايَةٍ اِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَائِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ اَوْ يَتَرَادَّانِ -

বা বর্ণনা বের করে ? অথচ এ সাক্ষীর ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এতে দু'টি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে যে, হয়ত দাবিদার দু'জন পুরুষ সাক্ষী পেশ করবে অথবা দু'জন পুরুষ সাক্ষী না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা সাক্ষী হিসেবে পেশ করতে হবে। এ ছাড়া তৃতীয় কোন পদ্ধতির কথা ইঙ্গিতেও বলা হয়নি। সুতরাং এ অবস্থাকে জায়েয বলে স্বীকৃতি দেয়া পবিত্র কুরআনের উপর বাড়াবাড়ি করা হবে।

উপরে বর্ণিত আয়াতের সংক্ষিপ্ত তরজমা পেশ করা হয়েছে। এবার একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন তৃতীয় পদ্ধতির যদি সামান্যতম সম্ভাবনা থাকত, তাহলে فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا -এর মাসয়ালার দ্বিতীয় অংশ অসম্পূর্ণ ছাড়া হতো না। বরং বাক্য এরূপভাবে সংযোগ হতো ঃ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا فَرَجُلٌ وَيَمِيْنُ الْمُدَّعِى "যদি একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা সাক্ষী পাওয়া না যায়, তা হলে একজন পুরুষ এবং দাবিদারের শপথ করতে হবে।" অধিকন্তু উভয় পদ্ধতি পেশ করার পর সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ "যে সমস্ত সাক্ষীদেরকে তোমরা পসন্দ কর।" (২ ঃ ২৮২) অথচ বর্ধিত তৃতীয় পদ্ধতিতে সাক্ষী শুধু একটি। কেননা দাবিদার তো কোন অবস্থাতেই সাক্ষী হতে পারবে না। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, ইব্ন শিবরামা বলেন, আবূ যিনাদের সাথে কসম ও এক সাক্ষীর ব্যাপারে আমার আলোচনা হয়েছে, তখন আমি এ আয়াত তিলাওয়াত করি এবং বলি, যখন এক সাক্ষী ও কসম দ্বারা কাজ চলে, তা হলে পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى "একজন মহিলার অন্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার কি প্রয়োজন আছে" ?

মোট কথা আয়াতের মাধ্যমেও হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য ও সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে। পরিশেষে এ স্তরে বাস্তবে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) তিনজন আয়িম্মা থেকে পৃথক হয়ে একাকী যে মতামত পেশ করেছেন, এখানেও তাঁর মতামত যথেষ্ট ভারী ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

٤٩٣ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ اَنَّ رَجُلاً حَدَّثَه اَنَّ الاَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ اشْتَرٰى مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) رَقِيْقًا فَتَقَضَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ الاَشْعَثُ ابْتَعْتُ مِنْكَ بِعَشْرَةِ الاَفٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ بِعْتُ مِنْكَ بِعِشْرِيْنَ اَلْفًا ـ فَقَالَ اجْعَلْ بَيْنِى وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ فَقَالَ الاَشْعَثُ اَنْتَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ـ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اُخْبِرُكَ بِقَضَاءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فِى الثَّمَنِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمَا بَيِّنَةٌ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ اَوْ يَتَرَادَّانِ *

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ الاَشْعَثَ اِشْتَرٰى مِنْهُ رَقِيْقًا فَتَقَاضَاهُ وَاخْتَلَفَا ـ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بِعِشْرِيْنَ اَلْفًا وَقَالَ الاَشْعَثُ بِعَشَرَةِ الاَفٍ – فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ اَوْ يَتَرَادَّانِ *

হাদীস নং- ৪৯৪

অনুবাদ ঃ হযরত কাসিম (র) তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আশআস ইব্ন কায়স হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে একটি গোলাম ক্রয় করেন। হযরত আবদুল্লাহ যখন তাঁর থেকে মূল্য চাইলেন, তখন উভয়ের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হলো। আশআস (র) বলেন, আমি দশ হাযার দিরহাম দিয়ে তোমার থেকে গোলাম ক্রয় করেছি। হযরত ইব্ন মাসঊদ বলেন, আমি বিশ হাযার দিরহামে তোমার নিকট গোলাম বিক্রি করেছি। তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তুমি আমার ও তোমার মধ্যে একজন ফয়সালাকারী নির্ধারণ কর। আশআস বলেন, আমি তোমাকে আমার ও তোমার মধ্যে ফয়সালাকারী নির্ধারণ করলাম। হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, তাহলে আমি আমার ও তোমার মধ্যে ঐ ফয়সালা প্রদান করবো যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মূল্য নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, তখন বিক্রেতার দাবিই গ্রহণযোগ্য হবে। অতঃপর ক্রেতা বিক্রেতার কথায় সম্মত হতে পারে অথবা ক্রয় ফিরিয়ে নিতে বা বাতিল করতে পারে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে কাসিম (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মূল্য নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং বিক্রিত দ্রব্য মজুদ থাকে, তাহলে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে অথবা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয় ফিরিয়ে নেবে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে يَتَرَادَّانِ-এর সাথে البيع শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতানৈক্য হয়, তখন বিক্রেতার দাবিই গ্রহণযোগ্য হবে। অথবা সে ক্রয়কে বাতিল করে দেবে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, আশআস (র) আমার থেকে একটি গোলাম ক্রয় করে। তিনি তার থেকে মূল্য বাবদ টাকা চাইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হলো। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি বিশ হাযার দিরহামে এ গোলাম তোমার নিকট বিক্রি করেছি। আশআস বলেন, আমি দশ হাযার দিরহামে ক্রয় করেছি। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়, তখন বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। সে ইচ্ছা করলে বিক্রয় বাতিল করতে পারবে।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটি পুনরুল্লেখ হয়েছে। কাজেই এখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

٤٩٥ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا اِلَيْهِ فِى نَاقَةٍ وَقَدْ اقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَقَضٰى بِهَا لِلَّذِى فِى يَدِهٖ *

হাদীস নং- ৪৯৫

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, দুই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হয় এবং একটি উটের ব্যাপারে বিবাদ করতে থাকে। উভয়ে এ দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যে, উটটি তার কাছেই জন্মলাভ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) উটটি তাকেই প্রদানের ব্যবস্থা করেন যার অধিকারে তখন সেটা ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ যার অধিকারে উট ছিল, সে এটার মালিক বলে স্বীকৃতি পায়।

٤٩٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ اخْتَصَمَ رَجُلَانِ فِى نَاقَةٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يُقِيْمُ الْبَيِّنَةَ اَنَّهَا نَاقَةٌ فَنَتَجَهَا فَقَضٰى بِهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِى هِىَ فِى يَدِهٖ -

وَفِى رِوَايَةٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَاقَةٍ اَقَامَ هٰذَا الْبَيِّنَةَ اِنَّهُ نَتَجَهَا وَاَقَامَ هٰذَا الْبَيِّنَةَ اِنَّهُ نَتَجَهَا فَجَعَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِىْ هِىَ فِى يَدِهٖ *

হাদীস নং- ৪৯৬

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু'ব্যক্তি একটি উটের মালিকানা নিয়ে বিবাদ শুরু করে। উভয়ে এ বিষয়ে সাক্ষী পেশ করে যে, উটটি তাদের এখানে জন্ম হয়েছে। তখন নবী করীম (সা) উটটি তাকেই দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন– যার অধিকার এটা ছিল।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হাযির হয়ে একটি উটের ব্যাপারে বিবাদ করতে থাকে। একজন এ সাক্ষী পেশ করে যে, এ উট তার কাছে জন্মেছে। অপরজনও এই সাক্ষী পেশ করে যে, উটটি তার নিকটে জন্মেছে। তখন নবী করীম (সা) উট তাকেই দেয়ার নির্দেশ দেন যার অধিকারে সেটি ছিল।

كِتَابُ الْفِتَنِ

ফিতনার বিবরণ

٤٩٧ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى اُمَّتِى فَاِنَّ لِلْجَهَنَّمِ سَبْعَةَ اَبْوَابٍ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ *

হাদীস নং- ৪৯৭

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের উপর যে ব্যক্তি তরবারী কোষমুক্ত করে, তাহলে দোযখের সাতটি দরওয়াযার মধ্যে একটি দরওয়াযা তার জন্য (নির্ধারিত) থাকবে, যে তরবারী কোষমুক্ত করে।

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী শরীফে হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন, হুযূর (সা) বলেছেন ঃ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا (যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।) এটা হলো ভীতি প্রদর্শন ও নির্দেশ, যাতে মুসলমানগণ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার না করে এবং ভাই ভাই-এর রক্ত প্রবাহিত না করে, নিজ শক্তিকে নিজের হাতে ধ্বংস না করে। যেমন কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَلَاتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ (তোমরা পরস্পর বিবাদ কর না, তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যাবে)।

٤٩٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى الْجُلَّاسِ قَالَ كُنْتُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ السَّبَائِى كَلَامًا عَظِيْمًا فَاَتَيْنَابِهِ عَلِيًّا (رضـ) وَنَحْنُ نَهُزُّ عُنُقَه فِى طَرِيْقَتِه فَوَجَدْنَاهُ فِى الرَّحْبَةِ مُسْتَلْقِيًا عَلٰى ظَهْرِه وَاضِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى فَسَاَلَهُ عَنِ الْكَلَامِ فَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ اَتَرْوِيْهِ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ عَنْ كِتَابِه اَوْ عَنْ رَسُوْلِه - فَقَالَ لَا - قَالَ نِعْمَا تَرْوِىْ قَالَ عَنْ نَفْسِى - قَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ رَوَيْتَ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَوْ عَنْ كِتَابِه اَوْ عَنْ رَسُوْلِه ضَرَبْتُ عُنُقَكَ وَلَوْ رَوَيْتَهُ عَنِّى اَوْجَعْتُكَ عُقُوبَةً فَكُنْتَ كَاذِبًا وَلٰكِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ ثَلٰثُوْنَ كَذَّابًا وَاَنْتَ مِنْهُمْ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ اَبِى الْجُلاَّسِ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ السَّبَائِى كَلاَمًا عَظِيْمًا فَاَتَيْنَابِهِ عَلِيًّا (رض) فَوَجَدْنَاهُ فِى الرَّحْبَةِ مُسْتَلْقِيًا ظَهْرَه وَاضِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الاُخْرٰى فَسَأَلَهُ عَنِ الْكَلاَمِ فَتَكَلَّمَ - فَقَالَ اَتَرْوِيْهِ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَوْعَنْ كِتَابِهِ اَوْ عَنْ رَسُوْلِهِ - قَالَ لاَ - قَالَ فَعَمَّنْ تَرْوِيْهِ - قَالَ عَنْ نَفْسِى - قَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْرَوَيْتَ عَنِ اللّٰهِ اَوْ عَنْ كِتَابِهِ اَوْ رَسُوْلِهِ ضَرَبْتُ عُنُقَكَ وَلَوْرَوَيْتَ عَنِّى اَوْ جَعَتُكَ عَقُوْبَةً فَكُنْتَ كَاذِبًا وَلٰكِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ ثَلٰثُوْنَ كَذَّابًا فَاَنْتَ مِنْهُمْ *

হাদীস নং- ৪৯৮

অনুবাদ ঃ আবুল জুল্লাস (র) বলেন, আমি ঐ সমস্ত লোকজনের মধ্যে ছিলাম যারা আবদুল্লাহ ইব্ন সাবাঈ থেকে এক ভয়াবহ কথা শুনেছি। আমরা তাকে আলী (রা)-এর নিকট নিয়ে আসি। পথে তার গর্দানে আমরা কিছু চড়-থাপ্পড়ও দিয়েছি। আমরা হযরত আলী (রা)-কে মসজিদের আঙ্গিনায় এক পা-এর উপর অপর পা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে পাই। তিনি সাবাঈকে তার প্রচারিত কথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সে তার কথা পুনরায় ব্যক্ত করে। তখন হযরত আলী (রা) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বর্ণনা করছ ? (অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে তুমি এটা অবগত হয়েছ যে, যেন তুমি নিজকে নবী হিসেবেই জেনেছ) অথবা আল্লাহ্র কিতাব থেকে অথবা আল্লাহ্র রাসূল থেকে ? সে বলল, না। তখন হযরত আলী (রা) বললেন ঃ তা হলে তুমি কার থেকে এটা বর্ণনা করছ ? সে বলল, নিজের থেকে। তখন তিনি বললেন ঃ যদি তুমি এটা বর্ণনা করতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অথবা আল্লাহ্র কিতাব থেকে অথবা আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষ থেকে, তা হলে আমি তোমাকে হত্যা করতাম। আর যদি এ ব্যাপারে আমার দিকে ইঙ্গিত বা আরোপ করতে, তা হলে আমি তোমাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতাম। তখন তুমি হতে মিথ্যাবাদী। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে এবং তুমি তাদের মধ্যে একজন।

অন্য রিওয়ায়েতে আবুল জুল্লাস (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে একজন যারা আবদুল্লাহ ইব্ন সাবাঈ থেকে মারাত্মক ও ভয়াবহ কথা শুনেছি। তখন আমরা তাকে হযরত আলী (রা)-এর নিকট ধরে নিয়ে আসি। আমরা তাঁকে মসজিদের

ব্যাখ্যা ঃ ইব্ন মাজাহতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মরফূ' হাদীস বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ ঐ পবিত্র সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন, দুনিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ বা ধ্বংস হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এক ব্যক্তি কবরস্থানে যাতায়াত করবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থানে হতাম! এবং দীন সম্পূর্ণ পরীক্ষা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে। আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় পাওয়া এরূপ ধৈর্য পরীক্ষার যুগ হবে এবং এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ হবে যে, মানুষ নিজেই মুখ দ্বারা মৃত্যু কামনা করবে, মৃত ব্যক্তিদের উপর ঈর্ষা করবে এবং মৃত্যুকে স্বীয় জীবনের উপর অগ্রাধিকার দেবে। যদিও দুনিয়ার মহব্বত ও ভালবাসা প্রত্যেক মানুষের স্বভাব ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে এবং কোন সময় ও কোন মূল্যের বিনিময়ে মানুষ দুনিয়াকে হাতছাড়া করা পসন্দ করে না। তবে এটা ঐ সীমা পর্যন্ত যে, দুনিয়ার জীবন সুখ-শান্তি, আনন্দ-উল্লাস ও আসক্তিতে পরিপূর্ণ থাকে এবং সারা দুনিয়া তাদের জন্য দোলনার মত আরামদায়ক হয়ে যায়। নতুবা এ দুনিয়াই শান্তির নীড়ের পরিবর্তে বিপদের ঘরে পরিণত হয়, অশান্তি ও কষ্টের ঘর হয়। অশান্তি ও অস্থিরতার ঠিকানা হয়। তাই মানুষ মৃত্যুকে জীবন থেকে অতি উত্তম বস্তু দেখতে পাবে এবং জীবন থেকে মৃত্যুর মধ্যে শান্তি খুঁজে পাবে।

كِتَابُ التَّفْسِرُ

পবিত্র কুরআনের তাফসীর

٥٠٠ – حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى فَرْوَةَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ اَلم قَالَ اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ وَاَرٰى *

হাদীস নং- ৫০০

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী الم -এর তাফসীর সম্বন্ধে বলেন, اَنَا اللّٰهُ (আমি হই আল্লাহ্)। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَاَرٰى (আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত ও সবচেয়ে বেশি দেখেন)।

ব্যাখ্যা ঃ اَنَا اللّٰهُ এবং اَللّٰهُ اَعْلَمُ এর সংক্ষিপ্ত হলো الم । তাফসীরে সিরাজুম মুনীরে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণিত, الم এর অর্থ اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ (আমি আল্লাহ্ এবং সর্বজ্ঞ) الم এর অর্থ اَنَا اَللّٰهُ وَارٰى (আমি আল্লাহ এবং সব কিছু দেখি) الر এর অর্থ اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ وَاَرٰى (আমি আল্লাহ জানি ও দেখি) অর্থাৎ তিন স্থানে همزه দ্বারা اَنَا এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। لام দ্বারা আল্লাহ্র (اللّٰه) দিকে এবং ميم দ্বারা اَعْلَمُ এর দিকে, راء দ্বারা ارٰى এর ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আঙ্গিনায় এক পা-এর উপর অন্য পা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখতে পাই। হযরত আলী (রা) তাকে তার তার প্রচারিত কথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে তার কথা পুনরায় ব্যক্ত করল। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণনা করছ (অর্থাৎ তুমি কি এটা ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছ) অথবা আল্লাহ্র কিতাব থেকে (পবিত্র কুরআনের উপর বাড়াবাড়ি করছ) অথবা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে [আঁ হযরত (সা)-এর উপর দোষারোপ করে] ? সে বলল, না। তখন হযরত আলী (রা) বললেন ঃ তাহলে কার কাছ থেকে এ কথা বর্ণনা করছ ? সে বলল, নিজের মন থেকে। তখন তিনি বললেন ঃ যদি তুমি বর্ণনার দাবি করতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অথবা তাঁর কিতাব থেকে অথবা তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে, তা হলে আমি তোমার গর্দান দ্বিখন্ডিত করতাম। আর যদি তুমি এ কথা আমার দিকে আরোপ করতে, তাহলে তোমাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতাম এবং তুমি মিথ্যাবাদী বলে প্রচারিত হতে (অর্থাৎ সাক্ষীর যোগ্য হতে পারতে না)। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এটা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে এবং তুমিই তাদের মধ্যে একজন।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মধ্যে মিথ্যাবাদীদের ব্যাখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত্রিশজন উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে তিরমিযী শরীফে একই বিষয়ে বর্ণিত আছে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না হবে। প্রত্যেকেই এ দাবি করবে যে, সে আল্লাহ্র নবী। হযরত সাওবান (রা)-এর বর্ণনায় পূর্ণ ত্রিশজনের সংখ্যা এসেছে। কোন কোন রিওয়ায়েতে, যেমন ইমাম আহমদের রিওয়ায়েতে মিথ্যাবাদীদের সংখ্যা ত্রিশ উল্লেখ করা হয়েছে। তিবরানীর রিওয়ায়েতে সত্তরজনের কথা বলা হয়েছে। তবে এরদ্বারা মূলত অধিক সংখ্যক বুঝানো হয়েছে, কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়।

٤٩٩ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَخْتَلِفُوْنَ اِلَى الْقُبُوْرِ فَيَضَعُوْنَ بُطُوْنِهِمْ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُوْا وَدِدْنَا لَوْكُنَّا صَاحِبَ هذَا الْقَبْرِ قِيْلِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَكُوْنُ قَالَ لَشِدَّةِ الزَّمَانِ وَكَثْرِهِ الْبَلَايَا وَالْفِتَنِ *

হাদীস নং- ৪৯৯

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের উপর এমন একটি যুগ বা সময় আগমণ করবে যে, অসংখ্য লোক কবরে যাতায়াত করবে, কবরের উপর স্বীয় পেট রাখবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থানে হতাম! জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরূপ কেন হবে ? হুযূর (সা) তখন বলেন ঃ যমানার ভয়াবহতা এবং বিপদ-আপদ ও বিশৃংখলার আধিক্যের কারণে এরূপ হবে।

حروف مقطعات সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে যে, এগুলোর কি অর্থ এবং কোন্ রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। জমহুর উলামা, বিশেষ করে চার খলীফার এটাই মত যে, আমরা এগুলোর উপর বিশ্বাস করি। এগুলোর অর্থ ও রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ্ ভাল জানেন।

٥٠١ - حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَبِيْطٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ الضَّحَّاكِ ابْنِ مُزَاحِمٍ فَيَسْأَلُهُ رَجُلٌ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ انَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ - مَا كَانَ اِحْسَانُهُ - قَالَ كَانَ اِذَا رَأَى رَجُلاً مَضِيْقًا عَلَيْهِ وَسَّعَ عَلَيْهِ وَاِذَا رَأَى مَرِيْضًا قَامَ عَلَيْهِ وَاِذَا رَأَى مُحْتَاجًا سَائِلاً قَضَى حَاجَتَهُ *

হাদীস নং- ৫০১

অনুবাদ ঃ হযরত সালমা ইব্ন নাবীত বলেন, আমি যাহহাক ইব্ন মুযাহিমের নিকট ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে انَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ (নিশ্চয়ই আপনাকে নেককার ও মুহসিন লোকদের অন্তর্ভুক্ত মনে হচ্ছে) এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হযরত ইউসুফ (আ)-এর মধ্যে ইহসানের কি ছিল ? তখন তিনি বলেন, যখন তিনি কোন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ লোক দেখতেন, তখন তার দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতেন। যখন কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতেন, তখন তার সেবার জন্য এগিয়ে আসতেন। যখন কোন অভাবী লোক দেখতেন, তখন তাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত তিনটি বিষয়ই নেককাজের উচ্চতম পর্যায় বলে গণ্য। কেননা দরিদ্র, অভাবগ্রস্থ ও অসহায় অবস্থায় মানব জীবন অত্যন্ত অন্ধকার ও বিপদ- আপদে পরিপূর্ণ থাকে। যার ফলে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের সময় আল্লাহ্র যে বান্দা সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তাকে তো রহমতের ফিরিশতা বলে প্রতীয়মান হয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন রোগে আক্রান্ত হয় এবং কোন দৈহিক কষ্টের শিকার হয়, তখন তার দুঃখ-বেদনার কি ঠিকানা, তার চিন্তা, অস্থিরতা এবং অশান্তির কি পরিমাণ। অতঃপর এরূপ দুঃখ ও বেদনার সময় আল্লাহ্র যে বান্দা তার সেবা ও দেখাশোনা করে, তার দৈহিক আরামের জন্য বিভিন্ন বস্তু ও আসবাবপত্র হাযির করে, সে মানবতা, ভদ্রতা, নেকী ও বুযর্গীর উচ্চতম উদাহরণ পেশ করে থাকে। অথবা অন্য কোন বিষয়ে কোন অভাবী লোকের অভাব পূরণ করা তাকওয়া ও নেকীর উচ্চতম স্থান– যা আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দাদের ভাগ্যে হয়ে থাকে।

٥٠٢ - حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى - ثُمَّ قَرَأَ انَّ فِى ذٰلِكَ لاٰيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ الْمُتَفَرِّسِيْنَ *

হাদীস নং-৫০২

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতাকে ভয় কর। কেননা তারা আল্লাহ্র নূর দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ "নিশ্চয়ই এতে রয়েছে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন।"

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ পাকের নূর দ্বারা দেখার দু'টি অর্থ হতে পারে। এটা হতে পারে যে, মুমিন ঈমানের কারণে চেষ্টা-সাধনা ও আত্মসংযমের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্যে পৌছে যেতে পারেন এবং কারামতের (অলৌকিক কাজ) মত কোন কোন ঘটনা ও অবস্থা তাঁর নিকট উদঘাটন হতে পারে। অথবা আল্লাহ্ তাকে সঠিক দলীল ও প্রমাণের আলোকে এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে সহীহ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করেন। যার ফলে তার মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের পারণামদর্শিতা ও দূরদর্শিতা সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সে নিজের জন্য সঠিক পথ অনুধাবন করতে পাবে।

٥٠٣ - حَمَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدُ الْمَالِكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِه تَعَالٰى فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ *

হাদীস নং- ৫০৩

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর ঃ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - (অতঃপর কসম তোমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই আমরা সবার নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব, তারা যা আমল করত)। এরদ্বারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কালেমাকে বুঝানো হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে হাদীসে কিয়ামতের দিন বান্দাদেরকে প্রশ্ন করা হবে এ ব্যাপারে সমর্থন রয়েছে কিন্তু সূরা আর-রাহমানে এটাকে অস্বীকার করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন ঃ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِه اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ (ঐ দিন মানুষ ও জ্বিন থেকে তাদের পাপের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে না)। (৫৫ ঃ ৩৯) সুতরাং পরস্পর বিরোধী আয়াতের ব্যাখ্যা হলো এই যে, হাদীসে বর্ণিত আয়াতে سوال বা প্রশ্নের অর্থ হলো হুশিয়ার করা ও ধমক দেয়া এবং সূরা আর-রাহ্মানে এ প্রশ্নের ব্যাপারে অস্বীকার করা হয়েছে যারদ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় এবং অজ্ঞতা দূর করা যায়। কিন্তু এরূপ প্রশ্ন আল্লাহপাকের শানে উত্থাপন করার (নাউযুবিল্লাহ) কোন অবকাশ নেই।[১]

১. হাদীসে বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে আরো বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সবাইকে তার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে ঐ দিন মানুষ ও জ্বিনকে জিজ্ঞাসা করা হবে না বলে যে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে, পরবর্তী আয়াতে এর ব্যাখ্যা রয়েছে। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, "পাপীদেরকে চেহারা দেখেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে।" (৫৫ ঃ ৪০) সুতরাং দ্বিতীয়বার তাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করার প্রয়োজন হবে না। –অনুবাদক

মজলিসে পরস্পর যৌন সম্ভোগ করতো। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তারা পরস্পর থুথু নিক্ষেপ করতো। মোটকথা তাদের মজলিস এ ধরনের অর্থহীন কাজকর্ম ও অশ্লীল কথাবার্তার কেন্দ্র হিসেবে পরিণত হতো এবং যখন তারা পরস্পর মিলে বসতো, তখন মানবীয় বোধশক্তি হারিয়ে ফেলতো এবং নরপশুতে পরিণত হতো।

٥٠٦ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ قُلْ مِنْ ضُعْفٍ *

হাদীস নং-৫০৬

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম (সা)-এর সামনে এ আয়াত তিলাওযাত করেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً –

তখন নবী করীম (সা) তাকে পুনরায় তিলাওয়াত করতে বললেন। অতঃপর বললেন ঃ এ আয়াতে "ضَعَفَ" শব্দের ض কে পেশ দিয়ে পড়।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত "ضَعَفَ" শব্দে ض এ যবর দিয়ে তিলাওয়াত করেন, তখন হুযূর (সা) তাঁকে বাঁধা প্রদান করেন এবং বলেন ঃ এখানে ض কে পেশ দিয়ে পড়। কেননা কুরায়শদের লা'নতের মধ্যে শব্দটি এরূপই রয়েছে এবং তিলাওয়াতকারীও কুরায়শ, তাই বাঁধা প্রদানই প্রয়োজন ছিল। অথবা আঁ হযরত (সা)-এর এটা সঠিকভাবে জানা ছিল, তাই বাধা দিয়েছেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, ضَعَفَ শব্দে উভয় লোগাত বা উচ্চারণ জায়েয। বুখারী শরীফের শরাহ্ ইরশাদে সারী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ضَعفْ শব্দ আসিম ও হামযার মতে যবর দিয়ে পড়তে হবে এবং এটা তামীযের লোগাত এবং পেশ দিয়ে কুরায়শদের লোগাত। কেউ কেউ বলেছেন ঃ "ضَعفْ" কে যখন পেশ দিয়ে পাঠ করা হয়, তখন দৈহিক দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করা হয় এবং যখন যবরের সাথে পাঠ করা হয় তখন عقل বা জ্ঞানের দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়।

٥٠٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

٥٠٤ – حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زِرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِئِيْلَ مَالَكَ تَزُوْرُنَا اَكْثَرَ مَا تَزُوْرُنَا قَالَ فَاَنْزِلَتْ بَعْدَ لَيَالٍ وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا *

হাদীস নং-৫০৪

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার হযরত জিবরাঈল (আ)-কে বললেন ঃ আপনি কেন আমার সাক্ষাতে বেশি বেশি আগমণ করেন না (বর্তমান অবস্থার চেয়ে আরো বেশি সাক্ষাতের কেন সুযোগ দিচ্ছেন না) ? এর কয়েকদিন পর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا "আমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ ব্যতীত অবতীর্ণ হই না। আমাদের সামনে ও পিছনে যা রয়েছে, তা সমস্ত তাঁরই জন্য।"

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী শরীফেও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। ইবন্ আবি হাতিমের মতে এ আয়াত ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওহী নাযিল বন্ধ থাকে এবং আঁ হযরত (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য অত্যধিক আগ্রহী ও ব্যাকুল ছিলেন।

٥٠٥ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاكَانَ الْمُنْكَرُ الَّذِىْ كَانُوْا يَأْتُوْنَ فِىْ نَادِيْهِمْ قَالَ كَانُوْا يَخْذِفُوْنَ النَّاسَ بِالنَّوَاةِ وَالْحَصَاةِ وَيَسْخَرُوْنَ مِنْ اَهْلِ الطَّرِيْقِ *

হাদীস নং-৫০৫

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে হানী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি ধরনের মন্দ কথা ছিল যা (কওমে লূত) তারা তাদের সভায় করে থাকত। তিনি বললেন ঃ তারা মানুষের উপর ফলের বীচি ও পাথর নিক্ষেপ করতো এবং পথিকদের সাথে ঠাট্টা করতো।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَتَأْتُوْنَ فِى نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ -এর মধ্যে "مُنْكَرْ" এর তাফসীর সম্পর্কে হযরত উম্মে হানী (রা) আঁ হযরত (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন। কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) বলেন, তারা মজলিসে বাতকর্ম করত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, তারা

হাদীস নং-৫০৭

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ (রা) রিওয়ায়েত করেন ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ আয়াতে دُخَانٍ (ধোঁয়া) এবং يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى بطشه (পাকড়াও) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র যুগে সমাপ্ত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ دُخَانْ এবং بَطْشَةَ সম্পর্কে একটি মত হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর মতে উভয় আযাব (ধোঁয়া ও পাকড়াও) নবী করীম (সা)-এর যুগে শেষ হয়ে গেছে। বর্ণিত হাদীস এর সমর্থনে রয়েছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত পূর্ণ ঘটনা এই যে, পর্যায়ক্রমে কুরায়শদের নাফরমানীর কারণে আঁ হযরত (সা) তাদের উপর বদ দু'আ করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর দূর্ভিক্ষ ছড়িয়ে দেন। ফলে অনেক লোক মৃত্যুবরণ করে এবং মানুষ হাড় ও মৃতদেহ খেয়ে জীবন ধারণ করে। দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে প্রত্যেকেই আকাশে ধোঁয়া দেখতে থাকে। পবিত্র কুরআনে ঐ অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءِ....

এরপর হযরত আবদুল্লাহ (রা) পরের আয়াত উল্লেখ করে স্বীয় মতামত পেশ করেছেন, انَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلاً انَّكُمْ عَائِدُوْنَ (যদি এ আযাব পরকালে আগমণ করে, তাহলে পরকালের আযাব কখন দূরীভূত হবে এবং তা কখন স্বীয় অবস্থায় ফিরে যাবে ?) সুতরাং এক দল হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সাথে একমত পোষণ করেন। যেমন মুজাহিদ, আবুল আলীয়া, ইবরাহীম নখঈ, দিহহাক, আতিয়াল আওফী (র) ও অন্যান্যগণ। ইব্ন জারীর (র) এই মত পসন্দ করেন। মোল্লা আলী ক্বারীও স্বীয় মুসনাদের শরাহ্র মধ্যে এ মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

দ্বিতীয় মতের সম্পর্ক ইব্ন আব্বাস (রা)-এর প্রতি। তিনি বলেছেন ঃ উভয় আযাব কিয়ামতের দিন দেয়া হবে। ইব্ন কাসীর এ ধারণার সাথে একমত এবং তাঁদের মাযহাবের স্বপক্ষে "مُبِيْنٌ" শব্দ দ্বারা দলীল নিয়েছেন। অথচ হযরত আবদুল্লাহ-এর রিওয়ায়েতের উপর তা শুধু একটি ধারণা ও সন্দেহযুক্ত বিষয়। অতঃপর يَغْشَى النَّاس এর দ্বারা দলীল পেশ করা হয়। এরদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ আযাব সমস্ত কাফিরের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য, শুধু মক্কার মুশরিকদের উপর নয়। কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা হযরত আবদুল্লাহ্র মাযহাবের দলীল পেশ করে থাকে।

٥٠٨ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَهَبَةِ اللّٰهِ لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ *

হাদীস নং- ৪০৮

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের

সন্তান-সন্ততি তোমাদেরই উপার্জন, তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র দান। আল্লাহ্‌র যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন।

ব্যাখ্যা ঃ হাকিম মুসতাদারাকে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক হাদীস বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী এটার সনদ সহীহ বলেছেন।

٥٠٩ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَكِّيِّ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى الْهَيْعَةَ عَنْ اَبِى قَبِيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُزَنِىِّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا اُحِبُّ اِنْ لِى الدُّنْيَا بِمَا فِيْهَا لِهٰذِهِ الْاٰيَةِ - قُلْ يٰا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا - فَقَالَ رَجُلٌ وَمَنْ اَشْرَكَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ اَشْرَكَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ اَشْرَكَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اِلاَّ وَمَنْ اَشْرَكَ *

হাদীস নং- ৪০৯

অনুবাদ ঃ নবী করীম (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত সাওবান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমি দুনিয়া ও এর ভিতরে যা রয়েছে, তা আল্লাহ পাকের এ আয়াতের পরিবর্তে পসন্দ করি না। আল্লাহ বলেছেন ঃ قُلْ يٰا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا - (হে আমার বান্দাগণ ! যারা তাদের নিজের উপর মাত্রাধিক্য কাজ করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ মার্জনা করে দেবেন।) তখন এক ব্যক্তি বলল, যে ব্যক্তি শিরক করেছে [হে রাসূল (সা) !] এর কি হবে ? তিনি চুপ থাকলেন। লোকটি পুনরায় বলল, যে শিরক করেছে ? এবারও তিনি চুপ থাকলেন। লোকটি আবারও বলল, যে ব্যক্তি শিরক করেছে ? তিনি চুপ রইলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ সতর্ক ও সাবধান হও, যে ব্যক্তি শিরক করেছে (সে ব্যক্তি ক্ষমা পাবে)।

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন অনুলিপিতে اَلاَّ এর পর واو রয়েছে, যেভাবে এ অনুলিপিতে রয়েছে, এবং কোথাও কোথাও নেই। মোল্লা আলী ক্বারী যে অনুলিপির শরাহ লিখেছেন, এতে واو নেই এবং তিনি বলেন, সম্ভবত এখানে اَلاَّ সাবধানতার জন্য, واو পতিত হওয়ার কারণ হয়েছে।

অর্থ এটাই হবে যে, খবরদার! যে ব্যক্তি শিরক করবে, তাকেও ক্ষমা করা হবে। অর্থাৎ যখন শিরক থেকে তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন তার শিরক-এর সমস্ত পাপ মার্জনা করা হবে। এরপর তিনি বলেন ঃ এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, اِلاَّ পৃথক করার জন্য এসেছে। অতঃপর এর অর্থ খুবই স্পষ্ট। কিন্তু অধিকাংশ অনুলিপিতে وَاوَ রয়েছে। ইমাম আহমদের রিওয়ায়েতেও وَاو রয়েছে। উভয় অবস্থায় অর্থ একই হবে।

٥١٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ التَّعَائِبِ الْكَلْبِى عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ وَحْشِيًا لَمَّا قَتَلَ حَمْزَةَ مَكَثَ زَمَانًا ثُمَّ وَقَعَ فِى قَلْبِهِ الاِسْلاَمُ فَاَرْسَلَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِى قَلْبِهِ الاِسْلاَمُ وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُّضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ـ

فَاِنِّى قَدْ فَعَلْتُهُنَّ جَمِيْعًا فَهَلْ لِّى رُخْصَةٌ ـ قَالَ فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ لَهُ - اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

قَالَ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ فَلَمَّا قَرَأَتْ عَلَيْهِ قَالَ وَحْشِى اِنَّ فِى هٰذِهِ الاٰيَةِ شُرُوْطًا وَاَخْشٰى اَنْ لاَ اَتى بِهَا وَلاَ اَحْقَقَ اَنْ اَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا اَمْ لاَ - فَهَلْ عِنْدَكَ شَئٌ اَلْيَنُ مِنْ هٰذَا يَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ فَنَزَلَ جِبْرِئِيْلُ بِهٰذِهِ الاٰيَةِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ـ قَالَ فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الاٰيَةِ وَبَعَثَ اِلٰى وَحْشِىٍّ ـ قَالَ فَلَمَّا قُرِأَتْ لَهُ قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاِنَا لاَ اَدْرِىْ لَعَلِّى اَنْ لاَ اَكُوْنَ فِى

مَشِيَّتِه اِنْ شَاءَ فِى الْمَغْفِرَةِ وَلَوْ كَانَتِ الاٰيةِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ وَلَمْ يَقُوْلُ لِمَنْ شَاءُ كَانَ ذٰلِكَ فَهَلْ عِنْدَكَ شَئٌ اَوْسَعَ مِنْ ذٰلِكَ يَا مُحَمَّدُ (ﷺ) ـ

فَنَزَلَ جِبْرِئِيْلُ بِهٰذِهِ الاٰيةِ قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّه هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ قَالَ فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ بِهَا اِلٰى وَحْشِيٍّ فَلَمَّا قُرِأَتْ عَلَيْهِ قَالَ اَمَّا هٰذِهِ الاٰيةِ فَنِعْمَ ثُمَّ اَسْلَمْ فَاَرْسَلَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ اَسْلَمْتُ فَاْذَنْ لِى لِقَائِكَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ فَلاَ عَنِّى وَجْهَكَ فَاِنِّى اَسْتَطِيْعُ اِنْ مَلأَ مِنْ قَاتِلِ حَمْزَةَ عَمِّىْ قَالَ فَسَكَتَ وَحْشِىٌ حَتّٰى كَتَبَ مُسَيْلَمَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُسَيْلَمَةَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلٰى مُحَمَّدٍ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ اَشْرَكْتَ فِى الاَرْضِ فَلِى نِصْفُ الاَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفُهَا غَيْرَانِ قُرَيْشًا قَوْمٍ يَعْتَدُوْنَ قَالَ فَقَدِمَ بِكِتَابِه اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاَنْ فَلَمَّا قُرِئَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ قَالَ لِلرَّسُوْلَيْنِ لَوْلاَ اِنَّكُمَا رَسُوْلاَنِ لَقَتَلْتُكُمَا ثُمَّ دَعَا بِعَلِىِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ (رض) فَقَالَ اُكْتُبِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ اَلسَّلاَمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَالْعَاقِبَةُ لِّلْمُتَّقِيْنِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ (ﷺ) ـ

قَالَ فَلَمَّا بَلَغَ وَحْشِيًا مَا كَتَبَ مُسَيْلَمَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এ আয়াত লিখে ওয়াহ্শীর নিকট প্রেরণ করেন। যখন তার নিকট এ আয়াত তিলাওয়াত করা হয় (তখন ওয়াহ্শী এ আয়াত শুনে ও বলে) আল্লাহ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে, এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা, তিনি তাকে ক্ষমা করবেন। আমি জানি না, আমি কি আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের মধ্যে আছি, যদি তিনি ক্ষমা প্রদর্শন করতে ইচ্ছা করেন। যদি আয়াত এরূপ হতো وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ "এ ছাড়া অন্যান্য পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন" এবং لِمَنْ يَّشَاءُ বাক্যটি যদি সংযোজন না করা হতো, তা হলে বিষয়টি ঠিক হতো।

অতঃপর ওয়াহ্শী বললো ঃ হে মুহাম্মদ (সা) ! আপনার নিকট কি এর চেয়েও ব্যাপকতর আল্লাহ্র কোন বিধান আছে ? তখন হযরত জিবরাঈল (আ) এ আয়াত নিয়ে নাযিল হলেন ঃ

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

"(হে নবী!) আপনি আমার ঐ বান্দাদেরকে বলুন, যারা তাদের নিজেদের উপর মাত্রাধিক্য আচরণ করেছে, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত পাপ মার্জনা করে দেবেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

বর্ণনাকারী বলেন, এবারও রাসূলুল্লাহ (সা) এ আয়াতটি লিখে ওয়াহ্শীর নিকট প্রেরণ করেন। যখন এ আয়াতটি তার সামনে তিলাওয়াত করা হয়, তখন সে বললো, হাঁ, এবার আয়াতটি ঠিক আছে, অতি উত্তম আয়াত। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ সংবাদ নিয়ে একটি লোক প্রেরণ করেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। সুতরাং আমাকে আপনার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে এটা বলে পাঠালেন যে, তোমার চেহারা তুমি দেখাবে না। কেননা এটা সহ্য করতে পারব না যে, আমি আমার চাচা হামযার হত্যাকারীকে চোখভরে দেখি। তখন ওয়াহ্শী চুপ হয়ে গেলেন। এ সময় মুসায়লামা কায্যাব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটএ শিরোনামে একটি পত্র প্রেরণ করে ঃ "মুসায়লামা রাসূলুল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর নিকট। আম্মাবাদ! নিশ্চয়ই আমি শরীক করেছি জমিতে (আরবভূমিতে) অর্ধেক ভূমি আমার জন্য এবং অর্ধেক কুরায়শদের জন্য, কিন্তু কুরায়শগণ এরূপ কওম যারা সীমাতিক্রম (সমস্ত কিছু ভোগ-দখল করতে চায়) করে।" তার এ পত্রটি দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে নিয়ে আসে। যখন পত্রটি তাঁর সামনে পাঠ করা হলো, তখন তিনি পত্রবাহক দু'জনকে বললেন ঃ যদি তোমরা দূত বা বাহক হিসেবে আগমণ না করতে, তা হলে আমি তোমাদের দু'জনকেই হত্যার ব্যবস্থা করতাম। অতঃপর তিনি হযরত আলী ইব্ন আবি তালিব (রা)-কে ডাকালেন এবং তাকে লিখার নির্দেশ প্রদান করেন ঃ"বিসমিল্লাহির রাহমানির

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْرَجَ لِلدِّرَاعِ فَصَقَلَهُ وَهَمَّ بِقَتْلِ مُسَيْلَمَةَ فَلَمْ يَزَلْ عَلَى عَزْمٍ ذٰلِكَ حَتّٰى قَتَلَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ *

হাদীস নং- ৫১০

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, যখন ওয়াহ্শী ইব্ন হারব হযরত হামযা (রা)-কে শহীদ করে, এরপর সে দীর্ঘদিন কুফরীর উপর বহাল থাকে। অতঃপর তার অন্তরে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা জাগে। তখন এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতের (এ পয়গাম নিয়ে) প্রেরণ করে যে, আমার অন্তরে ইসলামের আলো প্রবেশ করেছে। আমি শুনেছি, আপনি আল্লাহপাকের এ কালাম বর্ণনা করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُّضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا -

"যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে মা'বূদ হিসেবে মান্য করে না, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না, তারা ব্যভিচার করে না, যারা এ সমস্ত কাজ করবে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে অধিক শাস্তি প্রদান করা হবে। অনন্তকাল তারা ঐ আযাবে অপমানিত ও অপদস্থ হতে থাকবে।"

(অতঃপর ওয়াহ্শী বলে) আমি এ সমস্ত কিছুই করেছি, তাই আমার জন্য কি মুক্তির কোন উপায় আছে ? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হযরত জিবরাঈল (আ) নাযিল হয়ে বললেন ঃ হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি তাকে বলে দিন ঃ

اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

"কিন্তু যে ব্যক্তি (শিরক থেকে) তওবা করবে এবং বিশ্বাস স্থাপন করবে, নেককাজ করবে, তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ব্যক্তিদের (অতীত) পাপসমূহ (বর্তমান) নেকীসমূহের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এ আয়াত ওয়াহ্শীর নিকট প্রেরণ করেন। যখন এ আয়াত ওয়াহ্শীর নিকট তিলাওয়াত করা হয়, তখন সে বললো ঃ এ আয়াতে কয়েকটি শর্ত রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে আমি ভয় করছি যে, আমি এগুলো সম্পন্ন করতে পারব না এবং এটাও আমি সঠিকভাবে জানি না যে, আমি নেক আমল করতে পারব কি পারব না। সুতরাং হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার নিকট কি এরচেয়েও কোন সহজ উপায় আছে ?

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হযরত জিবরাঈল (আ) এ আয়াত নিয়ে নাযিল হলেন ঃ

রাহীম, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূলের পক্ষ থেকে মুসায়লামা কায্‌যাবের নিকট, যে সত্যপথে আছে, তার উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক। আম্মাবাদ! অতঃপর নিশ্চয়ই জমি বা ভূমি (সাম্রাজ্য) আল্লাহ্‌র জন্য। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে এর অংশীদার বা মালিক বানিয়ে দেন। আল্লাহভীরুদের জন্য পরিণাম কল্যাণময়। আল্লাহ্ তা'আলা রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর।" রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মুসায়লামার এ পত্রের কথা যখন ওয়াহ্‌শী অবগত হলেন, তখন তিনি তার বর্শা বের করে ধার করলেন এবং মুসায়লামাকে হত্যার পরিকল্পনা ও নিয়্যত করলেন। আর এ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে ইয়ামামার যুদ্ধে (ওয়াহ্‌শী) তাকে হত্যা করেন।

ব্যাখ্যা ঃ ইরশাদে সারীয়া এবং তাফসীরে সিরাজুম-মুনীরে বর্ণিত আছে, যখন ওয়াহ্‌শীর এ ঘটনা সংঘটিত হলো, তখন লোকজন আঁ হযরত (সা)-এর নিকট আরয করলেন, আল্লাহ্‌র এ বিধান কি ওয়াহ্‌শীর জন্য নির্ধারিত অথবা সবার জন্য ? তখন তিনি বললেন ঃ এ বিধানে সমস্ত মুসলমান অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা উপদেশ গ্রহণের বিষয় যে, ইসলামে রহমত ও দয়া কত ব্যাপক যে, যখন আন্তরিকতার সাথে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তার ছোট বড় সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং ঈমান আনয়নকারী কাফির এবং মুমিনদের অন্তর আনন্দিত করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সম্মিলিত মত হলো এই যে, গুনাহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রায় ও ইচ্ছা হলো শর্ত। অভিপ্রায় হওয়ার পর মুমিনদের গুনাহ তওবা ছাড়া ক্ষমা হয়ে যায়।

٥١١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّعْرَاءِ مِنْ اَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَخْرُجَنَّ بِشَفَاعَتِى مِنْ اَهْلِ الايْمَانِ مِنَ النَّارِ حَتّٰى لاَ يَبْقى فِيْهَا اَحَدٌ اِلاَّ اَهْلُ هٰذِهِ الايَةِ مَاسَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَم نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتّٰى اَتَانَا الْيَقِيْنَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ يُعَذِّبُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَقْوَامًا مِنْ اَهْلِ الايْمَانِ ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى لاَ يَبْقٰى اِلاَّ مَنْ ذَكَرَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى مَاسَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ اِلَى الشَّافِعِيْنَ *

হাদীস নং- ৫১১

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার শাফাআতে ঈমানদারগণ দোযখ থেকে বের হয়ে যাবে। এমন কি বিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ দোযখে বাকী থাকবে না, শুধু ঐ ব্যক্তিগণ বাকী থাকবে যাদেরকে এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে ঃ

مَاسَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتّٰى اَتَانَا الْيَقِيْنُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ ـ

"কোন্ বস্তু তোমাদেরকে দোযখে টেনে নিয়ে এসেছে ? (দোযখবাসী) বলবে, আমরা নামাযী ছিলাম না, মিসকীনদের আহার করাইনি, বিতর্ককারীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছি, আমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছি কিয়ামতের দিনকে, এভাবে আমাদের নিকট মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং কোন শাফাআতকারীর শাফাআত তাদের উপকারে আসবে না।"

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ ঈমানদারগণের মধ্যে অনেক কওমকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন শাস্তি প্রদান করবেন। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সুপারিশে তাদেরকে দোযখ থেকে বের করা হবে। এমনকি দোযখে একটি লোকও (ঈমানদার) বাকী থাকবে না, তবে (ঐ সমস্ত লোক বাকী থাকবে) যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে সম্বোধন করেছেন ঃ

مَاسَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتّٰى اَتَانَا الْيَقِيْنُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ ـ

"কি সে তোমাদেরকে দোযখে নিয়ে এসেছে, তারা বলবে আমরা নামাযী ছিলাম না, মিসকীনদেরকে আহার করাইনি, বিতর্ককারীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম, কিয়ামতের দিনকে মিথ্যা বলেছি, এভাবে আমাদের নিকট মৃত্যু এসেছে। সুতরাং কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না।"

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদা ও বিশ্বাসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ হাদীস মু'তাযিলা ও মুরজিয়া উভয় দলের বাতিল আকাইদের মূলোৎপটন করে দিয়েছে। মু'তাযিলা এ ধারণা পোষণ করে যে, কবীরা গুনাহ্কারী অনন্তকালের জন্য দোযখে থাকবে, বেহেশতের বাতাসও তারা পাবে না। মুরজিয়াগণ এর বিপরীতে এ ধারণা পোষণ করে যে, যারা শুধু কালেমা পাঠ করেছে, তারা যেন দোযখ থেকে মুক্তির সনদ লিখে নিয়েছে। এরা শুধু বেহেশ্তী। কিন্তু এ হাদীসদ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ উম্মতে মুসলিমার ফাসিক ও ফাজির দোযখের আযাব ভোগ করবে। অতঃপর আঁ হযরত (সা)-এর সুপারিশে তারা পর্যায়ক্রমে দোযখ থেকে বের হবে। ফলে শুধু কাফির ও মুশরিকই এতে বাকী থাকবে। আয়াতে করীমায় যার উল্লেখ করা হয়েছে।

٥١٢ - حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ لاَ يَبْقى فِى النَّارِ اِلاَّ مَنْ زَكَرَهُ اللّٰهُ فِى هٰذِهِ الاٰيةِ مَاسَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ اِلَى الشَّافِعِيْنَ *

হাদীস নং-৫১২

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, দোযখে একজন ব্যক্তিও বাকী থাকবে না। তবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন ঃ مَاسَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ اِلَى الشَّافِعِيْنَ -

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٥١٣ - حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ قَالَ الْحُقَبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً مِنْهَا سِتَّةُ اَيَّامٍ عَدَدَ اَيَّامِ الدُّنْيَا *

হাদীস নং-৫১৩

অনুবাদ ঃ আবূ সালিহ (র) থেকে বর্ণিত, আয়াত لاَبِسِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا (সেখানে থাকবে তারা অনেক হুকবা) এক হুকবার পরিমাণ আশি বছর যার ছ'দিন দুনিয়ার সমস্ত দিনের সমান।

ব্যাখ্যা ঃ মোল্লা আলী ক্বারী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হয়ত এ ছ'দিন দ্বারা আসমান ও যমীন সৃষ্টির ছ'দিন বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوات وَالاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ (তিনি ঐ পবিত্র সত্তা যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছ' দিনে তৈরি করেছেন।) অথবা দুনিয়ার সমগ্র বয়স ছ'দিনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা রিওয়ায়েতের দৃষ্টিকোণ থেকে عمر دنيا সাত দিন মেনে নেয়া হয়েছে। প্রত্যেক দিন হবে এক হাযার বছরের এবং এরূপ বর্ণিত আছে যে, সর্বশেষে ঐ নাফরমান মুসলমান, যাকে দোযখ থেকে বের করা হবে, তাকে সাত হাযার বছর পর বের করা হবে। অর্থাৎ সে عمر دنيا বা দুনিয়ার সামগ্রিক বয়সের সমান শাস্তি ভোগ করবে এবং এরও হিসাব করা হবে যে, এটা আমাদের উম্মতের যে হাযার বছর সমাপ্ত হয়েছে, এটা যেন দুনিয়ার বয়সের এক-সপ্তমাংশ দিন ছিল। সুতরাং এ হিসেবে সাত দিনের উপর কিছু কম ধরা হবে, যেটা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পাঁচশ' থেকে অধিক ঘাটতি বা হ্রাস পাবে না। কিন্তু এটা অনুমানভিত্তিক, যার উপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। এটা আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন যে, এ চলমান পৃথিবী আর কত দিন স্থায়ী হবে।

٥١٤ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ قَرَأَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ *

হাদীস নং-৫১৪

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ যুবায়র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى আয়াতে তিলাওয়াত করা হলে তিনি বলেন ঃ এরদ্বারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কলেমাকে বুঝানো হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্পাকের বাণী فَاَمَّامَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى (অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে এবং তাকওয়া অর্জন করে, আর সত্য মানে ভাল ও উত্তম কথাকে।) এখানে بِالْحُسْنٰى দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে كلمه توحيد । কেননা সমস্ত উত্তম ও সৌন্দর্যের মূল হলো কালেমায়ে তাওহীদ। এ ছাড়া কোন নেককাজ কার্যকর হবে না। তাফসীরের কিতাবে حسنى শব্দের আরো তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ ফরয ইবাদত, সওয়াব, বেহেশত ইত্যাদি।

كِتَابُ الْوَصَايَا وَالْفَرَائِضِ

ওসীয়ত ও ফারাইযের বর্ণনা

٥١٥ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ (رض) قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُ فِى مَرَضٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُوْصِىْ بِمَالٍ كُلِّهِ قَالَ لاَ - قُلْتُ فَنِصْفَهُ قَالَ لاَ - قُلْتُ فَثُلُثَهُ قَالَ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ لاَ تَدَعُ اَهْلَكَ يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ -

وَفِى رِوَايَةٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُوْدُ - قَالَ اَوَصَيْتَ قَالَ نَعَمْ اَوْصَيْتُ بِمَالِى كُلِّهِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاقِصُهُ حَتّٰى قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِى فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُوْصِىْ بِمَالِىْ كُلِّهِ قَالَ لاَ - قُلْتُ فَبِالنِّصْفِ قَالَ لاَ - قُلْتُ فَبِالثُّلُثِ - قَالَ فَبِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَنْ تَدَعَ اَهْلَكَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ *

হাদীস নং- ৫১৫

অনুবাদ ঃ হযরত সাআদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার অসুস্থতার সময় আমাকে দেখার জন্য আগমণ করেন। তখন আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার সমস্ত মাল ও সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ওসীয়ত করতে চাই। তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম, তা হলে এর অর্ধেক। তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন ঃ এক-তৃতীয়াংশও অনেক। স্বীয় পরিবারবর্গকে এ অবস্থায় ত্যাগ করে যেও না, যাতে তারা মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়ায়।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সাআদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর অসুস্থতার সময় তাঁকে দেখার জন্য তাঁর নিকট গমন করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ওসীয়ত করেছ? হযরত সাআদ (রা) বলেন, জ্বি হাঁ! আমি আমার সমস্ত সম্পদ ওসীয়ত করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বারবার এর পরিমাণ হ্রাস করতে থাকেন। অবশেষে হযরত সাআদ (রা) এক-তৃতীয়াংশের কথা বললেন। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ এক-তৃতীয়াংশও অধিক।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত সাআদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার অসুস্থতার কারণে আমাকে দেখার জন্য আগমণ করেন। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার সম্পূর্ণ সম্পদ ওসীয়ত করে যাচ্ছি। তিনি বললেন ঃ না। আমি তখন বললাম, তাহলে অর্ধেক। তিনি বললেন ঃ না। আমি পুনরায় বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ, তবে এটাও অধিক। কেননা তোমার পরিবারবর্গকে সম্পদশালী রেখে যাওয়া উত্তম এর থেকে যে, তুমি তাদেরকে দরিদ্র রেখে যাবে এবং তারা লোকজনের কাছে সাহায্যের জন্য হাত প্রসারিত করবে।

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এক-তৃতীয়াংশ মাল পর্যন্ত ওসীয়ত করা জায়েয, এর চেয়ে বেশি জায়েয নয়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এর চেয়ে কম করা উচিত এবং আঁ হযরত (সা)-এর উপরোক্ত বাণী দলীল হিসেবে পেশ করে বলেন, এখানে তিনি বলেছেন ঃ الثلث كثير (এক-তৃতীয়াংশও অনেক)। সুতরাং এক দল এই মত অনুসরণ করেন। অন্য দল বলেন, এক-তৃতীয়াংশের কম না করা উচিত। কেননা যদি ওসীয়ত এক-তৃতীয়াংশের কম করা নফল হিসেবেও জায়েয হতো, তাহলে তিনি হযরত সাআদ (রা)-কে এক-তৃতীয়াংশের কম করার কথা বলতেন। বায়হাকী তাঁর সুনানে হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ ওসীয়ত এক-তৃতীয়াংশ একটি মধ্যম অংশ, তাই এর চেয়ে কম বা বেশি হওয়া উচিত নয়।

٥١٦ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمِ النَّصْرَانِىَّ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدَهُ اَوْ اُمَّتَه *

হাদীস নং-৫১৬

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুসলমান একজন নাসারা বা খ্রীস্টানের উত্তরাধিকার হতে পারবে না। তবে যদি নাসারা মুসলমানের গোলাম অথবা দাসী হয়।

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে উত্তরাধিকারের মাসয়ালার ব্যাখ্যা হলো এই যে, কাফির মুসলমানের উত্তরাধিকার হতে পারবে না, এ ব্যাপারে সবার ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু মুসলমান কাফিরের উত্তরাধিকার হতে পারবে কিনা এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। জমহুর সাহাবা,

তাবেঈন ও চারজন ইমামের মত হলো এই যে, মুসলমান কাফিরের উত্তরাধিকার হতে পারবে না। তাঁদের দলীল বর্ণিত হাদীসসহ এরূপ আরো হাদীসসমূহ যাতে সুস্পষ্টভাবে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। তবে নাসারা পুরুষ যদি গোলাম হয় অথবা মহিলা যদি দাসী হয়, তবে (এটা হতে পারবে)।

হযরত মুয়ায ইব্ন জাবাল, হযরত মুআবিয়া, হযরত সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (রা) এবং মাসরূক (র) এবং মতে ওয়ারিস হতে পারবে। তাঁরা দলীল হিসেবে এ হাদীস পেশ করেন ঃ اَلاسْلاَمُ يَعْلُوْا وَلاَ يُعْلٰى (ইসলাম বিজয়ী হয়, পরাজিত হয় না)। কিন্তু এ দলীল অত্যন্ত দুর্বল। কেননা এ হাদীসে শুধু ইসলামের ফযীলতের উল্লেখ রয়েছে, উত্তরাধিকারের ব্যাপারে নয়। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত মাযহাবের পেশকৃত হাদীসে উত্তরাধিকারের বিষয়ে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া ইরশাদে সারীয়া (ارشاد ساريه) গ্রন্থে বলা হয়েছে, নাসারা যদি মুসলমানের গোলাম হয়, তাহলে নাসারার মৃত্যুর পর মুসলমান মনিব তার সম্পদের হকদার বা মালিক এ জন্য হয়ে থাকে যে, গোলামের মালের মালিক সে নয়, বরং প্রকৃত অর্থে তা অভিভাবকের। সুতরাং মুসলমান অভিভাবক হওয়ার কারণে তার মালের দাবিদার হয়ে থাকে, উত্তরাধিকার হিসেবে নয়।

٥١٧ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ *

হাদীস নং-৫১৭

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা মীরাসের নির্ধারিত অংশ এর হকদারকে প্রদান কর এবং যা অতিরিক্ত থাকে, তা নিকট-আত্মীয়কে (আসাবা হিসেবে, প্রাপ্ত বয়স্ক হোক অথবা অপ্রাপ্ত) দিয়ে দাও।

ব্যখ্যা ঃ আসহাবুল ফুরুয ঐ সমস্ত নিকট-আত্মীয়, যাদের অংশ নির্ধারিত এবং কুরআন ও হাদীসে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ অংশ হলো ৬টি ঃ $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{১}{৪}$, এবং $\frac{১}{৬}$। এগুলোর হকদার হলো– মা, বাবা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, এরা সংখ্যায় বারো, চারজন পুরুষ এবং আটজন নারী। এর থেকে উদ্বৃত্ত অংশ আসাবাগণ পেয়ে থাকে।

٥١٨ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ اَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ اَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا فَمَاتَ فَتَرَكَ ابْنَةً فَاَعْطَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاِبْنَةَ النِّصْفَ وَاَعْطٰى ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ *

হাদীস নং-৫১৮

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ (র) থেকে বর্ণিত, হযরত হামযা (রা)-এর কন্যা একটি গোলাম আযাদ করেন। এরপর উক্ত গোলাম মৃত্যুবরণ করে এবং সে একটি কন্যা সন্তান রেখে যায়। তখন নবী করীম (সা) তার কন্যাকে তার সম্পত্তির অর্ধাংশ প্রদান করেন এবং হযরত হামযা (রা)-এর কন্যাকে বাকী অর্ধেক দান কারেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ গোলাম আযাদকারী মহিলা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদের কন্যার আত্মীয় ছিলেন। কারো কারো মতে আযাদকারী স্বয়ং হযরত হামযা (রা) ছিলেন। দারে কুতনীর রিওয়ায়েত দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ হলো এই যে, আযাদকারিণী ছিলেন তাঁর কন্যা, তিনি আযাদকারী ছিলেন না। সুতরাং হাদীসের দ্বারা এ মাসায়ালা প্রমাণিত হয় যে, مولى العتاقة যাকে আসাবায়ে সাবাবীয়া (عصبه سببيه) বলা হয়, আসাবা হওয়ার কারণেই উত্তরাধিকারের হকদার হয়ে থাকে। ذوى الارحام এর উপর তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। অবশ্য عصبه نسبيه থেকে এর মর্যাদা একটু কম। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীস দ্বারা এটাও প্রতীয়মান হয় যে, مولى العتاقة (আযাদকারী মনিব)-এর মধ্যে পুরুষ হোক বা নারী, সেই حق ولا বা আযাদকারী হিসেবে উত্তরাধিকার লাভ করবে।

٥١٩ - اَبُو حَنِيْفَةَ عَنِ الهَيْثَمِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِى بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا - عَدَلَ مِنْ كَانَ يَعْقُوْلُ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى فَلَمْ يَقْرَبُوْهَا وَشَقَّ عَلَيْهِمْ حِفْظُهَا وَخَافُوْا الاِثْمِ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ فَنَزَلَتِ الاٰيةِ فَخَفَّفَ عَلَيْهِمْ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ الاٰية *

হাদীস নং-৫১৯

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ যখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِى بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

"নিশ্চয়ই যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ খেয়ে থাকে অর্থাৎ ভোগ করে, তারা যেন তাদের পেটে অগ্নি খেল এবং তারা অচিরেই দোযখে প্রবেশ করবে।"

সুতরাং যারা ইয়াতীমের সম্পদ দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ করে, তারা যেন ঐ সমস্ত মাল থেকে দূরে থাকে, এ মাল হিফাযত করা তাদের উপর কঠিন হয়ে যায়। কেননা তারা এ ব্যাপারে নিজের পাপে লিপ্ত হওয়ার ভয় করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذُوْحَسْرَةٍ وَنَدَامَةٍ *

হাদীস নং- ৫২১

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন হবে অনুতাপ ও অনুশোচনার দিন।

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা)-এর বাণীদ্বারা মূলত আল্লাহ্পাকের এ আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ (আপনি তাদেরকে অনুতাপের দিন সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) ভয় প্রদর্শন করুন। যখন সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়ে যাবে।) প্রকৃতপক্ষে কিয়ামতের দিন কাফির-মুশরিক এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ফাসিক, ফাজির ও বদকার স্বীয় পূর্ববর্তী পাপ ও অন্যায় কাজকর্মের জন্য অনুতাপ করতে থাকবে, অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে, দুঃখ ও কষ্টে হাত কামড়াবে। কিন্তু কিছুই করতে পারবে না। এরূপ অনুতাপ যদিও বেহেশতাবাসীদেরও হবে কিন্তু তা হবে অন্য পদ্ধতিতে এবং অন্য প্রকারে। তিবরানী ও বায়হাকীতে হযরত মাআয (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

لَيْسَ تَحْمِلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ عَلٰى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهَا ـ

"কিয়ামতের দিন বেহেশবাসীগণ কোন বস্তুর জন্যই অনুতাপ করবেন না, তবে ঐ মুহূর্তের জন্য যা (দুনিয়াতে) অতিবাহিত করেছেন কিন্তু সে সময় আল্লাহ্র যিকির করেননি।"

এটা মূলত অনুতাপ ও অনুশোচনা নয়, বরং অধিক পুরস্কার ও সওয়াব লাভের কামনা ও বাসনা।

٥٢٢ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْقِيَامَةَ ذُوْحَسْرَةٍ وَنَدَامَةٍ *

হাদীস নং-৫২২

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামত হবে অনুতাপ ও অনুশোচনার দিন।

٥٢٣ – اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ مِنَ الْجَنَّةِ مَدِيْنَةً مِنْ مِسْكٍ اُذْفَرَ مَاؤُهَا السَّلْسَبِيْلُ وَشَجَرُهَا خُلِقَتْ مِنْ نُوْرٍ فِيْهَا حَوْرٌ حِسَانٌ عَلٰى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعُوْنَ ذُوَابَةً ـ لَوْ اَنَّ وَاحِدَةً مِّنْهَا

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ الاية -

"তারা আপনার নিকট ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি তাদেরকে বলুন, তাদের জন্য মীমাংসা করা হলো উত্তম। যদি (ব্যয় ইত্যাদিতে) তাদের সাথে মিলে মিশে থাকে, তা হলে তারা তোমাদের ভাই।"

ব্যাখ্যা ঃ আবূ দাউদে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে এর আরো অতিরিক্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتَامٰى اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ - اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا الاية -

"তোমরা ইয়াতীমের মালে নিকট হয়ো না। হাঁ, তবে যা তাদের জন্য উত্তম এবং নিশ্চয়ই যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে ..... ।"

তখন যার যার অভিভাবকত্বে কোন ইয়াতীম ছিল, তারা সেখানে গিয়ে ইয়াতীমদের পানাহার তাদের থেকে পৃথক করে ফেলে। সুতরাং যখন ইয়াতীমদের খাদ্যদ্রব্য অতিরিক্ত হয়ে যেত, তখন এভাবেই রেখে দিত তখন ইয়াতীমগণ তা খেয়ে ফেলত অথবা তা নষ্ট হয়ে যেত। কাজেই এ সংবাদ যখন আঁ হযরত (সা)-এর নিকট জানান হলো, তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন ঃ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى

অতঃপর অভিভাবকগণ ইয়াতীমদেরকে তাদের পানাহারের মধ্যে শরীক করে নেয়।

٥٢٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ *

হাদীস নং-৫২০

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বালিগ হওয়ার পর কেউ ইয়াতীম থাকে না।

ব্যাখ্যা ঃ ইয়াতীম তাকেই বলা হয় যার পিতা মৃত্যুবরণ করেছে এবং এখনো সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সে আর ইয়াতীম থাকে না।

كِتَابِ الْقِيَامَةِ وَصِفَةِ الْجَنَّةِ

কিয়ামত, ও জান্নাতের গুণাবলী অধ্যায়

٥٢١ - اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ عَنْ

اَشْرَقَتْ فِى الاَرْضِ لاَ ضَاءَتْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَمَلأَتْ مِنْ طِيْبِ رِيْحِهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَنْ هٰذَا قَالَ لِمَنْ كَانَ سَمْحًا فِى التَّقَاضٰى ـ

وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ لَوْان وَاحِدَةً مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ اَشْرَقَتْ لاَ ضَاءَتْ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَمَلأَتَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ مِنْ طِيْبِهَا ـ

وَفِى رِوَايَةٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ مَدِيْنَةً خُلِقَتْ مِنْ مِسْكٍ اَذْفَرَ مُعَلَّقَةً تَحْتَ الْعَرْشِ وَشَجَرَ مِنَ النُّوْرِ وَمَاؤُهَا السَّلْسَبِيْلُ وَحُوْرٌ عِيْنٌ خُلِقَتْ مِنْ نَبَاتِ الْجَنَانِ عَلٰى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَبْعُوْنَ ذُوْابَةً لَوْاَنْ وَاحِدَةً مِّنْهُنَّ عَلَقَتْ فِى الْمَشْرِقِ لاَ ضَاءَتْ اَهْلُ الْمَغْرِبِ *

হাদীস নং-৫২৩

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতের মধ্যে মিশ্ক-আম্বরের এক শহর তৈরি করেছেন, যার পানি হলো সুমিষ্ট ও সুপেয়, বৃক্ষসমূহ হবে নূরের তৈরি, সেখানে থাকবে অপূর্ব সুন্দরী হুরগণ, যাদের সত্তরটি করে চুলের গোছা হবে। এদের মধ্যে যদি একজনও দুনিয়াতে নূর বিকীরণ করে, তা হলে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত আলোয় আলোকিত হয়ে যাবে এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের মধ্যবর্তী স্থানে তাদের সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়বে। লোকজন আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এগুলো কাদের জন্য ? আঁ হযরত (সা) বললেন ঃ যারা কর্জ আদায়ের ব্যাপারে একটু সহজ ও সহানুভূতিশীল হয়।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, হুযূর (সা) বলেছেন ঃ বেহেশতে এ হুরদের মধ্যে যদি একজন ভূপৃষ্ঠে আগমণ করে, তা হলে এর পূর্ব থেকে পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান সম্পূর্ণ আলোকময় হয়ে উঠবে এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের মধ্যবর্তী স্থান তার সুগন্ধে সুবাসিত হয়ে যাবে।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত উম্মে হানী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মিশক-আম্বর দ্বারা একটি শহর তৈরি করেছেন যা আরশের নিচে লটকানো অবস্থায় আছে। এর বৃক্ষসমূহ নূরের তৈরি, পানি হলো সুমিষ্ট। এতে রক্ষিত হুরগণ বেহেশতের ঘাস থেকে তৈরি। এদের প্রত্যেকের সত্তরটি করে চুলের বেণী বা গুচ্ছ হবে। যদি

তাদের মধ্যে একজনকে পূর্ব দিগন্তে লটকিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তা পশ্চিম দিগন্তের সমস্ত কিছুই আলোকময় করে দেবে।

ব্যাখ্যা ঃ বেহেশত ও বেহেশতের সৃষ্টি সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। খতীবও তাঁর তারীখে বোগদাদীর মধ্যে হযরত আনাস (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হুরগণকে জা'ফরান দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। তিবরানী কবীরে একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্ন মারদুবীয়া হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ফিরিশতাগণের তাসবীহ্ থেকে হুরগণের সৃষ্টি হয়েছে। তিবরানী হযরত সাঈদ ইব্ন আমির (রা) থেকে মরফূ হাদীস বর্ণনা করেন, যদি বেহেশতের নারীদের (হুরগণের) মধ্য হতে কোন নারী (হুর) ভূপৃষ্ঠে স্বীয় আলো ফেলে, তা হলে ভূপৃষ্ঠ মিশকের সুগন্ধে ভরপুর হয়ে যাবে এবং চন্দ্র-সূর্য স্বীয় আলো ত্যাগ করবে।

ইমাম গাযালী (র) মিন্হাজুল আবেদীন গ্রন্থে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, একবার সুফয়ান সওরীর কোন ছাত্র তাঁকে বললেন ঃ হযরত! আপনি দীনি মাসায়েলের বিশ্লেষণ ও গবেষণার কাজে এমন গভীরভাবে নিয়োজিত থাকেন যে, আপনার বাহ্যিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করলে আপনার জন্য আফসোস হয়। যদি আপনি পরিশ্রম একটু হ্রাস করেন এবং দীনি গবেষণার কাজ সামান্য কম করেন, তাহলেও আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান অনুযায়ী কাজ চলবে। তখন তিনি বললেন ঃ কেন আমি আমার জীবন ইলমের গবেষণার ব্যয় করব না, যখন এ বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস আমি জ্ঞাত হয়েছি যে, বেহেশতবাসী তাদের জন্য নির্ধারিত বেহেশতে অবস্থান করবে, তখন হঠাৎ বিরাট এক নূরের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়বে, যার ফলে আটটি বেহেশত আলোকময় হয়ে পড়বে। অনিবার্য কারণে বেহেশতবাসী এ ধারণা করবে যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার নূরের দ্যুতি। সুতরাং সবাই এর সামনে মাথা নত করে সিজদা করবে। তখন অদৃশ্য থেকে আওয়ায হবে যে, তোমরা নিজেদের মাথা উঠাও, ধোকা খেও না। এটা প্রভুর নূর নয়, এটা হলো বেহেশতের এক হুরের দ্যুতি যে তার স্বামীর সামনে হেসে দিয়েছিল। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে সে বেহেশ্তে যাওয়ার তৌফিক দিন। আমীন ।।

ইফাবা/২০০১-২০০২—প্র/৮০৫৮/(উ)—৩২৫০